

শ্রী শ্রীরাধারমণো জয়ন্তি ।

# ভক্তি ।

১ম সংখ্যা—৮ম বর্ষ ।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী ।

ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তিভক্তস্ত জীবনম্ ॥

## প্রার্থনা ।

নমস্তে মঙ্গলাধার সর্বমঙ্গল কারণ,  
শান্তি স্বরূপ ভক্তিশ, শান্তিঃ ভক্তিঃ প্রযচ্ছমে ।

হে মঙ্গলাধার ! হে সর্বমঙ্গল কারণ ! তোমায় নমস্কার, হে ভক্তির সীমার  
শান্তিময় প্রভু ! তোমায় নমস্কার, তুমি ভক্তি ও শান্তি প্রদান করিয়া আমাকে  
সুভাগ্য কর ।

হে আনন্দময় বিশ্বব্যাপী বিভো ! তুমি সকলকেই মঙ্গলের পথে লইয়া  
যাইতেছ। পিতা যেমন পুত্রদিগের মঙ্গলের জন্ত স্বভাবানুসারে কাহাকে মিষ্ট  
বাক্যে এবং কাহাকেও বশপীড়ন পূর্বক সংপথে আনয়ন করেন, সেইরূপ তুমি  
সম্পদ ও বিপদে শান্তি ও অশান্তির মধ্য দিয়া সকলকেই মঙ্গলের পথে লইয়া  
যাইতেছ, কিন্তু মজ্ঞান আমরা, তোমার এই অপকৃপাত বিচারের মঙ্গলময় ভাব  
কুরিতে পারি না। ঠায় ! আমরা তোমার মঙ্গলময় চৈতন্যসত্ত্বার সর্বব্যাপীত্ব  
অনুভব করিতে সক্ষম না হওয়াতেই বিমল আনন্দ লাভে বঞ্চিত। মোহ-

নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া মুখ দুঃখের স্বাত প্রতিঘাতে নিস্পেষিত। হে সৰ্বশক্তি-  
মন ! আমরা দুর্ভাগ ও সাধন ভজনহীন বনিয়াই ভক্তিরসে চিকিত্বে। তাই  
আকুল প্রাণে প্রার্থনা করিতেছি যে, আমাদের হৃদয়ে সাধন শক্তি সঞ্চায়  
পূর্বক তোমার আনন্দময় সত্যের অভিমুখে আকর্ষণ কর ! বাহাতে আমরা তোমার  
ভাবে বিভোর হইয়া আনন্দময় প্রাণে সংসারের কর্তব্য পালন করি, এবং  
মহানিদ্রার পরে তোমার চরণ সুকাশে উপনীত হইয়া মহাজাগরণের অপার  
আনন্দ সন্তোষ করিতে সক্ষম হই।

আজ সাত বৎসর হইল "ভক্তির ডালি" লইয়া তোমার পানে চাহিয়া  
আছি, আবার এই নতন বর্ষে তোমার মহলাশীর্ষাদ লাভের জন্ত প্রার্থনা  
করিতেছি, জানি না আমাদের এই "ভক্তির ডালি" তোমার দেবার উপযুক্ত  
হইতেছে কি না, তবে ভরসা এই যে, শিশু শূত্র পিতাকে ডাকিতে না পারিলেও  
তাহার আধ আধ বুলি যখন পিতার নিকট প্রিয় হয়, তখন তুমি জগৎ পিতা  
ও ভাবগ্রাহি ; তুমি নিশ্চয় ভক্তির লেখক ও গ্রাহকগণের উপর শুভাশীর্ষাদ  
বর্ষণ পূর্বক তাহাদিগকে তোমার মধুময় তত্ত্ব প্রচারের জন্ত উৎসাহিত করিবে।  
প্রতিগৃহে "ভক্তি" প্রচারিত হইয়া ইহার হৃদয় নিহিত তত্ত্ব মুখা দুানে যেন  
সকলের জীবন শাস্তিময় করে। দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া এই ভক্তি পত্রিকা  
যেন তোমার শ্রীচরণ দেবা করিতে সক্ষম হয়।

## প্রার্থনা ।

—:o:—

দয়ার ঠাকুর তুমি,                      গোবিন্দ হৃদয় রে,  
দয়া কর এই নরাধমে ।  
হৃদয় মন্দিরে মোর,                      বারেক দাঁড়ও রে,  
ললিত ত্রিভঙ্গ বাকা ঠামোঃ,  
রসিকের স্মরণীয়,                      "রাঙ্গা পা হৃৎকনি" হে,  
হেরিয়ে মানস নেত্রে মোর ।

তাপ-দহ প্রাণ মন, মুশীতল করি হে,  
 প্রেমানন্দে হইয়ে বিভোর ॥

মাথাইয়ে ভক্তি-ফুল, প্রীতির চন্দনে হে,  
 ফুল মনে করিব অর্চনা ।

মানব জীবন তাহে, হইবে সার্থক হে,  
 দূরে যাবে সংসার বাসনা ॥

দয়ালের শিরোমণি, দীনের ঠাকুর হে,  
 প্রেমময় পতিত পাবন ।

কলিযুগে মায়ারূত, পাতকী তারিতে হে,  
 প্রচারিলে নাম সংকীর্তন ॥

যুব জন পরিহারি, কাঙ্গালের বেশে হে,  
 দেশ দেশে করিয়ে ভ্রমণ ।

হুম্মিল কৃষ্ণপ্রেমে, নাথিয়ে মাতালে হে,  
 কাঁদিয়ে কাঁদালে জগজন ॥

সংসার-বাসনা নলে, দহে সদা হিয়া মোর,  
 মরু প্রায় এ পোড়া জীবন ।

মনে মোর শান্তি নাই, হয়েছি কাতর হে,  
 তব পদে লইবু শরণ ॥

কাঙ্গালের ধন তুমি, প্রেমের সাগর হে,  
 দয়া কর এই দীন জনে ।

হিয়ার অনল মোর, করহ-নির্দাষ হে,  
 বিদু মাত্র প্রেম বারি দানে ॥

দীন—শ্রীশশিভূষণ সরকার,

সোণামুখী।

# আবাহন ।

—:०:—

( প্রাণের দেবতা । )

( পীড়িকা । )

( আমার ) প্রাণের দেবতা,            হে গৌর হৃন্দর !  
পর্যাণের মাঝে এস ।  
তুমি এস, তুমি এস ।

অঁধার হৃদয়,            ক'রে আলোকিত,  
দীপ্ত হৃদাকাশে ব'স ।  
তুমি বস, তুমি ব'স ॥

মোর, কলুষ আসক্ত,            চিত খানি সৃষ্টা,  
( আছে ) নীরস ভাবেতে পড়িয়ে ।

( তুমি ) ওহে রসময় !            হইয়ে সদয়,  
কর সরস, কৃপা-বারি দিয়ে ॥

বুজ দিন হ'তে,            প্রাণে আশা ধ'রে,  
( আছি ) ভূষিত বড় সংসারে ।

চকোর যেমন,            শশী মৃধা লাগি,  
( অথবা ) চাতক, মেঘবারি তর ॥

আকুল হইয়ে,            ডাকিলে তোমায়,  
ধাকিতে তুমিত পার না ।  
পার না, পার না, বাথ পার না !

পর্যাণের মাঝে,            আকুল পিয়াস  
আরো জাগাইয়ে দাও না ॥

শুদ্ধ চিতে তব, হয় আবির্ভাব,

জুগুপ্স কি তবে পাবে না ?

পতিভ-পাবন, নামটী তোমার,

পবিত্র করিয়ে লও না ॥

অতি স্নমধুর, নামটী তোমার,

নামে দৃঢ় রতি হইলে—

প্রাণের দেবতা ! ওহে প্রেম বশ্ব ।

হিয়া মাঝে প্রেম উথলে ॥

নাম সত্য তব, দাঁও পরিচয়,

এ বিশ্বাস দৃঢ় কর না ।

•(আমি) বিশ্বাসের সাপ্তে হুরগম পথে—

চলি, পূর্ণ হোক বাসনা ॥

প্রাণের দেবতা ! পরাণেতে এস—

মায়া আবরণ খানি সরিয়ে ।

আমি, মানস-নয়ন, করি উন্মীলন,

ধন্ব হই শ্রীরূপ হেরিয়ে ॥

পরানে জাগিলে, তোমার শু রূপ,

বাহিরে জাগিবে, জাগিবে ।

প্রাণ গৌরময়, শুধু গৌরময়,

তখন এ দীন হেরিবে ॥

পরানের ধন ! হৃদয় দেবতা,

ভুলিয়ে, ভুলায়ে থেকো না ।

(তুমি) নিজ জন ক'রে এ অধম জনে—

দীপ্ত, প্রকাশিয়ে করুণা ।

ওহে, বুকনা মোরে ক'রনা ॥

দীন—শ্রীমসিকলপি দে ।

# বিভু গীত ।

—:—

( ১ )

পোহাইল বিভাবরী উদে (ঐ) দিনমণি,  
( মন ) রহিয়াছ কেন মৌনী চিত্ত' হরি চিত্তামপি ।  
তোমা হেন অনাথারে, রাখিবেন ভব ঘোরে,  
যিনি কৃপা নেজে হেরে, এ পাপ সংসারে ।  
এাণ তমঃ নাশ করি, ভয়াল কাল-যামিনী ।  
তবেরে মন আমার, মায়ী দুমে কেন আর,  
খুল হৃদয়ের দ্বার যাবে অঙ্ককার,  
গাও বিভু-গীত প্রাতে, গাহিছে যাহা ললিতে  
কল কণ্ঠে পিক বধু ষরিছে. নব রাগিনী ।

( ২ )

অরে মন আমার অচৈতন্য কেন এত,  
বৃথা মান সন্তম বৃথা যেন প্রিয় সূত ।  
কোথা রবে প্রিয়জন  
কোথা রবে পরিজন,  
যখন কাল শমন হইবে নিকটপ্রত ।  
সংসার যেন অনিত্য,  
ভাব নিত্য পরমার্থ,  
ভজিলে শ্রীহরি মত্যু সুখে পাশে মোক্ষ পথ ।

( ৩ )

প্রেম-নীরে কেন ডুবনা ?  
অন্নিয়া জর্পতে ওনে পায়স মন,

সংসার যয়াতে মজি অনুক্ষণ,  
 শ্রীহরি-চরণ হ'য়ে বিস্মরণ,  
 ভুগিছ ভবের ঘননা ।  
 পাপের লংসার সব মিথ্যাগয়,  
 কুহকের বাজী কিছু সত্যনয়,  
 অতএব মন নিত্য নিরঞ্জন,  
 নিরন্তর কর ভাবনা ।  
 ঐহিক সুখের ত্যজ অভিলাষ,  
 মিথ্যা বাক্য আর হাত্ত পরিহাস,  
 এসব ত্যাজিয়ে ভক্ত রূপ হয়ে,  
 শ্রীহরি করহ সাধনা ।

( ৪ )

কে আছে আপন বল ওরে অবোধ মন,  
 তোমার কে আছে হেথা কারে বলরে আপন ।  
 নহে, মাতা, নহে পিতা, নহে ভগ্নি, নহে ভ্রাতা,  
 যে সব দেখিছ হেথা সকলই স্বপন,  
 সদা ডাক হরি বলে, যিনিরে অস্তিম কালে,  
 তোরে লইবেন কোলে তিনি তোর আপন ।

( ৫ )

এ পোড়া পরাণে হরি পারিনা ভজিতে চরণ,  
 রূপা সিদ্ধ রূপা করি, ছাও মোরে নব-জীবন ।  
 জন্মিয়া এ ভব বাসে, মুগ্ধ হয়ে মায়া বেশে  
 ভুঞ্জি হুঃখ কৰ্ম্য দোষে, তবু যে বুঝেনা মন ।  
 ত্যজনা অবলা বঙ্গি  
 রাখিও ও শত দলে  
 হরি হে অস্তিম কালে, পাই যেন দরশন ।

দীনা—শ্রীমতী কুঙ্কুমারী দেব্যা ।

## কই তুমি ?

—:—

(১)

কই তুমি কোথা তুমি হেরি অন্ধকার ।  
কিছুই দেখিতে নারি ভীষণ অঁধার ।

অন্ধ আমি দয়া ক'রে  
চক্ষু দান কর মোরে  
হ্রস্ব সংসার পথে না চলে চরণ ।  
অন্ধকারে বারে বারে হেঁটুছি পতন ॥

(২)

এস হরি আলো করি জুড়াক জীবন ।  
এ অঁধারে আর কত করিব ভ্রমণ ।

চলেনা চরণ আর  
পতনেতে বার বার  
ক্ষত অঙ্গ জর জর, দেখ ভাল করে ।  
দয়া করে দয়াময় ত্রাণ কর মোরে ॥

(৩)

পথ হারা দিশে হারা হ্রস্ব সংসারে ।  
কুপথে বিপথে সদা পড়ি ঘুরে ঘুরে ।

অন্ধকার অন্ধকার  
অন্ধকার চারিদিক,  
অন্ধ আমি এ অঁধারে চলিব কেমনে ।  
দয়া ক'রে চক্ষুদান কর প্রভু দীনে ॥



( ৪ )

যাদের কাছেতে মোরে দিয়াছ পাঠায়ে ।  
 তরাতে দেখেনা কেহ মোর মুখ চেয়ে ।  
 কলুষ বলদ মত  
 বাগে পেয়ে অবিরত  
 খাটায়ে নিতেছে মোরে শতেক প্রহারে ।  
 বন্ধ আঁধি বলিবর্দ চক্রে যথা ধোরে ॥

( ৫ )

নাহি দয়া নাহি মম্বা করিন হৃদয় ।  
 আপনার কুজ নিতে ব্যস্ত অতিশয় ।  
 প্রাণটি দেহেতে রেখে  
 কক্ষ নেয় বিধি মতে  
 বলেনা কখন মোরে কেন পাট আর ।  
 যত খাটি তত বলে খাট আরবার ॥

( ৬ )

অন্ধ আমি কোথা যাব না পারি পলাতে ।  
 অস্থির সতত আমি এদের জালাতে ।  
 জ্বালার উপর জ্বালা  
 করে এরা বালা পালা  
 একে অন্ধ সদা মরি মনের বিকারে ।  
 তাহে এরা বাগে পেয়ে নিয়ত প্রহারে ॥

( ৭ )

রক্ষা কর দয়াময় এ ঘোর সঙ্কটে ।  
 কাতরে তোমারে প্রভু ডাকি করপুটে ।  
 রাখ হরি রাখ প্রাণ

কর মোরে পরিদ্রাণ\*

অন্ধকাবে মহা ফেরে প্রাণ বুঝি যায় ।

চক্ষুদান কর মোরে আপন কৃপাষ ॥

( ৮ )

তুমি না করিলে দখ কে করিবে আঁব ।

এ পাপী কেমনে তবে পাইবে নিস্তাব ।

অন্ধ আমি কোথা যাব

কোথ, গেলে আলে; পাব

দিশে হাবা পুথ হাবা আমি অভ্রাজন ।

দাও চক্ষু চেয়ে দেখি রাড়ন চরণ ।

শ্রীকালীপদ বিদ্যাস ।

## গৃহীর কর্তব্য কৰ্ম্ম ।

দুর্লভো মানুষ্যো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুযুঃ ।

তত্রাপি দুর্লভং মনো বৈকুণ্ঠপ্রদর্শনম্ ॥

জীব দেহেব মধ্যে মনুষ্য দেহ (মানব জন্ম) একেঁত দুর্লভ, তাহাতে আবার ক্ষণভঙ্গুর, সেই দুর্লভ ক্ষণভঙ্গুর মনুষ্য দেহ লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠপ্রিয় শ্রীহবির দর্শন লাভ আও দুর্লভ বলিয়া বিবেচনা করি। অপিও বলি, যেমন ভোজনের স্থায় ভক্তি কিছুতেই হয় না, পিতার স্থায় গুরু আর নাই, ব্রাহ্মিণের স্থায় উত্তম দানেব পাত্র আর নাই, ভগবান কেশব অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দেবতা নাই, গঙ্গার সমান তীর্থ নাই, খেতদানের তুল্যও দান নাই, গুরুরীক সমান জপ নাই, একাদশী প্রতের তুল্য ব্রত নাই, সত্যের স্থায় সদাচার নাই, সন্তোষের তুল্য সুখ নাই, ভাষ্যার তুল্য মিত্র নাই, দয়ার স্থায় ধর্ম নাই, স্বাধীনতার স্থায় সুখ নাই ;—সেইরূপ গৃহস্থপ্রমের স্থায় আশ্রম নাই । কিন্তু গৃহস্থকে অধুনা

অনেক আইন জানিয়া শুনিয়া এবং তন্নিয়ম প্রতিপালন করিয়া চলিতে হইতেছে। গৃহকর্তাকে অনেক বিষয়ের উপায় নিরূপণ করিতে হয়। প্রথমত জীবন রক্ষা বা আত্মরক্ষা, পরে ধর্ম রক্ষা, কর্ম রক্ষা, কুল রক্ষা, মান রক্ষা, শীল রক্ষা ও বংশ রক্ষাদি একান্ত কর্তব্য।

সেই সর্বশক্তি মূলাধার বিগাধার নিত্যনিরঞ্জনের আভ্যন্তরীণ ভাব সম্যক অবগতির জন্ত উপায় একমাত্র ধর্ম, সেই লীলাময়ের লীলা কৌশল উদ্ভেদ ও তত্ত্বনিরূপণের একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায় ধর্মলাভ, এই সৃষ্টি সামঞ্জস্য সৃষ্টি-তত্ত্বের আভ্যন্তর ব্যবচ্ছেদে মহত্ত্ব প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ প্রকৃষ্টতম উপায় ধর্মার্জন। ধর্ম শব্দ—ধ্ব বাতু হইতে নিষ্পন্ন, ধ্ব—ধারণে, ধারণ করে যে, পতিতে পরিত্রাণ করে যে, সেই ধর্ম, যে যাহার প্রকৃতির অক্ষুর রাখিয়া সর্ব প্রযত্নে তাহার গতির সুবিধান করে, তাহাই তাঁহার ধর্ম, ধর্ম নানা স্থানে নানা অর্থে ব্যবহৃত হইলেও মূল একই লক্ষ্য—অভিব্যক্ত করে। প্রাকৃতিক ধর্ম জীবের প্রকৃতিকে ধর্ম বলে, যাহার যাহা প্ৰভাব, তাহাই তাহার ধর্ম, যেমন অগ্নির ধর্ম, তাপ, শিলার ধর্ম শৈত্য ইত্যাদি। ধর্মে বিশ্বের প্রতিষ্ঠা এবং ধর্মই পাপক্ষয়ান্তে মোক্ষলভের সেতু স্বরূপ, অতএব ধর্মচরণ যে মানব মাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য তাহা কে অস্বীকার করিবেন ?

ধর্মই সামীপ্য, সাক্ষ্যাদি প্রাপ্তির দ্বার পরূপ। শাস্ত্র বিশেষের উক্তি “সত্যং নাস্তি পরোধর্মঃ” সত্যের অধিক ধর্ম নাই, যাহা সত্য তাহাই ধর্ম, যাহা প্রত্যক, ইন্দ্রিয় বিষয়ীভূত তাহাই সত্য, সত্য মহোকুতুস্ব শুদ্ধ মানব নেত্রের অগ্রবর্তী জাজ্জল্যমান পরিদৃষ্ট, মিথ্যা—শূণ্য, অন্ধকারময়, গভীর অন্ধকার গর্ভে নিহিত। সত্যে জগতের অস্তিত্ব, অসত্যে জগতের ধ্বংস। “বেদ প্রতিবাদ্য প্রয়োজন-বর্ধোধর্মঃ।” বেদ কর্তৃক প্রতিপাদিত এবং প্রয়োজনীয় যাহা তাহাই ধর্ম। বেদ শব্দে আদৌ সত্য। সত্যে যাহা প্রতিপাদ্য তাহাও সত্য। সত্যে যাহার প্রয়োজন তাহাও সত্য।

মহাপ্রভু শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের উক্তি “জীবে দয়া নামে কৃচি” (দেখরের নামে) “ভক্তিই” মুখের লক্ষণ, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য একদা এই কথা বলিয়া ছিলেন যে, “আমার জন্ত, আমার গতির জন্ত ভাবি নাই, আমার সঙ্গিপণের জন্তই আমি চিন্তিত,” মহামতি চণ্ডাণ্ড এই বাক্যে অতি পৌষণ করিয়া

বন্দীরাছেন—“আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশুতি স পণ্ডিতঃ,” সর্বজীবে আত্মভাব সর্বশাস্ত্রে সর্বজাতিব ধর্ম শাস্ত্রের উক্তি। সুষ্ঠু ধর্ম প্রবর্তক ক্রাইষ্ট ও তাঁহার শিষ্যগণ কতক জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়া ছিলেন—“তোমাঙ্গিগেব পিতা কে (ঈশ্বরকে) হৃদয়ে সহিত প্রীতি কব, এবং প্রতিবেশীকে আপনার জ্ঞান কর,” সর্বজীবে আত্মভাব সামান্য সাধনাব বিষয় নহে, এই আত্মভাবই মুক্তির হেতুর সোপান। সাধনা সর্বসিদ্ধিপ্রদ সাধনা বলে জীব সর্বপদ প্রাপ্ত হন। এ মহান সাধনা সর্ব শ্রেণীর সর্ব জাতিব করণীয়। মহাভাগ কৃষ্ণ হৈপায়ন, ধর্মের প্রকাশ ও মানবের ধর্ম তত্ত্ব বলা যে কব্য, সেই মানব ধর্ম এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন যে, স্বাধায় নিবৃত্ত, ব্রহ্মচর্য্য, দান, যজন, অকার্ণব্য, অনায়াস, অহিংসা, জিতেন্দ্রিয়, শৌচ ও দয়া এই কয়েকটির অনুষ্ঠানই মানব ধর্ম।

পঞ্চমহুংস শঙ্কবাচাধ্যও বলিয়াছেন যে, “ভূমি মণি চণ্ডাট্টকো বিষ্ণুঃ, ব্যর্থং কুপ্যসি ময়াসিষ্ণুঃ। সর্গং পশুত্বান্যায়নং, সর্বত্রোক্ষল ভেদজ্ঞানং”। অর্থাৎ তোমাতে আমাতে ও অস্ত্রে, সকলেতেই এক বিদ্যা আছে। তবে কেন আমার প্রতি অসহিষ্ণু হইয়া রাখা কোপ কব? নিজ আত্মাতে সর্বআত্মাকে দর্শন কর এবং সকল বিষয়ে ভেদজ্ঞান ত্যাগ কর।

সহদয় পাঠকগণ! স্বাধায়ানবত ব্রহ্মচর্য্য দান যজন, অকার্ণব্য, অনায়াস, অহিংসা, জিতেন্দ্রিয় শৌচ ও দয়াব যথাযথ শাস্ত্রীয় ভাবার্থ নিয়ে উল্লেখ কবিত্তেছি অল্পত্ৰই সহকায়ে পাঠ কবিয়া যুন। যিনি স্বাস্থ্যকৃত কার্যে নিশুণ, আপনার অনুষ্ঠিত কার্যের অনুষ্ঠানে যিনি তৎপর তিনিই স্বাধায় নিরত। যিনি ব্রহ্মের পদ প্রাপ্তেচ্ছ এবং পরে ত্ত গুণসম্পন্ন, দান প্রতিগ্রাহী, তিনি ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী দান সম্বন্ধে আবেদ উক্তি,—অচন্যহ্মি দাতব্যমদীনে নাম-রাত্নানা, স্তোকাদপি প্রথয়েন দান মিত্যভির্দীযতে ॥” দানে যিনি মনস্তাপ না পান, যাচক যাচাব নিকট বিফল মনোরথ নহেন, সামান্য দান কার্যেও যিনি যত্নসহকারে যাচকেব সম্মান বক্ষা কবেন, যাচক দান দাবীদেব ভরণ পোষণেই ব্যয়িত হয় তিনিই দাতা। যিনি ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচার্য্য উদ্যোগী যজমানের কুশলাকাজী শিষ্যক, তিনিই রাজক, যজ্ঞন—পৌরহিত্য। সর্ব বিষয়ে যিনি কৃপণতা পরিশূণ্য, দয়া দাক্ষিণ্যাদি অর্থ প্রভৃতিতে যিনি কাপণ্য না করেন, তিনিই অকর্ণব্য। অনায়াস সম্বন্ধে মত যথা ‘শরীরং পিডাতে যেন ওজেন

ত্বং শুভেন বা । অত্যন্তং তন্ন কুর্বাতি অনায়াসঃ স উচ্যতে ॥” শারীর্ষিক পীড়নে শুভেতে কিম্বা অশুভেতেই হউক, হর্ষ বা বিবাদেই হউক, যাহার আত্যন্তিকী ভাব পরিদৃষ্ট হয় না, তিনিই অনায়াসী । পরের যে কোন কার্যে অহুয়াশূণ্যতা প্রদর্শন, অপরের ধন জনে বা শোক দুঃখে হিংসা শূণ্য ভাব, যাহার স্বভাব তিনিই অহিংসক, মহামতি বৌদ্ধ ধর্ম প্রবর্তক শাক্য সিংহ অহিংসাকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়াছেন, “অহিংসা পরমো ধর্ম” এই মহামূল্য উক্তি তাহারই ।

ইন্দ্রিয় জয় ;—ইন্দ্রিয় পরিচালনের যথেষ্ট ক্ষেত্র বর্তমানেও তদাচরণে নিরুক্তি ভুবই জিতেন্দ্রিয় ব্যঞ্জক, ত্রীন্দ্রিক রুক্তি সমূহ স্কুরিত ও কাধাঙ্কম থাকিতেও যিনি সেই প্রকৃতিকে নিরুক্তি মার্গানুসারী করিতে সক্ষম, সেই মহা পুরুষই জিতেন্দ্রিয় ।

শৌচের সম্বন্ধেও প্রমাণ যথা ;—অভক্ষ্য পরিহারশ্চ সংসর্গশ্চাপ্যনিন্দিতৈঃ, আচারেণ ব্যবস্থায় শৌচমিত্যভিধীয়তে ॥ যাহা শাস্ত্রানুসারে অভক্ষ্য তাহার ভক্ষণ লালসা পরিহার, অভক্ষ্য ভোজনকারির সংসর্গ ত্যাগ করা, যিনি সদাচারী, তিনিই শৌচাচারী ।

দয়ার অর্থ মন্ত্রপুরাণোক্তি—আত্মবৎ সর্কভূতেনু যো হিতায় শুভায় চ ।

বর্ততে সততং হৃষ্টঃ ক্রিয়া হেমা দয়া স্মৃতা ॥

সর্কভূতের প্রতি আত্মবৎ শুভ ও হিত হৃচক যে ক্রিয়া তাহারই নাম দয়া ।

অপিচ পদ্য পুরাণে—যত্রাদপি পরক্লেশং হত্বং যা হৃদি জায়তে ।

ইচ্ছা ভূমিঃ সুরশ্রেষ্ঠ সা দয়া পরিকীর্তিতা ॥

সম্বন্ধে পরের ক্লেশ নিবারণ জন্তই হৃদয়ে যে ইচ্ছা সঞ্চারিত হয় তাহাই দয়া নামে অভিহিত হয় ।

ভারতে কুলভ নরকম্ব ধারণ করিয়া যাহার শ্রেণোলাভের বাসনা হয়, তাহা একমাত্র বিমুক্তভক্তি ব্যতিরেকে পূরণ হওয়ার উপায়ান্তর নাই । মনই একমাত্র পবিত্র ক্ষেত্র । মনের দ্বারা যাহা কৃত হয় তাহাই কৃত এবং মনের দ্বারা যাহা ত্যক্ত হয় তাহাই ত্যক্ত । মনঃ সংযম হইলেই সংসার ভ্রম শান্তি প্রাপ্ত হয় ।

বিষয় বাসনারূপ মনোরূতিই সংসাররূপ বিষয়কে অঙ্কুর। মনঃ সংযম করিলে ঐ সকল অঙ্কুর পল্লবিত হইতে পারে না, যে ব্যক্তি অঙ্কিত বস্ত্র ও বাহু ভোগাদি পরিত্যাগ পূর্বক সংশয় শূণ্য হইয়া অবস্থিতি করে, তাহারই মন জিত হয়। স্বায়ত্ত বাঙ্কিতকে পরিত্যাগ করিতে সক্ষম না হইলে সে পুরুষকে অধম বনিয়া গণনা করা যায়। যেমন লৌহ দ্বারা লৌহ কত্তন করে, সেইরূপ তীক্ষ্ণীভূত মনের দ্বারাই মনোবাসনা ছেদ করিতে হয়। বাসনা ত্যাগেই মনের শাস্তি।

গৃহস্থ সৰ্ব্বদাই আচার রক্ষা করিবে আচারবহীন ব্যক্তি ইহকালে ও পরকালে অসুখী হয়, যজ্ঞই কর, দানই কর, আর তপস্বীই কর, আচার বিচীন কৰ্ম্ম পুরুষের পক্ষে কদাচ শ্রেয়স্কর নহে। যে ব্যক্তি সদাচার পরিত্যাগ করিয়া অনাচারী হয়, সে কদাচ শুভফল ভোগী হইতে পারে না, স্বাচারবান ব্যক্তি একমুখে কদাচ কোনরূপ পাপ করিলে তাহাও তাহার আচার গুণে ম্লিন্ধ হইয়া থাকে। পারিভাষিক কথায় বলে আচারে লক্ষ্মী, বিচাবে পশুিত। সদাচারে চকলা যদি অচলা হইয়া গৃহে থাকেন তবে নারায়ণ ত আপনা হইতেই ধরা পড়িলেন, গৃহস্থের মাসব্রত, তিথিব্রত, নক্ষত্রব্রত ও দিনব্রত দ্বারাও হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হয়, এতদ্ব্যতীত মানসিক, কারিক ও বাচিকব্রত নামে যাহা মুনি ঋষিগণ নিৰ্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন তাহাও মানস পরিশুদ্ধি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। মাসব্রত যথাঃ—বৈশাখ, কার্তিক ও মাঘ সপূর্ণভাবে কেহ কেহ পালন করেন, কেহবা অষ্টমী, একাদশী, দ্বাদশী, চতুর্দশী ও পূর্ণিমা কিম্বা আমাবস্তা অথবা ষষ্ঠী পর্যন্ত নিয়মিতভাবে রক্ষা করেন, কেহবা রোহিণী, বিশাখা, অনুরাধা, চিত্রা, পুষ্যা ইত্যাদিকেও মানিয়া চলেন। আবার কেহ দিনব্রত বা বারব্রত অর্থাৎ রবি, সোম, বৃহস্পতি ও শনিবারকে বিশেষ রূপে রক্ষা করেন, অহিংসা, সত্য, চুরি না করা, ব্রূচর্ধ্য ও অকপটতা এ গুলিকে মানসব্রত বলে, এই ব্রূতেও শ্রীহরি প্রীত থাকেন, দিবাভাগে একবার অযাচিত অন্ন আহার রাত্রিকালে উপবাস, ইহাকেই কারিক ব্রূত বলে, বেদিধ্যয়ন, বিব্র'নাম কীর্তন, সত্য কথা বলা ও খলত্ৰা না করাকে বাচিকব্রূত কহে। দ্বাদশ মাসেও আমাদের আভাব কি আছে। বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিতে শ্রয়াস পাইলাম। “ন মাধব সমো বাসো ন গঙ্গাসদৃশী নদী। হৃদঃ খলু যোগোৎসব হরিভক্ত্যব গুভ্যতে ॥”

যাহারা বৈশাখ মাহাস্বয়ী জাত আছেন তাহারাই ধন্য । জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা, আষাঢ় মাসের শুক্লা একাদশীতে ভগবানের শয়ন মহোৎসব, পূর্ক দ্বিতীয়তে রথোৎসব, শ্রাবণ মাসে শ্রবণবিধি, ভাদ্রমাসে জন্মোৎসব, আশ্বিনে শ্রহুপ্ত ভগবান শ্রীহরির পার্শ্বপরিবর্তনোৎসব, কার্তিক মাসে উষানোৎসব, অগ্রহায়ণ মাসে শুরুপক্ষের ষষ্ঠীতে শুরু বর্ণ বস্ত্রের দ্বারা জগদীশ্বর হরি ও বৃষ্কার পূজা কর্তব্য, পৌষমাসে পুষ্যাভিষেক, মাঘী সংক্রান্তিতে সাধিবাসিত তণ্ডুল নৈবেদ্য প্রদান, ফাল্গুনের শুরুপক্ষের পঞ্চমীতে দোলোৎসব করিলে ও চৈত্রমাসে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র বা মৃত্তিকা নিশ্চিত জল পূর্ণ পাত্রে শালগ্রাম সমুদ্রব দেব জনার্দিনকে কিম্বা তৃদীয় প্রতিমাকে স্থাপনপূর্বক সেই জলস্থ ভগবানকে যে ব্যক্তি অর্চনা করেন, তাহার পুণ্য সংখ্যার গণনা কে করিবে ? গৃহমেধিরা ধর্মার্থকাম স্বরূপ ত্রিবর্গের সাধনে যত্ন করিবেন উহা সিদ্ধ হইলেই গৃহীর সকল সিদ্ধি লাভ হয় । গৃহী যে ধন উপার্জন করিবেন তাহার চতুর্থাংশ পারলৌকিক কর্মে ব্যয় করিবেন, অষ্টাংশ দ্বারা আশ্রয় পোষণ, কুটুম্ব ভরণ ও নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য নিরূহ করিবেন, অবশিষ্ট চতুর্থাংশ মূল স্বরূপ সংরক্ষণ করত যে কোনরূপে বর্জন করিবেন, এইরূপ আচার দ্বারা অর্থের সাফল্য হয় । নিত্য নৈমিত্তিক কর্মে দ্বারা কি পরকালে কি ইহকালে ফলপ্রদ হইয়া থাকে । নিত্যকর্ম না করিলে প্রত্যবার হয়, প্রায়শ্চিত্তাদি কাম্যত নৈমিত্তিক কর্মও অবশ্য কর্তব্য । যেমন ধর্মার্থকাম পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধ হইসেও তাহার অবিরোধ চেষ্টা করিতে হয় । বৃক্ষমূর্ছে জাগরিত হইয়া ধর্মকর্ম ও অর্থোপার্জনের উপায় চিন্তা করিবে ।

পরে গাত্রোখান পূর্বক বাহু শৌচাদি ক্রমাবয়ানে পূর্বক মুখ হইরা উপবেশন ও আচমন করত স্কন্ধা শব্দনাদি করিবেন । নক্ষত্রযুক্ত সময়ই শ্রাতঃসন্ধ্যার প্রকৃত সময় এবং সূর্য্যযুক্ত সময়ই সারাৎসন্ধ্যার প্রকৃত কাল । বিশেষ ব্যাঘাত ব্যতীত ঐ সময় লঙ্ঘন করু বিজ্ঞ ব্যক্তির কদাচ কর্তব্য নহে । আশ্রয়ান ব্যক্তি সন্ধ্যাকালে ও শ্রাতঃকালে হোম করিবেন । সূর্য্যামণ্ডল উদ্দিত হইতেছে এমন সময় তাহা নিরীক্ষণ করিবে না । কঙ্কতি কাদি দ্বাৰা কেশ শ্রীসাধন, মুকুরে প্রতি বিশ্ব দর্শন, দন্ত ধাবন, নয়নে অঙ্গন প্রদান, এবং দেব তর্পণ এই সকল কর্ম পূর্কাক্ষেই কর্তব্য । কোন গ্রাম গমনের পথে, কোন গৃহ গমনের পথে, কোন

তীর্থ গমনের পথে অথবা কোন ক্ষেত্রে গমনের পথে, মূত্র পরিত্যাগ করিতে নাই; 'হল কষ্ট ভূমি বা গোষ্ঠেও মূত্রত্যাগ করিবে না। পরত্রীকে নম্রাবস্থায় অবলোকন করিবে না, হরত সময় ভিন্ন আপন ভার্য্যাকেও নম্রাবস্থায় দেখিতে নাই, রজস্বলা স্ত্রীকে দর্শন স্পর্শ ও তাহার সহিত সস্তাষণও নিষিদ্ধ, যাহাকে দেখিতে নিষেধ আছে সে হটাৎ নয়ন গোচর হইলে নেত্র মুদিত করাই অবলোকন জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত। জলে মূত্র পুরীষ ত্যাগ ও মৈথুন কর্ম নিষিদ্ধ। বিভবানুসারে অগ্রে দেব, পিত মনুষ্য ও ভূতাদির পূজা করিয়া স্বয়ং অন্ন গ্রহণ করা গৃহীর উচিত, ভোজনকালে শুচি হইয়া পূর্ব মুখে বা উত্তর মুখে উপবেশন করিয়া মৌনাবলম্বন পূর্বক অন্ন গ্রহণ কর্তব্য। যতক্ষণ ভোজন পরি সমাপ্ত না হয়, তাৎ জাহ্নবর মধ্যে বাত যুগল স্থাপন করিতে হয়। অন্নের অত্যুক্ততা ও ব্যঞ্জনের লবণ দোষ ব্যতীত অথ কোন দোষ ভোজন কালে উদ্বেষণ করিতে নাই। গমন করিতে কবিত্তে অথবা শযান থাকিয়া আহার নিষিদ্ধ। উচ্চিষ্ট মুখে কাহারও সহিত বাক্যালাপ কিম্বা অধ্যয়ন করিবে না; এবং তদবস্থায় গো, ব্রাহ্মণ, অগ্নি ও নিজ মস্তক স্পর্শ করিবে না। অস্থোমুখ স্বর্ঘ্য ও নক্ষত্র, পতন কালে নিরীক্ষণ করিবে না। ছিন্ন আসন, ছিন্ন শয্যা ও ভগ্ন পাত্র পরিত্যাগ করিবে। গুরুদেব সমাগত হইলে আসন প্রদান, অভ্যুপান, মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ, প্রণাম, অনুগমন ও অনুকূল বাক্য প্রয়োগই কর্তব্য।

এক বস্ত্র হইয়া স্নান ও শযন করিতে নাই; উভয় হস্তে এক সময় মস্তক কণ্ঠন করিবে না এবং পুনঃ পুনঃ স্নান করাও নিষিদ্ধ, স্নানকালে হস্ত দ্বারা গাত্র মার্জন করিবে না এবং অনধ্যায় দিনে বেদাদি অধ্যয়নও নিষিদ্ধ, দিবাতাগে উত্তর মুখে ও রাত্রিতে দক্ষিণ মুখে মূত্র পুরীষত্যাগ করিতে হয়। গুরুজনের পাপ কর্ম প্রকাশ করিবে না, ক্রুদ্ধ ব্যক্তিকে শাস্তবাক্যে প্রবেশিত করিবে এবং পর নিন্দা শ্রবণ করিবে না। ব্রাহ্মণ, রাজা, হুঃখী, আতুর, বিদ্বান, গভিনী, ক্রী, ভারবাহী, মুক, অন্ধ, বধির, মত্ত, উন্মত্ত, বেশা, আসন্ন মৃত্যু ও বয় এই সকল ব্যক্তিকে পথ প্রদান করিবে। দেবালয়, চতুষ্পদ, অধিকৃত, গুরু, ও পণ্ডিত ইহাদিগকে প্রদক্ষিণ করিবে, অতিক্রম করিলে মহাপাপ হয়। অগ্নি পাত্ৰ, পাছুকা, বস্ত্র ও মালা ধারণ করিবে না, অগ্নিত যজ্ঞোপবীত ও স্বর্ণলঙ্কারও ধারণ করিতে নাই। অষ্টমী, চতুর্দশী ও পঞ্চমীতে তৈল মর্দন ও নারী সন্তোগ



নিষিদ্ধ। অগ্নের দেহে চরণ বা জম্মাঙ্গুষ্ঠ করত অবস্থান করিবে না এবং এক পদের উপর অঙ্গুষ্ঠ স্থাপন করিতে নাই ; কাহাকেও মর্শ্ব বেদনা দিবে না, কাহারও প্রতি নিতান্ত আক্ৰোশ করিবে না। যাচাতে পিশুনতা মনকে স্পর্শ করে একপ ব্যবহার করা অসুচিত, দাস্তিকতা, অভিমান ও নির্ধুরতা প্রকাশ বিদ্যান ব্যক্তি করিবেন না। মুর্থ, উদ্বাস্ত, কুংসিত, অত্যন্তমায়িক, ন্যূনপ্র, বিকলাঙ্গ ও দরিদ্র দেখিয়া উপহাস করিবে না। পুত্র ও শিষ্য ব্যতীত কাহাকেও উচ্ছিষ্ট প্রদান করিবে না এবং চরণ দ্বারা আগুন আকর্ষণ পূর্বক উপবেশন করিতে নাই। নিজের উদর পূরণার্থ পায়সাদি উত্তম দ্রব্য প্রস্তুত করিবে না। দেবতা ও অতিথির উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করিয়া স্বয়ং শেষভূক হইবে, পূর্ব মুখে বা উত্তর মুখে উপবেশন পূর্বক দত্তধারণ করিবে, মুখ প্রকালিত জল বৃক্ষ বা লতাতে পরিত্যাগ করিবে না। উত্তর শিরা বা পশ্চিম শিরা হইয়া শয়ন করিতে নাই। স্নানান্তে অগ্নিতাপে কেশ বা বস্ত্রাদি শুষ্ক করিবে না, গ্রহনাদি ভিন্ন রাত্রিকালে স্নান করিবে না। জলে অবগাহন করিয়া তন্মধ্যে গাত্র মার্জন করিবে না এবং হস্ত দ্বারাও গাত্র মার্জন নিষিদ্ধ।

• অগ্নের অনুলেপনাবশিষ্ট চন্দনাদি গ্রহণ করিতে নাই এবং অধিক বস্ত্র অত্যন্ত ছিন্ন বস্ত্র ও মলিন বস্ত্রও ধারণ করিবে না, গার্হস্থ আশ্রম অবলম্বন করিয়াই মানবেরা এই সমস্ত জপত পালন করেন এবং তাহারাই তাহাদের বাস্তব সমস্ত লোক জয় করা হয়, পিতৃগণ, মুনীগণ, ভূতগণ দেবদেবকল, মানববর্গ, ভূমি, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, অহুর সকলেই গৃহস্থকে অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করেন ও গৃহস্থদ্বারা পরাক্রান্তি প্রাপ্ত হইয়েন, “বোধহয় আমাদিগকে কিছু দিবেন” এই মনে করিয়া তাহার নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। বেদময়ী ধেনু, সকলের আধারভূতা, তাহাতেই বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত আছে। • সেই ধেনু বিশ্বের হেতুভূতা, ঋগবেদ তাহার পৃষ্ঠ, যজুঃ তাহার মধ্য, সামবেদ মুখ ও মস্তক, ইষ্টাপূত্র কর্ম তাহার বিষণ, সারু ও সৃষ্টি তাহার লোম, এবং শান্তি ও পুষ্টি তাহার বিষ্ঠা মুত্র, ঐ ধেনু স্বর্ণ পাদে প্রতিষ্ঠিতা, শর্জনই জগতের অর্জিবী, তাহার ঋগ্বা অপচয় নাই। সেই ত্রয়ীময়ী ধেনুর চারিটি স্তন, স্বাহীকার, স্বধাকার বঘট্কার ও হস্তকার। তন্মধ্যে দেবতার স্বাহীকার স্তন পান করেন, স্বধাকার স্তনে পিতৃগণকে আসক্ত, বঘট্কার স্তন মুনিবৃন্দের প্রিয়, এবং হস্তকার স্তন মনুষ্যেরা নিরন্তর পান করিয়া থাকে। ত্রয়ীময়ী ধেনু এই

প্রকারে সকলকে আপ্যায়িত করিতেছেন, যিনি যথাযোগ্যকালে অমরাঙ্গী পৃথক পৃথক বৎস দ্বারা ঐ ধেনুর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্তন পান করান, তিমি স্বর্গবাসী হন, এই জন্তই প্রতিদিন দেব, ঋষি, পিতৃ, মানব ও সৈন্যদায় প্রাণীকে স্বদেহবৎ পোষণ করা গৃহস্থের কর্তব্য ! এই কারণে সন্মাস্ত্রে শুচি হইয়া সমাহিত চিত্তে জল দান পূর্বক তর্পণ করা সর্বতোভাবে বিধেয়, অনন্তর স্বর্ঘ্যপূজা, গুরু পূজা এবং স্ব স্ব ইষ্ট পূজাস্থে অষ্টম মুহূর্ত পর্যন্ত অতিথি অভ্যাগতের আগমন কাল প্রতীক্ষা করিতে হয়, যে ব্যক্তি মিত্র অথবা একগ্রামে বাস করে তাহাকে অতিথি বলে না, যাহার কুল ও নাম অজ্ঞাত, মধ্যাহ্ন সময়ে হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাকে অতিথি বলে । অকিঞ্চন ভিক্ষু, শ্রান্ত, বুদ্ধু ব্রাহ্মণকেও অতিথি জ্ঞান করা কর্তব্য । এইরূপ অতিথি সমাগত হইলেই যথাশক্তি পূজা করিতে হয় । ঐ প্রকার অতিথির গোত্র, কুল বা অধ্যয়ন জিজ্ঞাসা করা বিজ্ঞগৃহীর কর্তব্য নহে । তাহার আকার সুন্দর বা কুৎসিত হউক তাহাকে প্রজাপতি তুল্য জ্ঞানে সম্মান করিবে । অতিথির পরিতোষ হইলেই গৃহী ন্যযজ্ঞরূপ ঋণ হইতে পরিমুক্ত হইয়া থাকেন । যে ব্যক্তি অতিথিকে না দিয়া ভোজন করে, সে কিঞ্চিৎ ভোজী হয় ; সে নিয়ন্ত্র পাপ ভোজন করে এবং পর জন্মে বিষ্ঠা ভোজী হইয়া তাহাকে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় । অতিথি ভগ্নাংশ হইয়া যাহার গৃহ হইতে ফিরিয়া যায়, অতিথির যাবতীয় হৃদ্ধত সেই গৃহীকে আক্রমণ করে এবং অতিথি গৃহস্থের নিখিল পুণ্য লইয়া গমন করেন, অতএব অতিথি উপস্থিত হইলে জল মাত্র দান বা আপনি যাহা ভোজন করে তাবন্ধাত্র অর্পণ করিয়াও তদ্বারা সাদরে অতিথি সেবা করা কর্তব্য । গৃহীব্যক্তি প্রত্যহ অন্নাদি বা উদক মাত্র দ্বারা শ্রদ্ধ করিবে এবং পিতৃলোকের উদ্দেশে বহু ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণে অসক্ত হইলে অন্তত একটি ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে । পরিব্রাজক, ব্রহ্মচারী, বা যে কোন ব্যক্তি গৃহে উপস্থিত হইয়া যাত্ৰা করে, তাহাদিগকে ভিক্ষা প্রদান করা কর্তব্য । ভিক্ষার পরিমাণ এত গ্রাস মাত্র । চারিগ্রাস পরিমাণে যে ভিক্ষা তাহার নাম অগ্রভিক্ষা, ঐ অগ্রভিক্ষা চতুর্গ হইলে ব্রাহ্মণেরা তাহাকে হস্তকার বলিয়া থাকেন । সাংসারিক কাল কোন অতিথি সমাগত হইলে তাহার প্রতিও পূর্ববৎ আতিথ্য করিবে অর্থাৎ শয়ন, আসন ও স্নানাদি দিয়া যথোচিত সম্বর্ধন করিবে । এইরূপে যে পুরুষগাহঁ হয় তার স্তুতি করিয়া যথাবিধি বহন করেন ; দেবতা, পিতৃলোক ও ঋষিগণ সকলেই

তঁাহার প্রতি সঙ্কল্পে কল্যান বর্মী হন। গৃহস্থের প্রদত্ত অন্নাদি দ্বারা পশু পক্ষীগণ এবং ক্ষুদ্রকীট সকলও পালিত হইয়া থাকে। গৃহীরা এইরূপ নিয়মে অবস্থিতি করিলে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, চতুর্কর্গ লাভ করিতে পারে। নিত্য বৈকুণ্ঠ গমনেচ্ছুকগণ সর্বাগ্রে ধর্মাচরণে জীবনের পূর্ণাছতি প্রদান করিয়া জীবন বিনিময়ে এই ধর্ম রহ লাভ করিয়া থাকেন। সর্বশক্তিমান যিনি পিতা, পুত্র, আদি, অস্ত, পূর্ব, পশ্চিমাди দিকদমূহ, যিনি চন্দ্র সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্ক নিচয়, যিনি শ্রব্য, শ্রোতা, কর্তা, ক্রিয়া, কারণ কার্য, সেই সর্বভূতস্থ সর্বগত এবং সর্ব মূলাধার পরম ব্রহ্মের প্রতি স্বকীয় মনোরত্তির প্রবৃত্তি নিষ্ঠা সহকারে অর্পণ কর। হৃদয়ে পবিত্র মূর্তি স্থাপিত করিয়া একান্ত ঐকান্তিকী যত্ন সহকারে ত্রীকান্তের চরণ শ্রান্তে জীবন উৎসর্গ কর। অলীক্যে তোমার তাবৎ বাসনা তঁাহার লক্ষ্যভূত হইয়া প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার লভে সমর্থ হইবে। যোগ যোগাদি অশাস্ত্র ব্রত পরিবর্জন করিয়াও যদি ভক্তি যোগ আরাধ্য কর তবে অবশ্যই বাসনা—রূপ ফল প্রাপ্ত হইবে। সর্বকালে সর্বারাধ্য আরাধ্যদেবের মূর্তি মনন, পূজন ও চিন্তন করত আত্মোৎসর্গই সাধনার চরমাদর্শ। যে কালে যে আশ্রমে বাস কল্প না কেন, সেই সর্ব মূলাধার ব্যতীত গতি কি আছে! যে দেব দেবীকে ভজন সাক্ষাৎ কর না কেন, এক কেশব ত্রীকৃষ্ণকেই স্মরণ করা হয়! যিনি গৃহাশ্রমে থাকিয়া বিধি নিয়ম পালন করিয়া সিদ্ধ হইতেছেন তিনিই ধন্য!

দীন হীন ভিখারী •

শ্রীবিপিন বিহারী রায় ভক্তিরহ।

## মায়া ও যোগ মায়া ।

—\*—

চাঁদের এক পিঠ আলো, এক পিঠকালো। পৃথিবীর অর্ধেক দিবা, অর্ধেক রাত্রি। মায়া ও যোগ মায়া এক বস্তুরই দুই পিঠ, আলোকিত পৃষ্ঠা যোগ মায়া, সেই বস্তু দুই পৃষ্ঠাই স্বচ্ছ। এক অস্তমুখ, অপর পিঠ বহিমুখ। অস্তমুখ

পৃষ্ঠে ভগবান্ ফলিত হন, বহিমূৰ্খ পৃষ্ঠে ভূত ফলিত হয়, যোগ মায়্য চিংশক্তি, স্বচ্ছ প্রসন্ন সলিল উড়াগবৎ । উহার কম্প নাই, নির্বাত । উহাতে সর্বস্ত নিত্য ফলিত । পৃষ্ঠান্তর কম্পিত, তরঙ্গিত, তরঙ্গনিয়াক্তন উহাতে নানাত্ত ফলিত হয় এবং তরঙ্গের কোলে কোলে “আমিত্ত” ছাইয়া গড়ে । এই স্থিরাস্থিরের সন্ধিতেই জীবোপাধি আরোপিত । চিংশক্তিতে তিনি, জীবশক্তিতে আমি ; জীবশক্তিতে তরঙ্গিত আমার “আমি” এর প্রসার । মায়ার বক্ষে ভূত, যোগ মায়ার বক্ষে ভগবান্ প্রতিবিস্তিত হন । মায়ের বৃকে যেমন শিশু, যোগ মায়ার বৃকে তেমন ঠাকুর ঝুলিতে থাকেন । ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ, জীব নিত্যদাস, এই সম্বন্ধোপলব্ধির নাম যোগ । যে মায়াবলে এই যোগ ঘটে, তাহার নাম যোগমায়ী । রজ্জ্বতে সর্গভ্রমরূপ বিক্ষেপ মায়াকৃত, যোগমায়ী দিব্য নয়নাঙ্গনশলাকা । মায়ী কামরূপিণী, যোগমায়ী সর্স্কামবিধাতিনী ; মায়ী মলিনবাসনা, দুঃখময়ী ; যোগমায়ী পরাশ্রবাসনাময়ী, সুখময়ী । মায়ী অমানিশা, তরুতে ভূতভীষ্ণ জন্মায়, যোগময়ী পূৰ্ব্বমানিশা, কানিন্দিতীরতমালোদ্ভাসিকা । যোগমায়ী শিবস্বরণী, মায়ী তার স্নুচরী পিশাচী । আলোর আঁধারবৎ মায়ী দেবীর চেড়ী !

“কে জলে লসতীতি কৈলাস বা কৈলাস !” কৈলাস কারণ সলিল বিচুম্বিত শ্রীপীঠন উহাতে মায়াতীত পরম পুরুষ শিব ভগবতী যোগময়ী প্রকৃতি সহ বিরাজমান । যাহার প্রভাবে জীব বদ্ধ হয়, সে মায়ী ; যাহার প্রভাবে জীব নিত্য মুক্ত শিবত্ব প্রাপ্ত হয়, তিনি যোগমায়ী । যোগমায়ী কুণ্ডলিনী জাগরিত হইলে, মায়ার কুহক স্পন্দ ঘুচিয়া যায় । এই চিন্ময়ী নাগিণী ললাটোর্ধ্বে মহাদীপ্তময়ী কণা দ্বারা মণিযুক্ত মুকুট রচিত করিতে থাকে । মায়ী ভূত প্রেত প্রেতিনী লইয়া, সেই যোগমায়ার সেবা করে । যোগমায়ী এই ভাবে শিবত্ব ফলাইয়া জীবকে কৈলাস হইতে শ্রীবৃন্দাবনে পৌঁছায় । অতঃপর ঈশ্বর মানুষ হইবেন । ঈশ্বরত্বোত্তক জ্যোতির সংহরণ হইলে মানুষলীলা ঘটে । অর্জুন সদাই কৃষ্ণ দেখিতেন, কিন্তু একদা তাহার বিগ্নরূপ অর্জুন সহ কুব্বিতে পারিলেন না । মানুষ করিতে না পারিলে, মধুর লীলা চাওনা হয়না । ঈশ্বর জ্ঞানই উপাসনার প্রয়োজন ঘটায় । ব্রহ্ম জনের ঈশ্বর জ্ঞান নাই, উপাসনাও নাই । জীব মায়ী বেশে ঈশ্বরবোধ লইয়া উপাসনায় প্রবৃত্ত হয় । ক্রমশঃ মায়ার বহিমূৰ্খতা ছুচে এবং যোগমায়ার অন্তমূৰ্খতা স্ফুটি পায় এবং ঈশ্বরও ক্রমশঃ

মানুষের আকার প্রকার স্বভাব ধরিতে থাকে। এই ব্রজাভিমুখ্যতাই এখন আলোচ্য। কিন্তু জীবের এই ঈশ্বর জ্ঞান এক প্রকার স্বাভাবিক, উহা সহজে ঘুচে না। কিন্তু প্রেম বিহীনতায় যতটুকু ভুলিয়া থাকে যায়, ততটুকুই মার্ধ্যমুখ। সর্বজন বাঞ্ছিত ব্রজজনের এই ভ্রান্তি কি তাঁহাদের হীনতের পরিচায়ক নয়? আমরা যাহাকে ঈশ্বর বলি, তাঁহারা তাহাকে ঈশ্বর বলিয়া চিনে নাই? এবে বিস্ময়াবহ ভ্রান্তি ও মূর্থতা! তা নয়, তাঁহাদের পায় অনেক উচু। আমাদের যিনি ঈশ্বর, তিনি তাঁহাদের জ্ঞাতি কুটুম্ব!

রাধা+কৃষ্ণ=শ্রীগৌরানন্দ। তবু রাধা, কৃষ্ণ হারা হইয়া উম্মাদিনী, কৃষ্ণ "রাধা রাধা" করিয়া ধূলয় লুপ্তিত হন। এই মহা ভ্রান্তি বিনা লীলা সংঘটিত হয় না। চিত্রাজ্যের এই ভ্রান্তির নাম যোগমায়া। জীব জগতের যে ভ্রান্তি কাহাঁর নাম মায়া। কৃষ্ণ ও ব্রজদেবীগণের পূর্বস্মৃতি বিলুপ্ত ছিল, তাতেই নবীন প্রেমের নিত্য নবতানন্দ ঘটয়াছে। জীবের ( নিত্যত্ব সন্দেহে ) পূর্বস্মৃতিও নাই; তদ্বিলোপও নাই। তবে যোগমায়ার সাহায্যে অনন্ত মমতার দিকে ভক্তন প্রভাবে জীব যতই অগ্রসর হয়, ততই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব সঙ্কুচিত হয় এবং মানুষভাব ব্যক্ত হয়। এই প্রক্রিয়ার উপাধি যোগমায়া। প্রক্রিয়া শব্দে শক্তি বিশেষকৈ বুঝিতে হইবে। সুতরাং যোগমায়া শক্তি রটিং পেপার বা চোষ কাগজ দিয়া চাপ দিলে উচ্ছ্বাসিত মসীভাগ উঠিয়া যায় এবং অল্প ঝিলমিল পাকা অক্ষরে স্থায়ী বসিয়া থাকে। সেইরূপ যোগমায়া ঐশ্বর্যের ছটা হরিয়া লয়, মধুরাশ্বর ঠেকুর মানুষটি দেখা যায়। এই পাকা অক্ষরে মানুষ নিত্য এবং মধুর। উনি জীবের সঙ্গে মিলিয়া প্রেম মিশিয়া বিলায়েম। সুতরাং প্রেম প্রাপ্তি যোগমায়ার হস্তে। মায়ার সংশ্রবে যিনি আমাদের ঈশ্বর অনন্ত, যোগমায়ার সংশ্রবে তিনি আমাদের প্রভু, সখা, পুত্র, পতি, মানুষ। এই দুই রাজ্যের ভজন প্রণালীও পৃথক। কৈলাসবাসিনী যোগমায়া অধিকার ধাম শিরোমণি ব্রজধামে। কারণ, কারণ সলিল, কারণ শরীর তুরীয়ম্পর্শী। যোগমায়ার মলিনবৃত্তি মায়াচেড়ী যোগমায়া সঙ্গে এধামে অধিকার পায় নাই। উহার অধিকার হইয়াছিল দক্ষপুরে, যেখানে শিবনিন্দা শিববিরোধ, যোগমায়া সতীর অন্তর্ধান, যেখানে অহঙ্কার কল্পিত যজ্ঞস্থলে ভূত প্রেতের শাসনমেলা।

নানা বর্ণের কাপড়ে গুদরী প্রস্তুত হয়। মায়ার গুদরী (সংসারের নানাভ, মমত্ব,) পরিত্যাগ করিয়া যোগমায়ার উপহার অনুরাগের একমুগ্ধা বসন ধারণ করা জীবনের লক্ষ্য। রাগোত্তানের মালিনী যোগমায়া; উনি ভক্তে অনুরাগের অপূর্বসাজী উপহার দিয়া থাকেন। যোগমায়ার সম্বন্ধ সিদ্ধদেহে, মায়ার সম্বন্ধ সাধন দেহে। সিদ্ধদেহস্কৃতি ও যোগমায়ার শুভকটাক্ষ সম্পাত এই দুই একাবস্থা বা এক সূত্রে অনুস্থিত। রাজরাণীর অগোচরে দাসীর কতই প্রভা ও প্রভাব; কিন্তু যেই রাজ্যী সাক্ষাতে আইলেন অমনি সেই দাসী মিয়মানা, অধনতা ও হীনপ্রভা। তখন আগস্তক বুঝিলেন ইনিই প্রকৃত রাণী। ভ্রম গেল।

কৃষ্ণ অবিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম। ব্রহ্মজ্ঞান বিনা আত্মস্বিকী মমতা দ্বারা ব্রজজন সিদ্ধ কাম হইয়াছেন। জীবচিতে স্বত-ই ঐশ্বরজ্ঞান আসিয়া সম্বন্ধ কাম করিয়া দেয়। ভীতি সম্ভ্রমাদি ঐশ্বর জ্ঞানের সহচর। জীবের পক্ষে ব্রজভাব আদর্শ মাত্র। যোগমায়ার মধ্যবস্তিত্ব (বটকাশী) বিনা সম্বন্ধে স্বনিষ্টতা ঘটতে পারে না। ব্রজে মায়া নাই। শুধু মমত্ব। মায়া পূতনা স্তনে বিষ মাধিয়া অবশ্য করিয়াও নিজে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রজে কাপট্য টিকেনা উহা সরলা যোগমায়া রচিতধাম। আদ্যাশক্তি সংসার দক্ষযজ্ঞে মায়া বপুঃ পরিত্যাগ করিয়া সংসারোদ্ধে হিমাচলশিখরে নব বপুঃ ধারণ করতঃ শিবত্বের উজ্জ্বল মহিমা বোধনা করিয়াছেন। সূতরাং মায়া ও যোগমায়ার দেহ ভিন্ন মাত্র। শিববিরোধিনী মায়া, শিবপক্ষপাতিনী যোগমায়া। সতী শিববাক্য উপেক্ষা করিয়া পিতামাতার প্রতি মমতা দেখাইয়াছিলেন, সূতরাং ইনি মায়া, কিন্তু যখন শিবনিন্দায় রুপ্তা হইয়া এহেন মাবাপের অধিক ভালবাসাকে এক কালীন উপেক্ষা করিয়া যেহ শোধন করিয়াছিলেন তখন তিনি যোগমায়া। অতএব সাধা দেহ মায়া, সিদ্ধদেহ যোগমায়া। কবে কৃষ্ণ যোগময়া দ্বারে আমাদের স্তম্ভ করিয়া লইবেন!

শ্রীবৈষ্ণবানুগ

শ্রীকালীহর দাস বসু ।

## সংপ্রসঙ্গ ।

—:—

( পূর্বপ্রকাশিতের পর । )

চ। তুমি যে কৰ্মের বিশেষণে “প্রারদ্ধ” শব্দ ব্যবহার করিলে, তাহার অর্থ কি ?  
র। কৰ্ম তিন প্রকার, সঙ্কিত, ক্রিয়মান ও প্রারদ্ধ, যে কৰ্মের বীজ পূর্বে বপন করা হইয়াছে তাহাকে সঙ্কিত ও যাহা বর্তমানে বপন করা হইতেছে তাহাকে ক্রিয়মান, এবং সঙ্কিত বীজ যাহা অঙ্কুরিত হইয়া বর্তমানে ফল প্রদান করিতেছে, তাহাকে প্রারদ্ধ বলে ।

চ। তুমি পূর্বে বলিয়াছ যে জ্ঞানলাভের পর সঙ্কিত ও ক্রিয়মাণ কৰ্ম-বীজ দ্রুত হইয়া যায়, কিন্তু সাক্ষাত কৰ্ম বীজের ফলই যখন প্রারদ্ধ, তখন সঙ্কিত কৰ্ম নষ্ট হইল কিরূপে ?

র। মনে কর তোমার রক্ত দুষ্টিবশতঃ ফোড়া হইয়াছে, ফোড়ার মধ্যে তাহাই পূজ সঞ্চার করিবার কারণ, অতএব তোমার দেহের মধ্যে যে রক্ত বিকার প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা ক্রিয়মান, ও যাহা বিকৃত হইয়াছে তাহা সঙ্কিত, এবং ঐ বিকৃত রক্ত যাহা পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া উহার ফল স্বরূপ ফোড়ার মধ্যে পূজরূপে পরিণত হইয়াছে, তাহাকে প্রারদ্ধ বলিয়া জানিও । যে রক্ত দুষ্টি হইতেছে ও হইয়াছে, ঔষধের দ্বারা তাহা প্রশমিত হইলেও যে পূজ পূর্বে প্রস্তুত হইয়া উহার ফল স্বরূপ ফোড়ার মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহাকে যেমন নিগত করিয়া দিতেই হইবে, সেইরূপ যে সুধক জ্ঞানরূপ ঔষধ পান করিয়াছেন, তাহার কৰ্মমালিন্য রূপ রক্ত দুষ্টির বীজ, যাহা সঙ্কিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা তুল্য অগ্নি সংযোগের দ্বারা তৎক্ষণাৎ ভস্ম হইয়া যায়, কিন্তু উহার বিকৃত পরিণাম ফল স্বরূপ প্রারদ্ধ ভোগ করিতেই হইবে ; তবে সঙ্কিত ও ক্রিয়মানের যোগি থাকায় অজ্ঞানীদের প্রারদ্ধ ভোগ কঠোর হইয়া পড়ে, কিন্তু শ্রীভগবানের কৃপায় তাহার উক্ত এই প্রারদ্ধ মরণ

ভেবে ভোগ করেন, তাপের সংস্রবে মাখনের স্থায় ভগবদ্ভাবের চৈতন্যময় শক্তি ভক্তের প্রারব্ধ ভোগ সরল ও রূপান্তরিত হইয়া যায় ।

চ। সঙ্কিত ও ক্রিয়মাণ কর্ম মালিন্য নষ্ট হইলে কি বিষয় বুদ্ধি থাকে না ?

র। তুমি যে হিসাবে বিষয় বুদ্ধির কথা বলিতেছ, যদিও তাহাকে বিষয় বুদ্ধি বলে না, তথাপি জ্ঞান লাভ পূর্বক মন একলক্ষ্যে চালিত না হইলে তাহারও প্রকৃত ক্রিয়া হওয়া অসম্ভব, সম্পত্তির বুদ্ধি করিয়া যে উহা ভোগ করিতে না পারিল, সে তো ভারবাহী গর্দভ মাত্র, তাহার বিষয় বুদ্ধি কোথায় ? আজ তুমি সত্যকে পদদলিত করিয়া প্রাণান্ত পরিশ্রমে সম্পত্তি অর্জন করিলে, তোমার মুক্লাম ক্রমশঃ ঐ সম্পত্তিকে বুদ্ধি করিবার ক্ষমতা নিযুক্ত রহিল, অথচ তাহার অতি সামান্য অংশ তোমার প্রকৃত ভোগে আসিবার পূর্বেই মৃত্যুর আকর্ষণে তুমি সেই অর্জিত সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া হতাশ প্রাণে কাল সাগরে ভাসিয়া গেলে, পরে সুস্থ দেহে যখন ঐ ভোগের পর কর্ম্মাভ্যাসী কোন ব্যাধিগ্রস্ত দরিদ্রের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রারব্ধের কঠোরতা ভোগ করিতে লাগিলে, ভাই ! তখন তোমার সেই অর্জিত সম্পত্তি কোথায় ? ফলতঃ একবার গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিবে যে, বৎসর গুলা স্রোতেয় স্থায় বহিয়া যাইতেছে, জীবন এই কয়টা বৎসরের সমষ্টি মাত্র, অথচ দেহের মধ্যে তুমি যে কয়দিন থাকিবে তাহারও কিঞ্চিৎ নিশ্চয়তা নাই, কল্যাই তোমার দেহ কাল সাগরে বিলীন হইয়া যাইতে পারে, এবং এই দেহ রূপ পরিবর্তন করিবা মাত্র অর্জিত সম্পত্তির সহিত তোমার কোনরূপ সম্বন্ধ থাকিবে না, তখন কর্ম্মই প্রবল হইয়া তোমাকে শুভাশুভ ফল প্রদান করিবে, ফলতঃ তাহার বিষয় বুদ্ধি আছে, তাহার কর্ম্মের দ্বারা ক্রমের বুদ্ধি হয়, নতুবা যে বিষয় রাখিতে পারে না তাহার বিষয় বুদ্ধি কোথায় ? আজ তুমি দুশ হাজার টাকার মালিক আছ, দেহ পরিবর্তনের পরে যদি তুমি দুশ টাকার মালিক হইতে পার, তাহা হইলে বুঝিবে যে তোমার অর্পেকাকৃত বিষয় বুদ্ধি আছে, আর যদি তুমি ধ্রুমন বিষয় লাভ করিতে পার, যাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া চিরকাল তোমার ভোগে আসিবে অনন্তকালেও তোমার হস্তচ্যুত হইবে না, তাহা হইলে বুঝিবে যে তুমি বিষয় বুদ্ধির চরম সীমায় পৌঁছিয়াছ।



ফলতঃ এই অবিদ্যার বিষয় লাভ করিতে হইলে, শ্রীভগবানকে লাভ করিবার লক্ষ্য স্থির রাখিয়া তাঁহার আদিষ্ট পথে অগ্রসর হওয়া আবশ্যিক, এই রূপে যদি সাধক সেই জন্মে শিক্কাকাম হইতে অক্ষম হয়, তাহা হইলেও দেহ পরিবর্তনের পরে তাহার অধোগতি হয় না, কেন না তিনি নিজে বলিয়াছেন—

“তুচিনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোহভিজায়তে।”

অতএব তাঁহার আদিষ্ট পথে যুক্তভাবে বিষয় ভোগ করিয়া দেহত্যাগের সময় বাসনার আকর্ষণে যদি সেই যুক্তভাবে ভগ্ন হয়, তাহা হইলেও সাধক জ্যোতীর্ষ্ম দেহ ধারণ পূর্বক জীবনের পথে অগ্রসর হইয়া কিছুকাল পুণ্য লোকে আনন্দ সন্তোষের পরে যখন পুনরায় স্থল দেহে প্রবিষ্ট হয়, তখন শুদ্ধ স্বভাব ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করে, এবং সেই জন্মে সংস্কারের আকর্ষণে তাহার ছন্দয়ে পূর্ব জন্মাজ্জিত জ্ঞান ক্ষুরিত হইয়া তাহাকে উন্নতির পথে চালনা করে।

এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, যে বিষয় রক্ষা করিয়া উহা ভোগ করিতে পারে তাহার বিষয় বুদ্ধি প্রকৃত কি না, কিন্তু ইহাও জানিও যে যুক্ত প্রাণে বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিলে এই বিষয় বুদ্ধির ফল ভোগ করা যায় না, অথচ জ্ঞানের দ্বারা অসার বিষয় হইতে মনকে প্রত্যাহত করিয়া বিষয়ের সার ভগবচ্চরণে সংযুক্ত পূর্বক কেবল আরক্ত ক্ষয়ের জন্ত বিষয় ভোগ করিলে এই বিষয় বুদ্ধির অমিয় ফল ভোগ করা যায়। লক্ষ্যজ্ঞান সাধক, রূপ রসাদি ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয় সম্পদাদি সন্তোষ করিবার সময়েও উহা ভগবদ্ভাবে অনুরঞ্জিত করিয়া প্রসাদ স্বরূপে ভোগ করিবার শক্তি লাভ করেন, এই রূপে তিনি ভোগে যোগে ও যোগে ভোগ অরলগন পূর্বক প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির যে পথেই যান না কেন, সকল অবস্থাতেই তাঁহার ভাব অব্যাহত থাকায় তাঁহাকে ভোগজনিত অবসাদ সহ করিতে হয় না বলিয়া তিনি প্রকৃত বিষয় ভোগের আবাদ পান, তাহা তাঁহাকে অধিক প্রবৃত্তির পারে লইয়া গিয়া অনন্ত আনন্দের অধিকারি করে।

চ। ভোজনের দ্রব্য নিবেদন করিয়া আহার করিবার নিয়ম আছে বটে, কিন্তু অপর ইন্দ্রিয়গুলির ভোগ্য দ্রব্য কি নিবেদন করিতে হইবে ?

র। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন :—

“যং করোমি যদশাসি যজ্জহোমি দদাসি যং ।

যং তপশ্বসি কৌন্তেয় তং কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥”

অর্থাৎ তুমি ভোজনাদি ইন্দ্রিয় ভোগ বা দান তপস্বাদি সংকর্ষ্ম জনিত আশ্রয় প্রাসাদ ভোগের জগ্ন যে কোন কর্ষ্ম কর না কেন, আমাকে সমর্পণ করিয়া করিবে।

এবং ক্রমশঃ এই সমর্পণ অভ্যাস হইলে যখন তোমার ভাব স্থায়ী হইবে, যখন—

“যুক্তাহার বিহারস্ত যুক্তচেষ্টয়া কর্ষ্মহু ।

যুক্তপ্ৰপাববোধস্ত যোগো ভবতি দুঃখহা ॥”

অর্থাৎ যখন আহার নিদ্রাদি সকল কর্ষ্মই যুক্ত ভাব অব্যাহত থাকিবে, তখন সেই যোগই তোমার সমস্ত দুঃখ হরণ করিবে।

ফলতঃ যুক্ত ভাবে যে কোন কর্ষ্মই কর না কেন, ফেলা জলে নির্ম্মালা সংযুক্ত থাকিলে যেমন তাহা নির্ম্মল হয়, সেইরূপ তোমার ভোগে বা কর্ষ্মে প্রতিক্রিয়া রূপ অবসাদের মানিষ্ঠ থাকিবে না, তপ্তি দান পূর্নক উহা তোমাকে নিরুক্তির পথে লইয়া যাইবে, কর্ষ্মকর্ম করিয়া মোহ জনিত আসক্তির বন্ধন হইতে তোমাকে মুক্ত করিয়া দিবে, এবং এইরূপে ভাবে তাপে বর্ষ্মবীজ গুলি ঝলসিত হওয়ায় যখন উহাদিগের অঙ্কুর উৎপাদনের শক্তি লোপ হইয়া যাইবে, তখন এরূপ হইবে যে, ব্যবহারিক ভাবে বর্ষ্ম করিয়াও তুমি উহা হইতে নিষ্টিষ্ট থাকিবে।

এইরূপে তত্ত্বজ্ঞানের আলোকে গম্য পথ নির্ণিত হইলে—

“নৈব কিকিৎ করোমীতি যুক্তো নশ্চেষত তদ্বিৎ ।

পশুন্ শূন্যস্পৃশন স্ত্রিয়ন্নঃগ গচ্ছন্ স্বপন স্বমন ॥

প্রলপন বিতজন্ গৃহ্ণন্ মিস্মিন্মিস্মনপি ।

ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেষু বক্তন্তে ইতি ধারয়ন্ ॥”

অর্থাৎ তখন তোমার এরূপ বোধ হইবে যে, তুমি কিছুই করিতেছ না। দর্শন শ্রবণাদি সমস্ত কর্ষ্মই ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতেছে এবং দ্রষ্টারূপী জ্ঞান্নার শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া তোমার মন, প্রভু ভাবে তাহাদিগকে নিয়মিত রূপে চালাইয়া, করিতেছে মাত্র।

এই বোধ হইবার পরে যখন তোমার মন সদাই আত্মানন্দে বিভোর থাকিবে, মেধোমুক্ত তপনের ত্রায় আত্ম জ্যোতীতে তোমার চিন্তাকাশ আলোকিত হইয়া চৈতন্য শক্তির বিহার ভূমি হইবে এবং স্পর্শমণি সংযুক্ত লৌহের রূপান্তর প্রাপ্তির ত্রায় মনের অহংভাব পুরিশুদ্ধ হওয়ার সে আত্মার উদ্দেশে বলিয়া উঠিবে—

ধ্বং! তোমার গরবে গরদিনী আমি,  
রূপসী তোমার রূপে—

তখন সেই শক্তিবলে তোমার মন ইন্দ্রিয়গণকে পূর্ণ দাসত্বে নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা লাভ করিবে, অধির তাপ জলে মগ্নকরিত হইলে তাহা হইতে বাষ্প বহির্গত হইয়া যেমন ইঞ্জিনকে চালনা করে, সেইরূপ মন আত্ম শক্তিতে বলবান হইয়া প্রভুরূপে কেবল প্রেরক কক্ষের জন্ত ইন্দ্রিয়গণকে নিয়মিত ভাবে সূচালনা পূর্বক তপ্তির পথে লইয়া থাকিবে।

জীবভাব অপনীত ও মিব ভাব লভ হওয়ার মন অতঃপর জীবশক্তি জমিত আত্ম প্রাসাদ সম্ভোগ করিতে করিতে নিত্যানন্দের পথে অগ্রসর হইবে, এবং তাহার পথদর্শকরূপে নিঃসলা বুদ্ধিকে প্রেরণ করিয়া তোমার আত্মা কেবল দৃষ্টা বা সাক্ষী রূপে অবস্থান করিবে মাত্র।

মনের এই অবস্থা হইলে :—

“নিপাতে ন ম পাপেন পত্র পত্র নিবাস্তমঃ।”

অর্থাৎ পত্রপত্রস্থিত জলের ত্রায় পাপ তাহাতে দিপ্ত হইবে না।

এইরূপে অগ্রসর হইতে হইতে ক্রমে প্রাকৃতিক সীমা অতিক্রম করিলে, যখন আত্মদর্শন হয় এবং চুম্বকের আকর্ষণে ক্ষুদ্র লৌহপিণ্ডের ন্যায় মন আত্মতে সংলগ্ন হইয়া গড়ে কেবল তখনই :—

“ভিদাতে হৃদয়গ্রহি চ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।

ক্ষীয়ন্তে চাম্য কক্ষাণি ভস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥”

চ। এ কেবল শাস্ত্রীয় উপদেশ মাত্র, শুনলাম, এবং মন কিরূপে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া ক্রমে চরম লক্ষ্যে উপনীত হয় তাহাও বুঝিলাম, কিন্তু কিরূপে এই উপদেশ জীবনে প্রতিফলিত হইবে, তাহার উপায় তো কিছু

শুকিলাম না। কিরূপ কার্য্য করিলে প্রত্যেক ইন্দ্রিয় ভোগ্য বস্তু শ্রীভগবানে সমর্পিত হইবে এবং এই সমর্পণ করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণই বা কি, তাহা না জানিলে এই উন্নত অবস্থায় পৌঁছিয়া কিরূপে ?

র। ভাই। ভাবই সমর্পণের মূল, নতুবা কেবল নিয়ম রক্ষার জন্য এক বার নারায়ণের নাম করিয়া জলের ছিটা দিতে না দিতে আহার করিতে বসিলে প্রকৃত নিবেদন করা হয় না, অথচ, দ্বাণাদি অপর ইন্দ্রিয়গণের ভোগের সময় এই ছিটা টুকুই বা দিবে কি করিয়া! শ্রীভগবান জীবের উপভোগের জন্য যে সকল বস্তু প্রদান করিয়াছেন, তাহাদিগের নিকট হইতে ভিক্ষা স্বরূপে তাহা পুনরায় গ্রহণ করিবার তাহার কোন আবশ্যক নাই, অথবা তাহার সৃষ্ট জীবের নিকট হইতে একটু তুচ্ছ খোমোমোদ পাইবার জন্য তিনি বসিয়া নাষ্ট। কেবল জীবের কল্যাণের জন্যই তিনি এই সকল উপায় নিদেশ করিয়া দিয়াছেন জানিও : মনে কর নদী যদি বলে “হে জীব তুমি আমাতে অবগাহন ও আমার বারি পান কর, তাহা হইলে তোমার শারীরিক শানি নষ্ট ও কৃষা নিদুস্তি হইবে.” তাহা হইলে যেমন জীবের শানি নষ্ট বা কৃষা শাস্তি রূপ মঙ্গলের উদ্দেশ্য ভিন্ন নদীর অত্র কোন সার্থক্যকিতে পারে না, সেইরূপ শ্রীভগবান কেবল জীবের কল্যাণের জন্যই সমস্ত ইন্দ্রিয় ভোগ্য বস্তু তাহাকে নিবেদন অর্থাৎ তাহার ভাবে অনুরক্তিত করিয়া ভোগ করিবার আদেশ দিয়াছেন, ইহাতে লালসা দমিত ও ভোগ্য বস্তুর অনিষ্টকারিতা অপগত হয়, হৃদয়ে ভগবৎ স্মরণ জনিত স্বাধিকৃত্যবের উদ্দেশ্য হওয়ায় সেই ভাব ভোগ্য বস্তুর রজস্তম গুণকে অভিত্ত করিয়া উহার অবসাদ জনক শক্তি নষ্ট করিয়া দেয় এবং এইরূপে ক্রমশঃ ভাব স্থায়ী হইলে শ্রীভগবানের সহিত যোগ অব্যাহত থাকায় সাধকের মৃত্যু বা অধঃপতনের ভয় তো নিবারণ হয়ই, অধিকন্তু উদ্ধগতি বা জীবনের পথ বিলুপ্ত হওয়ায় তিনি অচিরে প্রকৃতির অতীত ভূমিতে উপস্থিত হইয়া কৃতার্থ হন।

সম্মুখে ভোগ্য বস্তু উপস্থিত হইলে যে মুঢ় কেবল ইন্দ্রিয় তৃপ্তির উদ্দেশ্যে লোভী পশুর ন্যায় উহা ভোগ করে, আশ্রিতে শুষ্ক কাষ্ঠ সংযুক্ত হইলে যেমন উহা বৃদ্ধি পায় ও ধুমোদগার পূর্বক গৃহকে মলিন করিয়া দেয়, সেইরূপ ঐ ভোগ্যবস্তু তাহার লালসাকে বৃদ্ধি করিয়া চিন্তে মলিনতার ছাপ লাগাইয়া দেয়

এবং গৃহে অবর্জনা জমিলে যেমন তাহা হইতে সর্পাদি হিংস্র জন্তুর আবাস স্বরূপ নানারূপ আগ্রাছা উৎপন্ন হয়, সেইরূপ চিত্ত মালিন্য বুদ্ধি পাইলে ঐহা খলতা, কুটিলতা প্রভৃতি হিংস্র বৃত্তির আবাস স্থল হয়, এবং রোগ শোকাদির বীজের প্রসূতি হইয়া হৃদয়কে অশান্তিময় করিয়া ফেলে।

ক্রমশঃ

—হরেন্দ্রনাথ শর্মা—

## লীলা রহস্য ।

( পূর্ব প্রকাশিতের পর । )

প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ আপনাদের স্মরণ আছে যে, পূর্বে প্রবন্ধে লিখিয়াছি শ্রীভগবান বহুদেবকে আদেশ করিলেন,—

“যদি কংসাদিভেষি ত্বং তর্হি মাং গোকুলং নয়।

মন্দারানামনামশু ত্বং যশোদা গর্ভসন্তবাং ॥”

অর্থাৎ যদি কংস হইতে তোমাদের ভয় হইয়া থাকে, তবে আমাকে গোকুলে লইয়া যাও সেখান হইতে যশোদা গর্ভ সন্তুতা আমারই মাঝাকে এখানে আনয়ন কর ইত্যাদি। বহুদেব তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রাণের প্রাণ শ্রীভগবানকে পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, সকল সংশয়, সকল দুঃখ, সকল ভয় বিদূরিত হইয়াছে, কিন্তু যদি কংস কোনরূপ অনিষ্ট করে, যদি কংসের অত্যাচারে হৃদয়নিধিকে হারাইতে হয়, সেই ভাবনা হৃদয়ে উদয় হওয়ার সুনির্মল হৃদয় শ্রীবহুদেব শ্রীগোবিন্দকে বন্ধে ধারণ করিয়া নন্দালয়ে গমনের উদ্যোগ করিলেন। দ্বারদেশে উপনীত হইবামাত্র হৃদয় কপাট সকল আপনা আপনি খুলিয়া গেল, কেহ দেখিল না স্ততরাং কেহ ব্যথা দিবার রহিল না ভাববিরোধী কংসানুচর সকল ষোর স্ত্রীয়া অতিভূত হইল।

“তাঃ কৃষ্ণ বাহে বহুদেব আগতে স্ময়ং ব্যবর্ভাস্ত যথা তমোরবেঃ ।

দ্বার্যুশ্চ সর্ব্বাঃ পিহিতা হুরত্যয়া বৃহৎ কবাট্যয়স কৌলশৃঙ্গলৈঃ ॥”

শ্রীকৃষ্ণকে বহন করিয়া যেমন বহুদেব দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, অমনি দ্বার সকল খুলিয়া গেল, যে সকল কপাট অতি কঠিন খিল ও শৃঙ্গলদ্বার রুদ্ধ

ছিল, তাহা স্বর্ঘ্যোদয়ে অন্ধকারের স্থায় একেবারে খুলিয়া গেল। বহুদেব অমাত্যসে কংস কারাগার হইতে বাহির হইলেন এদিগে বৃষ্টি হইতেছিল, অনন্ত দেব বিদ্র নিবারণের নিমিত্ত সহস্র ফণা বিস্তার করিয়া বৃষ্টিপাত হইতে বহুদেবকে ও শ্রীগোবিন্দকে রক্ষা করিতে করিতে বহুদেবের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

“বরষ পর্য্যন্ত উপাংসু গর্জিতঃ শেষোবগাং বারিনিবারন কণৈঃ।”

পাঠক! এইবার এই লীলার রহস্য টুকু স্থিরভাবে ভাবিয়া রাখুন। সাধক অভিমানের আলায় স্বরূপ দেহাত্মবাদ অর্থাৎ অন্তর্য কোষকে অতিক্রম করিয়া যখন সাধনার ধন গুরদত্ত ইষ্টদেবকে হৃদয়ে ধারণ করত কার্যক্ষেত্রে গমন করিতে থাকেন, তখন তাহার অসং সঙ্গ ও জাত্যাভিমানাদি সীমাবদ্ধ ভাব আপনা আপনি খুলিয়া যায়, যেমন কংসের কারাগারের দ্বার অতি সুদৃঢ় কিছুতেই খুলিত না অথচ আপনা আপনি খুলিয়া গেল, সেইরূপ যে জাত্যাভিমানের কোনও একটু হানি কর কার্যে প্রথম সাধক ব্যাকুল হইয়া পড়ে, সাধনার উন্নতিতে দেহাত্ম বুদ্ধির গণ্ডী যখন ছাড়িয়া যায়, তখন ঐ অভিমান কপট আপনা আপনি খুলিয়া যায়, সাধক স্থূল দেহের ভাব ছাড়িয়া হৃদয় দেহতত্ত্ব পথে চলিতে আরম্ভ করেন, ঐ সময় পরনিশা ও অযথা প্রশংশাদি দ্বারা সাধক অধ্যাত্ম পথে ব্যথিত বা ভীত কিম্বা লক্ষ্য চ্যুত না হয়, তাহার জগত্ সংস্কৃত সহস্র সহস্র শিক্ষা বা বিধব্যাপী গুরুত্ব শক্তিতে তাহাকে আশ্রয় দেন, সাধক নিরন্তর গুরুর আশ্রয়েই আছেন ইহা অনুভব করত পরমানন্দে গম্য পথে অগ্রসর হইতে থাকেন, জগতের সমস্ত কার্যে সং অসং সকল লোকই শিক্ষা গুরু রূপে কর্তব্যাকর্তব্য শিক্ষা দিতেছে, ইহা অনুভব করিতে পারে, কাহাকেও ঘৃণা করে না, সাধকের মারু ব্যবহারে কর্তব্য জ্ঞান দৃঢ় হয়, অসাধক পার্শ্বচারীর ব্যবহারে ত্যাজ্য বিষয় নিশ্চয় করিয়া নিজে সাবধান হয়। ঐ সময় সাধক এতই ভাবা-বিষ্ট থাকে যে, অসং অসতী নরনারীর অসং ভাবকেও সং ভাবের আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে গুরু মনে করিয়া ভক্তি করে, যেমন অবপূত পিঙ্গল নায়ী বেণুকে তাহার উপপতির জগত্ ব্যাকুল প্রাণে ছল ছল নেত্রে পথ পানে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন, হে বারবিলাসিনি! তুমি আমার আশীর্বাদ কর তুমি যেমন তোমার প্রিয় জনের নিমিত্ত পথপানে ছাহিয়া আছ, আমি যেন আমার প্রিয়তম প্রাণদাতা শ্রীহরির জন্য ইক্লপ ব্যাকুল ভাবে তাঁহার

দর্শন কামনা করিতে পারি। এইরূপে সাধক প্রথম কক্ষা কংস কারাগারের দেহান্ত বুদ্ধির ব্যাপার; দ্বিতীয় কক্ষা রুষ্টিপাত নিন্দাতৃতি অতিক্রম করিয়া অধ্যাত্ম পথে চলিতে থাকেন। এদিকে—

“মম্বোনি বর্ষতাসকং যমানুজ্ঞা গন্তোর তোরৌষ যবোয়ি কেশিয়া।

ভয়ানকানর্ভ শতাকুলানদী মার্গং দদৌ সিদ্ধু রিব শ্রিয়ঃ পতেঃ ॥”

তখন পর্জ্যন্তোর অধিশক্তি দেবরাজ ইন্দ্র অতিশয় রাগি করায় যমুনার জল বুদ্ধি পাইয়াছে, ভয়ানক জলের বেগ, যমুনার আবর্তন ও স্রোত দেখিয়া ভয়ে বিষয়ে বহুদেব ভাবিলেন আর যাওয়া হইল না, কেমন করিয়া এই স্রোত এই তরঙ্গ এই আবর্তন অতিক্রম করিষ্য? পরপারে যাইব? হায়! আমার জীবন ধনকে গোকুলে রাখা হইল না। ভয়ে বিষয়ে কাতর হইয়া ভক্তবান্ধা কাম্যক শ্রীহরিকে স্মরণ করত কাতর ভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, বহুদেবের প্রার্থনার শ্রীভগবৎ ঋতাকে আশ্রয় দিবার মানসে এক অপূর্ক খেলা খেলিলেন, যেখানে বহুদেব তাঁড়িয়া যমুনা জল নিরীকরণ করিতে ছিলেন সেখানকার জল স্পির হইল, সহসা এক শূণাল অনায়াসে পার হইয়া গেল, বহুদেব সাহস পাইলেন আর ভয় রহিল না, ভবভয়চারী শ্রীহরিকে বক্ষে করিয়া বহুদেব যমুনা পার হইলেন।

পাঠক এখানে আবার অধ্যাত্ম রাজ্যের অপূর্ক কৌশল ভাবুন, হুখ পাইবেন; সাধন পথে অগ্রসর হইবার সাহস আসিবে। স্থান বিশেষে যমুনার পৃথক পৃথক নাম বুদ্ধিতে হইছে। এখানে যমুনার যমুনা বিষয় ভোগ বাসনা নামে অভিহিত হন। সাধক স্থল দেহের ভোগকে জয় করিলেও যাবৎ পর্যন্ত বাসনাময় স্মরণ দেহের বিষয় বাসনাকে জয় করিতে বা সংযম করিতে না পারে, ততদিন গোকুলে গমন সহজ হয় না। যমুনা যেমন ভয়ানক বেগবতী ও জল পরিপূর্ণ, বাসনা নদীও সেইরূপ প্রবৃত্তি জলে নানাপ্রকার ভাব স্রোতে ভোগ আবর্তনে অতিশয় ভীষণ মূর্তি ধারণ করে, যে সাধক হতাশ হইয়া উহা অতিক্রম করিবার চেষ্টা না করে, সে সাধক কষ্ট সঞ্চিত ভাব ও তপস্তার ফল ঐ স্থানেই হারায়, যাহার সংস্কর সহায়, যে প্রত্যেক বিষয়ে আরাধ্য দেবের নিকট শক্তি সঞ্চয় প্রার্থনা করে, তাহার ভয় থাকে না, তাহাকে সাহস দিতে শ্রীভগবান নানাপ্রকার লীলাবু অবতারণা করেন, সে ভীত না হইয়া সর্কশক্তিমানের অব্যর্থ শক্তিকে সংগ

করে, যেমন পূর্ণরূপে নির্ভরকরে, অমনি তাহার জ্ঞান চক্ষুর নিকট বিষয় বাসনাকে অনায়াসে অতিক্রম করিয়াছে এমন কত শত দৃষ্টান্ত আসিয়া উপস্থিত হয়। সে অকাতরে বলিতে থাকে “মুকুং করেতি ষ্টাচালং পঙ্গুং লজ্জয়তে গিরিং যং কুপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবং ॥” যাহার শক্তিতে বোবা কথা কহিতে পারে, পঙ্গু পর্কত লজ্জন করিতে পারে, আমি সেই পরমানন্দময় শ্রীহরিকে বন্দনা করি, আমার ভয় কি? সাধক তখন সাহসে বুক বান্ধিয়া বিষয় বাসনাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়। বহুদেব যেমন যমুনা পার হইয়া অনায়াসে গোকুলে উপস্থিত হইলেন, সাধকও সেইরূপ বিষয় বাসনাকে পরাজয় করিয়া আরাধ্য দেবকে ধ্যান করিতে করিতে হৃদয় গোকুলে ভাবনিধি ভগবানকে স্থাপন করেন। বহুদেব যেমন নন্দালয়ে উপস্থিত হইয়া যশোদার সযাগত—মায়াকে গ্রহণ করিয়া শ্রীহরিকে তথায় রাখিয়া আসিলেন, “সুতং যশোদাশয়নে নিধায় তং নয়াং সমাদায় পুন গৃহানগাং।” সাধক ও হৃদয় গোকুলে ভক্তির-কেন্দ্রে ভগবানকে রাখিয়া হৃদয় হইতে মহামায়াকে একেবারে গ্রহণ করিয়া কংসালয়ে লইয়া যান। অর্থাৎ সাধকের মায়াকে বাল্কিক ভাবেই কর্তব্য পালনের অহুকুলে সুস্মার করার আত্মরিক মায়াকে না। যতক্ষণ গোকুলে মহামায়াকে আবিভূত ছিলেন, ততক্ষণ যশোদা প্রভৃতি সকলেই নিদিত, যেমন শ্রীগোবিন্দ তথায় গেলেন সকলে জাগিয়া উঠিল। পাঠক এ বিষয় পূর্বে বলিয়াছি যতক্ষণ হৃদয়ে মায়ার প্রকাশ থাকে, ততক্ষণ জীবাত্মা নিদিতের স্থায় থাকে, ভক্তি ও নামে কুচি প্রভৃতি ঐ মায়ার সঙ্কীর্ণ ভাবে অপ্রকাশ থাকে, শ্রীকৃষ্ণর রূপায় মায়াকে অপসারিত হইলে ভাবময় শ্রীভগবান প্রকাশ পান, তখন সাধক ভাবানন্দে জাগিয়া উঠেন এবং আরাধ্যদেবের প্রতি প্রবল ভক্তির মধুরতা আবাদন করিয়া লীলারূপে মাতিতে থাকেন। আর্হা ব্রজলীলা কি মধুর; বলিয়া বুঝান যায় না, ভাবিয়া বিভোর হওয়াই ভাল, সাধক! প্রাণে প্রাণে ভাবুন, আর লীলার জয় দিউন, এইবার শ্রীভগবানের ব্রজলীলার রহস্য বলিতে প্রবৃত্ত হইব। প্রাণ ভরিয়া অকপট হৃদয়ে গোকুল বিহারি শ্রীহরির নাম উচ্চারণ করুন, শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া অদ্য অবসর লইলাম।\*

শ্রীদীনবন্ধু শর্মা।



শ্রীশ্রীরাধারমণে জয়তি ।

# ভক্তি ।

২য় ও ৩য় সংখ্যা—৮ম বর্ষ ।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী ।

ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্ত্য জীবনয় ॥

## প্রার্থনা ।

দীন তারণ দীনেশ দীন দৈম্যার্গিহারক ।

দীব্য-ভাবং দীব্য-দৃষ্টিং দীব্য-মূর্ত্তিং ও দর্শয় ॥

হে দীন-তারণ । দীনজনেব চুঃখ দূর করিতে তোমার মতন আর কেহই নাহি । হে দীনজন বন্ধো । • তুমিই দীনেব হু খ ও দৈত্ব নাশ করিতে প্রভু, পবিত্র ভাব দাও পবিত্র দৃষ্টি দাও তোমার সুপবিত্র নখনানন্দকর মনোমোহন মূর্ত্তি দেখাইয়া দাও তোমার দেবিষা মনের আশা পূর্ণ করি তোমার দরশনে নয়ন মন চিরদিনের মতন জুড়াইয়া যাউক ।

হে বিধাধার ! বিধের যেদিকে চাই তাগতেই তোমার মঙ্গল সঙ্গার পরিচয় পাওয়া যায় । মঙ্গলময়ী ! বিধব্যাপী তোমার মঙ্গলময় ভালবাসা অনুভব করাইয়া দাও, যখনই তোমার দয়ার প্রাণে ভাবের সঞ্চয় হয় তখন আর কোন অভাব !

কোন অশান্তি কোনরূপ বিকোপ থাকে না, প্রাণে অপূর্ণ ভ্রমবশ্ত উদয় হয়, তখন মনে হয় তোমার ভালবাসার বিদু বিদু হৃদয়ে লইয়া, সংসারে, পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু, পতি, পত্নী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসিয়া সুখ পাইতেছে এবং সুখ দিতেছে। এক এক জনের ভালবাসা পাইয়াই তোমাকে মনে হয়, আরও মনে হয় পিতা, মাতা, ভাতা, বন্ধু, পত্নী, পুত্র এবং কথারূপে তুমিই সকল ভাবের পূর্ণতা অনুভব করাইতেছ, শাস্ত্র, দাস্ত্র, সখ্য, মধুর ও বাৎসল্য এ সকল ভাব তুমিই অনুভব করাইতেছ তুমি ভাবের আধার তোমা হইতেই সকল ভাব আসিতেছে, আবার সাধকের হৃদয়ে যাহার যেমন ভাব তাহা তুমিই গ্রহণ করিয়া সাধককে সুখী করিতেছ, তুমি ভাব সকার না করিলে ভাবের বিদূলাভ করিতেও কোন ব্যক্তি সমর্থ হয় না। তুমি নানাভাবে ভাল বাসিয়া বাচাইতেছ, আদর করিতেছ, সুখ দিতেছ, কিন্তু নাথ ! আমি, প্রাণ খুলিয়া তোমার ভাল বাসিতে পারিলাম না, কবি হই পরিহাপের বিষয়। আমি তোমার ভালবাসা পাইয়া সুখী হইতেছি, কত শত শত নর নারীর হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া ভাল বাসিয়া অভাবমোচন কবিয়া যহ করিতেছ তাহার সংখ্যা করিতে পারি না, কিন্তু আমি তোমায় ভাল বাসিয়া তোমার আদেশ পালন করিয়া তোমার সদিচ্ছ পূর্ণ করিতে পারিলাম না। প্রভো ! ভালবাসা শিখাইয়া দাও যেমন প্রতি নিয়ত প্রতি কার্যে প্রত্যেক ব্যক্তি দ্বারা তোমার সকারিত ভালবাসা পাইতেছি, তেমন করিয়া যেন বিগর্জীবে ভাল বাসিয়া তোমার ভাব অনুভব করিতে পারি। মোহে বিমুগ্ধ হইয়া অন্ধের মতন ঘোর অন্ধকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যেন সংসার কূপে পতিত না হই, নিজগুণে ভাল বাসিয়া দীব্যতত্ত্ব দীব্যনেত্র প্রদান করিয়া তোমার বিগর্জাপী দীব্য মুক্তি দেখাইয়া দাও, আমার হৃদয় পোষিত ভিন্নজীবনের আশা পূর্ণ হইয়া যাউক। ভাবে ভাবে সকলের নিকট তোমার মহিমা কীর্তন করি।

দীনবন্ধু শর্মা ।

## শ্রীগোরাঙ্গ ও বৈষ্ণব ।

—:—

বৈষ্ণব মাত্রেই, শ্রীগোরাঙ্গকে, পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, তাহা, যিনি না করেন, তিনি বৈষ্ণব-পদ-বাচ্যও হইতে পারেন না। শ্রীগোরাঙ্গে বিশ্বাস না হইলে, শ্রীরাধাক্ষে বিশ্বাস হইতে পারে না। শ্রীরাধাক্ষে বৃষ্টিতে হইলে, শ্রীগোরাঙ্গ বৃষ্টি আবণ্ডক। শ্রীগোবান্দ কি ?—পরতত্ত্ব ( শ্রীগোরাঙ্গ ) = শ্রীরাধা + শ্রীকৃষ্ণ। “শক্তি শক্তিমতোরভেদাং” অর্থাৎ শক্তি ও শক্তিমান ঐতিম। পরতত্ত্ব, রসতত্ত্বের প্রকাশ ও বিকাশের জগু দুই মূর্তিতে প্রকাশ পান—শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ। আবার, সেই শ্রীরাধাক্ষে এক হইয়া, অর্থাৎ ‘পর-তত্ত্বাবস্থায়’ যেমন ছিলেন, তেমন হইয়া শ্রীগোরাঙ্গরূপেই উদ্ভিত হইলেন।

শ্রীপ্রভু অবতীর্ণ হইয়া, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবৃন্দাবন স্থাপন করিলেন। শ্রীগোরাঙ্গ, শ্রীরাধাক্ষে বিষয়ে শুদ্ধ সাক্ষ্য দিয়াছেন তাহা নহে, শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ খানিতে জীবনী দান করিয়াছেন। তাহাতে বৃন্দাবন লীলা অর্থাৎ প্রজের নিগুঢ় রস কি, মাধুর্য, ভজন কাহাকে বলে ও প্রকৃত ভজন প্রণালী কি, তাহা প্রভু নিজে আচরিয়া জীবকে শিখাইলেন। কোন জীবের সাধ্য ছিলনা যে, “শ্রীরাধার” প্রেম’ কি, তাহা আপনি হৃদয়ে ধরিয়া, জীবকে দেখাইয়া দেয়।

“প্রেমা নামাত্তুতার্থঃ শ্রবণপথগতঃ কস্য নাম্নাং মহিদ্ভঃ ।

কৌ বেত্তা কস্য বৃন্দাবন বিপিন মহামাধুবিবু শ্রবেশঃ ॥”

কোবা জানাহি রাধাং পরমরস চমৎকার মাধুধামীমা—

‘মেকটোচতন্য চন্দ্রঃ পরম করুণয়া সৰুমাশিচকার ॥’

অর্থাৎ প্রেম নামক পরম পুরুষার্থ, যাহা পূর্বে কহা হইয়াও শ্রবণ পথে গমন করে নাহি, নমি-মহিমুখ্যাহা পূর্বে কেহ জানিতেন না, শ্রীবৃন্দাবনের পরম মাধুরী, যাহাতে কেহই প্রবেশ করিতে পারেন নাহি, এবং পরমাসুখ্য মাধুর্ধ্যরসের পরাকাষ্ঠা স্বরূপা শ্রীরাধা, যাহা পূর্বে কেহই অবগত ছিলেন না, কেবল চৈতন্য চন্দ্র প্রকটিত হইয়া, এই সমস্ত আবিষ্কার করিয়াছেন।

বেদের মায়াবাদ, বিশিষ্টের অধ্যক্ষ-চর্চা, তত্ত্বের বিভীষিকা প্রভৃতি মন্যাবিধ জর্জরিত দেশ উচ্ছন্ন যাহতে ছিল। এমন কি, শ্রীমদ্ভাগবতেও এই মায়াবাদ ও অধ্যক্ষ চর্চার গন্ধ পাওয়া যায়। প্রভু, এ ক্ষুদ্রের নিরাশ করিলেন।—  
করিয়া কি করিলেন ? যথা—

“ব্রজের নিগড় রস বিদাইয়া ধরে ধরে ॥”

“গৌর পরশমণির কি দিব তুলনা ।

আমার গৌরাস্বের গুণে, কলুষিত জীবগণে,

নাচিয়া গাইয়া হইল সোণ ॥”

অর্থাৎ—শ্রীগৌরস্ব “সাধন-কণ্টক পথে কুল ছড়াইলা ।”

প্রভুর কৃপায়, আমবা জানিচ্ছি যে নাম কীর্তন ও রস আশ্রয়ন জীবের প্রধান সাধন। নাম-রস-সুধাপানে জীব নিঃশূল হয় ও ভগবানের প্রেমরূপ ধন প্রাপ্ত হয়।

প্রভু মুবারিকে বলিতেছেন. “মুবারি, অধ্যক্ষ-চর্চা করিও না, তাহা হইলে আমাকে পাংবে না।” আরো বলিলেন যথা—

“বেদ প্রতি ক্রোধ করি বলি উত্তর ॥

হস্ত, পদ, মুখ, মোর নাহিক লোচন ।

এই মতে বেদে মোর কবে বিড়ম্বন ॥”

অর্থাৎ—অধ্যক্ষ চর্চায়, যোগযজ্ঞে ও মায়াবাদে সেই ব্রজেন্দ্র নন্দনকে পাওয়া যাইবে না।

এই ভক্তি ভাবধীন বেদান্ত চর্চায় ও অধ্যক্ষ চর্চায় দেশ ছাড়ে খাড়ে হাইতেছিল, এখনও যাইতেছে। যথা—

“উপাসতাং বা গুরুবর্ষ্যকোটীরধীয়তাং বা ক্রান্তি শাস্ত্র কোটী: ।

চৈতন্য কাকণ্য কটাক্ৰভাজং ভবেৎ পরং সদ্যঃ স্তম্ভস্ত ল্পভঃ ॥”

অর্থাৎ—কোটা সংখ্যক শ্রেষ্ঠ গুরু সেবাই করুক, আর বহু বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করুক, কিন্তু ক্রমমাত্রে গুঢ় শ্রেয়লাভ হইতে, শ্রীচৈতন্য কৃপাদৃষ্টিপ্রাপ্ত ব্যক্তিরই হয়।

শ্রীপোরাঙ্গ অবতারের অত্যাচার উদ্দেশ্যে মধ্যে সামান্য এই কয়েকটার উল্লেখ করিয়া গেল।

শ্রীপ্রভুর অমৌম রূপা লাভ করিয়াও যদি কোন বৈষ্ণব শ্রীভুক্তকে পূর্ণ-ভগবান রূপে, বিশ্বাস করিত না পারেন, তবে, শ্রীপ্রভু যে, তাঁহাদের পরমারাধ্য-বস্তু শ্রীশ্রীরাধা-সেবক, মধুর-ভজন শিক্ষা দিয়াছেন তজ্জগৎ তাঁহাদের নিকট, গুণরূপে অবশ্য প্রণম্য ও মাত্ৰ হইতে পারেন।—ইহাতে, কেহ অস্বীকার ও অবিশ্বাস করিতে পারেন না।—ইহার জগৎ, শ্রীভুক্ত নিকট বৈষ্ণবমাত্রই দায়ী হইতে হইবে, এহা সুনিশ্চয়।

ভাই বৈষ্ণব! আমার শ্রীভুক্ত কি বস্তু! একবার শ্রীনিত্যানন্দের মহাবাক্য অনুভব কর।

“অক্ৰোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়।

অভিমান শূন্য সঁদাঁ নগরে বেড়ায় ॥

যে না লয় তারে, বলে, দস্তে তৃণ ধরি।

“আমার কিনিবা লহ ভজ গৌর হরি ॥”

শ্রীভুক্ত চরিত্র কি একবার মনে করুন।

“উঃপরে কান্দে শ্রীভুক্ত জীবের লাগিয়া।”

আবার বাহুস্বাষ বলিতেছেন—

“কে আর করিবে দয়া পতিত দেখিয়া।

পতিত দেখিয়া কেবা উঠিবে কান্দিয়া ॥”

শ্রীভুক্ত, পতিত দেখিলে দুঃখে অধীর হইতেন। আর সেই পতিত উহা দর্শন করিয়া, শ্রীভুক্ত সন্দেহ রোজন করিত—করিয়া উদ্ধার হইত। কবে কে ইহা দেখিয়াছেন যে, একজন, একটা পতিত জীবের গলা ধরিয়া রোদন করিয়াছেন? কোন অবতारे এরূপ করুণা প্রকাশ করিয়াছেন? কোন অবতारे দস্তে তৃণ ধরিয়া জীবের দ্বারে ‘কৃষ্ণনাম’ ভিক্ষা করিয়াছেন? কোন অবতारे কটাতে একখানি কৌপীন পরিয়া দ্বারে দ্বারে কৃষ্ণ বসিয়া রোদন করিয়া বেড়াইয়াছেন?—ভাইরে, এমন পতিতপাবন, দয়ার সাগর হেমকুটি মধুরমুষ্টি হুম-

কৈমল কটিতে একখানি সামান্য কৌপীন-পরিহিত দেখিয়াও কি হৃদয়দ্ৰবীভূত হয় না—তাঁহার এরূপ দৈগ্ধভাব দেখিয়াও কি আমাদের অপরিবৃত্ত হৃদয়-ক্ষেত্রে পবিত্রতার সুখিমল সমীরণ প্রবাহিত হয় না—অবিধাসের মরুময় ক্ষেত্রে বিধাসের কুমুম-কলিকা ফোটে না—অহমিকা পূর্ণ সমুদ্র-শিরশ্রীড়াবনত হইয়া তাঁহার চরণে ঢলিয়া পড়ে না? প্রভু, পতিত দেখিলেই দুঃখে অধীর হইতেন, আর সেই পতিত উহা দর্শন করিয়া, প্রভুর সঙ্গে রোদন করিত,— করিয়া উদ্ধার হইত।” যখন, প্রভু, নিতাইয়ের মান রক্ষার্থ মাধাইকে দণ্ড করিবেন বলিলেন, তখন নিতাই, প্রভুর চরণ ধরিয়া বলিলেন, “প্রভু, তুমি না বার বার বলিয়াছ যে, এ অবতারে আর চক্ষু ধরিবে না? এবার না তুমি আপনি কাদিয়া জীবকে কান্দাইবা ও নিশ্চল করিবা, আর কারুণ্য-রসে তাহা-দিগকে উদ্ধার করিবা?” প্রভু, মধুর হাসিয়া বলিলেন, “তাই বটে।” প্রেম, অতি গোপ্যবস্তু—অল্যাধন। ইহার একমাত্র সঙ্গাধিকারী, প্রভুপ্রেমস্বরূপ স্বয়ং। প্রেম-বিতরণ অশ্রুদ্বারা সম্ভব নহে। তাই, প্রভু বলিয়াছেন,—

“অশ্রুকায মোর অংশ দ্বারা হয়।

প্রেম বিতরণ অশ্রু দ্বারা নয় ॥”

এ সব ত অশ্রু কোন অবতारेই ছিল না। এ সমুদয় কার্য, আমার শ্রীঅমিয় গৌরাস্তের নিজে, ইহার সঙ্গাধিকারী তিনি এ-ন, আর কাহারও ইহাতে অংশ নাই।

ভাইরে! এমন দয়ার সাগর, পতিত পাবনের শ্রীচরণে প্রাণ বিকাইতেও কি আমাদের ইচ্ছা হয় না?—তাহাকে পূর্ণ ত্রফ বলিতে প্রাণ চায় না? হয়! আমাদের হৃদয় কত কঠিন—কত অশুচি। আমরা, মহাপাতকী?

যেই জন পুণ্যবান, কে না তাঁর বনে ভাগ?

তাহাতে মহা কিবা আর?

পাপীয়ে যে ভালবাসে, আমি তুলবাসি তাঁরে,

সেই জন জেয় অবতার।

মিত্রকে যে ভালবাসে, 'সকাম সে ভালবাসা,

সে ত ক্ষুদ্র ব্যবসায় ছার।

শত্রু মিত্র তরে,

যাঁর সমভাবে কৃপা দে প্রাণ,

সেই জন দেবতা আমার।

আহা! এমন পতিত উদ্ধারণ, প্রেমের অবতার, কে কবে দেখিয়াছ? অশ্রু অবতারে, প্রভু, পাপীকে—শত্রুকে দণ্ড করিয়াছেন, আর, এ অবতারে প্রভু, তাহাদিগকে আদরে প্রেমালিঙ্গন করিয়াছেন। এ অবতারে শত্রু মিত্র সমভাবে দেখিতেন। তাই, যখন পথদাস্ত মাধাই, প্রভুর কুম্ভ-কোমল শ্রীঅঙ্গে কলসীর কাণা নিক্ষেপ করিয়া রক্তাক্ত কনোবর করিয়াছিল, তখন প্রভু, বলিয়াছিলেন—

“মেবেছ আমার কলসীর কাণা।

তাই বলে কি প্রেম দিলাব না।”

• আহা! এই প্রেম—পীড়াপূর্ণ মগুর-বচনে মাধাইকে কোল দিয়াছিলেন। এমন ক্ষমা কে করে করিয়াছেন? এ ছেন অভেদাত্মক পরমাত্মীর কে কবে দেখিয়াছেন? শত দেশে করিলেও ইহাঁর নিকট ক্ষমা পাইবার আশা আছে। এই জগতই বলি, শ্রীগোরাঙ্গের চরণেই আমাদের আয়-সমর্পণ করা উচিত। অচৈতন্য কলিয়ুগে, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য ব্যতীত আমাদের উপায় নাই। আমরা কলির জীব, মহাপাপী—ভক্তি বিধাসহীন—সংযম বিহীন। অতএব, পাপীকে, যিনি ভাল বাসেন, তিনিই আমাদের ভজনীয়-বস্তু হইতে পারেন। আরও, “আপনি আচরি ধর্ম জীবের শিখাইলা।” আপনি আচরণ কত্তিয়া ভজন প্রণালী জীবকে শিখাইলেন। কলির, অগম্য জীবের, সহজ ও সুখ-সাধ্য পথ দেখ ইয়া দিলেন। অথ কোন অবতারে, এগম্য আচরিয় শিখান নাহ—চাঁখে আঙ্গুল দিয়া দেখুইয়া দেন নাই—অধকে হাত ধরিয়া লইয়া যান নাই। প্রভু বলিয়াছেন “পাপ দাও, ধর্ম নাও।” আপনি পাপের বোঝা মাথায় ধরিয়ো, জীবকে শ্রীনাম তরীতে উঠাইয়া, চিদানন্দ সিঙ্গুনীরে, প্রেমানন্দের লহরীতে পাঠাইতে নাচার্হতে স্নেহময় চৈতন্যধামে লইয়া যাইতেন। আহা! এমন অযাচিত রূপে প্রেমদান কেহ কখন করেন নাই।

“যে জন পলায় তাঁর ধরে কোলে করি

শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রেমের করে অধিকারী।”

• কৃষ্ণভেদ, পানাহারাও নিস্তার ছিল না; তাহাদিগকে প্রেমালিঙ্গন দিয়া, পরম পুরুষার্থ প্রেম ধনের অধিকারী করিতেন। এমন দয়ালু অবতার কোন যুগে হয় নাই, হইবার নহে।

“চণ্ডালে ব্রাহ্মণে,  
বৎসে কলাকুলী,  
কবে বা ছিল এ রঙ্গ।”

হে ভাই বৈষ্ণব! একবার প্রাণ ভরিয়া দেখ, আমার রসরাজ শ্রীগৌর-বিগ্রহের কি জগদ্বলান সোনার বরণ, সচ্চিদানন্দময় মূর্তি,—শিঙ্কার কি জলন্ত আদর্শ। আহা! আমার এক মূর্তিতে সবই (গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণব) পাওয়া যায়। আমার শ্রীগৌরবাহ্নের শ্রীমূর্তি, শ্রীশ্রীরাধাক্ষের যুগল মূর্তি কি জলন্ত উপমা। ইহাই প্রকৃত যুগল মূর্তি। একদিকে সেই জগদ্বলান প্রেমপূর্ণ বঙ্কিম চাহনি, অশ্রুদিকে আবার দাগভাব—রাধাভাব। হে ভাই জগদ্বাসী? যদি রাধাক্ষেব অতির দেখে, একাত্মা (পবতত্ত্ব) দেখিতে চাও, তবে, শ্রীগৌরাক্ষ মূর্তির প্রতি দৃষ্টিপাত কর।—দেখ, জলেতে জল মিশিয়া গিয়াছে।

শ্রীনিগীকান্ত বহু, ডাক্তার।

## আকাঙ্ক্ষা ।

—:—

(ঈশ-প্রেম।)

কৃত দিন কত আশ জাগে মনে

কত ভাসি গড়ি বসি নিবঞ্জে,

তবু সে বাসনা স্থিরতা-হারী।

শৈশব-প্রভাতে ধূলি খেলাসাথে

কৈশোরে বসিতে জাহ্নবী সৈকতে,

আশার আবেশে ছিহু আশ্রহারা।



যৌবনে আসিয়ে সংসার অঙ্গনে,  
কত সুখ-আশা জাগেরে পরাণে,  
জ্বলদ-পটলে ধেমতি চপলা ।

অসার আশার (ঐ) কুহকে তুলিয়া,  
জীবন যাপিনু সুখের লাগিয়া,  
বারেক শ্রীহরি হ'দনা বলা ।

প্রতিদিন ওই তরুলতা গণ,  
অরচিত্তে ঙ্গ শ রাতুল চরণ,  
অঞ্জলি ভরিয়া কুহুম চালে ।

মধুর প্রভাতে বিভু গুণ গান,  
মিশিয়া বিহগ নভোনীলিমার,  
নারিছে অমিয়া যেন ভুতলে ।

অনন্ত উচ্চাসে গভীর আবেশে,  
ধাইছে তটিনী মিশিতে প্রাণেশে,  
অচপ্ত আকাজকা হৃদয়ে ভরা ।

বিধু বিভাকর জ্যোতিক মণ্ডল,  
ঘুরে বোয়ামপথে প্রেমেতে বিহ্বল,  
যে প্রেম আলোকে উজ্জল ধরা ।

অহো বিভু প্রেমে প্রমত্ত সকলি,  
চরমে পরম পরাংপরে মিলি,  
লভিতে অক্ষয় অব্যয় ফল ।

মগন এ পাপী কলুষ সলিলে,  
কছু না স্মরিলে শ্রীনিবাসে ভুলে,  
হবে কি উপায় অস্তিমে বল ।

**প্রেমময় !**

সুখ-সত্যময়ী মধুর মরুতি,

হেরি সারা বিশ্ব পুলকিত অতি,  
 গাপীর অন্তরে সে ছবি কই ?  
 হে বিভো দয়াল এ কাঙ্গাল ডাকে,  
 ঘুচাও আঁধার তব প্রেমালেকে,  
 “আকাঙ্ক্ষা” হৃদয়ে জাগিছে এই ।

দীন—শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দাস ।

## যুগল-মাধুরী ।

( গান )—সিন্ধু খানসাজ ।

—:—:—

সুখময় বৃন্দাবনে চলরে আমার মন-পাগল ।  
 নিরখিয়ে রাধা শ্রামে, কব্ধা প্রাণ সুশীতল ।  
 ( কিবা ) প্রণয় পীয়ুষ রসে, নৌহে রাধা ভূজ পাশে ।  
 ভকত হৃদয়াকাশে উদ্ভিত হয় কেবল ।  
 কুসুমিত কুঞ্জবনে, মদুরময়ুরী সনে,  
 নৃত্যবরে বিভোর প্রাণে, ঐ শুননা পিকের কুছ বেলা ।  
 ললিতাদি সখী যারা, সুরমা নিরুঞ্জে ঘেরা,  
 সোহাগ ভরে কতই তারা, দিচ্ছে পদে প্রেমের ফুল ।  
 মরি কি বাঁশীর গান, ব্রজগোপীর নজায় প্রাণ,  
 মধুনাও বহে উজান, তুলিতেছে কতই রোল ।  
 চলরে ললিত, চলরে ভরিত, পার্বসু যদি, কর্তে পীরিত,  
 সে বিনে এমন দয়াল সুহৃদু আর কে তোমাব হবে বল ।

দীন—শ্রীললিত মোহন মঙ্গল ।

# রাজ্য পা ছ'খানি ।

( অষ্ট সখীর শ্রীচরণ সেবা । )

—:—

মরি ! মরি কি হৃন্দর রাজ্য পা ছ'খানি রে,

কমল আসনে শোভাময় ।

বারেক হেরিলে, আর বারেক মরিলে রে,

পুলকে পরাণ পূর্ণ হয় ॥

গোপী চিত্ত বিমোহন অপরূপ ধন রে,

সখীগণ তাই মিলে ।

বেষ্টন করিয়া ওই সত্যক হইতে রে,

দাঁড়াইরে আছে যে সকলে ॥

কোন সখী করে নয় কনক ভঙ্গার রে,

পদ যুগ ধুইবারে আশ ।

কোন সখী মুছিবার তরে অগ্রসর রে,

এলাইত তার কেশ পাশ ॥

চামর লইয়া কেহ হইল উদ্যত রে,

করিবারে মধুর ব্যঞ্জন ।

কেহুবা গুপ্ত, গদে দিতে পরাইয়ে রে,

করিয়াছে করেছে গ্রহণ ॥

কাজে করে অলক্তক, কারো বা চন্দন রে,

মাখাইতে যুগল চরণে ।

কোন সখী ব গুণি জন্ম, কেহ বা কমল রে,

আনিয়াছে আত্মীয় বতনে ॥

এইরূপে অষ্ট সখী, অষ্ট রত্ন ল'য়ে রে,  
 সেবিবে শ্রীযুগল চরণ ।  
 সেবা অধিকার লভি' পশ্চাতে থাকিয়া রে,  
 • আমি কি করিব দরশন ।  
 দীন—শ্রীরসিক লাল দে ।

## প্রার্থনা ।

( শ্রীশ্রীরামা পা দু'খানি স্মরণে এই কবিতাটি লিখিত । )

—:—

কবে হেন শুভদিন হইবে আমার ?  
 বিষয়ে গরল বলি, ফেলিব দূরেতে ঠেলি,  
 পদ-ভূষা পিব অনিবার ॥  
 সদা সখী ভাবনায়ে, থাকিব প্রমত্ত হ'য়ে,—  
 করিব মানমে ত্রজে বাস ।  
 দুগলের শ্রীচরণে, ভাব পুষ্পাঞ্জলি দানে,  
 উথলিবে আনন্দ উচ্ছ্বাস ॥  
 কতু না ভুঙ্কার ল'য়ে, সখীর করেতে দিগ্নে,  
 চেয়ে রব সতৃষ্ণ নয়ন ।  
 সৃখী মোর সেই জলে, ধোয়াবে পদ কথলে,  
 হব আমি আনন্দে মগন ॥  
 কতু বা চন্দন করে, রহিব অনতি দূরে,  
 সখী গাছা লইবে চাহিয়া ।

পদ যুগে মাথাইবে,                      কিবা হুথ উপজিবে,  
 উল্লাসে পূরিবে মোৰ হিয়া ॥

হায় ! হেন দিন হবে,                      নৃপূৰ নিৰুণ যবে—  
 দিবা নিশি শুনিব শ্ৰবণে ।

সংসারের কলরব,                      হইবে নীরব সব,  
 মঞ্জীর আৰাব সদা শুনে ॥

বুখা মোৰ এই আশ,                      ব্যৰ্থ মোৰ অভিলাষ,  
 আকাশ কুলুম সম কথা ।

কোথা আমি আছি প'ড়ে,                      দূৰে, দূৰে, অতি দূৰে,  
 নরকের কীট আছি কোথা ॥

তবে যদি কৃপা কর,                      হে কিশোরি ! হে কিশোর !  
 আসিবে, আসিবে দিন শুভ ।

সদা শুদ্ধ চিত্ত হ'য়ে,                      প্রকৃতির ভাব ল'য়ে,—  
 দাসী হ'য়ে চরণ সেবিব ॥

দীন—শ্ৰীৱসিকলাল দে ।

## বসন্ত বিবেক ।

—:~:—

আর ভয় নাই ।

• অস্ত্র দায়ক ভয়হাৰি-পদে,  
 শরণ লইলে রব ছিরাপদে ।  
 আয় পিতৃভক্ত শ্যাম সব ভাই,  
 তাঁরে ভালবাসি, আর ভয় নাই ॥

বড় মেহ তাঁর পুত্রগণ প্রতি,  
 করিছে পালন, নাশিছেন ভীতি ।  
 মেহ পরায়ণ এত কেহ নাই,  
 সহায় জনক, আর ভয় নাই ॥  
 পিতা মাতা বন্ধু এই তিন জন,  
 স্বভাবতঃ হিতকারী এ ভুবন ।  
 সংসার-খুশানে পাছে ভয় পাই,  
 তেঁই তিনি ক'ন “আর ভয় নাই ॥”  
 তুষার যবে করে অক্রমণ,  
 শুষ্ক কর্ণদেশ বিগুরু বদন ।  
 গুণাগত প্রাণ হারাই হারাই,  
 নীরাকারে ক'ন,—“আর ভয় নাই ॥”  
 সুধার জালায় যবে দেহ জলে,  
 নাহি যায় জালা প্রবেশিলে জলে ।  
 কুণ্ডলিনী ( আদ্যাশক্তি ) করে পালাই-পালাই,  
 খাদ্যরূপে ক'ন,—“আর ভয় নাই ॥”  
 যেই শত্রু হাতে পড়ি মোরা যবে,  
 উদ্ধারিতে ব্যস্ত ভয়হারি তবে ;  
 নানা অবতारे দেখিবারে পাই ।  
 মাতিভঃ মাতিভঃ জীব ! আর ভয় নাই  
 সময়ে যেদিকে চাহিছে যথানি,  
 অভয় বচন তখনই শুনি ;  
 সেদিকে তাঁহারে দেখিবারে পাই,  
 “এই যেরে ঠামি, আর ভয় নাই ॥”  
 না ডাকিতে যবে নির্জৈ রূপা বশে,  
 ভব-ভয়-হারি ভয়রাশি নাশে,

কালের কটাক্ষে আর ভয় নাই,  
ডাকহে মুহূর্ত্ত, আর ভয় নাই ॥  
আয় আয় মাই আয় সবেমিলি  
ভক্তি ভরে বলি করি কৃতাঞ্জলি  
ত্রাণ পিতঃ মোরা অজ্ঞ যত ভাই  
নাজানি ডাকিতে, আর ভয় নাই ॥

## দুইটী গান ।

( ১ )

হরি ! ছল কে বুঝিতে পারে ।  
যথা তোমার নাম, ব্যক্ত অবিরাম,  
তথায় শনশাম, বিপদ বাড়ে ॥  
দৈত্যকুলের শ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ চুড়ামণি,  
সদা মুখে করতেন কৃষ্ণ নাম ধ্বনি,  
কিস্ত তথায় দেখ ওহে গুণমণি,

কি ছলে বধিলে তাঁহার পিতারে ।

সুগ্রীবের সাথে যেদিন হয় মিতালী,  
সেদিন হতে তোমার পড়ে পদধূলী,  
কিস্ত তথায় দেখ ওহে বনমালী,

কি ছলে নাশিলে বালি কপীপুত্রে ॥

যেদিন হতে পড়িয়াছে পদরঞ্জ,  
শূলক্কা মাঝে শ্রীমদ আশ্রয়,  
কি ছলে বধিলে ওহে ব্রজ রাজ,

বান্ধব সহিতে বীর রাবণের ।

ব্রজ ভূমে দেখ শ্রীমন্দ নন্দন,  
 দুগ্ধ পোষ্য তুমি ছিলেহে যখন,  
 কি ছলে করিলে পুতনা নাশন,  
 শকট ভাঙ্গিলে পদেতে মুরারে ।

ব্রজ ভূম হতে মথুরা নগরী,  
 নিমন্ত্রণে গিয়ে ওহে বংশীধারী,  
 কি ছলে নাশিলে মাতুলে শ্রীহরি,  
 বিচ্ছেদ সাগরে ভাসালে রাধারে ।

যে ছলেতে এসব করিলে নিধন  
 সে ছলেতে নাশ বাসনা রাবণ ।  
 লালসা পুতনা রাধিকারমণ  
 মনরূপী আমার অবাধ্য দৈতেরে ॥

হিংসা কংশ মোর নাশ দয়া করি,  
 অহঙ্কার বালী নাশহে মুরারী  
 তাহলে প্রেমেতে রাধা ভাব ধরি  
 পদ রজ দাও দীন মহেন্দ্রে ॥

( ২ )

আমি কবে বল ব্রজভূমে যাইব রে ।  
 আহা ! ব্রজজনের অনুগত হইব রে ॥

কবে শ্রীরাস মণ্ডলে,                      হেদ্বিব রাধা শ্রামলে,  
 • যুগল পদ কমলে নমিব রে ॥

শ্লিষ্ট কালিন্দী জলে,                      জ্ঞান করি দুতুহলে,  
 ত্রিতাপ তাপিত দেহ জুড়াব রে ॥

কবে রাধাকৃষ্ণ বলি,                      বেড়াইব লীলাস্থলী,  
 উর্কে ছুটি বাহু তুলি নাচিব রে ॥



কবে গোবর্দ্ধনা চলে, হেরিব নয়ন যুগলে,  
শ্রীরাধা গোবিন্দ বলে ভ্রমিব রে ॥

গোষ্ঠে সখাজন সঙ্গে, রামকৃষ্ণ মানা সঙ্গে,  
খেলিলে দেখিব সঙ্গে চলিব রে ॥

কবে রাধা শ্যাম কুণ্ড, হেরিব ললিতা কুণ্ড,  
কবে হৃদয় পাষাণ্ড শোধিব রে ॥

করে প্রেষ্ঠা সখীগণে, দিব্যরত্ন সিংহাসনে,  
রাধাকৃষ্ণ একাসনে সেবিব রে ॥

কবে স্বক্কে ঝুলি ধরি, মেগে খাব মাধু করি,  
(জয়) রাধে বলি গলি গলি বেড়াব রে ॥

দীন মহেন্দ্র বলে, আমার অস্তিত্বকালে,  
রেখো হরি চরণতলে ঠেলোনা রে ॥

জীবাদম—শ্রীমহেন্দ্রনাথ মহাস্তি ।

## নান্দী ।

—:o:—

( ১ )

হে দেব !

তোমার প্রশান্ত মূর্তি ফুটিল যখন,  
উৎসবে উৎসাহ উৎস ছুটিল তখনি ;  
টুটল ঘুমের ষোর,—নিশার স্বপন,  
উঠিল হৃদয়তন্ত্রী ঝঙ্কারি অমনি ।

( ২ )

এ যে সেই সে দিনের পরিচিত ছবি—

এ যে সেই সে দিনের পরিচিত গান :—

এ যে সেই সে দিনের স্বাক্ষর পূরবী—  
স্পন্দিতা নন্দন গঞ্জে নন্দন পরাণ ।

( ৩ )

ওগো ও ধত্ত অয়ি বরণ্য,  
তুমি আজি কত দূরে—অতি দূরে ।  
বন্ধ পরাণ, মুক্ত সে পথে অতিথি ।  
তব স্নিগ্ধ মেহুর শুভ্র মধুর,  
সঙ্গীত কোন্ পুরে—কত দূরে ?  
মুক্ত পরাণে দীপ্ত তোমার সিরিত ।

( ৪ )

ওগো শান্ত সৌম্য, শুদ্ধ-বুদ্ধ,  
ওগো ও প্রতিভাশালি !  
তোমারি কার্যে, তুমি গো আর্ঘ্য—  
করুণা দাও গো ঢালি ॥

শ্রীগোপেন্দু শর্মা ।

## নব শ্রীকৃষ্ণাদে ।

—:—

হে করুণাময় ! তোমার জয় হউক ! হে কোটি সূর্য প্রভাময় ! তোমার  
জয় হউক ! হে নিখিল অখিল ব্রহ্মাণ্ডভাওপ্রদর ! তোমায় জয় হউক !  
তোমার ভুবর্ধ মঙ্গল নামের জয় হউক ! তোমার অনন্ত 'নরক নিবারণ নামের  
জয় হউক ! তোমার মহিমাময়, গৌরব ময়, প্রতিভাময়, নামের জয় হউক !

হে পিত! তুমি স্বর্গ হইতে আশীর্বাদ পাঠাইয়া দাও! আজ তোমার এই পুণ্য মঙ্গল জন্মবাসরে তুমি আমাদের মস্তকে অনন্ত কল্যাণ ঢালিয়া দাও! সারা বৎসর কারাগ্রমতাপিত—তনুতে শান্তি সলিল ছিটাইয়া দাও! তোমার সঞ্জীবন-মন্ত্রে হৃদয়ে নব বলের শক্ত সঞ্চার কর! হে কামদ! হে সর্ব সংরক্ষক পরমাতীতদাতা! তুমি আমাদের রক্ষা কর! তুমি আমাদের কুপথ হইতে সুপথে পরিচালিত কর! তোমার সেই শুভ্র, সত্য, দীপ্ত, মুক্ত পবিত্র পথের পুণ্য দীপালোক প্রদর্শিত কর! আবার বলি হৃদয়ে নব বলে বলীয়ান কর!

হে তত্ত্ব বৎসল! বরষে বরষে তোমার এই পুণ্য দিনে তুমি আমাদের শিরে যেরূপ অশেষ আশীষ ঢালিয়া দাও, তেমনি সেই শাশ্বতী নীতি অনুসারে আজীবন তুমি আমাদের আশীর্বাদ কর।—আশীর্বাদ কর, যেন বিগত বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও তোমার সেই কণক-উজ্জল পথের পথিক হইয়া ভুমানন্দে প্রাণ মাতাইতে পারি। আশীর্বাদ কর, যেন পাপ হইতে দূরে থাকিয়া অসত্য, অন্যায়, অধর্ম, অজ্ঞান হইতে অসংযুক্ত ও অসংশ্লিষ্ট থাকিয়া তোমার সেই মুক্ত আলোকে স্থির, ধীর, অবিচলিত দৃষ্টি রাখিতে পারি, আর আশীর্বাদ কর, যেন ক্রম, হিংসা, প্রহারণা, প্রবঞ্চনা, মদ, মাংসখ্যে অভিভূত না হইয়া অহমিকা, গর্ভ, ভ্রান্তি অন্ধকারে নিমগ্ন না হইয়া তোমার দীনান্তীন ভৃত্য হইয়া সদানন্দে তোমার কর্ণে আপনাকে নিয়োজিত রাখিতে পারি।

অয়ি! কৃষ্ণ-গুরবে গরবিনী রোহিণীযুক্ত জয়ন্তী-অষ্টমি! তুমি এস, আমার কাল বিলম্ব করিও না। এই দেখ! তোমার আবাহনের জন্য কত কোটি প্রাণ বন্ধাজলী হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে! তুমি এস! এই দেখ প্রকৃত কুসুমের স্তবকে স্তবকে, ব্রিহস্পের আকুল সঙ্গীতের পড়তে পড়তে, ভক্ত ভারুকের ভাবতরা প্রাণোন্মাদী নাম গানের তানে তানে সমীরণ প্রবাহে ধীরে ধীরে তোমার আগমনী গীতি গীত হইতেছে! অয়ি! গোঁরব শালিনি! পুণ্যবতী! তুমি এস! আমি তোমার প্রতি পল অল্পপল চন্দন চূয়ায় বিভূষিত করিয়া দিব! আমি তোমার প্রতিপদবিক্ষেপে পূত পবিত্র ভাগীরথী বারি ছিটাইয়া দিব! তুমি এস! আমি আজ তোমায় গলগন্ধি কৃতবাসে আবাহন করিতেছি, তুমি এস! এস—এস, অয়ি জনদাতা!

পুরুষের জন্ম গরবে গরবিনী তিথি-রাজি! তোমার কাতর কণ্ঠে আবার ডাকিতেছি  
তুমি এস! ঐদেখ, কাতারে কাতারে কোটি কোটি প্রাণী তোমার জয় ঘোষণা  
করিবার জন্য উদ্‌যীব রহিয়াছেন, তুমি আর কণ-বিলম্ব করিও না!—তুমি এস!

জয় দাও ভাই জয় দাও! আমার কৃষ্ণ গৌরবিনী জন্মষ্টমীর জয় দাও!  
এস ভাই আত্রক ভারতের কোটি কোটি নয় নারী এস, আজ সেই পরম পুরুষ,  
পরম পিতা, অক্ষয়, অক্ষয়, অনন্ত, আদি পুরুষ গোবিন্দের এই পূণ্যময়ী জন্মতিথি  
উৎসবানন্দে অতিবাহিত করি! এস! মুহূর্ষুহু সুমধুর নাম সংকীর্ণনে  
আজিকার প্রতিপল প্রতি মুহূর্ত্ত ধনিত প্রতিধ্বনি করি! এস—এস!—আজ  
কোটি ভ্রাতার সমতান নিনাদিত মহিমা স্তোত্রে বৈকুণ্ঠের হৃবর্ণ সিংহাসন বিচলিত  
করি! এস—এস!—আজ জগদ্ধাতু পুরুষের জন্ম বাসরে হিমগিরির সমুচ্চ  
শিখর হইতে কুমারিকার অস্ত্র প্রাপ্ত পর্যন্ত ভারতের নগর, নগরী, দিগি, গুহা,  
বনস্থলী, পল্লী, প্রান্তরের কেন্দ্রে কেন্দ্রে মধুমাধা হবি নাম গানে কোটি কণ্ঠে  
মুগ্ধরিত করিয়া ছুলি! আয় ভাই আয়! প্রেম-ভক্তি-অশ্রু সঙ্গে লইয়া দৌড়িয়া  
আয়! আয় আয়, ভাই কে আজ পরম প্রভুর পবিত্র জন্মদিনে অর্ঘ্যদান করিবি  
ছুটিয়া আয়! আয়—আয় ভাই সকল, মঙ্গল নিলয় জগন্নিবাস জগন্নাথের  
জন্মবাসরে অহৈতুকী প্রেম অকপট ভক্তি আনন্দ কম্পাশ্রু সঙ্গে লইয়া কে আসিবি  
ভাই ছুটিয়া আয়! আয়—আয় ভাই! কোটি ভ্রাতা সমস্বরে—সমস্বরে—  
সমতানে বিধিপিতার চরণ পদে অর্ঘ্যদান করিয়া জীবন সার্থক করি! বল দেখি  
ভাই, আর আমার সঙ্গে হুরে হুরে আমারি মতন বিষয় সম্ভাপ তাপিত জীব মুক্ত  
কণ্ঠে মুক্ত প্রাণে বল দেখি ভাই;—

“অনাদি নিধনং বিষ্ণুং ত্রিলোকেশং ত্রিবিক্রমং  
নারায়ণং চতুর্ভূজং শঙ্খ চক্র গদাধরং  
পীতাস্বরধরং নিত্যং বনমালা বিভূষিতং  
শ্রীবৎসাকং জগৎসেতুং শ্রীপতিং শ্রীধর্মং হরিং  
দেবকী গর্ত্তসমুৎসং দৈত্যসৈন্য বিনাশনং  
গৃহাণার্থ্য মিদং দেব! \*গোবিন্দায় নমো নমুঃ ॥

শ্রীগোপেন্দু শর্মা ।

## বলিদান ।

( ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে লিখিত )

—:—

গোড় নগরের অনতিদূরে মাধবীপুর, একখানি অনেক দিনের প্রাচীন গ্রাম। হিন্দু নরনারীর নিবাস-নিকেতনে গ্রামখানি পরিপূর্ণ। আর গ্রামের অদূরে মুসলমানের কতকগুলি সজীবগৃহ যেন মাধবীপুরের দ্বারবান্ রূপে বিরাজিত। মাধবীপুরের অধিবাসীর মধ্যে অনেকেই সত্বতি সম্পন্ন। বিশেষতঃ জয়নাথ ভট্টাচার্য্য সে গ্রামের এক জন বহিষ্ট যশস্বী জমীদার। গ্রামে একটি দেব মন্দির আছে; পাষণময়ী শক্তি মূর্ত্তিই উক্ত মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। এই শক্তি মূর্ত্তির নাম “গণরঙ্গিনী চণ্ডীদেবী।”

চণ্ডী দেবীর উদ্দেশে প্রত্যহ ১৫১২•টী করিয়া ছাগ মেঘ মহিষ বলি হইয়া থাকে। রক্ত ব্যতিরেকে চণ্ডীদেবী প্রসন্ন হন না, চণ্ডীদেবীর সন্তুষ্টির একমাত্র উপদান পশু শোণিত; তদানীন্তন তান্ত্রিক লোকের এইরূপ বিশ্বাস বহু দেশেই বদ্ধমূল হইয়াছিল।

বহুকাল হইতে এ জীব হিংসা এ পৈশাচিক ব্যাপার সুখসম্পন্ন হইয়া আসিতেছে; এবং পাষণময়ী চণ্ডীদেবী ও পাষণ হৃদয়ে অবাধে এ নিরীহ নির্যাতন সছ করিয়া আসিতেছেন। মন্দিরের পুরোহিত চণ্ডীদেবী, সেবক গণপতি আচার্য্যই এই জীব হিংসার প্রধান প্রণয়দাতা। তাহার পূর্বপুরুষগণও হিংসার স্রোতে ভাসিয়া দেবতার উদ্দেশে লক্ষ লক্ষ জীবহত্যা করিয়াছে। গল্পপতি আচার্য্য “মহাজনো যেন গতঃস পত্না” এই বচনের দোহাই দিয়া কাহারও কথানা ম্যানিয়া পূর্ব পুরুষের পদানুসরণ করিয়া আসিতেছে। গ্রাম বাসীর মধ্যে প্রায় পণ্ডর আনা লোকই পুরুষানুক্রমে এই গাথের পথিক। এই চণ্ডীদেবী ও গণপতি আচার্য্য গ্রামের কুল দেবতা ও কুল পুরোহিত। কাজেই এই দেবতা ও পুরোহিতের বিরুদ্ধে কেই কোন কথা উঠাইতে পারিত না।

উঠাইলেও তাহা অগ্রাহ হইত। সে সময়ে গণপতি আচার্য্যকেই মাধবী পুরের অধিকাংশ লোকে ব্যাস বশিষ্ঠের মত সন্মান করিত। জয়নাথ ভট্টাচার্য্য

এই জীব হিংসার বরাবর বিরোধী ছিলেন। দেবতার উদ্দেশে এই অজর্জর রক্তপাত তাঁহার প্রাণে বড়ই লাগিত। কিন্তু তিনি জমীদার হইয়াও তাহার কোন প্রতিকার করিতে পারিতেন না। গ্রামের শত সহস্র লোক গণপতি আচার্যের বাধ্য ও বশীকৃত। জয়নাথ ভট্টাচার্য একা তার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কি করিবেন? বরং জয়নাথ ভট্টাচার্য ও তাহার পুত্র ভূতনাথ ভট্টাচার্য বলিদানের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন বলিয়া; তাঁহাদিগকে বিপদগ্রস্থ করিবার জন্য গণপতি আচার্য ও তাহার অনুরাগ শিষ্য সেবকেরা সর্বদাই সচেষ্ট থাকিত।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

কার্তিক মাস; দীপাবসিতা অর্থাৎ মাসের আর কয় দিন বাকি আছে মাত্র। সেই আমাবস্যার কৃষ্ণা রজনীতে চণ্ডীদেবীর সম্মুখে নরবলি দিতে হইবে; এই শৈশাচিক উৎসবে মাধবীপুরের প্রায় সকলেই আনন্দে উন্মত্ত। সেই নিশ্চয় কার্য সম্পাদনে সকলেই বিস্তৃত। কেবল জয়নাথ ভট্টাচার্যের করুণাপূর্ণ গৃহে এই নিষ্ঠুর আনন্দ প্রবেশ করিতে পারে নাই। আগামি দীপাবসিতা রজনীতে দেবীর সম্মুখে যাহাতে নরবলি না হয়; বুদ্ধ জয়নাথ ভট্টাচার্য ও ভূতনাথ ভট্টাচার্য পিতা পুত্র তাহারই চেষ্টা করিতেছেন। আমি যে সময়ের কথা লিখিতেছি; গোড় নগরে সে সময়ে বাঙলার রাজধানী। সে সময়ে গোড়ের রাজসিংহাসনে বসিয়া হোসেন সা বাঙলার শাসন করিতেছেন। ভূতনাথ ভট্টাচার্য বুদ্ধ পিতার অনুরাগে লইয়া এই পাশব বৃত্তি নিবৃত্তির জন্য বাদসা হোসেন সার সান্ন্যগ্রহ সাহায্য প্রার্থী হইয়া গোড়ে উপস্থিত হইলেন। এবং মাধবীপুরের নৃশংস বৃদ্ধান্ত বাদসা হোসেনসাকে জানাইলেন। কিন্তু ভূতনাথের সদয় চন্দয়ের করুণ প্রার্থনা বাদসা হোসেন সার হৃদয়ে পঁহছিল না। ভূতনাথের কাণ্ডরক্তক্ষয়ের প্রকৃত মর্শ্ব বাদসার সাম্রাজ্য গন্নিত হৃদয় গ্রহণ করিতে পারিল না। সেই সময়ে মন্ত্রী রূপ সনাতন থাকিলেও, তাঁহাদের সাহায্যে বাদসা ভূতনাথের মর্শ্ব ব্যাপা বৃদ্ধিতে পারিতেন। কিন্তু ছুংথের বিষয়; এই ঘটনার কিছুদিন পূর্বেই নীতি নিপুন বৈষ্ণব চুড়ামণি রূপ সনাতন বাদসার মন্ত্রী পদ ত্যাগ করিয়া, বিবেক বৈরাগ্যের উদ্ভাসিত শক্তিতে আক্রান্ত হইয়া প্রীচৈতন্য

দেবের পদানুসরণ করিয়াছেন। কাজেই ভূতনাথ প্রত্যাখ্যাত হইয়া ক্রমশঃ  
বাটি ফিরিলেন। এদিকে সেই দীপালীভূষিত কৃষ্ণা রজনীতে পাষণময়ী  
চণ্ডীদেবীর সম্মুখে নরবলি ব্যাপ্তর অবাধে সুসম্পন্ন হইয়া গেল। এ নৃশংস  
ব্যাপারে বৃদ্ধ জয়নাথের হৃদয় যেন সর্বদা দগ্ধ হইতে লাগিল। তিনি অক্ষ  
আকুলিত লোচনে ভূতনাথকে ডাকিয়া বলিলেন; বাবা ভূতনাথ! হেষ্  
হিংসা পূর্ণ ও দয়া মমতা শূন্য এ দেশে থাকিয়া আর কাজ নাই। এসব নিষ্ঠুর  
লোকের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া চল যাই; আমরা মহানন্দানদীর ধারে দেবগঞ্জ গ্রামে  
গিয়া বাস করি। ভূতনাথও সে মতের অনুমোদন করিলেন; এবং বৃদ্ধপিতা  
জয়নাথ ভট্টাচার্য ও অন্যান্য পরিবার বর্গকে সঙ্গে করিয়া দেবগঞ্জ গ্রামে বাত্রা  
করিলেন। দেবগঞ্জ যাত্রা করিবার সময় ভূতনাথ চণ্ডীদেবীকে—

“সর্ব মঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।

শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥

এই মন্ত্র বলিয়া প্রণাম করিলেন; এবং বলিলেন, করুণাময়ী মা! জানি মা!  
তুমি অভয়া, জানি মা তুমি অশরণ পালিনী, শরণাগত দীনার্ভ তারিণী জগজ্জননী।  
আমার এ পবিত্র বিশ্বাস যেন আমার এ হৃদয় হইতে জন্ম জন্মান্তরেও বিদূরিত না  
হয়। যেখানে যে অবস্থায় থাকিনা কেন মা! তোমার দয়াময়ী মূর্তিতে  
তোমাকে যেন দেখিতে পাই! তোমার জগদ্ধাত্রী মূর্তিতে যেন তোমাকে ভাবিতে  
পারি! মাগো! তোমার “জগজ্জননী” নাম তোমার “দয়াময়ী” নাম বজায়  
রাখিতে গিয়া আমাকে দেশত্যাগী হইতে হইল! এই বলিয়া গলদক্ষ লোচনে  
স্নাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া ভূতনাথ জন্মের মত মাধবীপুর ত্যাগ করিয়া  
দেবগঞ্জ চলিল গেলেন। মাধবীপুরের যা কিছু শুভ যা কিছু মঙ্গল সমস্তই  
ভূতনাথের সঙ্গে চলিয়া গেল।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

ভূতনাথের দেশ ত্যাগের কয় দিন পরেই মাধবীপুরে মহামারী উপস্থিত  
হইল। বসন্ত রোগে সমস্ত গ্রামখানা ধ্বংস হইতে বসিল। প্রায় প্রত্যেক  
ঘরেই ছই চারিটি করিয়া শব পাচিতে লাগিল। মাসুখের পরিবর্তে শৃগাল কুহুরে

মাধবীপুর পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এইরূপে সোনার মাধবীপুর ঋশান ভূমিতে পরিণত হইল। গণপতি আচার্যের আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সকলেই মহা প্রস্থান করিয়াছে। কি জানি কেন জানিনা; কেবল গণপতি আচার্য নরক যন্ত্রণা লইয়া বাঁচিয়া আছে। বসন্ত রোগে তাহার একটি চক্ষু ও নাক বসিয়া গিয়াছে। গণপতি এখন রূপাকণার ভিখারী হইয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছে। গঙ্গাজল বিবপত্র লইয়া চণ্ডীদেবীর খোজলয়; এমন লোকও মাধবীপুরে আর নাই। যে চণ্ডীদেবীর নর শোণিত পশু শোণিত উদর পূর্তির একমাত্র উপাদান ছিল; সেই চণ্ডীদেবী এখন সামান্য জল পুষ্পেও বস্কিতা। এদিকে দেবগণে আসার কিছুদিন পরেই ভূতনাথ এক অতুত স্বপ্ন দেখিলেন—চণ্ডীদেবী বলিতেছেন; “ভক্ত ভূতনাথ! মাধবীপুরে গণপতির সাহায্যে আমার “জগজ্জননী জগদ্ধাত্রী” সাজ কাড়িয়া লইয়া আমাকে নরবাতিনী রাক্ষসীর সাজ পরাইয়া দিয়াছিল। সমগ্র মাধবীপুর গণপতির কুমন্ত্রণায় আমার করুণাময়ী মূর্তির পূজা করে নাই। দানবী মূর্তির কল্পনা করিয়া নর শোণিত পশু শোণিত দ্বারা আমার পূজা করিয়াছে। এই শুক্লতর পাপের প্রয়শ্চিত্ত এখন মাধবীপুর ভোগ করিতেছে। আমি দেবগণে গিয়া তোমার সেবা তোমার পূজা লইবার জন্ত প্রস্তুত আছি।” ভূতনাথ এইরূপ স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া চণ্ডীদেবীকে দেবগণে লইয়া আসিলেন। এবং সাহসিক ভাবে যথাবিধি চণ্ডীদেবীর অর্চনা করিতে লাগিলেন। “রণরঙ্গিনী চণ্ডীদেবী” নামের পরিবর্তে নাম রাখিলেন; “করুণাময়ী ভবতারিণী”। ভূতনাথের অনুগ্রহে এবং এই জাঘত দেবতার রূপায় দেবগণে গ্রামে থানি স্বর্গীয় আনন্দে আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল। সেই শান্তিময় বিগ্ভবনেশ্বরের বিধ রাজ্যের ব্যবস্থাই এই; যেখানে অহিংসা সেইখানেই প্রেম, যেখানে প্রেম সেখানেই চিরশান্তি। সাহসিক পূজাতেই যে দেবী পীতা হন, এবং ত্রৈহিক পারত্রিক সকল রকমে কল্যাণ সাধিত হয়, তাহা দেখাইবার জন্তই এই দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঘটনাটির উল্লেখ করিলাম। পাঠকগণ, আমার অভিপ্রায়ের কিঞ্চিৎ মাত্র গ্রহণ করিলে আমি ধন্য হইব।

শ্রীগৌরমোপাল সেন।



## জীব পাখী ।

—:0:—

বিধাতা ব্যাধের এক,                      মোহিনী মমতা জাল ;  
আবরিয়া আছে জীব গণে ।

নিত্য সে চতুর ব্যাধ,                      স্বাবর জঙ্গম প্রাণে ;  
পীড়িতেছে বাসনা পীড়নে ॥

ভুলিয়া রয়েছে তবু,                      বিশ্ববাসী যত জীব ;  
মমতার সৌন্দর্য্য দেখিয়া ।

রুদ্ধিন কাঁচের মত,                      ভঙ্গুর সৌন্দর্য্য তার ;  
জীবগণ দেখেনা ভাবিয়া ॥

অবোধ বলিয়া বৃষ্টি,                      বৃষ্টিতে পারেনা আছা ;  
জীব-পাখী ব্যাধ-অভিপ্রায় ।

মমতা সৌন্দর্য্যে তাই,                      ভুলে আছে জীব-পাখী ;  
মোহ শরে পীড়িত গো তার ॥

শ্রীগোর্ গোপাল জৈন ।,

## সংপ্রসঙ্গ ।\*

( পূর্ব প্রকাশিতের পর । )

—:0:—

কলড: মোহে মুগ্ধ ও জালসার বশবর্তী হইয়া ইন্দ্রিয়গণকে ভোগের পথে চালনা করিলে পরিশ্রমে বিষময় ফলোৎপত্তির কারণ হয়; অতএব জ্ঞানের দ্বারা এই পাশব

\* পাঠকগণের প্রতি লেখকের অনুরোধ এই যে, উহার যেন ভাঙ্গ দীনের লিখিত সংপ্রসঙ্গের সহিত একত্র করিয়া ইহা পাঠ করেন ।

আবেগকে প্রশমিত করিয়া প্রশান্ত মনে শ্রীভগবানকে স্মরণ পূর্বক কেবল প্রারদ্ধা ক্রমের জন্য ভোগ করা মনুষ্যাভিমানী জীব মাত্রেয়ই কর্তব্য।

এই জনাই শাস্ত্র বলিমাছেন :—

আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনক ।

সামান্য মেতঃ পশুতিনরাণাম্ ॥

জ্ঞানং হি তেষা মধিকো বিশেষঃ ।

জ্ঞানেন বিহীনা পশুভিঃ সমানঃ ॥

অর্থাৎ আহার নিদ্রা ও মৈথুনাদি বিষয়ে পশুদিগের সহিত মনুষ্যের এক মাত্র প্রাণেদ কেবল জ্ঞানে, এবং এই জ্ঞানের জগৎই মানব পশু হইতে উন্নত, নতুবা জ্ঞানহীন মনুষ্যের সহিত পশু দিগের কোন প্রভেদ নাই।

ভাই! এই যে জ্ঞানের কথা বলিলাম, ইহা ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞান, অবিচার অন্তর্গত সামান্য জড় বা অর্থকরি বিদ্যা নহে, এই জ্ঞানাত্মির দ্বারা সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ কর্ম ভ হইলে জীব মুক্ত সাধকের মন বভাবে অবস্থিত থাকিয়া যখন কেবল প্রারদ্ধা ক্রমের জগৎ প্রভূ রূপে ইন্দ্রিয়গণকে চালনা পূর্বক তাহাদিগের দ্বারা বিষয় ভোগ করে, শান্তি সমীপে বিদ্ধ হইয়া তখনই সে নির্মূল সুখের অমিয় ধারা প্লাবিত কুরিতে সক্ষম হয়, অতএব নিঃস্বয় জ্ঞানিও যে, জ্ঞানের সাহায্য ভিন্ন ভাব স্থায়ী হয় না, ও ভাবস্থায়ী না হইলে ভগবদ্ভাভের কারণ স্বরূপ শুদ্ধ ভক্তি বা প্রেমের উদয় হয় না এবং সংসঙ্গট এই সকল দুর্ভেদ ধন লাভের মূল স্বরূপ ; জীবের হৃদয় ক্ষেত্র প্রকৃত কল্যাণ লাভের বাসনা রূপ হলের দ্বারা কম্বিত হইলে শ্রীভগবান নিজে তাহাতে এই মূল রোপন করেন, অতএব সংসঙ্গের সুযোগ কখন ত্যাগ করিও না, সরল প্রাণে তব্ব জিজ্ঞাসু হইয়া এই সংস্কের দ্বারা জ্ঞান অর্জন পূর্বক যতদিন না পেন্দন পাও অর্থাৎ কেবল শারীর কর্ম ব্যতীত অন্যান্য মূল কর্ম ত্যাগ না হয়, ততদিন শ্রীভগবানের সংসার বোধে তাঁহার প্রিয় অনুচর বিবেকের দ্বারা চূড়িত হইয়া দাস ভাবে কর্ম কর, অহংকারের উত্তেজনায় হৃদয়ে জন্মমরণের দুঃখময় ফল প্রভাবিত তুচ্ছ সংসার বাসনার বীজ বপন করিও না, ফলত খুটি ধরিয়া ঘুরিলে যেমন ঘুরিবার সাধ মেটে অথচ পতনের ভয় থাকেনা সেইরূপ ভগবদ্ভাবে

কার্য করিলে উহা বন্ধনের কারণ না হইয়া কেবল কর্ম ফলের অনুকূল হয় মাত্র ।

এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখা য়ে একই কার্য ভাব ভেদে বিভিন্ন ফলের জনক হয়, যে কর্ম মুক্ত ভাবে লালসার আকর্ষণে অনুষ্ঠিত হইলে বন্ধনের কারণ হয়, ভগবদ্ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে তাহাই আবার মুক্তি ফল প্রসব করে, সুতরাং ভগবদ্ভাবে অব্যাহত রাখিয়া ইন্দ্রিয়গণকে কার্ণ্যে বা ভোগে নিগূত করিলেই শ্রীভগবানকে অর্পণ করা সিদ্ধ হয় জানিও এবং এইরূপে ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা অনুষ্ঠিত প্রত্যেক কার্য বা ভোগ ভগবদ্ভাবে রঞ্জিত হইলে, অর্থাৎ ভাবের দ্বারা শ্রীভগবানকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ বৃদ্ধিতে রুত বা ভুক্ত হইলে লালসার মালিন্য না থাকায় উহা কার্য বা ভোগ জন্মিত বন্ধনাদি অবনতির কারণ না হইয়া মনের উর্দ্ধগমন বা উন্নতির পথ বিস্তর শূন্য করিয়া দেয় ; মন তখন অধোগতি বা মৃত্যুর চুঃখময় কবল হইতে মুক্ত ও নিঃচর্যাস্থিকা বুদ্ধির সহিত মিলিত হইয়া আত্মার উদ্দেশ্যে জীবনের পথে দ্রুত অগ্রসর হয় এই জন্য গৌ গনু ভগবান বলিয়াছেন:—

প্রসাদে সর্ক্স চুঃখানাং হানিরসোপকায়তে

প্রসন্নচেতসোহাশু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে ॥

অর্থাৎ প্রসাদ ভোজীগণ সর্ক্সবিধ চুঃখের কবল হইতে মুক্ত হইয়া যখন প্রসন্নতা লাভ করে, তখনই তাহাদের বুদ্ধি আমাতে প্রতিষ্ঠিত হয় ।

ফলতঃ ভাবই মুগর্পণের মূল, এক্ষণে এই নিবেদনের ভাব অর্থাৎ ভাব কিরূপে প্রযুক্ত হইলে নিবেদন সিদ্ধ হয় সেই কার্যকরী উপায় শ্রবণ কর ।

ভোজন শরীর রক্ষার জন্য, রসনেন্দ্রিয় তৃপ্তি বা সুখাশান্তি তাহার আনুসঙ্গিক ফল মাত্র ; অতএব ভোজনের দ্রব্য সম্মুখে উপস্থিত হইলে লালসার বশবস্তী হইয়া তাহা তৎক্ষণাৎ ভোজন না করিয়া সেই ভোজ্য দ্রব্যের শ্রদ্ধা শ্রীভগবানকে স্মরণ করিবে, তিনি আমাদের এই পার্শ্বভৌতিক দেহ রক্ষার জন্য ভৌতিক উপকণের দ্বারা খাণ্ড দ্রব্য সৃষ্টি করিয়াছেন, আবার মাতা, ভগ্নী বা অপর কোন ভৌতিক আধারের আকরণে অব্যক্ত থাকিয়া সেই সকল দ্রব্য মুখরোচক ও সহজ পাচ্য রূপে প্রস্তুত করিয়া আমার সম্মুখে রাখিয়াছেন এবং আমার বাহতে শক্তি ও জঠরে অগ্নি সকার পূর্বক ভোজন ও পচন কার্য সমাধা করিতেছেন,

ফলে এইরূপে তাঁহার কৃপার কার্য আলোচনা করিতে করিতে মন যখন কারণ স্বরূপ শ্রীভগবানের ভাবে আল্লাত হইবে, তখন তোমার ভাবানুযায়ী যে মূর্তিকে তুমি প্রিয় বোধ কর, সেই জ্যোতীর্ঘয় ভগবন্মূর্তি চিন্তা করত কল্পনা যোগে তাঁহার চরণ কমল হইতে একটি জ্যোতীরশিখা আকর্ষণ পূর্বক খাণ্ড দ্রব্যে সংযুক্ত করিয়া দিবে এবং কল্পনার চক্ষে দেখিবে যেন ঐ খাণ্ড হইতে রজস্বল গুণ কৃষ্ণ ও রক্ত বর্ণ বাস্পাকারে বহির্গত হইয়া গেল।

এই ভাবে নিবেদন করিয়া ও তাঁহার অনুমতি লইয়া শরীর রক্ষার জন্ত প্রশান্ত মনে ও প্রসাদ বুদ্ধিতে আহাৰ করিলে সেই আহাৰ প্রকাশ শক্তি সম্পন্ন সত্ত্বগুণকে বৃদ্ধি করিয়া রোগ শোকের কারণ স্বরূপ দেহ ও মনের গ্লানি নষ্ট করিবে, এবং এরূপ অবস্থাতে যদিও লালসার ভাব বর্তমান থাকে তাহা হইলে প্রসাদে প্রযুক্ত হওয়ার জন্ত ঐ লালসা শুদ্ধ ভাব ধারণ করায় অনিষ্ট করিতে পারিবে না।

দ্রাণেশ্বরী তৃপ্তির জন্য কোন সুবাসিত পুষ্পাদি আভ্রাণ করিবার সময় উহার স্পষ্টাঙ্কে স্মরণ করিবে, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে মনে করিবে যে আহা! কুর্মে ফলের আকর্ষণে আমরা এই ভৌম নরকে আগমন করিয়াছি কিন্তু এখানেও দয়াময় ভগবান আমাদের তৃপ্তির জন্য কেমন সুন্দর সুন্দর কুমুমাди সৃষ্টি করিয়াছেন, ইত্যাদি চিন্তা করিয়া কল্পনা যোগে উহা সর্বব্যাপি শ্রীভগবানের চরণনিঃসৃত জ্যোতিতে সংযুক্ত করিয়া প্রসাদ স্বরূপে আভ্রাণ করিবে, যোগ শাস্ত্র বলেন যে বস্ত্র মাত্রেরই স্বজাতীয় বস্তুর দ্বারা আকর্ষিত হয়, সুতরাং তোমার হৃদয়ে ভগবৎ স্মরণ জনিত সত্ত্বগুণের উদ্বেক হওয়ার উহা পুষ্পাদি নিহিত রজস্বল গুণকে অভিতূত করিয়া উহার সত্ত্বগুণকেই আকর্ষণ করিবে; ফলে প্রকাশ শক্তি সম্পন্ন ঐ সত্ত্বগুণ তোমার হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া চিত্ত মালিন্য ধৌত করিয়া দিবে।

রেল গাড়ির গতি দেখিয়া বুদ্ধিমানেরা যেমন উহার অন্তর্নিহিত বাস্প শক্তি অনুভব করেন, সেইরূপ দর্শন ও স্পর্শন করিবার সময় সর্ব ভূত্বের মধ্যে চৈতন্য সঙ্গী অনুভব কর, নয়ন তৃপ্তিকর সৌন্দর্য্য দেখিলে ও স্পর্শ সুখকর বস্ত্র পাইলে তাহাতে তাঁহার প্রকাশাদিক্য উপলব্ধি করিয়া আনন্দিত হও; শ্রবণ করিবার সময় শব্দ ব্রহ্মের ভাব বিনিময় কারি শক্তি অনুভব কর, বাক্য হইতে বিদ্যা ভাব

আকর্ষণ করিয়া লও, তাহা হইলে প্রত্যেক বাক্য হইতেই তাঁহার মাধুর্যের আভাস প্রাপ্ত হইবে, বিশেষতঃ ভগবৎপ্রসঙ্গ অবশ্যে তোমার হৃদয় তাঁহার মাধুর্যের পিসুখ ধারায় প্রাবিত হইবে।

পূর্বে বলিয়াছি যে বিদ্যা ও অবিদ্যা ভাবময়ী ময়া ব্রহ্মেরই শক্তি, এবং এই সুক্ষ ও স্থূল রূপিণী বিদ্যা ও অবিদ্যার সীমা পার না হইলে চৈতন্যময় শ্রীভগবানকে লাভ করা যায় না, শব্দ ব্রহ্ম যখন বাক্য রূপে মায়িক আধার হইতে নির্গত হয়, তখন গুণের সংশ্রব থাকায় তাহাতে বিদ্যা বা অবিদ্যা ভাব স্কুরক শক্তি নিহিত থাকে, এবং এই জন্যই শব্দের সংযোগ করিয়া কেহ রুঢ় বাক্য বলিলে বিরক্ত ও মিষ্ট বাক্য বলিলে তুষ্ট হুওয়া যায়, কিন্তু জ্ঞান লাভ করিলে তুমি বিদ্যা ভাবময় বাক্যের ন্যায় অবিদ্যা ভাব স্কুরক বাক্য হইতেও চৈতন্য মাধুর্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবে, অবিদ্যা নিহিত অব্যক্ত চৈতন্যের মহিমা অনুভব করিবে, ফলে কেহ তোমাকে দুর্ভাক্য বলিলে বা নিন্দা করিলে কর্ম মালিন্য ক্ষয় ও আকর্ষিত হইল ভাবিয়া আনন্দিত হইবে ও উপেক্ষার দ্বারা বৃদ্ধি সংঘত করিয়া চিন্তে মলিনতা সংযুক্ত হইতে দিবে না, এইরূপে ক্রমে মায়িক সীমা পূর হইয়া যখন ব্যক্ত চৈতন্যের অধিকারে বিচরণ করিতে সক্ষম হইবে, তখন বুঝিবে যে, নিন্দা বা সম্মান তোমার নহে, সমস্তই প্রভুর প্রাপ্য, ও তাঁহার নিকট ঠিক পৌঁছিল কি না তুমি কেবল তাহার পরিদর্শক মাত্র, পোষ্ট আফিসের বাক্সে পত্র ফেলিলে যেমন তাহা ঠিকানায় পৌঁছে, সেইরূপ তোমার দেহরূপ পোষ্ট আফিসের করণরূপ ডাক বাক্সে যদি কেহ নিন্দা বা সম্মান রূপ পত্র ফেলিয়া দেয়, তাহা হইলে তোমার মনরূপ পোষ্টমাষ্টার চিন্তারূপ চাপরাসীর মারফৎ তাহা প্রভুর নিকটে পাঠাইয়া দিবে, ফলে এইরূপ নিলিপ্ত থাকায় তোমার চিন্তে গুণের দাগ লাগিবে না, সুতরাং নিন্দা বা সুখ্যাতি তোমার নিকট সমান হইয়া যাইবে।

প্রার্থনা যোগে শক্তি সঞ্চয় পূর্বক এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে তোমার মন অগ্রে স্তরে উদ্বিগমি হইয়া যখন প্রত্যেক ইন্দ্রিয় ভোগ্য বস্তু ভগবদ্ভাবে অনুরঞ্জিত করিয়া প্রসাদ স্বরূপে ভোগ করিতে সক্ষম হইবে, তখন সর্বদা ভগবৎস্মরণ অব্যাহত থাকায় যোগ—সিদ্ধি জনিত আনন্দ ও শান্তি তোমার চির সাঙ্গ

হইবে ও স্থায়ী ভগবদভূতি জনিত বিধাস ও নির্ভরতার শক্তি অচিরে তোমার অন্তঃনিহিত সচ্চিদানন্দ ভাবে ব্যক্ত বা জাগরিত করিয়া মোহবন্ধন নষ্ট করিবে, তুমি কৃতার্থ হইবে ।

চ। ভাই আহালাদির ন্যায় মৈথুন ও ভোগের একটি প্রধান উপকরণ, অতএব যদি অশ্লিল মনে না কর, তাহা হইলে উপস্থিত্তির সমস্তোপ করিবার সময় কি উপায়ে এই নিবেদন সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা বুঝাইয়া দিয়া আমার কৌতুহল ও জ্ঞান পিপাসা মিটাইয়া দাও ।

র। আমি এ পর্যন্ত রূপ রসাদি পঞ্চ বিষয় ভগবদ্বাবে পরিত্যক্ত করিয়া শ্রমাদ বুদ্ধিতে ইন্দ্রিয়গণের নাহায্যে ভোগ করিবার উপায় বলিয়াছি ; এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় পরস্পর সাপেক্ষ বলিয়া উভ্যেদের সমন্ধে পৃথক ভাবে আলোচনা করি নাই, উপস্থিত্তির কর্মেন্দ্রিয়ের অন্তর্গত ও ইহা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অন্তর্গত বৃগেন্দ্রিয়ের সাপেক্ষ, এই ইন্দ্রিয় সমন্ধে পৃথক ভাবে যখন তোমার জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে, তখন সাধ্যমত তেমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিব, আর ইহাতে অশ্লীল মনে করিবার কারণ কিছু নাই, বরং ইহা অধিকতর আবশ্যকীয় প্রশ্ন, কেন না নিয়মিত ভাবে ইহা চালনা করিবার উপায় না জানিলে অধঃপতনের পথ সরল হয়, যদিও এই ইন্দ্রিয় বিষয়ক ভোগ নিবেদন করিবার ভাব আয়ত্ত করা প্রথমতঃ কিছু কঠিন বোধ হয়, কিন্তু আন্তরিক ইচ্ছা ও চেষ্টা হইলে কখনই তাহা অপূর্ণ থাকে না জানিও ।

যাহা হউক ইহা বুঝিবার পূর্বে একটা কথা স্মরণ রাখিও যে, ভগবদাদিষ্ট পথে ভোগ না করিলে সেই ভোগ্য বস্তুর নিবেদন সিদ্ধ হয় না, অধিকন্তু প্রত্যাখ্যাত হওয়ার বিপরীত ফল প্রসব করে, তিনি যে সকল ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় ভোগ করিতে অনুমতি দিয়াছেন, যাহাতে মনের আবেগপ্রতি না হইয়া উৎকর্ষমণ্ডল সরল হয় ; এইরূপ ভগবদনুমোদিত সৌন্দর্য আহার \* সদ্ব্যকল্প কখন ও শবণ সম্ভাব্যোদ্দীপক বস্ত্র দর্শন, স্মীয়দারায় নিয়মিত গমণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়

\* প্রকৃত আত্মমতি প্রয়োগ সাধকের প্রবর্তক অবস্থায় মস্তিষ্কের প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্তব্য, কেননা ব্রহ্মসুখ গুণাত্মক বস্তু সমল ও আবরণ শক্তি সম্পন্ন, অতএব উহা চিত্ত ও শুদ্ধির অন্তরায় এবং মস্তিষ্কগোত্রক বস্তু নির্মল ও প্রকাশকর, স্থূল ও স্থূক্ষ রূপে হৃদয়ের মধ্যে

তৃপ্তিকর নির্মল ভোগই শ্রীভগবানে অর্পিত হইবার যোগ্য, কেননা নির্মল পদার্থ যাত্রাই প্রকাশকর, সুতরাং উহা ভগবদ্ভাবে প্রসাদ বুদ্ধিতে ভোগ করিলে চুম্বকের ভাবে নির্মল লৌহে শীঘ্র চুম্বকত্ব সঞ্চারের স্থায় উহাতে চৈতন্য শক্তি দ্রুত সঞ্চারিত হইয়া চিত্ত মালিণ্য বিনষ্ট করিয়া দেয়। অধিকন্তু ভালবাসার বস্তুকে তাহার প্রিয় দ্রব্য সমর্পণ করাই উচিত, অপ্রিয় বা মন্দ দ্রব্য দেওয়া ভালবাসার পরিচায়ক নহে, অথচ ভালবাসা বা ভালবাসার বীজ স্বরূপ ভক্তির সংযোগ না থাকিলে সমর্পণের উপযোগী ভাব বা চিত্তার ক্ষুণ্ণ হইয়া যায় না।

এক্ষণে বোধ হয় বুঝিয়াছ যে ধর্ম্য সঙ্গত ভোগই নিবেদিত হইবার উপযুক্ত, কেননা প্রকাশ শক্তি সম্পন্ন হওয়ায় উহা প্রসাদ বুদ্ধিতে ভুক্ত হইলে জ্ঞানোন্মেষের কারণ হয় এবং এই জ্ঞানই মনকে উর্দ্ধমুখী করে ও মুক্তির পথে চালনা পূর্বক আত্মার সহিত মিলন করিয়া দেয়। এক্ষণে তোমার জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তর দিতেছি শ্রবণ কর।

উপস্থেল্লিয় সমস্তাগের জগৎ বিধি বিহিত স্বীয়দারায় গমন করিবার সময় পাশব আবেগের বশবস্তী না হইয়া ধীর ভাবে বিচার করিবে যে, কে তোমার মন ও ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করিতেছে, তোমার হৃদীর রক্ত, মাংস, বিষ্ঠা ও মূত্র প্রভৃতিতে পূর্ণ স্থল দেহ যদি এই আকর্ষণের কারণ হইত, তাহা হইলে চক্ষু কণাদি অবয়ব সকল বর্তমান থাকিতেও তাহার জ্যোতিহীন মৃত দেহ তোমার ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করিতে পারে না কেন? অতএব বাস্তব মध्ये টাকা থাকিলে যেমন লোভীগণের মন তদ্বারা আকর্ষিত হয়; সেইরূপ ঐ দেহের মধ্যে এমন কি বস্তু আছে যাহার সংস্পর্শ সুখ লাগিয়ায় তোমার মন প্রসূক্ত হইতেছে, ফলতঃ এইরূপ বিচার করিলে বুঝিবে যে চৈতন্য জ্যোতীর প্রকাশাধিক্যই আনন্দাধিক্যের কারণ, সুতরাং এক মাত্র চৈতন্য ভিন্ন প্রকৃত আনন্দ লাভের দ্বিতীয় উপায় নাই ও সেই চৈতন্যই তোমার হৃদীর পাক ভৌতিক দেহে প্রতিবিম্বিত হইয়া বাসনা ও সংস্কার অকুয়ারি তোমাকে আনন্দ দান করিতেছে এক সময়

আহত হইতে উহা চিত্তকে নির্মল করিয়া দেয়, তখন চৈতন্য জ্যোতী সেই নির্মল চিত্ত ভেদ পূর্বক জ্ঞান স্বরূপে প্রকাশিত হইয়া সার্বিককে ধর্মের আনন্দময় পথ দেখাইয়া দেয়, এবং এই জগৎই গীতায় ভগবান বলিয়াছেন:—“ব্রহ্মণ্যম্ নাভিত্যুয় সৎ ভবতি ভারত।”

বিশেষ তোমার মন সেই আনন্দের উচ্ছ্বাস সন্তোগের আশায় প্রলুদ্ধ ও আকর্ষিত হইয়া ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাহার সহিত মিলিত হইতে চাহিতেছে, শারিরীক উত্তাপের সময় বারি অভাবে যেমন শীতল বস্ত্র অপেক্ষাকৃত সুখপ্রদ বোধ হয়; সেইরূপ অনাবরিত চৈতন্যের অভাবে দেহোপরি উহার মধ্যস্থ জ্যোতীর্ষ্মর চিন্মাত্রের আভাস দৃষ্টে সংস্কারের দ্বারা চালিত হইয়া সুখ প্রয়াসে তাহাকেই হৃদয়ে ধারণ করিতে চাহিতেছে।

এইরূপ বিচার করিতে করিতে যখন হৃদয়ে অনন্ত আনন্দের মূল প্রস্রবণ স্বরূপ চৈতন্যময় ভগবানের ভাব উদয় হইবে, যখন বুঝিবে যে তিনিই তোমার প্রায়ক ক্ষয়ের অঙ্কুলে বাসনা তৃপ্তির জগ্ন তোমার জীব দেহে প্রতিবিন্দিত হইয়াছেন, এবং তুমি তোমার ভাবানুযায়ি প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া সুখ প্রয়াসে প্রকারান্তরে তাঁহারই দ্বারা আকর্ষিত হইতেছ, তখন তাঁহার অপার প্রেম অনুভব করিয়া তোমার মন ভগবৎভাবে পূর্ণ হইয়া যাইবে, স্ত্রীকে স্পর্শ করিয়া ভগবৎ সংস্পর্শ জনিত আনন্দের আভাস অনুভব করিবে, ইন্দ্রিয়গণ আঙ্গাধীন ভাবে চালিত হইবে, তোমার মনের উপর প্রভু বিস্মার পূর্বক তাহাকে অন্ধ ও শক্তিহীন করিয়া রাখিতে সক্ষম হইবে না, যদি কখন অনিয়মিত ভাবে তোমার মনকে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা পায়, ভগবৎকৃপা লব্ধ জ্ঞানের কষাঘাতে তোমার মন তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে সংযত করিতে সক্ষম হইবে।

এই সময়ে তোমার মনে দৃঢ় ধারণা হইবে যে, তুমি অমৃতের সন্তান, এবং ইন্দ্রিয়গণ তোমার আশ্রিত দাস মাত্র, কেবল বাসনা তৃপ্তি পূর্বক প্রায়ক ক্ষয় করিবার জগ্নই তাহাদের সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন, অতএব ভ্রমণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে হইলে যেমন বশীভূত অশ্বের দ্বারাই তাহা সম্পন্ন হয়, জ্ঞানের অমিয় ফল স্বরূপ এই ধারণা স্থায়ি হইলে ইন্দ্রিয়গণ সেইরূপ বশীভূত ভাবে কেবল প্রায়ক ক্ষয়ের যন্ত্র স্বরূপ স্রিয়র ভোগ করিবে, এবং এই ভাবাগ্রয়ে পুণীসংযোগের ফলে সন্তানের উপস্থিতি হইলে সেই সন্তান সাধু ও ধার্মিক হইয়া পিতামাতার ইহপরকালব্যাপী আনন্দের কারণ হইবে জানিও।



ভাই! যে সাধক ভাবাশ্রয়ে শ্রাসাদ বুদ্ধিতে ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা রূপ রসাদি বিষয় ভোগ করেন; প্রতিক্রিয়ার অবসাদ কখনই তাঁহাকে আক্ৰমণ কল্পিতে পারে না, তৃপ্তি লাভ ও প্রারম্ভ ক্ষয় করিয়া তিনি মুক্তির পথে দ্রুত অগ্রসর হইয়া পরিণামে অনন্ত আনন্দ সম্ভোগের অধিকারি হন, নতুবা রিপূর উত্তেজনার পাশব আবেগের আকর্ষণে ইন্দ্রিয়গণের বশীভূত হইয়া মনকে বিষয়ের ভোগ্য করিয়া তুলিলে অবসাদ ও অতৃপ্তি নিত্যসঙ্গী হয় এবং ঐ কৰ্ম্মবীজ হইতে শতশত বাসনা লতা উদ্ভূত হইয়া যাবৎ জ্ঞানরূপ দাবানল প্রজ্জ্বলিত না হয়, তাবৎ সংসার রূপ ভৌম নরকে আবদ্ধ করিয়া ইহার বিভিন্ন স্তরে পরিভ্রমণ করায়, অর্থাৎ সেই মুগ্ধ জীবকে তাহার কৰ্ম্মানুযায়ি নানা যোনিতে নিক্ষেপ করিয়া যাতনা প্রদান করে, এক্ষণে এই নিবেদনের তত্ত্ব বুঝিলে কি ?

এই স্থলে আরও একটি কথা বলা উচিত বোধ হইতেছে, অজ্ঞানী মানব ভোগ সুখের জগু উন্নত ; কিন্তু কিছুতেই নিৰ্ব্বিয়ে ইচ্ছামত সুখ পাইয়া তৃপ্ত হইতে পারে না, অতৃপ্তি ও বাসনা ক্রমশই বাড়িয়া যায়, এমন কি ইন্দ্রিয় শিথিল হইলেও বাসনার তীব্রবেগ তাহাদের জীবদেহ ও মনকে যাতনা দেয়, কিন্তু তাহারা বুঝে না যে অহংকারের বিকার ও মোহ জনিত পাশব আবেগই তাহাদের এই অতৃপ্তি জনিত দুঃখের কারণ, যদি তাহাদের ধৰ্ম্মজ্ঞান থাকিত ; যদি তাহারা মহুষ্যের মত আপনাদের প্রকৃত উন্নতির পথ অববেণ করিত, যদি তাহারা ভোগ করিবার বিজ্ঞান আয়ত পূৰ্ব্বক বিচার বুদ্ধির অনুগত হইয়া রূপ রসাদি বিষয় ভোগ করিতে সক্ষম হইত, তাহা হইলে এই ভোগই তাহাদিগকে ইহকালে অবসাদ বিহীন আনন্দ ও তৃপ্তিদান পূৰ্ব্বক আপন অধিকারের সীমা পার করিয়া অনন্ত আনন্দময় চৈতন্য ভূমিতে উপস্থিত হইবার সহায়তা করিত, হয়! ধৰ্ম্মহীন হইয়াই মানবের আজ এই চূর্ণদশা, মোহ তাহাদিগের বর্তমানকে কঠোর ও ভবিষ্যতকে অন্ধকারময় করিয়া দিতেছে, প্রকৃত শিক্ষার অভাব তাহাদিগকে পশুস্তরের স্তরে অবনত করিতেছে, আহা! বিহারের অনিয়মিত লালসায় এবং ব্যবহারের কাপট্যে তাহারা পশুরও অধম হইয়া কেবল মানবের ছদ্মবেশ মাত্র ধারণ করিয়া সংসারে বিচরণ করিতেছে। ভ্রমবশে ধৰ্ম্মকে ঐহিক সুখের বাধক মনে করিয়া তাহার সংশ্রবে ষাইতে চাহে না ; কেহ কেহ কৰ্ম্মকে

ধর্ম ভ্রমে ফলের দিকে লোলুপ দৃষ্টি করিয়া প্রবক্ষিত হয়, কিন্তু ধর্ম যে কি পদার্থ তাহা জানিতে চায় না, ধর্মই যে সংসার হইতে চৈতন্য ভূমিতে উন্নীত হইবার শান্তিময় পথ এবং ভোগানন্দ ও তৃপ্তি প্রভৃতি যে ঐ পথের এক একটি স্তর মাত্র, মোহবশে তাহা বুদ্ধিতে চেষ্টা করে না ক্রমশঃ অধঃপতনই যেন তাহাদের নিয়তি ; কদাচ কোন ভাগ্যবান নির্জের প্রকৃত মতল অবেষণ করিতে করিতে ধর্মতত্ত্ব অবগত হইয়া কৃতার্থ হন, এবং এই জন্যই ভগবান গীতায় অর্জুনকে বলিয়াছেন :—

“মল্লযাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ব্যততি সিদ্ধয়ে ।

যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তদ্বতঃ ॥”

চ। অনিরাছি যোগ ও ভোগ বিপরীত ভাবাপন্ন, যদি তাহাই হয় তাহা হইলে ভোগের মধ্যে যোগের সংশ্রব কিরূপে থাকিতে পারে ?

র। সূর্যালোক ও অন্ধকার কি বিপরীত ভাবাপন্ন নহে ? কিন্তু অন্ধকারময় অরণ্য পার হইতে হইলে পথ নির্দেশ পূর্বক হিংস্র জন্তু ও পদস্বলন হইতে আশ্রয়লাভ করিবার জন্য যেমন আলোকের সাহায্য লইতে হয় ; এবং সেই আলোক যেমন সূর্যালোকেরই ভাব বিশেষ ভিন্ন আর কিছু নহে, সেইরূপ ভোগের অন্ধকারময় সীমা পার হইবার সময় যোগের অর্থাৎ ভগবদ্ভাব বিশেষের সাহায্য লইয়া ধর্মপথে না চলিলে ভ্রান্তপথে গমন পূর্বক আশক্তিগহ্বরে বা কামাদি হিংস্র জন্তুর কবলে পতিত হইয়া বিনষ্ট হইতে হয় ; ভাই ! যোগের দ্বারা ভাবশুদ্ধ করিয়া কামাদি বুদ্ধিগণকে সংযত ও ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিতে না পারিলে ভোগে সুখ ও তৃপ্তি লাভ করা সুদূরপরায়ত । মনে কর গড়ের মাঠে ভ্রমণ করিবার ইচ্ছা করিয়া কোন ব্যক্তি গাড়িতে অগ্নি যোজনা করিল, কিন্তু অগ্নিকে বশতাপন্ন করিয়া চালাইবার শক্তি না থাকায় সে বিপথগামি হইয়া খানায় পতিত হইল, ফলে সংকল্প সিদ্ধ না হওয়ায় তাহার ভ্রমণ বাসনা মনের মধ্যেই প্রধুমিত হইতে লাগিল, যদি তাহার অগ্নিকে বশীভূত করিয়া চালাইবার শক্তি থাকিত তাহা হইতে যেমন তাহার সাহায্যে ইচ্ছামত ভ্রমণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিত, সেইরূপ যোগ শক্তির সাহায্যে ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া চালনা করিতে না পারিলে ভোগে সুখ ও তৃপ্তি লাভ করা যায় না ।

মনের যুক্তভাষনষ্ট হইলে কিরূপে আত্মা শক্তিহীন, বুদ্ধি বিহীন ও যোগ্যাদি আশক্তির আলয় হয়, রূপক ছলে তাহা তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি শ্রবণ কর ।

আত্মা, দেহ রাজ্যের রাজা, বুদ্ধি সেই রাজার মন্ত্রী, মন সেনাপতি ; কামাদি বৃত্তিগণ সর্দার ও ইন্দ্রিয়গণ সৈন্য স্বরূপ, রাজ্যে সুখ শান্তি বিরাজিত, এমন সময়ে অহঙ্কার নামে ঐ রাজ্যের একজন ক্ষমতাশালী দুর্দান্ত ব্যক্তি রাজ্য লাভের আশায় মিত্র বেশী শত্রুরূপে মনের সহিত ষনিষ্টতা করিয়া তাহাকে বুদ্ধির বিরুদ্ধাচারি করায় দেহরাজ্যে নিয়মের বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল, ইতিমধ্যে অহঙ্কার স্বীয় প্রিয় মন্ত্রী ও সহকারি ভেদবুদ্ধির সহায়ে বৃত্তিগণকে উত্তেজিত করায় তাহার অহঙ্কারের বৃহৎ পড়িয়া বিদ্রোহী হইল ও আপনাদের অধীনস্থ সৈন্য ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে মনকে আর দ্বাধীন এবং আত্মা ও বুদ্ধিকে বন্দী করিয়া অহঙ্কারকে রাজ্যে অভিযুক্ত করিল, যে রাজ্যে শান্তি বিরাজমান ছিল, রাজ্য অযোগ্য ও স্বার্থপর হওয়ায় এবং সর্দারগণ রাজশক্তির দ্বারা নিয়মিত চালিত না হওয়ায় সেই রাজ্যে অশান্তি ও অত্যাচারের স্রোত প্রবাহিত হইল, ফলে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী উপস্থিত হইয়া রাজ্যকে উৎসন্ন করিল । ভাই ! সেই জগত্ই বলিতেছি যে, অনবধানতা বশতঃ মনকে মিত্ররূপী শত্রু অহঙ্কারের বশবর্তী হইতে দিয়া তাহার যুক্তভাষনষ্ট করিবার কারণ হইও না । লগ্ননের আলোক কাঁচের মধ্যে দিয়া যেমন বাহিরের বিকাশ পায় ; আত্ম শক্তি সেইরূপ জ্ঞান বা বুদ্ধির মধ্য দিয়া মনে সঞ্চারিত হয় অতএব অহঙ্কারের প্রলোভনে মনকে এই আলোকের বাহিরে রাখিতে দিও না, তাহা হইলে সে বুদ্ধির পরামর্শ অনুসারে অহঙ্কারকে শাস্ত করিয়া তাহাকে আত্মার বশতাপন্ন করিয়া দিবে এবং অহঙ্কারও স্বান্তিক ভাবাশ্রম হইয়া সচ্ছক্তি রূপে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির ও আত্মার কল্যাণ সাধন করিবে, বৃত্তিগণ মিত্র ভাবে অবস্থান করিবে ও ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত থাকিয়া তোমাকে তৃপ্তির পুথ লইয়া যাইবে এবং তুমিও এই অনিত্য রাজ্য সুখে ভোগ করিরা অনিত্য রাজ্যে উন্নীত হইবার যোগ্য হইবে ।

হরেন্দ্র শম্মা ।

# শ্রীহরিদাসের জীবন চরিত ।

( পূর্ব প্রকাশিতের পর । )

—:—

হরিদাস এতক্ষণ নীরব নিষ্পন্দ ভাবে বসিয়াছিলেন। মুলুক পতির উপদেশ বাক্য সমাপ্ত হইলে আশ্রয় বিস্মৃত হইয়া বলিলেন, অহো বিধু মায়া! এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাশ্ব করিয়া উঠিলেন। অনন্তর বিনয় মধুর বচনে অতি ধীর ভাবে বলিলেন, “বাপ! জগতে সকলেরই এক ঈশ্বর। আপনি ঈহাকে খোদা বলিয়া ভজনা করেন, আমি তাঁহাকে সচ্চিদানন্দময় হরি জ্ঞানে আরাধনা করি। কোরাণে ও পুরাণে কেবল তাঁহারই তত্ত্ব এবং তাঁহারই নাম মাত্র ভেদ লইয়াই হিন্দু ও যবনে প্রভেদ। প্রভু! তিনি ঈহার মন যেরূপে লগুয়ান, তিনি সেই মতই তাঁহাকে আরাধনা করেন। যদি ঈহাতে আমার কোন অপরাধ হয়, আমাকে ছাত্র মত শাস্তি দিন।” হরিদাসের জ্ঞান গর্ভ বাক্যে মুলুক পতি ও সভাস্থ মুসলমানগণ প্রীত হইলেন কিম্বা দুর্ভাগ্য বিদেষ পরায়ণ! গোরাই কাজি বলিতে লাগিল, প্রভু! এ ব্যক্তিকে যথোচিত শাসন না করিলে মুসলমান ধর্ম ও যবন জাতির অত্যন্ত কলঙ্কের কথা; কারণ ঈহাকে দণ্ড না দিলে অনেকে মুসলমান ধর্ম ত্যাগ করিয়া ইহার সহিত কাফেরের ধর্ম গ্রহণ করিবে। হয় ঈহাকে শাসন করুন নচেৎ কলমা পড়িয়া প্রায়শ্চিত্ত করুক। “মুলুক” পতি পুনরায় হরিদাসকে বলিলেন তুমি স্বধর্ম গ্রহণ কর নচেৎ শাস্তি পাইতে হইবে। তখন ভগবত্তত্ত্ব হরিদাস কিয়ৎকাল ধ্যানস্থ থাকিয়া চিন্তা করিলেন যে তাঁহার প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের হৃদয়, শ্রীহরির মধুর নাম জন্মের শোধিত্যাগ করিতে হইবে। তাহা তিনি কখনই পারিবেন না, কারণ তাঁহার হৃদয় ময় প্রাণ যে শ্রীহরির। তাঁহার যে আর কিছুই নাই, সকলই যে শ্রীহরির। তক্তের হৃদয় পদই যে শ্রীহরির আধার স্থান। সেই হৃদয়

হইতে আলৌকিক ঐশ শক্তির বলে বলীয়ান হইয়া, গভীর স্বরে ধীর  
কণ্ঠে ধর্মবীর হরিদাস বলিয়া উঠিলেন—

“খণ্ড খণ্ড হই, যায় দেহ প্রাণ,  
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরি নাম।”

ধন্য হবিদাস! তুমি কি প্রহ্লাদের অবতার? প্রহ্লাদ ভিন্ন এ জগতে  
কেহ কখন দৃঢ়তা দেখাইতে পারে নাই। সে যে সত্য যুগের  
কথা, এখন যে কলিযুগ! তুমি অনায়াসে জীবন বিসর্জন করিতে পার  
কিন্তু হরি নাম ত্যাগ করিতে পার না। তাহাতেই তোমাকে গ্রহ কর্তরা  
প্রহ্লাদ ও ব্রহ্মার অবতার বলিয়াছেন। তোমার এই সুদৃঢ় বিশ্বাস পূর্ণ  
তেজস্বয় বাক্য, আজ অবধি যাহারা বিশ্বাসের সহিত ভগবানরেনাম  
লয়ন, তাহাদের হৃদয় ফলকে দৃঢ় অঙ্কিত হইয়া আসিতেছে।

তখন সভাস্থজনমণ্ডলী হরিদাসের এই অগ্নিময় বাক্য শ্রবণ করিয়া স্তম্ভিত  
হইলেন, এবং “মলুক পতি” প্রকাশ্য দরবারে অপরাধী দ্বারা, ভূণের মত  
অসম্মানিত হইয়া ক্রোধ বিরুদ্ধ কম্পিত স্বরে, গোরাই কাজির দিকে দৃষ্টপাত  
কারিয়া বলিলেন, “তোমাদের যা কর্তব্য হয় কর।” ঐ মুহূর্ত্তে গোরাই  
কাজি পাইকগণকে হরিদাসকে বান্ধিয়া বাইশ বাজারে বেত্রবাত করিতে  
আদেশ করিল। কাজি কহিল, যদি এ ব্যক্তি বাইশ বাজারে বেত খাইয়া  
জীবিত থাকে, তবে বুঝিব ইহার কথা সত্য, নচেৎ যবন হইয়া যাহারা  
হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে তাহাদের এই শাস্তিই ঠিক। তৎক্ষণাৎ হরিদাস  
পাইকের হস্ত বন্দী হইয়া সভাস্থল হইতে বহিষ্কৃত হইলেন। হরিদাস-  
ঠাকুরকে পাইকেরা বাজারে লইয়া বেত্রবাত করিতে লাগিল। পাইকগণের  
কঠিন বেত্রবাত হরিদাসের কোমল দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়া শোণিত স্রোত  
প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন তাহার বাহুজ্ঞান লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু  
অন্তরাঙ্গা নাম ব্রহ্মে লিপ্ত হইয়া প্রহার যন্ত্রণা অনুভব করিতে পারিল না।  
স্তম্ভবৎসল করুনাময় হরি! তুমি আজ কোথায়? আজ যে তোমার ভক্ত  
তোমার নাম লইয়া বেত্রবাতের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়াছে। তুমি একদিন

তোমার ভক্ত প্রহ্লাদকে পাষণ, অগ্নি, বিষময়সর্প ও হেস্তিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলে। আর একদিন তুমি তোমার প্রিয় গোপগোপীগণকে ভীষণ দাবাগ্নি, অজস্র বজ্রপাত, বিষময় বালীসর্প ও ছুর্ত অসুরগণ হইতে রক্ষা করিয়াছিলে; আজও যে সেইরূপ ভক্ত হরিদাস যমদূত সদৃশ পাইকের বেত্রাঘাতে মৃতবৎ হইয়াছে। প্রভু! কোথা তুমি? ঐ নয়? আজও প্রহ্লাদের মত হরিদাসকে কোলে বসাইয়াছ। পাইকের প্রহার আপনাই পিট পাতিয়া লইতেছে। প্রভু! ধন্য তোমার মহিমা। আপনার দেহ ক্ষত বিক্ষত করিয়া আজ হরিদাসের মাহাত্ম্য বুদ্ধি করিতেছ। এ তোমার কি খেলা? আর হরিদাস তুমি ওকি করিতেছ? তুমি এখন আনন্দে অত বিভোর কেন? তোমার প্রাণ বুঝি আজ প্রাণের প্রাণকে পাইয়াছে বলিয়া এত আনন্দ? দেখিতেছ না, ক্ষীর সর নবনী দ্বারা পালিত কোমলাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইতেছে? তোমাদের খেলা তোমরাই জান!

হরিদাসের নির্ঘাতন দর্শনে প্রত্যেক বাজারের লোক আর্তনাদ করিয়া উঠিতে লাগিল। পাইকগণকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া ঐ মহাপুরুষকে ছাড়িয়া দিতে বলিল, কিন্তু নির্দয় পাইকগণ কাহারও হাহাকারে কর্ণপাত না করিয়া অনবরত বেত্রাঘাত করিতে লাগিল। হরিদাস তখন করুণাময় পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন “প্রভো! ইহারা আমার কি করিতেছে জানে না, তুমি ইহাদের অপরাধ ক্ষমা কর। আমার জন্ত যেন ইহাদের পাপ না হয়।” প্রায় উনিশ শত বৎসর পূর্বে, এশিয়ার সুদূর পশ্চিম প্রান্তে, কোন মহাত্মা কিন্না মনুষ্য দেহধারী মহাদেবতা প্রাণাস্তকর বিপত্তির সময়েও আপনার কণ্ঠে ক্লিষ্ট না হইয়া, আপনার ভাবনা না ভাবিয়া যাহারা তাঁহার প্রাণের উপর আঘাত করিতেছিল, তাহাদিগের ভাবনা ভাবিয়াছিলেন, তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। শুধু ইহাই নহে, তাহাদিগের জন্ত ভগবানের কাছে এই বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন, “পিতা তুমি এই যোষাধিগের সকল অপরাধ ক্ষমা কর। কারণ ইহারা কি করিতেছে, তাহা ইহারা জানে না।” “এসিয়ায় পূর্বে প্রান্তে, ভারতের পুণ্ড্রক্ষেত্রে ঠাকুর হরিদাসও ঠিক সেই প্রাণে, সেই প্রেমে, সেইরূপ অচল

বিধাসে এবং উক্তির অপার্থিব উচ্ছ্বাসে, তাদৃশ আসন্ন মৃত্যুর সময়ে, তাঁহার প্রাণারাম্য হরির নিকট প্রার্থনা করিলেন—

“এ সব জীবনের করহ প্রসাদ,  
মোর দ্রোহে নহ এ সবায় অপরাধ।”

চৈতন্য ভাগবত।

এই প্রার্থনাই ভগবানের অনন্ত প্রেমে ভক্তের সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গ, ইহাই ভক্ত হরিদাসের জীবন ব্রত রূপ মহাযজ্ঞের পূর্ণাহতি। এরূপ ঘটনা ও এইরূপ প্রার্থনা জগতে নিত্য হয় না। কিন্তু যখন হয়, তখন পৃথিবীতে কেমন এক প্রকার স্বর্গীয় সমীর প্রবাহিত হইতে থাকে, লতা তখন আনন্দে দোলে, পাদপ অচ্ছাত সারে পুষ্পাঞ্জলি দেয়, মেঘ মধু বর্ষে, সূর্যের জ্যোতি স্নিগ্ধ ভাব ধারণ করে, শিশু স্নগভীর নিদ্রার মধ্যেও মায়ের কোলে চক্ষু বুজিয়া হাসে, বিহঙ্গের কণ্ঠে উল্লুগুর মত আনন্দ নিঃস্বন হইতে রহে, এবং মনুষ্যের ধর্ম্যে ও কর্ম্যে ব্যতিরেক অভ্যন্তরের জীবনে একটা যুগান্তর উপস্থিত হইয়া পড়ে। অবশেষে পাইয়ান যখন দেখিল, বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত করিয়াও মৃত্যু হইলনা, তখন কহিল তুমি মরিবার লোক নও, তুমি না মরিলে আমাদের প্রাণদণ্ড হইবে। এখন আমাদের উপায় কি? হরিদাস কহিলেন, “ভাই! তোমাদের চিন্তা কি! আমি মরিলেই যদি তোমাদের মঙ্গল হয়, তাহা হইলে এখনই মরিতেছি। “হরিদাস এই বলিয়া ক্রমে ক্রমে বাহ্য জ্ঞান লুপ্ত হইয়া সমাধি অবস্থায় রহিলেন। পাইকেরা তাঁহাকে মৃতবৎ দেখিয়া “মুলুক পতির” দ্বারে ফেলিয়া দিল। “মুলুকপতি” হরিদাসকে গোর দিতে বলিল। গোরাই কাজীর সহ্য হইল না। তাহার হৃদয় তখনও বিবেচ্য বিষয় পরিপূর্ণ। সে বলিল এ নরোধমকে মাটিদিলে সংগতি হইবে, অতএব ইহাকে গঙ্গায় ভাসাইয়া দেওয়া হউক।

কিয়ৎকাল পরে হরিদাস ভাগীরথী সঙ্গিলে ভাসিয়া ভাসিয়া বাহ্য জ্ঞান লাভ করিলেন; এবং তীরে উঠিয়া হরিনাম জপ করিতে লাগিলেন। নগরে জনরব উঠিল যে, হরিদাস এখনও জীবিত আছেন, এবং গঙ্গাতীরে বসিয়া

হরিনাম জপ, করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য আশাল বৃদ্ধ, বনিতা সমস্ত লোকই পাগলের মত ছুটিল। মূলুকপতিও তাঁহার আলৌকিক শক্তিতে, তাঁহাকে পীর জ্ঞান করিয়া তাঁহার পদতলে পতিত হইলেন; এবং লজ্জিত হইয়া করযোড়ে স্ববস্তুতি করিতে লাগিলেন।

“সত্য সত্য জানিলাম তুমি মহাপীড়।

এক জ্ঞান তোমার মে হইয়াছে স্থির ॥”

\* \* \* \*

“আপন ইচ্ছায় তুমি থাক যথা তথা।

যে তোমার ইচ্ছা তাই করহ সর্বথা ॥”

চৈতন্য ভাগবত।

অনন্তর হরিন্দাস হরিনাম গাইতে গাইতে ফুলিয়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। ফুলিয়া বাসীগণ তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দে বিহবল হইল। তথায় ক্রিয়ং কাল থাকিয়া শাস্ত্রপুরে শ্রীঅদ্বৈতের গৃহে উপনীত হইলেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু ও হরিন্দাস শুনিলেন নবদ্বীপে নিমাই পণ্ডিত অপূর্ব ভক্তিরসে বিভোর হইয়াছেন, এবং নবদ্বীপস্থ ভক্ত মণ্ডলীর দিবা রাত্রি হরিনাম সংস্কীর্ণনে নবদ্বীপ ভক্তি তরঙ্গে টলমল করিতেছে। হরিন্দাস আচার্যের সহিত নবদ্বীপে আসিয়া, শ্রীগৌরঙ্গের অমানুষিক প্রেম দেখিয়া তাঁহাকে সান্নাৎনরামধর জ্ঞানে ভক্তি করিতে লাগিলেন।

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য নিশাবসানে স্বপ্ন দেখিলেন, যেন তাঁহার প্রার্থনার ধন শ্রীগৌরঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আচার্য জানিতেন তিনি তাঁহার একান্ত অনুগত দাস, যদি যথার্থই তিনি অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে নিজ পাশে আবদ্ধ করিয়া লইয়া যাইবেন, এই ভাবিয়া হরিন্দাসের সহিত শাস্ত্রপুরে গমন করিলেন।

‘সত্য যদি প্রভু হয় মুই হও দাস।

তবে মোরে বান্ধিয়া আনিবে নিজপাশ ॥”

চৈতন্য ভাগবত।

শ্রীগৌরঙ্গ দেব একদিন প্রকাশ অবস্থায় শ্রীবাসের ভ্রাতা রামাই পণ্ডিতকে শ্রীআচার্যকে আনিতে পাঠাইলেন। ক্ষুদ্র নদী যেমন অপেক্ষাকৃত বৃহৎ



নদীতে মিলিত হইয়া প্রবল বেগে সাগরাভিমুখে ধাবিত হয়, হরিদাসও আচার্যের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীগৌরানন্দ সাগরে মিলিত হইলেন। একদিন শ্রীগৌরানন্দেব প্রকাশিত হইয়া শ্রীবাসের বিমুখটায় বনিয়া আপনাকে অভিব্যেক করিতে বলিলেন। ঐ দিবস মহাপ্রভু সপ্তপ্রহর প্রকাশ অবস্থায় ছিলেন, ইহাকে “সাত প্রহরिया ভাব বা” মহা প্রকাশ বলে। ঐ দিবস প্রভু প্রকাশ অবস্থায় ক্রমে ক্রমে ভক্তগণকে আপন করিতে লাগিলেন। যাহার যে ইষ্ট দেবতা, ভক্তগণ মহাপ্রভুকে সেইরূপে দেখিতে লাগিলেন। কেহ বা তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ, কেহ বা শ্রীরাম, কেহ বা তাঁহাকে জগজ্জননী আনন্দময়ী রূপে দেখিলেন। প্রভু হরিদাসকে ভিতরে ডাকিলেন। হরিদাস দীন হীন কাঙ্গালের মত বাহিরে থাকিতে ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু ভক্তবৎসল ভগবানের কাছে ভক্তই আদরের ধন। তিনি বলিলেন “আমি তোমার দৈন্তে বড় দুঃখিত হই, তুমি আসিয়া আমাকে দর্শন কর।” হরিদাস যাইয়া শ্রীচরণ প্রান্তে পূজায় লুপ্ত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন, এবং রোদন করিতে করিতে তাঁহার স্ববস্তুতি করিতে লাগিলেন।

প্রভু বলিলেন—

“—উঠ উঠ মোর হরিদাস।

মনোরথ ভরি দেখ আমার প্রকাশ ॥”

প্রভু আরও বলিলেন—

“তোমার মারন নিজ অঙ্গে করিলড।

এই তার সাক্ষী আছে মিছা নাহি কড ॥

যেবা গোণ ছিল মোর প্রকাশ করিতে।

শীঘ্র আইছ তোর দুখে না প্যরো সহিতে ॥”

শ্রীগৌরানন্দেব বলিলেন, “তোমার কি প্রার্থনা বল” হরিদাস কহিলেন—

“শচীরমন্দন রূপা কর মোরে।

কুল্লর করিয়া মোরে রাখ ভক্ত স্বরে ॥”

তখন ভক্ত মণ্ডলী হরিদাসের প্রার্থনা শুনিয়া আকাশ মণ্ডল কম্পিত করিয়া অয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন ।

শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাস শ্রীগোরাঙ্গ দেবের আদেশ ক্রমে ধরে ধরে হরিনাম প্রচার করিতে লাগিলেন । ইহারা জগাই মাধাইয়ের ভীষণ পাপাচার দর্শনে কাতর হইয়া, শ্রীগোরাঙ্গ মহাপ্রভুর নিকট উভয়ের উদ্ধারের জন্ত প্রার্থনা করিলেন ।

প্রভু সত্যযুগে হিরণ্যকশিপুকে বাহুবলে, ত্রেতাযুগে রাবণ ও কুন্তকর্ণকে ষটুর্কাণের দ্বারা এবং দ্বাপরযুগে শিশুপাল ও দণ্ডবক্রকে চক্রের দ্বারা কিনাশ করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন, কিন্তু এবার তিনি প্রেমাভারে, ভক্তের অনুরোধে ভক্তবৎসল জগাই ও মাধাইকে হরিনামরূপ মহাপ্রভুর দ্বারা উদ্ধার করিয়া পতিতপাবন নামের পরিচয় দিলেন । হরিদাস একবৎসর কাল শ্রীগোরাঙ্গদেবের সম্যাস গ্রহণ পর্যন্ত নবদ্বীপে ভক্ত মণ্ডলীর মধ্যে বাস করিয়াছিলেন ।

যেমন নদীর জল সাগরে মিলিত হইলে তাহার কোনও প্রভেদ থাকেনা, সাগরের সহিত হেলিয়া হুলিয়া, তরঙ্গ তুলিয়া নৃত্য করে ; হরিদাসও সেইরূপ গোরাঙ্গসাগরে মিলিত হইয়া তাঁহার সহিত পুতুল সাজিয়া নৃত্যগীত করিয়াছিলেন । ষড়্দের উজ্জল রত্নের স্বরূপ শ্রীযুক্ত কালীশ্রমর ঘোষ মহাশয় “ভক্তির জয়” গ্রন্থে ইহাকে যথার্থই সাগর সম্বন করিয়াছেন । যথার্থই হরিদাস তারপর তাঁহার সেই তেজোময় গাঙ্গীর্ঘ্য ভাব ভুলিয়া পঞ্চম বৎসরের বালকের স্থায় নাচিয়াছেন, গাইয়াছেন ও পুতুলের মত খেলিয়াছেন ।

শ্রীগোরাঙ্গ দেব চব্বিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে কাটোয়া নগরে শ্রীকেশব ভারতীর নিকট সম্যাস মন্ত্রে দীক্ষা লইয়া শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নাম গ্রহণ করেন । অবশেষে তিনি মাতৃ আঞ্জায় নীলাচলে যাত্রা করিলেন । হরিদাস অশ্রুসিক্ত নয়নে কহিলেন, “প্রভো ! তুমি নীলাচল যাত্রা করিলে আমার উপায় কি হইবে ? আমি নীচ জাতি আমার তথায় স্থান হইবেনা ।” শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হরিদাস ! তুমি ক্রন্দন সম্বরণ কর, আমি শ্রীজগন্নাথ দেবের আদেশে তোমাকে তথায় লইয়া যাইব ।

কিছু দিন পরে হরিদাস ভক্ত বৃন্দের সহিত নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মহাপ্রভু তখন নবদ্বীপবাসী ভক্তগণের আগমনে আনন্দিত হইয়া প্রেমালিঙ্গন করিবার জন্ত অগ্রসর হইলেন। তাঁহাদিগের সহিত যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমার প্রাণাধিক ভক্ত হরিদাস কোথায়” জনৈক ভক্ত কহিলেন, জগন্নাথ দেবের সেবকগণ পাছে তাঁহাকে স্পর্শ করেন এই ভয়ে রাস্তার এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান আছেন। চৈতন্যদেব তাঁহার দৈন্ত্য দেখিয়া আনন্দিত হইলেন, এবং আলিঙ্গন দান করিবার জন্ত নিজেই অগ্রসর হইলেন। হরিদাস কহিলেন “প্রভু রক্ষা করুন আমি নীচ পামর, আপনার স্পর্শের যোগ্য নহি”। প্রভু তাঁহার কোন বাধা আপত্তি না শুনিয়া, তাঁহাকে কোলে লইলেন, এবং উভয়ে অজস্র প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

অহোবত স্বপচোহতো গরীয়ান ।

যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্ ।

তেপুস্তপস্তে জুহবুঃ সম্বরার্থ্যা

ব্রহ্মানুচূর্ণাম গৃণতি যে তে ॥ ৭

শ্রীমদ্ভাগবত। ৩। ৩৩

“যাঁহার রসনায় দিবানিশি তোমার নাম বর্তমান, সে চণ্ডাল হইলেও গরীয়ান। যাঁহার তোমার নাম গ্রহণ করেন, তাঁহারাই যথার্থ তপস্বী করেন, হোম করেন, তীর্থে স্নান করেন, বেদাদি পাঠ করেন এবং তাঁহারাই যথার্থ সদাচার সম্পন্ন।”

• অনন্তর শ্রীগৌরান্দ্র প্রভু হরিদাসের জন্ত সাগর কূলে একটা সাধন কুটির নির্মাণ করিয়া দিলেন। • তিনি জীবনের শেষাবস্থায় ঐ উদ্যান মধ্যস্থ কুটিরে বাস করিয়া সাধন ভজন করিতেন। মহাপ্রভুর ভৃত্য গৌবিন্দ প্রতিদিন তাঁহাকে মহাপ্রসাদ দিয়া যাইতেন, এবং শ্রীচৈতন্য দেবও কোন দিন এককী কোনদিন বা ভক্তগণকে লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন।

একদিবস প্রভু অত্যন্ত হুঃখিতান্তঃকরণে কহিলেন “হরিদাস! কলিকালে এই গো ব্রাহ্মণের হিংসাকারী যবনগণ কি প্রকারে উদ্ধার হইবে তাহার

চিত্তার অবসন্ন হইতেছি।” হরিদাস কহিলেন “প্রভু তাহার চিন্তা করিবেন না অক্ষয় বা অবহেলায় নাম উচ্চারণ করিলে জীব উদ্ধার হয়, এই জলন্ত বিবাদে তিনি কহিলেন “অজামিল যখন তাহার পুত্র নারায়ণকে ডাকিয়া বিষ্ণুদ্বতের দ্বারা বৈকুণ্ঠে গিয়াছিলেন, তখন যবনগণ হারাম শব্দ উচ্চারণ করিয়া উদ্ধার পাইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে ?

দংষ্ট্রী দংষ্ট্রীহতো স্নেচ্ছ হারামেতি পুনঃপুনঃ ।

উক্তাপি মুক্তি না পোতি কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণত ॥

নৃসিংহ পুরাণম্ ॥

প্রভু তাঁহার এই যুক্তিপূর্ণ বাক্য শুনিয়া সুখী হইয়া পুনরায় কহিলেন, হরিদাস ! জীব, জন্তু, স্থাবর জঙ্গম কি উপায়ে উদ্ধার হইবে ? হরিদাস কহিলেন, “প্রভু আপনি যে এবার নবরূপে অবতান গ্রহণ করিয়া উচ্চ সংস্কীর্ণন প্রচার করিয়াছেন, ঐ ধরনি যেখানে যতদূর যাইবে তাবৎ জীবজন্তু ও স্থাবর জঙ্গম উদ্ধার পাইবে।”

“এত শুনি প্রভু মনে চমৎকার হইল।

মোর গুঢ়লীলা হরিদাস কেমনে জানিল ॥”

চৈতন্য চরিতামৃত ।

শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন যখন নীলাচলে আসিতেন, হরিদাসের সাধন কুটিরে থাকিতেন। প্রভু ভক্তগণের কাছে প্রায়ই বলিতেন যে, আমি নামের মাহাত্ম্য হরিদাসের কাছে শিক্ষা করিয়াছি।

“নামের মহিমা আমি তাঁর ঠাই শিখিল।

তাঁর প্রসাদেই নামের মহিমা জানিল ॥”

চৈতন্য চরিতামৃত ।

ক্রমে হরিদাসের বার্নিক্য দশা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, এক্ষণে তিনি নুনাধিক অশিষ্ঠী বৎসরের বৃদ্ধ ও দেশ শেষাবস্থায় গুরুভারাক্রান্ত হইয়াছিল। ক্রমে তাঁহার তিন লক্ষ নাম জপ করা কঠিন হইয়া উঠিল। তিনি সংখ্যা নাম পূর্ণ না হইলে আহার করিতেন না। কোন কোন দিন প্রভুর ভৃত্য

গোবিন্দ প্রসাদান আনিলে, প্রসাদ অমাণ্ড করা মহাপরাধ জানে, প্রসাদের বন্দনা করিয়া বিমাত্র মুখে দিতেন ; এবং সমস্ত দিবানিশি উপবাস থাকিয়া নাম জপ করিতেন। পর দিবস প্রভু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “হরিদাস তুমি এক্ষণে সুস্থত ?” হরিদাস কহিলেন, “প্রভো! আমার দেহ সুস্থ বটে, কিন্তু মন অসুস্থ, কারণ আমার জপের সংখ্যা কিছুতেই পূর্ণ হইতেছে না।” প্রভু কহিলেন, “তুমি এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছ, এবং দিনক দেহ পাইয়াছ। এখন সাধনের জন্য আগ্রহ কেন ? নামের মহিমা প্রচারের জন্য তুমি অবতীর্ণ হইয়াছিলে, সে কার্যত এক্ষণে শেষ হইয়াছে, অতএব সংখ্যা কমাইয়া নাম জপ কর।” হরিদাস কহিলেন, “প্রভো! আমার এক প্রার্থনা আছে শ্রবণ করুন, আমি অস্পৃগু হইন কর্ণে রত হইয়াও আপনার আশ্রয় লাভ করিয়াছি, আপনি আমাকে নরক হইতে উদ্ধার করিয়া বৈকুণ্ঠে স্থান দিয়াছেন, আপনি ইচ্ছাময়, আমাকে রূপী করিয়া অনেক নাচাইয়াছেন। আমি স্নেহ হইয়াও আপনার প্রসাদে ব্রাহ্মণের সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রভো! আমার বহুদিন হইতে এক বাগনা আছে। বোধ হয় আপনি অচিরে লীলা সম্বরণ করিবেন, আমাকে যেন তাঁহা না দেখিতে হয়। তাহার পূর্বেই যেন আমি শরীরত্যাগ করিতে পারি। প্রভো অস্তিম সময়ে যেন আমার হৃদয় তোমার যুগল চরণ ধারণ করিতে পারি ; হৃদয়ে যেন তোমার অকলঙ্ক চাঁদ বদন দেখিতে পাই, তোমার শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নাম জিহ্বায় উচ্চারণ করিতে করিতে যেন প্রাণ দেহ ছাড়িয়া যায়। দয়াময় আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ করুন।” প্রভু কহিলেন, “হরিদাস! কৃষ্ণ রূপাময়, তুমি যাহা চাহিবে তাহাই অবশ্য পাইবে, কিন্তু তোমার আমাকে ছাড়িয়া যাওয়া উচিত নহে, তোমাকে লইয়াই জামার যে কিছু সুখ।” হরিদাস শ্রীগোবিন্দের চরণ ধরিয়া বলিলেন, প্রভো! মায়াত্যাগ করুন, এই অধুম পাপীকে এই দয়া করিতেই হইবে। আমার মস্তকের গণি স্বরূপ কত মহা মহা ভক্ত আছেন, অনন্ত বিধ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকা মরিলে কিছুই ক্ষতি হয় না, সেইরূপ আমার মৃত্যুতে আপনার লীলার কিছুই ক্ষতি হইবে না। প্রভো! তুমি ভক্তবৎসল, আমার এই আশা নিশ্চই পূর্ণ করিতে হইবে।

অল্প মধ্যাহ্নে ক্রিয়া করিতে গমন করণ, কল্যা শ্রীজগন্নাথ দেখিয়া এখানে দর্শন দিবেন।”

পরদিবস প্রত্যুষে শ্রীগোরাঙ্গ প্রভু, রায় রামানন্দ, বাসুদেব সার্কডোম, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, সরূপ গোসাঁই প্রভৃতি ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন, এবং হরিদাসকে বেঠেন করিয়া মহা সংস্কীর্তন আরম্ভ করিলেন। প্রভু ভক্তগণের নিকট হরিদাসের মহিমা কীর্তন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ সকলেই হরিদাসের চরণ ধূলি লইলেন এবং হরিদাসও ভক্তগণের চরণ ধূলি মস্তকে ধারণ করিলেন। অনন্তর ভক্তবর হরিদাস ভক্তবৎসল শ্রীগোরাঙ্গ দেবকে সম্মুখে বসাইলেন। তাঁহার নয়ন ভূঙ্গবয় গৌরাঙ্গ মুখ-পদ্মের মধুপান করিতে লাগিল, তাঁহার হৃদয় শ্রীগোরাঙ্গের চরণ যুগল ধারণ করিল, এবং মুখে শ্রীক্ষটচতন্য নাম উচ্চারণ করিতে করিতে জীবাত্মা নাম বক্রের সহিত দেহত্যাগ করিয়া বহির্গত হইল।

ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্মদেব যেমন নবজলধর শ্যাম মূর্তি দর্শন করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করিয়া ছিলেন, আজ হরিদাসও সেইরূপ সোণার বরণ ত্রিভঙ্গিম গৌরাঙ্গ মূর্তি দর্শন করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করিলেন। মহাপ্রভুও ভক্তগণ প্রেমামানন্দে বিহ্বল হইয়া হরিদাসের মৃতদেহ কোলে করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। হরিদাসের দেহ বিমানে আরোহণ করাইয়া সংস্কীর্তন করিতে করিতে সমুদ্রোপকূলে লইয়া চলিলেন। হরিদাসের দেহকে সমুদ্র জলে নান করাইয়া সকলে তাঁহার পাদোদক পান করিলেন সমুদ্র আজ মহাভীর্ণ হইল।”

অবশেষে সমুদ্র উপকূলে হরিদাসের দেহকে যথা নিয়মে সমাধি দিলেন। আজ অবধি বহুতর সাধক ও ভক্তগণ সমাধি স্থান অক্ষধারায় গৌত করিয়া থাকেন। সমাধির পার্শ্বে মহাপ্রভুর স্বহস্ত রোপিত একটি প্রকাণ্ড জীর্ণ বকুল বৃক্ষ আজ অবধি ঐ সমাধিকে ছায়া দান করিতেছে।

শ্রীমহেশ্র নাথ বহু ।

সম্পূর্ণ ।

# মাতৃ পূজা ।

—:—

চুম্বেরীরসী মাতা মাতা হি পরমোগুরুঃ ।

সর্বদেব ময়ীমাতা পূজ্যা বক্ষ্যা প্রযত্নতঃ ॥

মাতৃ পূজা কথাটা আজকাল ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে হয় ; এক সময় এই আৰ্য্য্য বর্ভের আৰ্য্য সন্তানগণের নিত্য জিলাৰ শ্ৰথম অনুষ্ঠেয় ছিল মাতৃ পূজা । জননীকে শ্ৰণাম, জননীৰ চরণ ধূলি মস্তকে ধারণ, জননীৰ শুভাসীর্ষাদ গ্রহণ এবং বেদ বাক্য সমজ্ঞানে জননীৰ বাক্য পালন আৰ্য্য সন্তানের সকল কাৰ্য্যের প্ৰারম্ভে শুভ স্বস্ত্যয়ন স্বৰূপ ছিল । জননী যে কি বস্তু তাহা মাতৃভক্ত সন্তান ভিন্ন অন্য কাহাকেও ভাষা দ্বারা বুঝান যায় না । গৰ্ভ ধারণ ও প্ৰতিপালন দ্বারা সকল গুরুজন এমন কি পৰমগুরু পিতা অপেক্ষাও মাতা অধিকতর পূজ্যা হন । শ্ৰিয় পাঠকগণ ! এক দিনও যে মাতৃ মেহ লাভ কৰিয়াছে একবারও যে মায়ের মমতাৰ বিষয় ভাবিয়াছে সে জানে মাতাৰ ছায় মেহ মমতা পূৰ্ণ হৃদয়ে জগতের আৰ কেহই ছাল বাসিতে পারে না । শাস্ত্ৰালোচনায় এবং লৌকিক ব্যবহাৰে জানা যায় স্বার্থ ভিন্ন কেহই কাহাকে ভাল বাসে না যে বাহাকে ভাল বাসে সেই তাহার ভাল বাসা হইতে নিজের উপকাৰ বা নিজের সুখ স্বচ্ছন্দতাৰ প্ৰত্যাশা করে । আশু সুখ ভালসা বিহীন ভালবাসা জননী ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট পাওয়া যায় না ইহা সুনিশ্চিত, ঋৰ্ভধাৰিণী জননীৰ ভালবাসা সুনিশ্চল, উহাতে স্বার্থ পক্ষও আৰোপ কৰা পাপের কৰ্ম্ম । সন্তান যদি অকপট হৃদয়ে ভাঙ্কিয়া দেখে জননী ঋৰ্ভধায়ণ অবধি প্ৰসবকাল পর্য্যন্ত গৰ্ভস্থ সন্তানের সুখের জন্য কত ভাবে, কত সাবধান হন, কত কষ্ট সহ করেন, প্ৰসব সময়ের অসহ যত্নণা অবধি সহ কৰিয়া পুত্ৰ মুখ সন্দর্শন কৰিয়া অবধি পুত্ৰের প্ৰতিপালনাৰ্থে ক্ৰতি দিয়ত বৈৰূপ ক্লেশ সহ করেন সেরূপ যত্নণা সহ কৰিয়া আৰ কেহ

ভাল বাসিতে পারে কি না সন্দেহ। স্ব ইচ্ছায় আহার, যথা সময়ে নিদ্রা ও নিজের সুশয়ন প্রভৃতি একেবারে পরিত্যাগ করিয়া পুত্র মঙ্গল পরায়ণা জননী এক একদিন যেরূপ ক্রেশ সহ কষ্টে, পুত্র যাবজ্জীবন চেষ্টা করিয়াও জননীর নিকট সেই ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারে না। প্রিয় পাঠকগণ। পূর্বতন আর্ধ্য ঋষিরা এই সুনির্মূল মাতৃ ভাব স্মরণ করিয়াই পূর্ণ ব্রহ্মসনাতনকে মাতৃভাবে উপাসনা করিতেন। পুত্র শত শত অপরাধ করিয়াও যদি একবার মা বলিয়া ডাকিয়া কাছে আসে জননী পুত্রের মমতায় আত্মহারা হইয়া পুত্রকৃত দোষ ভুলিয়া পুত্রের সকল অপরাধ মার্জনা করেন। শ্রীভগবানের নিকটও ঐরূপ ভাল বাসা পাইবার প্রত্যাশায় ঋষিরা “ত্বমেব মাতা” “ত্বং দেবী জননী পরা” ইত্যাদি বাক্যে মাতৃ সম্বন্ধে তাঁহার প্রতি ভক্তি ভাবে আত্ম সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইতেন। আজকাল মাতৃ ভাব কি মধুর, মাতৃ স্নেহ কি অনুপমেয়, মা আর সন্তান সম্বন্ধ কি অমিয় পূর্ণ, তাহা অনুভব করিতে না পারায় বিশ্বজীবজীবনকে মা বলিয়া ডাকা যে কি সুখের তাহা অনেকে জানে না সুতরাং মা বলায় যে একটা বেশী ভালবাসার পরিচয় হয় তাহাও স্বীকার করিতে পারে না। আমরা মা হইতেই প্রথম ভালবাসা শিখিয়াছি নিজের স্বার্থ ত্যাগ করিয়া নিজের সুখের দিকে লক্ষ্য না করিয়া যে, পরের দুঃখ দূর করিতে হয় ইহার একমাত্র শিক্ষা গুরু জননী। আমার বিশ্বাস মাতৃ স্নেহের ভাব বাহার হৃদয়ে অঙ্কিত হয় নাই, মাতৃ বাক্য পালন করিয়া মায়ের প্রীতি সম্পাদন করিয়া মায়ের নিকট অমোঘ আশীর্ষাদ যে পায় নাই সেই মাতৃ ভক্তি হীন, মাতৃ পূজা পরাঙ্মুখ অভক্ত সন্তান কখনও বিশ্ব জীব-জননীকে মাতৃভাবে উপাসনা করিয়া উন্নত হইতে পারে না। পূর্বে বলিয়াছি এই আর্ধ্য ভূমিতে প্রতি ঘরে ঘরে মাতৃ ভক্ত সন্তান ছিলেন, সকলেই জানিত মাতৃ ভক্তি হীন মনব ধার্মিক হইতে পারে না, মাতৃ ভক্তিহীন সন্তানের ধর্ম, কর্ম, তীর্থ, তপস্যা সকলই বিফল, মাতৃ বিদ্বেষী সন্তানের কাতর প্রার্থনা শ্রীভগদান শ্রবণ করেন না। তাই মাতৃ ভক্তির প্রভাবে প্রতি ঘরে শান্তিদেবী বিরাজ করিতেন। অভাব ও অকাল মৃত্যু বা দুর্ভাগ্য ব্যাধির বহুগণা অনেকে ভোগ করিতেন না। মাতৃ ভক্তির কথা



আর নূতন করিয়া নূতন নূতন দৃষ্টান্তের দ্বারাও নূতন নূতন ভাষায় বক্তব্য করিয়া বুঝাইতে হইত না। তমো গুণের আহার তমো গুণের বিহার ও তমো গুণের সঙ্গ দোষে আমরা অন্ধ হইয়াছি, প্রত্যেক দেবতা জননীর যত্নে লালিত পালিত হইয়াও তাঁহাকে চিনিতে পারি না, তাই সেই সুনির্খাল শাস্ত্র মুখ হইতে বঞ্চিত আছি, এই জগুই মাতৃ ভক্তির কথা বলিতে ও লিখিতে গিয়া কোথায় একটা মাতৃ ভক্ত সন্তান আছেন, কোন ব্যক্তি মাতৃপদে মস্তক নত করেন, কোন ভাগ্যবান মাতৃবাক্য প্রতিপালন করেন, তাহার অনুসন্ধান করি। প্রিয় পাঠকগণ! আজ আপনাদের নিকট এমন একটি আদর্শ মাতৃ ভক্তের বিষয় বলিব, যাহার মাতৃ ভক্তির ভাব আমি প্রত্যেক অনুভব করিয়াছি; যাহার অবিচারে মাতৃ বাক্য পালনার্থে আমি বিধিত হইয়াছি এবং সে দিন যাহার মাতৃ পূজা সন্দর্শনে আমি আশ্রয় ও উর্দ্ধ্বাহ হইয়া উচ্চ কণ্ঠে ধন্য ধন্য রবে প্রশংসা করিয়াছি এবং ভাবে ভাবে প্রাণের আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিয়াও আশা মিটাইতে পারি নাই। পাঠকগণ! আমার এ আদর্শ আরোপিত নহে এ আদর্শ কল্পিত নহে বা ইহাতে কিছু মাত্র রঞ্জিত ভাব নাই বরং এই আদর্শ পুরুষের গুণ বর্ণন করিতে আমার ভাষা সম্পূর্ণ যোগ্যতা নলিয়া আমি কুণ্ঠিত হইতেছি। ভক্তের জীবন চরিত্র ভক্তি পত্রিকার পবিত্র অনঙ্কার স্বরূপ, সেই জগু এই মহাত্মার জীবন চরিত্র লিখিবার আশা থাকিলেও সকল বিষয় ভাল রকমে জানিতে পারি নাই বলিয়া আনুস্তম্বটনা লিখিতে পারিব না, কেবল মাতৃ ভক্তির অনুকূলে সামান্ত ভাবে ইহার পরিচয় পাঠকবর্গের গোচর করিব। প্রিয় পাঠকগণ! এই আদর্শ মাতৃ ভক্তের নাম শ্রীযুক্ত পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায় ইনি খুলনা জেলার অন্তর্গত সাতক্ষীরা মহকুমার প্রধান ও প্রাচীন উকিল। ইহার জন্মস্থান ঐ মহকুমার অধীন মাদারবাড়িয়া গ্রামে, ইহার পিতার নাম ৮মাঘবচন চট্টোপাধ্যায়। অতি শিশুকালে ইনি পিতৃহীন হইয়া দক্ষিণ শ্রীপুর গ্রামে মাতুলালয়ে একমাত্র জননীর স্নেহে প্রতিপালিত ও বহুত হন, এক্ষণে ইহার বয়স প্রায় ৬৫ বৎসর। শিশুকাল, হইতে এ পর্যন্ত পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায়ের জীবনের অনেক ঘটনা মাতৃ ভক্তির উজল দৃষ্টান্ত স্বরূপ এবং

স্কুলের প্রতিপদ। দুঃখের বিষয় আমি সেই সকল ঘটনার আমূল বৃত্তান্ত ভালরূপে না জানায় আজ পাঠকগণকে সেই সকল বৃত্তান্তে সুখী ও উৎসাহিত করিতে পারিলাম না। শিশুকাল হইতে পরেশনাথ কেবল তাঁহার জননীর যত্নেই উৎসাহিত হইয়া অতিশয় উৎসাহে ও শ্রবল অধ্যবসায় সহকারে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। অর্থাভাব নিবন্ধন অতি কষ্টে পাঠ্য পুস্তকাদি সংগ্রহ করিয়া কখন কখন বা অপরা ছাত্র পড়াইয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়াও নিজের ব্যয় ভার নিজেই বহন করিয়া শিক্ষা করিয়াছেন। মাতৃভক্ত পরেশনাথ মা ভিন্ন আর কিছুই জানেন না, অতি শৈশবে পিতৃহীন, সুতরাং পিতৃ স্নেহ ও মাতৃ স্নেহ উভয়ই জননীর নিকট লাভ করিয়া একমাত্র জননীকেই পালনী শক্তি ও পোষণ শক্তির আলয় জ্ঞানে মা “মাহা বলেন” তাহাই শাস্ত্র, মাতৃ বাক্যই সর্বথা পালনীয় বোধে মাতৃ আজ্ঞানুসারে শিক্ষালাভ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য একমাত্র পুত্রের জননী পতিহীনা পরেশনাথের মাতাও অতি কষ্টেই পুত্রকে লালনপালন করিয়াছেন। এরূপে নানা ভাবে সুখে দুঃখে ক্রমিক সুশিক্ষিত হইয়া পরেশ নাথ উকিল হইলেন। মাতৃ আদেশ অক্ষুর ভাবে প্রতিপালন করিয়া মাতৃ আশীর্বাদে ঐ ওকলাতি ব্যবসায়েই পরেশনাথ ঐ দেশের মধ্যে মাতৃ গণ্য ধনী হইয়াছেন। পরোপকারার্থ দান ও ঐরূপে পোষণ করা পরেশনাথের স্বভাব সিদ্ধ কার্য। \* \* \* এক্ষণে বক্তব্য বিষয় এই যে, আমাদের আলোচ্য মাতৃ ভক্ত পরেশনাথ একেবারে নিঃস্ব অবস্থা হইতে ধনী হইলেন, কোন গুণে? কেবল বিজ্ঞান বুদ্ধিতে ও কেবল ওকালতিতেও নহে তাহা বেশ বলিতে পারি! আমরা সাহসের সহিত বলিতে পারি, একমাত্র মাতৃ ভক্তিই হাঁহার উন্নতির প্রধানতম সহায়! মাতৃ ভক্তি বলে পরেশনাথ যখন যে কার্যে প্রবৃত্ত হন, বিপন্ন জননী প্রসন্ন হইয়া সেই কার্যের সফলতা তাঁহার হস্তে প্রদান করেন, পরেশনাথ মাতৃ ভক্ত বলিয়া সম্প্রদায়িক মানসী দেবী তাঁহার গৃহে সর্বদা বর্তমান। পরেশনাথ অকাতরে ধোলা প্রাণে ব্যয় করেন। আমরা পরেশনাথ হইতে আর একটি সুশিক্ষা পাইতেছি যে, “নির্ধন অস্বাস্থ্য হইতে যে ব্যক্তি ধনী হয় সে স্বভাবত রূপণ হয়” এই জনপ্রতি পরেশ বাবুকে একেবারেই স্পর্শ করিতে পারে নাই পরেশনাথ অরূপণ ধনী

এবং অহংকার শূন্য দাতা। আজ ৪ চারি বৎসর যাবত সাধারণের আগ্রহে ৩০শে আখিন রাধি বন্ধনের দিন তিনি পদ্মপুরানোক্ত বিধি অনুসারে পৃথিদ্দেবীর মূর্তি গড়াইয়া যথা বিধি মাতৃ পূজা করেন, ঐ পূজায় নানা স্থান হইতে লোক সমাগম হয় তিনি অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়া সকলকে পরিতোষ পূর্বক ভোজনাদি করান। কেবল দেবীর পূজাই পরেশনাথের উৎসবের সর্ব্বঙ্গ নহে তিনি তাঁহার গর্ভধারিণী জননীকে যথা শাস্ত্র মতে পাণ্ডু অর্বাদি দ্বারা অর্চনা করেন। এবার ১৩১৬ সাল ৩০ আখিন ঐ পূজার পরেই বাহিরু বাটীতে সর্ব্ব সমক্ষে নিজ গর্ভধারিণী জননীর পূজা করিতে অনুরুদ্ধ হওয়ায় পরেশনাথ তাহার অনুষ্ঠান আরম্ভ করিলেন; উত্তম আসনে পরেশনাথ জননীকে বসাইয়া সঙ্গিক তাঁহার পাদদ্বয় ধোত করাইলেন, পরে যথা বিধি ধ্যান করিয়া জননীর পূজা করিতে লাগিলেন, প্রিয় পাঠকগণ তখনকার সেই সুভ আদর্শ-দৃশ্য দেখিয়া সমাগত বালক বৃদ্ধ নরনারী মাত্রেই, বিস্মিত ও ভাবাপ্লুত হইয়াছিলেন, আহা! সে দৃশ্য অতি মনোহর, সেই দৃশ্য দেখিলে পাষাণ হৃদয়েও মাতৃ ভক্তি সঞ্চারিত হয়, পরেশনাথ পূজা করিয়া যখন সাষ্টাঙ্গে মাতৃ চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছিলেন, তখন সভা মধ্য হইতে অতি জ্বলিত কুঠুে ঐ পরেশনাথেরই ভাবে ভাবে রচিত দুইটি নাম গীত হইল। সমায়েচিত সুরে ভাবে ও ভাষায় গানের প্রত্যেক কথায় শ্রোতৃ বৃন্দের শরীর রোমাকিত হইতে লাগিল, পরেশনাথও তখন ভাব গদ গদ ভাষায় মাতৃ স্তব পাঠ করত ভাবাশ্রুপূর্ণ নেত্রে মাতৃ মূর্তি দর্শন করিয়া সমাগত দর্শক মণ্ডলীকে বিমুগ্ধ করিতে লাগিলেন, গানহুইটী এই ;—

১নং গীত ।

তুক—একতারা ।

—:o:—

মাগো! কর আশীর্বাদ, ঘুচি অবসাদ, ঘাতঘাত আর যেন ঘটে না আমার।

ওমা তোমারি আদেশে, মায়া মোহ পাশে, জড়িত হয়েছি সহেনা যে আর ॥

মাগো দেহ কাটি পাশ, পুরাইতে আশ, অধম সন্তানে তরাঙ্ক এবার ।  
 ওমা বারে বারে বয়ে তব ঋণ ভার, হইতেছে ভার, সহিতে আমার ॥  
 মাগো অশোধ্য যে ঋণ, শুধিতে দীন, না পারি বঞ্চিত চরণে তোমার ।  
 ওমা দেহ পদাশ্রয়, মুক্তির আশ্রয়, আসিতে না হয়, সংসারেতে আর ॥  
 মাগো ! তুংহি মুক্তি দাত্রী, তুংহি ত্রাণ কত্রী তুংহি ত্রি মুক্তি সর্বস্ব আমার ।  
 ওমা তব দীন দাসে, অধম পরেশে দিও পদ ছায়া অন্তে একবার ॥

## ২নং গীত ।

সিন্ধু—কাঁকি ।

—ঃঃ—

“জননী জনম ভূমি স্বর্গ হাতে পরীয়সী !

তাই মা তোমারে আর জন্ম ভূমি ভালবাসি ॥

যে ঋণে তোমার কাছে, সন্তানের, কাণ্ড আছে, অসোধ্য সেই ঋণ মাগো !  
 শোধিবারে কে সাহসী ॥ নিজ পরমাত্ম দিগা, পড়িয়া সন্তান হিয়া, তাহাঁলে কিরূপে  
 মাগো শোধিবারে হই প্রসাদী ॥ লালিতে পালিতে নোরে, কত দুঃখ বারে বারে,  
 পেয়েছ জননী তুমি ভাবিলে মরিতে যদি ॥ তুমি মাগো শিফরিত্রী, সত্য তুমি  
 মুক্তিদাত্রী সর্ভক্তি পূজনে মুক্তি, মুক্তি যে ভক্তির দামী । আশীর্বাদ কর মোরে  
 যত দিন এ সংসারে, যে ভাবে রাখেন বিহু যেন তব ভাবে ভাসি ॥ জনম ভূমির,  
 তরে, সদা দেহ পাত করৈ, অন্তে মাগো সেই কোলে লীন হতে অভিলাষী ॥”  
 গান শেষ হইলে সমাগত জনমগুলীর ও পরেশনাথের অনুরোধে আমি  
 বক্তৃত্ব করিতে দণ্ডায়মান হইলাম, তখনকার ভাবে ভাবিত হইয়া শ্রীগুরু  
 রূপায় মাত্ৰ ভক্তি ও আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে আমি যৎ কিঞ্চিৎ বলিলাম,  
 অধিক্ষণ বলিবার সময় ছিলনা এবং পরেশনাথের মাঠ পূজাই সকলকে  
 বুঝাইতে একান্ত মতি হইতে লাগিল, প্রাণে প্রাণে কেবল ঐ মাত্ৰ ভক্ত  
 পরেশ বাবুকেই বলিতে লাগিলাম পরেশনাথ তুমি ধন্য ! তুমি নিজে অনু-

ঠান করিয়া পুত্র পরম্পরা এই সদনুষ্ঠানের বীজ বপন করিয়া যাইবে। তোমার বংশে সকলেই যে মাতৃ ভক্ত হইবে এবং তোমার বংশধরেরা যে এইরূপে সর্বদেব দেবী স্বরূপা জননীর অর্চনায় জীবন জনম সার্থক করিবে তাহার তুমিই একমাত্র জনক। পাঠকগণ! আজও আশীর্বাদ ও পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করি, স্বরে স্বরে পরেশনাথের শ্রায় অকপট মাতৃ ভক্তের প্রকাশ হউক, অমোঘ মাতৃ আশীর্বাদ লাভ করিয়া আর্ধ্য সন্তান অজর অমর ও কীর্তিশালী হউক। প্রিয় পাঠকগণ! এই দৃষ্টান্তটী উল্লেখ করিয়া মাতৃ-পূজার তত্ত্ব ও ফল সকলকে জানানই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। ব্যক্তি বিশেষকে প্রসংশা করিয়া কোনরূপ স্বার্থ বা খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করা ইহার মুখ্যলক্ষ্য নহে। পাঠকগণ! সংসারে যদি পত্নী, পুত্র, কন্যা পরিপূত হইয়া আদর্শ সংসারী হইতে চাও তবে জননীর প্রতি অচলা ভক্তি রাখিও। যদি ধনী হইয়া যশস্বী হইতে কাহারও বাসনা থাকে, মাতৃ বাক্য দৈববানী রূপে অতি সত্য জানে প্রতিপালন করিও; তোমার যশ, তোমার ধন, তোমার প্রতিপত্তি সকলের নিকট আদর্শ রূপে বোঝিত হইবে। যদি সংসার করিতে করিতে পরাংপরা পরমেশ্বরের শ্রীচরণ চিস্তার মধুরতা আশ্বাদন বা দেহান্তে পরাশ্রয় লাভের প্রত্যাশা থাকে, তবে অবিচারে অকপটে প্রীতির সহিত ভগবদ্ভাবে জননীর চরণে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া জননীর পদবুলি মস্তকে ধারণ করিয়া জননীর চরণোদক পান করিয়া সর্বদেব দেবীর পূজা ফল ও সর্ব তীর্থ স্থান ফল লাভ করত অদৃত হও। মাতৃ ভক্তের জয় অবগুস্তাবী, মাতৃ ভক্ত চির সুখী, মাতৃ পূজা পরায়ণ ব্যক্তি দেবতুল্য, সকলের পূজ্য, জয় মাতৃ ভক্তের জয় ॥

শ্রীদীনবন্ধু শর্মা।

# লীলা রহস্য ।

( পূর্ব প্রকাশিতের পর । )

—:—

প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ ! আবিষ্টিচিন্তে ভক্তিতরা প্রাণে মূর্তিমতী ভাল বাসা রূপিনী শ্রীযশোদার কোলে আজ গোকুল বিহারী শ্রীহরির লীলার নিগূঢ় রহস্য আলোচনা করুন ।

পূর্বে বলিয়াছি যে, শ্রীহরির প্রকাশে গোকুলের বালক বৃদ্ধ নর নারীর ঘূমের ঘোর ভাঙ্গিয়া গেল, সকলেরই প্রাণে ভাবের সঞ্চার হইল । ব্রজধাম যেন ভাল বাসার রাজ্য হইল, গোকুলবাসী নর নারী আজ আনন্দভরা প্রাণে আনন্দময় যশোদা নন্দনকে দেখিতে যাইতেছে, দেখিতেছে আর ভাবিতেছে আহা ! এমন জ্যোতি এমন ভাব এমন গঠন তো আর দেখি নাই, মা যশোদে ! তুমি ধন্যা তোমার সন্তানের সাহাস্য বদন নিরীক্ষণ করিয়া আমরাও ধন্য হইলাম ।

যশোদার শ্রীকোমল কোলে থাকিয়া কমল লোচন শ্রীগোবিন্দ সমাগত নর নারীকে ভাবানন্দে মাতাইতেছেন, একবার যে দেখিতেছে সেই আনন্দ বিভোর প্রাণে গোবিন্দের শ্রীমুখ পানে চাহিয়া আছে নয়ন ফিরাইতে পারে না, চক্ষুর নিমিষকালও দর্শন স্নেহের বিরাম দিতে সাধ্য হইতেছে না । নন্দ ভবন হইতে নিরানন্দ চিরদিনের মত চলিয়া গিয়াছে । পরস্পর যশোদার পুত্রের জন্ম বৃত্তান্ত শ্রবণ ও কীৰ্ত্তন করিয়া ব্রজ বাসীগণ অভূতপূর্ব আনন্দ অনুভব করিতেছে—

“নন্দ স্ত্রীভ্রাজ উৎপন্নো জাতাঙ্কাদো মহামনাঃ ।

আহুয় বিপ্রান্ বেদজ্ঞান্ স্নাতঃ স্তচিত্রলঙ্কৃতঃ ॥

বাচরিত্ত্বা স্বস্ত্যয়নং জাতকর্মাঙ্কজ স্যবৈ ।

কারয়া মাস বিধিবং পিতৃদেবার্চনং তথা ॥

আত্মজের জন্ম বৃত্তান্ত শ্রবণে আনন্দান্তঃকরণে মহামনা নন্দ মহারাজ্ঞান করিয়া পবিত্র ভাবে পবিত্র বস্ত্র পরিধান করত পবিত্রাঙ্কুর বেদন্ত্র ব্রাহ্মণগণকে ডাকাইলেন এবং তাঁহাদিগের দ্বারা যথু বিধি বেদ মন্ত্র পাঠ ও স্বস্ত্যয়ণ করিয়া পুত্রের জাত কর্ম সমাধা করিলেন। পরে আনন্দ মনে পিতৃগণের ও দেবগণের যথাবিধি অর্চনা করাইলেন। নন্দ মহারাজ মুক্ত প্রাণে মুক্ত হস্তে শ্রিয়তমপুত্রের মঙ্গল কামনায় দান করিতে লাগিলেন, দানীয় দ্রব্যের সংখ্যা নাই, গো, হুবর্ণ, বস্ত্র ও নানাবিধ অন্নাদি দান করিলেন, দান দুঃখীর দুঃখ দৈন্য দূর করিলেন। শাস্ত্রজ্ঞ ও সাধনা নিষ্ঠ দ্বিজগণের সম্মান করিতে লাগিলেন, আত্মীয়গণকে বস্ত্র ও অলঙ্কার দ্বারা সুশোভিত করিলেন, সকলেই যেন আনন্দময় নন্দ নন্দনের শুভ-কামনায় সকল কামনা ভুলিয়া গিয়াছে। কাঁহারও অশ্রু কথা নাই, গোকুল বাসী গোশ গোপিনীর মুখে কৃষ্ণের রূপলাবণ্যের কথা, মনে ঐ ভুবন ভুলান মধুর রূপের চিন্তা, প্রাণে প্রেমানন্দের উচ্ছ্বাস, কাঁহারও মুখে অশ্রু কথা নাই। ভক্তগণ! আমরা সকলে আশীর্বাদ কর, আমিও যেন উঁহাদের মতন ভাবরাজ্যে ভাবমরকে দেখিয়া ভাল বাসিয়া তাঁহারই প্রেমে তাঁহারই ভাবে তাঁহারই সাধনায় মনের সাধ মিটাইতে পারি।

শ্রীর পাঠকগণ! এইখানে এই লীলার রহস্য ভাবুন। সাধকের প্রাণে যখন ভগবৎ ভাবের সহিত আরাধ্য দেবের আবির্ভাব হয়, তখন তাহার আনন্দের সীমা থাকে না, সাধক তখন নানা প্রকারে দান ও জীবকে আঁহাদি প্রদান করিয়া আন্তরিক পরিতৃপ্তির ভাব বাহিরেও প্রকাশ করেন। ঐ প্রার্থনীয় সুখ যাহাতে নষ্ট না হয়, তাহার জন্ত সংলোকের সঙ্গ করেন, বেদন্ত্র ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সত্বগুণ প্রধান ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি স্বস্ত্যয়ণ অর্থ ভাবের বৃদ্ধি ও ভাবের পুষ্টি ঐরূপ সংলোকের সঙ্গ না লইলে গুরু ও ভগবৎ কৃপায় প্রাপ্ত ভাবন রক্ষা হয় না। যে সাধক এই কৌশল জানেন, তাহার ক্রমোন্নতি অবশুস্তাবী আশ্রমে সাধক কিছু মাত্র ভাব পাইয়াই একবারে ধরাকে সরার ন্যায় জ্ঞান করার মত নিজের মহিমা নিজের সাধন ও নিজের ক্ষমতার বিষয় প্রকাশ করিয়া গুরুগিরি বা লাভ পূজা ও প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা করে তাহারই অধঃপতন হয়। এই অত্যাশঙ্ককীয় সাবধানতা ও সংসঙ্গের আবশ্যিকতা শিখাইবার জন্যই

ভগৎ শক্তিতে শক্তিমান মহামনা নন্দ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ দ্বারা জন্মোৎসব সমাধা করিলেন ইহারই নাম জাত কৰ্ম্ম। ভাবজন্মাইলেই হয় না, রক্ষা করা চাই। আমরা ভাব রক্ষা করিতে পারি না বলিয়াই, কদাচিৎ প্রাপ্ত ভাব যেমন আশে অমনি মৃত বৎসার সন্তানের ন্যায় অদৃশ্য হয়।

এইরূপে ভাবের পুষ্টির জন্ত সংসদ করিতে করিতে যখন দেহাদি রক্ষার আবশ্যক বা সময় হইবে, তখন সাধকের কর্তব্য পালনে পরাশ্রুত হইলে চলিবে না, এই সুশিক্ষা দিবার জন্যই বোধ হয় এই সময় নন্দ মহারাজ দানাদি কৰ্ম্ম ও পিতৃদেবার্জনাদি সমাধা করিয়া কি করিলেন একবার নিব্বিষ্টচিত্তে আলোচনা করুন।

গোপান্ গোকুলরক্ষায়ৈ নিরুপ্য মথুরাং গতাঃ ।

নন্দঃ কংসশ্চ বার্ষিক্যং করং দাতুং কুরুদুবহ ॥

শুকদেব বলিলেন, হে কুরুকুলতিলক মহারাজ পরীক্ষিত ! নন্দরাজ গোকুল রক্ষার নিমিত্ত সুযোগ্য গোপগণকে নিযুক্ত করিরা কংসের বার্ষিক কর প্রদানার্থ নানাবিধ উপায়ে দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া বন্ধুগণ সমভিবাহারে মথুরাধামে কংসালয়ে গমন করিলেন, তথায় যাইয়া যথা যোগ্য কর প্রদান করিয়াই বহুদেবের নিকট গমন করিলেন, মহামনা বহুদেবও আনন্দিতচিত্তে নন্দরাজের সমাদর করিলেন।

“বহুদেব উপশ্রুত্য ভ্রাতরং নন্দমাগতাং ।

জাহ্নাদন্তকরং ব্রাজে যযৌ তদবমোচনাং ॥

মহামনা বহুদেব নন্দ সমাগম শ্রবণ করিয়া এবং কংসের কর প্রদান করা হইয়াছে শুনিয়া প্ৰীত মনে প্রিয়তম ভ্রাতা নন্দ রাজকে সন্তুষ্ট করিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন।

তং দৃষ্ট্বা সহসোখায় দেহঃ প্রাণ মিবাগতাং ।

প্ৰীতঃ প্রিয়তমং দোভ্যাং সমজে শ্ৰৈমবিস্কলঃ ॥

নন্দরাজ বহুদেবকে দেখিয়া দেহে প্রাণ কামিলে যেরূপ দেহ সতেজ ও পুলকিত হয়, সেই রূপ আনন্দ বিহ্বলপ্রাণে প্রিয়তম বহুদেবকে বাহু প্রসারিত করিয়া আলিঙ্গন করিলেন।



পূজিত সুখমাসীনঃ পৃষ্ঠানাময় মাদৃতঃ ।

ঐসক্তধীঃ স্বাস্ত্রজয়ো রিদমাহ বিসাম্পতে ॥

বহুদেবও নন্দকে যথাযোগ্য মন্দের করত নন্দ ভবনে লালিত নিজ তনয়-  
দ্বয়ের ( কৃষ্ণ ও বলরামের ) সুখ সম্বাদ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং নানাবিধ প্রশ্ন  
করিতে করিতে মহাস্য বদনে শব্দের সহিত ধর্মতত্ত্ব বিষয় আলোচনা করিতে  
লাগিলেন । বহুদেব বলিলেন—

দৃষ্টিভ্রাতঃ প্রবয়স ইদানীমপ্রজয়তে ।

প্রজাশয়া নিবৃত্তত প্রজা যঃ সমপদ্যত ॥

হে ভ্রাতঃ ! সম্ভান হইবার কাল অতীত হইলেও আশাশীত ভাবে আপনার  
একটি সুসম্ভান হইয়াছে, ইহা আমাদের পরমসুখের বিষয় এবং আপনারও  
বহুভাগ্যের ফল ।

নৈকত্র প্রিয় সংবাসঃ সুহৃদাং চিত্রকর্মণাং ।

ওষেন বৃহ্যমানানাং লবানাং শ্রোতসোযথা ॥

হে প্রিয় ! জলের বেগে চালিত তৃণ যেমন কখন কখন একত্র হয়, আবার  
বিযুক্ত হইয়া নানাস্থানে চলিয়া যায়, তদ্রূপত সংসারের বিচিত্র ব্যাপারে প্রায়ই বন্ধু-  
বান্ধব বহুকাল একত্র বসতি করিতে পায় না । চিরদিন একত্র থাকিতে পারে না ।

পুংস্তুবিগৌবিহিতঃ সুহৃদোহ্যনুভাবিতঃ ।

নতেষু ক্রিষ্ণ মানেষু ত্রিবর্গোহর্থায় কল্পতে ॥

কিন্তু হে প্রিয় ! যতদিন একত্র থাকিতে হয় ততদিন বন্ধু বান্ধবগণকে কষ্ট  
না দিয়া ধর্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গ রক্ষা করিতে হয় বন্ধুগণের প্রাণে কষ্ট দিয়া  
চিত্তকে চঞ্চল করত শর্তানুষ্ঠান করিলে ধর্মও হয় না এবং ধর্মের লক্ষ্য যে ভগ্নবৎ  
প্রাপ্তি বা মুক্তি তাহাও হয় না । যখন যেখানে থাকিতে হইবে তাহাদিগকে সুস্থ  
করিয়াই হির, চিত্তে শর্তানুষ্ঠান করিতে হয় । তুমি যে রাজার কর দিয়া নিরুপদ্রব  
হইলে ইহা অতি উত্তম কার্য হইয়াছে ; কর্তব্যকর্মের প্রতি অবহেলা করিলে  
অমঙ্গল হয় ।

নন্দ উবাচ ।

অহোতে দেবকী পুত্রাঃ কংসেন বহবোহতাঃ ।

একাবশিষ্টাবরজা কত্মা সাপি দিবং গতা ॥

বসুদেব প্রিয় বন্ধু নন্দকে এইরূপ উপদেশ দিলে পর নন্দও তাঁহার উপদেশে প্রীত হইয়া বলিতে লাগিলেন । হে ভ্রাতঃ ! কি দুর্ভাগ্য দেবকী হইতে তোমার বহু পুত্র হইয়াছিল কিন্তু দুষ্টাস্তঃকরণ কংস সে সকলকেই বিনাশ করিয়াছে । একটা কনিষ্ঠা কত্মা জন্মিয়াছিল সেও কংসের অত্যাচারে স্বর্গে গমন করিয়াছে ।

ননং হৃষ্টনিষ্ঠেয় মদৃষ্ট পরমো জনঃ ।

অদৃষ্টে মাস্ত্বন স্তত্ত্বং যোবেদ ন মুহতি ॥

কি করিবে ভাই, সকলেই অদৃষ্টের বাধ্য । মানুষ আপন কৃত কর্মের ফলরূপ অদৃষ্ট দ্বারাই সুখী ও দুঃখী হয়, সুখ দুঃখের একমাত্র দাতা নিজেই যে ব্যক্তি এই নিজ কর্মতত্ত্ব জানে সে কখনও অধঃপতিত হয় না এবং প্রাপ্ত কার্যের ফলাফলে ব্যতিব্যস্তও হয় না ।

বসুদেব উবাচ ।

করোবৈ বার্ষিকো দস্তো রাজ্ঞে দুষ্টাবয়ক্ৰবঃ ।

নেহহেয়ং বহুতিথং সন্ত্যং পাতাশ্চ গোকুলে ॥

বিশুদ্ধ সত্ত্ব স্বরূপ বসুদেব জ্ঞানানন্দ স্বরূপ নন্দের বাক্যে প্রীত হইয়া বলিলেন, 'আচ্ছা ভাই কংসকে কর দেওয়া হইয়াছে আমাদের সহিত দেখা হইল, আর বৃথা সময় নষ্ট করিও না শীঘ্র গোকুলে গমন কর, তুমি তথায় সর্ষদাই থাকিবে কারণ গোকুলে অনেক উৎপাত হইবার সম্ভব ॥

ইতি নন্দাদয়ো গোপাঃ প্রোক্তান্তে শৌরিণা, যয়ুঃ ।

অনোভি রনভৃদ্ যুক্তৈঃ তমনুজাপ্য গোকুলং ॥

এই ভাবে বসুদেব ও নন্দ পরস্পর আলোচনার পর বসুদেবের অজ্ঞানুসারে নন্দাদি গোপ সকল সকটে আরোহন করিয়া গোকুলে গমন করিলেন ।

প্রিয় পাঠকগণ এক্ষণে বসুদেব ও নন্দের আলোচিত প্রত্যেক কথার তাৎপর্য আলোচনা করুন ।

ক্রমশঃ—

শ্রীদীনবন্ধু শর্মাঃ ।

# সাক্ষ্য গীতি গৌরচন্দ্র ।

—:—

## সংকীৰ্ত্তন চপ্ ।

আহা কি মনোহর গৌরকিশোর আরতি ।

হেঁরিন্ধা ঐ আরতি, জন্মে রতি, যুগলভাবে ঐ মুরতি ॥

দক্ষিণে নিত্যনন্দ, দাঁড়য়ে সদানন্দ, অষ্টদ্বত নিরানন্দে সযুখে ক'রেছেন স্থিতি ।

বামেতে গদাধর, মরি কি সুন্দর, শ্রীবাসাদি চামর ঢুলাইছেন হ'রে প্রীতি ॥

ছাদশ সখাগণে, দাঁড়য়ে হুঁষ্ট মনে, শ্রীসরূপ আদিসবে সখীভাবে সেবার সাধি ।

মহাস্তগণেধ্যানে, গোপামীরা হেরেন ক্রানে, ঠাকুর শ্রীমনোহর হেরনয়ন সবার প্রতি ॥

ফুলেরমালা গলায়দোলে, হেরিলে মনভুলে, সুগন্ধে মনানন্দে ভক্তবৃন্দে করেন স্ততি ।

কোটি কোটী শশধর, জিনি বদন সুন্দর, সুধাপানে সুধার পানে,

বারে বারে বাড়ায় রতি ॥

নবদ্বীপ সুধাকর, পাশে তারকানিকর, সংকীৰ্ত্তন সুধাদানে জীবনধের করেন গতি ।

শ্রীপদ যুগলে আশ, শ্রীবিপিনবিহারীদাস, যত কলুষ নাশ, ছদয়ে ক'রে বসতি ॥

## স্ততি গীতি ।

একতারা ।

শ্রীরাধারমুণ্ণ দিও শ্রীচরণ যখন মুদিব যুগল নয়ন ।

বিপদে সম্পদে, বাসক'রে ছদে, মন সাধ মম করহ পূরণ ॥

পিব নাম সুধা পিয়াসা কেবল, নয়নে হেরিব মুরতি যুগল,

নমিব ভজিব হইব শীতল, বিরলে সেবিব যুগলরতন ।

বিধমাবে হরি আসি যতবার, বিমল কিরণে হরছে আঁধার,

হাসিমুখে যেন হেরি হে দৌহার গোপীভাবে ভাবি এই নিবেদন ।

রীতি নীতি দুটা দিও রাখাশ্যাম, রীতিমত যেন পূর্ণ হয় কাম,  
 দানকর দয়া হ'ওনা হে বাম, এ পতিতজনে পতিতপাবন ।  
 সতত বাসনা শুন হে শ্রীহরি, যুগলরূপ যেন নয়নে নেহারি,  
 স্যোষণা রমনায় হরি হরি করি, যেন জাহ্নবী জীবনে ত্যজি এ জীবন ।

দীন হীন—

শ্রীবিপিনবিহারী দাস ।

## শ্রীজয়দেব গোস্বামী ।

—:—

মাগর উপকূলে কেন্দুবির নামক গ্রামে ভক্ত কবি শ্রীজয়দেব গোস্বামী ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । ইঁহার পিতার নাম ভোজ দেব ও মাতার নাম বামা দেবী ছিল । জয়দেব গোস্বামী শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের আবির্ভাব হইবার বহুপূর্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ; কারণ শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু তাঁহার রচিত ( গীত গোবিন্দের মূললিত কবিতা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতেন । যথা—

“বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ ।

এই তিন গীতে করায় প্রভুর আনন্দ ॥”

চৈতন্ত চরিতামৃত ।

যৌবনের প্রারম্ভে পাণ্ডিত্য বুদ্ধিবলে ভক্তি গ্রন্থাদি পাঠ শেষ করিয়া ছিলেন । ঐ বয়সে তাঁর বৈরাগ্যানল তাঁহার হৃদয় মধ্যে হতাশনের স্থায় প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল তিনি সংসার আশ্রমে বীতরাগ হইয়া কাস্তা করঙ্গ ধারণ করিয়া জন্মের মত বাটী হইতে বহির্গত হইলেন । বহু তীর্থাদি ভ্রমণ করিয়া অবশেষে শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে উপনীত হইলেন । তথায় তিনি তৃণাপেক্ষা নীচ হইয়া নিম্নতেন্দ্রিয় অবস্থায় সাধন ভজন আরম্ভ করিলেন, এবং কঠোর বৈরাগ্যের ব্রত সকল পালন করিতে লাগিলেন । ক্রমে তাঁহার হৃদয়ে ভক্তি ও প্রেমের বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া, হৃদয়ের

ধৈর্য, বিবেক, প্রীতিফুলগুলি প্রক্ষুটিত হইতে লাগিল। কিছুদিন পূর্বে একজন ব্রাহ্মণ অপত্যবিহীন অবস্থায় অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া, পুত্রকামনায় অতি দীন ভাবে শ্রীজগন্নাথ দেবের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন এবং প্রতিক্ষা করিলেন, “প্রভো! আমার প্রথমেই যে পুত্র কিম্বা কন্যা জন্মগ্রহণ করিবে, আপনার পরিতোষের জন্ত শ্রীচরণে সমর্পণ করিব।” শ্রীজগন্নাথ দেব ব্রাহ্মণের প্রার্থনায় পরিতুষ্ট হইলেন, কিয়ৎকাল পরে ঐ ব্রাহ্মণ পত্নী গর্ভবতী হইয়া একটা রূপবতী কন্যা প্রসব করিল। কছারত্ব দিন দিন শশি কলার স্থায় পরিবর্তিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ কন্যার প্রকৃত পদ্মের ন্যায় রূপ দেখিয়া পদ্মাবতী নাম রাখিলেন। কন্যাটির যখন শৈশবাবস্থা উত্তীর্ণ হইল, ব্রাহ্মণ তাহাকে লইয়া শ্রীজগন্নাথ দেবের নিকট সমর্পণ করিলেন। শ্রীজগন্নাথ দেব স্বপ্নাবস্থায় আদেশ করিলেন “কিয়ৎদূরে জয়দেব নামক একজন উদাসীন ভক্ত আছেন এই কন্যা লইয়া তাঁহাকে সমর্পণ কর, তাহা হইলে আমার দাসী ভাবে গ্রহণ করা হইবে।”

ব্রাহ্মণ প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া তৎক্ষণাৎ সন্ন্যাসী জয়দেবের নিকট উপনীত হইয়া, শ্রীজগন্নাথ দেবের আজ্ঞা বলিলেন। জয়দেব গোস্বামী চিরদিনই বিরক্ত উদাসীন, তিনি প্রভুর আজ্ঞা শুনিয়া চমকিত হইলেন, এবং বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, হায় প্রভু! কেন আমায় এমন বিড়ম্বনায় ফেলিলেন, কেনই বা আমার প্রতি নির্দয় হইলেন। আমি না হয় তাঁহার এদেশ হইতে দূরে পলায়ন করিব, তবুও আমি বিবাহ স্ত্রে আবদ্ধ হইব না। অবশেষে ব্রাহ্মণকে বলিলেন, তুমি কন্যা লইয়া যাও, আমার কন্যাতে প্রয়োজন নাই।

“কন্যা লয়্যা যাও তুমি মোর কাজ নাই।

বরঞ্চ তাঁহার দেশ ছাড়িয়া পলাই।

ভক্তমাল।

ব্রাহ্মণ তাঁহাকে শ্রীজগন্নাথ দেবের আজ্ঞা পালন করিবার জন্ত অনেক বুঝাইতে লাগিলেন। অবশেষে ব্রাহ্মণ বিরক্ত হইয়া তাঁহার সহিত বহু তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন, কিন্তু জয় দেব গোস্বামী তথাপি কন্যা গ্রহণ করিলেন না। ব্রাহ্মণ

উপায়ান্তর না দেখিয়া কল্যাণকে কহিলেন, “পদ্মাবতী ইনি তোমার স্বামী, তুমি ইহার কাছেই থাক” এই বলিয়া তিনি তথা হইতে চলিয়া গেলেন। পদ্মাবতী সেই সাধুর নিকটে বসিয়া থাকিলেন। অনন্তর জয় দেব কহিলেন, “তোমার এখানে কি প্রয়োজন? তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও।” তখন সেই কল্যাণ ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, প্রভু! জগনাথ দেবের আজ্ঞায় পিতা আমাকে আপনার চরণে সমর্পণ করিয়াছেন, অতএব আপনি আমার স্বামী, আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আপনি যদি আমাকে পরিত্যাগ করেন; আমি আপনার চরণ ছাড়িব না; এবং উহাই কায়মনোবাক্যে সেবা করিব। জয় দেব গোস্বামী কল্যাণের সাক্ষর রোদণে দয়াদ্রু চিত্ত হইয়া, মনে মনে নানা বিচার করিতে লাগিলেন। শ্রীজগনাথ দেবের ইচ্ছা কখনও অগ্রাথা হইবার নয়; বোধ হয় তিনি আমাকে মায়া বন্ধনে এবার বন্ধন করিলেন। তিনি ইচ্ছাময় সূতরাং তাহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

যাহা হউক তিনি নানা চিন্তা করিয়া অবশেষে তাহাকে গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন তিনি সেই স্থানে একটা পর্ণশালা বান্ধিয়া, সেই কুটীরে শ্রীশ্রীরাধা মাধব ঠাকুর প্রকাশ করিলেন। পদ্মাবতীকে রাধা মাধবের সেবায় নিযুক্ত করিলেন। পদ্মাবতী অদ্ভুত প্রেম ভক্তিভাবে রাধা মাধবের সেবা করিতে লাগিলেন। বোধ হয় প্রভু বিচার করিয়াই যেমন দেবা তেমনি দেবী সংঘটন করিয়া দিলেন। তিনি স্বামীর মত শুদ্ধ প্রেমিকা ছিলেন। জয়দেব গোস্বামী একদিন রাধা মাধবের সৌন্দর্য্যে মোহিত হওয়ার তাহার কবি কল্পনা বৃদ্ধি প্রবল হইয়া শ্রীগীতগোবিন্দ নামক গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কবি জয়দেব খণ্ডিতা মধুর রস বর্ণনা করিতে গিয়া কিছু সন্দিক্ধ চিত্ত হইলেন, কারণ সুকুমার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে শ্রীরাধার চরণে ধরাইতে কিছু তুংখ বোধ করিলেন। তিনি ব্যাকুলান্তঃকরণে পুঁথি বন্ধ করিয়া স্নান করিতে গেলেন।

রসিক শেখর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তখন জয় দেবের রূপ ধারণ করিয়া বৃহৎ প্রবেশ করিলেন। পদ্মাবতী কহিলেন, “এই মাত্র স্নান করিতে বাহির হইলেন, আবার কি জন্ত ফিরিয়া আসিলেন?” জয়দেবরূপী শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, “স্নান করিতে গিয়া একটা শ্লোক মনে পড়িল লিখিয়া যাঁই”।

যলিয়া রসিক শেখর নিয়ের শ্লোকটী পুঁথিতে লিখিয়া ক্রুৎগতি চলিয়া  
গেলেন।

স্মর গরল ধওনঃ মম শিরসি মওনঃ

দেহি পদপল্লব মুদারং ।

জ্বলতি ময়ি দাক্ষণ্যে মদন কদনানলো

হরতু তত্পহিত বিকারং ॥

শ্রী গীতগোবিন্দম্ ১০ম সর্গ ।

অনতি বিলম্বে জয়দেব গোস্বামী স্নানাদি সমাপন করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। পদ্মাবতী চমকিত হইয়া কহিলেন, “আপনি এইমাত্র গ্রন্থ লিখিয়া গেলেন, আর ইহার মধ্যে কিরূপে স্নান করিয়া আসিলেন। সমুদ্র এখান হইতে প্রায় অর্ধক্রোশ দূর। এই সময়ের মধ্যে কি প্রকারে গমনাগমন করিলেন? আমার মনে নানা প্রকার সন্দেহ উপস্থিত, অতএব সবিশেষ বলুন।” জয়দেব গোস্বামী পদ্মাবতীর কথায় আশ্চর্যগোচরিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, বোধ হয় প্রভু ইহার ভিতর কিছু গুঢ় খেলা খেলিয়াছেন। অনন্তর তিনি মহা সন্দীপ্ত হইয়া পুঁথি খানি খুলিয়া দেখিলেন যে, গ্রন্থ মধ্যে কয়েক পংক্তি ঝলমল করিতেছে। তখন তিনি ভক্তি গদ গদ ভাবে, অশ্রুসিক্ত নয়নে, রোমাঞ্চিত কলেবরে, প্রেম বেশে পুঁথি খানি হৃদয়ে রাখিয়া অর্ধক্ষুট স্বরে, পদ্মাবতীর করে ধরিয়া কহিলেন, “এ জগতে তুমিই ধন্য, তোমার জীবন সফল হইয়াছে, কারণ তুমিই তোমার হৃদয় স্বামীকে যথার্থ নয়ন গোচক করিয়াছ।” গীতগোবিন্দের সেই অলৌকিক ঘটনা সকল স্থানে প্রচার হইয়া পড়িল।

কিয়ংকাল পরে শ্রীশুক্লযোতম ক্ষেত্রের রাজা কি ভাবিয়া আপনি এক খানি গীত গোবিন্দ রচনা করিলেন এবং অমাত্যগণকে প্রচার করিতে আদেশ করিলেন। সভাস্থ পণ্ডিতগণ রাজার আদেশ শ্রবণে কহিলেন জয়দেব গোস্বামী রচিত গীত গোবিন্দ প্রভুর অতিশয় প্রিয়, তাহার বর্ণনা মধুর ও সুন্দরিত। সে গ্রন্থ পাঠ করিলে কেহ ইহা পাঠ করিবে না।” রাজা সভাস্থজন মণ্ডলীর এই কথা শ্রবণে, পরীক্ষার কারণ শ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরে •

গমন করিলেন। শ্রীজগন্নাথের শ্রীচরণে দুইখানি গ্রন্থ রাখিলেন। জগন্নাথদেব জয়দেব গোস্বামীর কৃত গ্রন্থ খানি তুলিয়া হৃদয়ে ধারণ করিলেন। কৃত গ্রন্থ তদবস্থায় রহিল। তখন রাজা অত্যন্ত অভিমানিত হইয়া সাগর সলিলে ঝাঁপ দিয়া তুচ্ছ জীবন ত্যাগ করিব সংকল্প করিলেন। শ্রীজগন্নাথদেব রাজাকে নিজ ভক্ত জানিয়া দয়াদ্র হইয়া স্বপ্নাবেশে কহিলেন “জয়দেব কৃত গীতগোবিন্দের দ্বাদশ স্বর্গের প্রথমের প্রথমের রচিত বার শ্লোক থাকিবে।” রাজা ইহাতে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। জয়দেব কৃত শ্রীগীতগোবিন্দ কাব্য জগতে এক অতি মধুর মূললিত সৃষ্টি। প্রেম জগতে মধু চক্রের স্রাব। প্রেমিক ভক্তগণ ইহার মধু পান করিয়া মত্ত হইয়া উঠেন। প্রেমিক চুড়ামণি, রসিক শেখর শ্রীকৃষ্ণ তিনিই এই মধুপান করিবার একমাত্র অধিকারী। শ্রীক্ষেত্রে কোন এক মালীর কণ্ঠা বাতাকু ক্ষেত্রে বাতাকু তুলিতে তুলিতে আনন্দ মগ্ন চিত্তে জয়দেব কৃত গীত গোবিন্দেব একটী গীত গান করিতেছিলেন। রসিকবর শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়তমা শ্রীরাধিকার গুণগাণে মোহিত হইয়া শ্রীমন্দিরে আর থাকিতে পারিলেন না। প্রেমিক চুড়ামণি গোপনে কণ্ঠার পশ্চাৎ হইতে গান শ্রবণ করিতে লাগিলেন। আসিবার সময় কোমল শ্রীপাদপদ্মে শিলাও কঙ্করাদি ফুটিতে লাগিল ও কণ্টকে শ্রীঅঙ্গের বস্ত্র সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া জড়াইয়া গেল। পাণ্ডাগণ মন্দিরে আসিয়া তাঁহার বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি ছিন্ন ভিন্ন দেখিয়া মহা চিত্তিত হইয়া রাজার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। ভক্ত রাজা আসিয়া বেশ দর্শনে অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কাতরে কহিলেন, প্রভু! আপনি কি অভাবে কোথায় গিয়াছিলেন? আহা! আপনার শ্রীচরণে কতই বেদনা বোধ হইতেছে। এ দাস সম্মুখে থাকিতে কেন আত্মা করিলেন না। এ জীবন আপনার কার্যে যদি ত্যাগ করিতে হয় এখনই প্রস্তুত আছি। শ্রীজগন্নাথ দেব রাজার কাতরোক্তি শুনিয়া স্নায়াদ্র চিত্ত হইলেন, এবং নিশাকালে স্বপ্নাবেশে কহিলেন “মালী কণ্ঠা যখন গীত গোবিন্দ পড়িতেছিল আমি তখন ভাগ্য শুনিতে গিয়াছিলাম। আসিবার সময়ে তাঁহার বেগুণ বাড়ীতে আমার বস্ত্র জড়াইয়া গিয়াছিল।”

ক্রমশঃ।

শ্রী :-



শ্রী শ্রীরাধারমণে জয়তি ।

## ভক্তি ।

৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা—৮ম বর্ষ ।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বপিনী ।

ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্ত্য জীবনম্ ॥

## প্রার্থনা ।

বাঙ্কাকল্পতরো দেব ! ভক্তিং দেহি হি প্রভো ।

ত্বদন্যো দীনদৈন্যার্তি-হারকো নাস্তি কশ্চন ॥

ত্বমেব জগতাং নাথ ত্বমেব বিশ্বভাবন ।

ত্বমেব হর্তা কঠাচ কৃপালুস্বং জগন্ময় ॥

হে বিশ্বজীব-জীবন ! তুমি নিয়তই জীবের সহিত খেলিতেছ, যত দিন জীব তোমার খেলা না বুঝিতে পারে ততদিন তাহার নিজ কৰ্মকল অবলম্বনে বিধ-নিয়ন্ত, শক্তিশারা মুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ, ভাল মন্দ ভোগ দিয়া জীবকে নাচাও । তোমার খেলা অনুভব করিয়া তোমাতে আশ্রয় সমর্পণ করিতে পারিলে জীব কৰ্ম ও কৰ্মফল ভোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি পায়, তখন কেবল তোমার প্রেমের খেলারই অনুভব হয় । তোমার খেলা তোমার প্রিয় ভক্ত-ভিত্তি অস্ত্রে বুঝিতে, জানিতে ও অভ্যাস করিতে সমর্থ হয় না ; তুমি বাহ্যকে বিশ্বজীব, তুমি বাহ্যকে তোমার

অনুভবময় ভাবে অনুপ্রাণিত কর, তুমি যাহাকে আপন করিয়া লও, সেই নব্যভক্তি তোমাতে আশ্রয় সমর্পণ করিয়া তোমার শক্তিবলে তোমার কর্তব্যের সুকৌশল অনুভব করিতে সমর্থ হয়। হে মঙ্গলময়! তুমি না বুঝাইলে অনন্তকাল জ্ঞান বিচার ও সাধনাদি দ্বারাও তোমার লীলার বিমাত্র সম্ভা কেহ বুঝিতে পারে না। রূপাময়! রূপাংশে দীনের ভাবনেত্র প্রকাশ করিয়া দাও; জগৎ ভরা তোমার খেলা অনুভব করি। সদানন্দ লাভ করি। আশীর্বাদ কর, শক্তিদাও, বিপদের স্বাত প্রতিষেধে যেন একভাবে থাকিতে পারি, সুখে ও দুঃখে সমভাবে যেন তোমায় ডাকিতে পারি, সংসার অতি ভয়ানক স্থান। অতি কষ্টে তোমার নিকট কান্দিয়া কান্দিয়া যে ভাব টুকু লাভ করি, ধন্য না হইতে হইতে, ভাবে না মজ্বিতে মজ্বিতে এমন এক একটা বিক্ষেপ উপস্থিত হয় যে, তাহার অত্যাচারে সকল পরিশ্রম, সকল আশা একেবারে নির্মূল হয়। হে দয়াল! এই ভাবে আর কতকাল উঠিব না মিব, আর যে ওঠা নামার ক্রেশ সহ হয় না, যাহারা তোমায় একেবারে ডাকে না, তাহারা তোমার নামে, তোমার প্রেমে, তোমার ভাবে যে কি সুখ, তাহা অনুভব করিতে পারে না, সুতরাং এক রকমে থাকে; কিন্তু নাথ! ডাকিয়া, ভাবের আভাস পাইয়া, যাহারা বিক্ষিপ্ত হয় তাহাদের বড়ই দুঃখ, তোমার রূপায় তোমায় ডাকিয়া সুখের আশা পাইয়াছি, তোমায় ভাবিলে, তোমাতে ভালবাসা আসিলে, জীবন জুড়ায় বিশ্বাস আসিয়াছে, তাই বিক্ষিপ্ত হইলে বড়ই ব্যথা পাই। দুঃখ হামিন্! আর ব্যথা দিওনা, বিক্ষেপ দূর কর, বিপদ সরাইয়া দাও, অভাব মোচন হউক; না হয় বিক্ষেপ দ্বিপদ ও অভাব অবাধে সহ করিবার সমর্থ্য দাও, তোমায় কান্দিলে তোমার রূপ রসিকে চাহিয়া তোমার করুণাকণা কামনা করিতেছে, দেখ' যেন বাহ্যিক অস্তুর নিকট দীনের কাতর প্রার্থনা বিফলে না যায়।

দীনবন্ধু শর্মা।

## দম্পতী দর্পণ ।

—:—

দ্বিগুণ পাঠক পাঠিকাগণ! আপনাদিগের নিকট একটি গৃহস্থ চিত্র উপস্থিত করিতেছি, এ চিত্রপটে দ্বৈগুণবন্ধু একান্ত প্রেমজননীর বিষয়ই অঙ্কিত করিতে

বহু করিব, আশী—আদর্শ চিত্র দর্শনে যদি গৃহস্থ দম্পতী পবিত্র চেতা ও সংযমী হয়, তবে সীহজেই তাহাদের ভগবদ্ভক্তি লাভের প্রবল ইচ্ছা হইবে এবং অল্প-কালমধ্যে পতি পত্নী একাগ্রতা ও সংযমের বলে পরমেশ্বর সত্ত্বা উপলব্ধি করিয়া রুতার্থ হইতে পারিবে। গৃহস্থকে ধর্মালোচনায় আকৃষ্ট করা ও ভগবদ্ভক্তি লাভের অধিকারী করাই এ চিত্রের প্রধানতম লক্ষ্য, তবে জ্ঞানি না আমার এই চিত্রে অভিলষিত ফল ফলাইতে পারিবে কি না, শ্রীভগবৎ রূপাই লেখকের একমাত্র অবলম্বন ও সম্বল। শ্রীভগবান আমাদের মানসিক শান্তি বিধানের নিমিত্ত যদি সং প্রবৃত্তি দেন এবং সরল ভাষায় আবগুকীয় বিষয় যদি প্রকাশ করিতে পারি তবেই মঙ্গল। পাঠক পাঠিকাগণ, রূপা করিবেন এবং আশা করি, ভাষার দিকে একান্ত লক্ষ্য না রাখিয়া প্রতিপাত্ত বিষয়ের ও ভাবের প্রতিই লক্ষ্য রাখিবেন।

পতি পত্নীর কর্তব্য, শ্রোতব্য ও জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত করিব এই আশা করিয়া ইহাকে দম্পতী দর্পণ নাম দিলাম। দর্পণে যদি ভাষার কাঠিন্য ও অসংলগ্নাদি দোষরূপ আবর্জনা থাকে, তবে পাঠকগণ সরলতা, অদোষ দর্শিতা ও গুণযাহিতারূপ মার্জিত বস্ত্রে পরিষ্কৃত করিয়া ইহাতে ধর্মদম্পতীর রূপদর্শন করিবেন ইহা একান্ত প্রার্থনীয়।

প্রবোধ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক পবিত্রচেতা ব্রাহ্মণ কুমার যজ্ঞো-পবীত সংস্কারের পর হইতেই কিছুদিন ব্রহ্মচর্য্যে থাকিয়া সংস্কার নিকট সাধন তত্ত্ব ও বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া গুরুর আদেশে ও পিতামাতার প্রার্থনায় গৃহে প্রত্যাগত হইয়াছেন, প্রবোধ নামানুরূপ গুণশালী ও শাস্ত্র স্বভাব হইয়া সকলেরই প্রীতি বর্দ্ধন করিতেছেন, সকলেই প্রবোধের গুণে মোহিত ; প্রবোধের যেমন মেধা, যেমন প্রিয় দর্শনমূর্ত্তি, তেমনই সরল ভাষায় শাস্ত্রের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া প্রবোধ আত্মীয় স্বজন ও বাহুবংশের মনে এক অনুরূচনীয়া পবিত্র ভাবের উদয় করিয়াছেন। সদাচারের একান্ত পক্ষপাতী প্রবোধ একবার যাহার সহিত আলাপ করিতেছেন তাহাকেই সং পথের পথিক করিয়া সং সঙ্গের মহিমা প্রত্যক্ষ দেখাইতেছেন, অল্পদিনের মধ্যে প্রবোধ আদর্শ পুরুষ বলিয়া মান্ত্য পাইতেছেন। সাধু সঙ্গ, শাস্ত্র অধ্যয়ন ও সাধন ভজন করায় প্রবোধের সংযমই স্বভাব, সুতরাং বিবাহ করিতে ইচ্ছা না থাকিলেও বহু

বান্ধবগণের এবং পিতা মাতার একান্ত অনুরোধে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন, প্রবোধের রূপ ও গুণের কথা প্রচার হওয়ায় বিবাহের প্রস্তাব করিবার মাত্রই সম্মত হইল, কারণ অনেকেই সংপাতে কল্যাণ করিয়া কল্যাণে হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে বাসনা করেন, সুতরাং সুশিক্ষিত শাস্ত্রমতাব যোগ্য পাত্র পাইলে অনেকে কৃতজ্ঞ হন ইহা আর বিশেষ করিয়া বলিতে হয় না। রত্ন কাহাকেও অন্বেষণ করেনা রত্নকেই লোকে চায়। প্রবোধ পাত্র-রত্ন, সুতরাং পূর্ক হইতেই অনুসন্ধানকারী কল্যাণকরণ সংবাদ পাইবামাত্রই আমি আগে আমি আগে করিয়া সম্মত হইব করিল।

পাত্রী স্থির হইল, বিবাহের দিনও স্থির হইল। কিন্তু প্রবোধ কিছু অস্থির চিত্ত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, আমাদের সমাজে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ করিয়া বিবাহ করিবার প্রথা নাই, অথচ যাহাকে বিবাহ করিব তাহাকে লইয়াই ঘাষজীবন হয়তো একত্র থাকিতে হইবে, কপেরদিকে না চাহিলেও অনুরূপ গুণ দেখিয়া যোগ্যযোগ্য বিচার করিয়া বিবাহ করা যে ধর্ম বিরুদ্ধ ইহাতো আমার বিবেচনায় আসে না। কি করি, মঙ্গলময় যাহা করিবেন তাহাই হইবে; আমি যদি বান্ধবগণের প্রথার বিরুদ্ধে কল্যাণ দেখিয়া কল্যাণ সহিত কথোপকথন করিয়া বিবাহ করিতে যাই, তবে সাধারণের মধ্যে একটা তীব্র সমালোচনার প্রস্রবণ উঠিতে থাকিবে, দেখা যাইউক কি হয়, এইরূপ ভাবিয়া প্রবোধ দেব মন্দিরে বসিয়া প্রার্থনা করিতেছেন। ভগবানের নিকট প্রার্থনা প্রবোধের সকল কার্যের অকটী প্রধান অঙ্গ। প্রবোধ বলিতেছেন, হে ভগবন! কৃপাকর, আমার বড় আশা চিরদিন তোমার ভাবে থাকিয়া পবিত্র ভাবে পরমানন্দে জীবন অতি-বাহিত করি, দেখ যেন বিবাহ করিয়া ভাব ছাড়া না হই, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে, তথাপি স্বার্থীদের হায় ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা করি, আমার ভাবের অনুকূল শাস্ত্র প্রকৃতির কল্যাণ সহিত যেন বিবাহ হয়, তাব বিরোধিনী চঞ্চলা ও কাপটীচারিণী স্ত্রীকে আশ্রয় করিয়া সংসার না করিতে হয়, দীন-দীনেন ইহাই কাতর প্রার্থনা; হে দীন দয়াল! দীনেন আশা পূর্ণ করিও। প্রায় প্রতি দিনই সকাল বিকাল দেব গৃহে এইরূপ প্রার্থনা করেন, দেখিতে দেখিতে বিবাহের দিন উপস্থিত হইল, শুভদিনে শুভলগ্নে মহা সমারোহে বিবাহকর্ম সমাধা হইল। পাত্রীর নাম সুন্দলা, সুশীলা যগ্নার্থই সুশীলা, দেখিতেও সুন্দরী, সুতরাং

যোগ্য সম্মিলনে সমাগত লোক ও বর এবং কত্যা পক্ষীয় নর-নারী অতিশয় প্রীতলাভ করিলেন, বিবাহের মন্ত্রাদি ও লোকাচার এবং স্ত্রীআচাররূপ কন্য তরঙ্গ অতিক্রম করিয়া প্রবোধ স্ত্রীলার সহিত বাসর গৃহে কতিপয় যুবতী পরিবেষ্টিত হইয়া ভাবিতেছেন।

হায় হায় ! পবিত্র আর্ধ্য সমাজের কি অধঃপতন ! ধর্ম কেবল মুখের কথায়ই আছে, কৈ কার্যে তো কিছুই দেখিলাম না, কি করি ! শাস্ত্রে যাহা বিধি আছে শ্রী গুরুদেবের নিকট যাহা শুনিয়াছি, নিজেও শাস্ত্রযুক্তি এবং বিচার দ্বারা যেরূপ বুঝিয়াছি, তাহারত কিছুই মিলিলনা। বিবাহের পূর্বে যেরূপ ভাবে বিবাহ করিব আশা ছিল, সমাজের সংস্কারের অভাবে তাহার কিছুই হইল না, আত্মীয় স্বজনগণ কেবল বাহ্যিক আমোদে মত্ত; এমন কি পরম হিতৈষী পিতা ঠাকুরও একবার আমার আত্মোত্তিরদিকে দৃষ্টি করিলেন না, ভাল বাসিয়া কেবল নানাবিধ বাগোত্তমের সমারোহ করিয়া একটী অপরিচিতা অশিক্ষিতা এবং বিবাহ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা কন্যার সহিত মিলিত করিয়া দিয়া নিজ কন্তব্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করত আনন্দে আহারাদি করিতে চলিলেন; কন্যার পিতাও সম্মেহ পালিতা কন্যাকে বরহস্তে সমর্পণ করিয়া কন্যাদায় হইতে রক্ষা পাইলেন। আমাদের যে কি হইবে, আমরা এক্ষণে কি করিব, তাহার বিষয় কেহই ভাবিলেন না, কোন উপদেশ দিলেননা, পুরোহিত মহাশয় কেবল বচনে পণ্ডিতের তায় ব্যস্ত সমস্ত হইয়া মদ্রত অসদ্রত বিচারহীন সার্থ পনের তায় শীঘ্র শীঘ্র সংস্কৃত বচন শুলি আবৃত্তি করিয়া দক্ষিণা গ্রহণ করত বাজে কথা বলিতে বলিতে চলিয়া গেলেন। আমরা বিবাহ যে কি ব্যাপার তাহা কিছুই বুঝিলাম না, আমি যদিও সংস্কৃত বচনের কিছু কিছু অর্থ বুঝিতে পারিয়াছি কিন্তু এ ব্যক্তি কিছুই বুঝিল না। সামাজিক প্রথা কিম্বা বিবাহ হইয়া গেল, বর পক্ষীয় ও কন্যা পক্ষীয় কর্তাদের কুটমিতা আরম্ভ হইল, বর ও কন্যার একত্র বাস, নরনারীর জয়ধ্বনির সহিত অনুমোদিত হইল। এদিকে আবার কতকগুলি অপরিচিতা দিলাসিনী যুবতী রমণী আমাদের কাছে লইয়া আসার আমোদ প্রমোদ করিবার মানসে নানা প্রকার ভাবভঙ্গি করিতেছে, এখন করি কি ? হায় হায় ভগবন ! এত দিনের বিবেক, এত দিনের সংযম সকলই কি আজ হারাইব, বহু প্রার্থনার লব্ধ মনুষ্য জীবন পশুত্বে পরিণত করিবার কি আজ প্রথম দিন ? ইন্দ্রিয় লম্পটতা শিখিবার কি

এই প্রথম শিকাগার ? আশক্তি রজ্জুতে ব্যক্তিত্ব স্বাধীনতা লোপ করত ঘোর সংসারী সাজাইবার জগুই কি বন্ধু নামধারী আত্ম-শত্রুগণের এত উৎসাহ ? আমি যদি আড়ম্বর প্রিয় বান্ধবগণের ব্যবহারের যোগ্যযোগ্য বিচার না করিয়া এই সময় হইতে ভোগ সম্পট পশুর ছায় ব্যবহার করি, তবে একেবারে বিবেক হারাইব মোহে মজিব, অধঃপতিত হইব, আর উঠিতে পারিব না, চির জীবনের তরে শাস্তিহারা হইব। বান্ধব নামধারী মোহাক্ষ কূপে নিপতিত স্বজনগণ কেহই যে আমার তুলিতে পারিবে না তাহা দ্রব সত্য। নিজেও মজিব, পত্নীকেও মজাইব, আর কত লোক যে আমাদের সঙ্গ দোষে মজিবে তাহারও সীমা থাকিবে না। গীতায় ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন ;—

আত্মিব,হাস্তনো বন্ধুঃ আত্মিব রিপূরাশ্বনঃ

বন্ধুরাত্মাশ্বনা তস্ত যেনৈবাত্মাশ্বনা জিতঃ ।

অর্থাৎ নিজেই নিজের প্রকৃত বন্ধু, আর নিজেই নিজের পরম শত্রু। যে ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া কৰ্ম করত আত্মার উন্নতি করিতে যত্ন করে, সেই ব্যক্তি নিজেই নিজের বন্ধু, আর যে ব্যক্তি বিচার না করিয়া ভোগাসক্ত হওত আত্মার অধঃপতন করে, সে ব্যক্তি নিজেই নিজের পরম শত্রু।

এইরূপে ভাবিতে ভাবিতে ব্যাকুল হইয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে কাতর কণ্ঠে প্রবেশচন্দ্র প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, হে ভগবন ! মঙ্গলময় তুমি সর্গাস্ত্রধামী ! তুমি বিগ্ৰহী-জীবন ! আমার প্রাণ তোমাঞ্জেই চায়, আমি তোমার ভাবছাড়া হইয়া তুচ্ছ সুখে সুখী হইতে পারিবনা, তোমায় না ডাকিয়া পশুর ছায় ইন্দ্রিয় ভোগ করিয়া শাস্তি হারা প্রাণে একদিনও বাঁচিতে পারিবনা। ভাব দাও, বিদ্যাসমৃদ্ধ করিবার শক্তি দাও, আজ নিজের ভার ও পত্নীর ভার বহন করিয়া অস্থগিত পদে তোমার রূপার উপর নির্ভর করিয়া ধর্ম জীবন লাভ করত সনানন্দ উপভোগের অধিকার দাও, আমি ভোগ চাহিনা, আমি পরিজন চাহিনা, আমি সমাজ চাহিনা এবং 'আমি ধর্মহীন' ভাবহীন নর নারীর নিকট মান সম্বন্ধও চাহিনা, আমি চাহি কেবল তোমাকে। হৃদয়নাথ ! অজ্ঞ আমি বড়ই বিপন্ন, দাসকে এই বিপদের সময় একবার দেখা দাও, যেন তোমার ভাবে ভাবিত হইয়া ভোগলালসাপিসাচী ও তাহার প্রত্যক পরিচায়িকা স্বরূপিণী

এই যুবতী হৃদয়ে স্থায় চক্রে বা পরম পবিত্র মাতৃ ভাবে দেখিতে পারি।  
দীনদয়াল! শক্তি দাও, তুমি শক্তি না দিলে বিবেকবলে বন্ধুনাথধারী শত্রু  
কুলের এই ষড়বন্ত্র হইতে আশ্রয় রক্ষা করিতে পারিবনা, হায় নাথ! আজ আমার  
কি হৃদয়! কোথায়ও বিবেকের জ্বালোচনা নাই, কেহই প্রকৃত বন্ধুর কার্য  
করিতেছে না, এক জনের মুখেও পবিত্র আশ্রয় উদ্ভের কথা শুনিতে পাইনা, আজ  
আমার চতুর্দিকে কেবল আসক্তির বস্ত্র ও আসক্তির কথা। গুরো! হে জ্ঞানপ্রদ  
পরম স্নানধর! এ সময় একবার স্বেথা দাও, তোমার সহৃদয়বলে মোহ জাল  
হইতে প্রাণ বাঁচাই, সংসারে তোমার ছায় আমার আর আপন জন কেহ নাই, হে  
গুরো! শক্তিদাও—মানসিক বল দাও ও শান্তি দাও।

এইরূপে প্রাণের আবেগে প্রার্থনা করিতে করিতে প্রবোধ কি যেন একটা  
আশ্রয় বাধ্য পাইলেন, অমনি সহাস্রবদনে সমাগতা রমণীন্দ্রেরদিকে ও  
পত্নীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া “জয় গুরু জয় গুরু” ধ্বনি করত পত্নীকে বলিলেন। দেখ  
তোমার পিতা তোমাকে অলঙ্কার ও বস্ত্রে সাজাইয়া আমার হাতে সমর্পণ  
করিলেন, তুমি সামাজিক সংস্কার ও প্রথাভঙ্গারে মাথা হেট করিয়া রহিলে  
আনিলেনা তুমি আজ কোন্ এক নূতন ভাবরাজ্যে যাইবে, কোন্ এক নূতন  
ব্যক্তির হাতে সমর্পিত হইলে ও কোন্ এক নূতন কার্যে ব্রতী হইতে আদিষ্ট  
হইলে। আর আমিও বুঝিতে পারিতেছি না যে এত আশ্রয় প্রমোদের সহিত  
আমি কি সুখের বস্ত্র গ্রহণ করিলাম? না সুখ হারাইবার বস্ত্র পাইলাম?  
তুমিও আনিলেনা তোমার আমার এই মিলন কি অশ্রু, আমিও বুঝিয়া  
তোমার বুঝাইতে পারিলাম না আমাদের এই পাণি গ্রহণের মধ্যে আশ্রয়ভিত্তিক  
ও মঙ্গলময়ের সন্নিহিত কোন গুঢ় তত্ত্ব নিহিত আছে কি না।

বধার্থ এ বিষয়ে তুমিও অনভিজ্ঞা, আমিও অনভিজ্ঞ। তুমি আমার প্রতি  
ধেরূপ ব্যবহার করিবে, আমি তোমাকে লইয়া যে নিয়মে চলিব, সে বিষয়ে  
পুরোহিত মহাশয় যে সকল শাস্ত্রীয় বচন আবৃত্তি করিলেন, তাহার কিছু তাৎ  
পর্য্যই বুঝিয়াছি কি? আমার বিশ্বাস উহার কিছুই বুঝিতে পার নাই, আর  
আমার ইহাও একান্ত বিশ্বাস যে, বিবাহ-তর্ক না বুঝিয়া কেবল ভোগ্যভোগ্যের  
পরাকাষ্ঠা দেখাইবার নিমিত্ত স্ত্রীপুরুষের মিলন ভোগ্যভোগ্যের  
মিলন অপেক্ষা কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নহে। সুতরাং যদি তুমি বিবাহতর্ক না

বুঝিয়া থাক, আর কেবল ইন্দ্রিয় সুখ ও সম্ভান কামী হইয়া আমাচ আশ্রয় কর, তবে তোমার আমার এই মিলন চির দুঃখের ও আত্মস্বাভবনতির জন্ম হইবে সন্দেহ নাই। যদি আমার সহিত মিলিত হইয়া ধর্ম্মানুসারে সংসারাত্রম করত শান্তি লাভ করিতে চাও, তবে প্রথমে বিবাহ তত্ত্ব বুঝিয়া লও; কেবল কি উদ্দেশ্যে তোমার আমার এই সংযোগ এবং ইহাতে বিপ্ন নিরস্তা মঙ্গলময়ের কোন স্তভ ইচ্ছা আছে কি না, তাহাও বিচার করিয়া লও, নতুবা আমাকে লইয়া সংসার করিয়া সুখ পাইবেনা, আমার ব্যবহারে তোমার শান্তি হইবেনা, আমা হইতে তোমার আত্মস্বাভবনতির পরিবর্তে আত্মস্বা অধঃপতনই হইবে। এখন জিজ্ঞাসা করি আমার এই সকল কথা তাৎপর্য্য বুঝিলে কি? যদি না বুঝিয়া থাক তবে বীল, পুনর্বার আমার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিতে যত্নকরি। আমার কথা উত্তর দাও, মূর্খতার উচ্চ পরিচয়রূপ লজ্জা ত্যাগ কর, বল—তুমি কি মানুষের মতন সুখী হইতে চাও, না কেবল ইন্দ্রিয় পরায়ণ পশুর মতন থাকা আশা কর?

নব বিবাহিতা বনু সুশীলা যদিও সামাজিক প্রথার অনুকূলে প্রথমে লজ্জিতা ও অধোবদনা ছিল, কিন্তু ধর্ম্ম প্রাণ স্বামীর সেই কর্তব্য জ্ঞানোদ্দীপক সতেজ বাক্য শ্রবণে প্রাণে একপ্রকার ধর্ম্মময় কর্তব্যদ্বন্দ্বন আসিয়া সেই কপট লজ্জার বন্ধন একেবারে ছিন্ন করিয়া দিল। সুশীলা মস্তক উন্নত করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, আপনার কথা অর্থ আমি বুঝিয়াছি, আমিও স্মৃতিভিলাম আজ আমার জীবনের শান্তি লাভের প্রথম দিন, না শান্তি হারাইবার প্রথম দিন। আমি নিজে অশিক্ষিতা এবং এখাবৎ কোন ধর্ম্ম প্রাণ সুশিক্ষিতা নরনারীর সঙ্গও পাই নাই, অতএব যাহাতে আমার মঙ্গল হয়, আনাকে সেই ভাবে চলিতে আদেশ করুন, আমি আপনার আদেশ মত কর্ষ করিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি, আর ইহাও অকপট হৃদয়ে বলি যে, যদি আমাকে গ্রহণ করিয়া আপনার শান্তি, ধর্ম্ম ও আত্মস্বাভবনতি হারাইতে হয় এবং আমাকেও অধঃপতিত হইয়া পশুর মতন থাকিতে হয়, তবে আপনি আমার গ্রহণ করিবেন না, আপনি যেমন ছিলেন থাকুন, আমিও যেমন ছিলাম থাকি। আমি ধর্ম্ম চাই, উন্নতিচাই এবং আত্মস্বাভবনতির অনুকূলে মানসিক শান্তিও একান্ত প্রার্থনা করি। এই বলিয়া সুশীলা নিরস্ত হইলে প্রবোধচন্দ্র সুশীলার সেই অকপট ধর্ম্ম প্রাণতার পরিচয় পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। সাধারণে বিবাহ করিতে প্রফুল্ল



বদন হয়, কিন্তু এতক্ষণ প্রবেশ কেবল চিন্তিতই ছিলেন এইবার প্রবেশের মুখে বিবাহদিনের আনন্দ প্রকাশ হইতে লাগিল। “জয় গুরু জয় গুরু” বলিয়া আরাধ্য-দেবের ও গুরুদেবের কৃপায়ই এইরূপ পবিত্র চেতা পত্নী পাইয়াছেন ভাবিয়া পরমেশ্বরের ভাল বাসা ও মঙ্গল ইচ্ছার শত শত ধন্যবাদ দিলেন।

পরে প্রীতি প্রফুল্ল নয়নে পত্নীর প্রতি শুভ দৃষ্টি করিয়া মনে মনে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন, এবং সমাগতা রমণীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, দেখুন আপনারা আমার অপরিচিতা কুলবধু, আমি দেশান্তর হইতে বিবাহ করিতে আসিয়াছি, আমি পর পুরুষ, আপনারা পরিহাস বাক্য প্রয়োগ করত বুঝা আমোদ করিবার বাসনায় যে এখানে আসিয়াছেন ইহাকি আপনারদের ধর্ম ? আর এইরূপ ব্যবহারে কি কোনরূপ শাস্তি লাভের প্রত্যাশা করেন ? মানুষের সর্বদা সেইরূপ আহার ব্যবহার ও সেইরূপ আলোচনা করিতে হইবে, যাহাতে মনো-বৃষ্টি শাস্ত হয় এবং মনে আত্মার উন্নতি জনক পবিত্র ধর্মময় ভাব উদ্দীপিত হয়, অতএব আপনারা যদি পবিত্রতা চান ও আত্মার উন্নতি কামনা করেন, তবে আমার কথায় রাগ না করিয়া এখনই এই বাসরগৃহ পরিভ্রাণ করত আপন পতির নিকট বা বিশ্রাম স্থানে গমন করুন, আমি আমার কর্তব্য বিষয় চিন্তা করি এবং আমাদের ভাবী উন্নতির বিষয় বুঝিয়া লই। আর যদি আমার কথা শাস্ত ভাবে শুনিতে ইচ্ছা করেন তবে বসুন, নতুবা আর আমার ভাবের হানি করিবেন না, যাহারা প্রাণের পবিত্র ভাবের হানি কারক, তাদৃশ বান্ধবকে আমি সামাজিক প্রথাযুগ্মে এক বারও বান্ধব বলিয়া মনে করি না এবং ঐরূপ অধোগতির সহকারী নরনারীর সহিত বাক্যালাপ করিতেও আমি ঘৃণা করি। আপনারা আমার কর্তব্যের গুরুত্ব ও আমায় ইহাকে এখন যাহা বলিতে হইবে তাহা আমার কথায় বুঝিতে পারিয়াছেনত ?

প্রবেশের এই কথা শুনিয়া অসংযত ভাবে চালিত, কেবল ভোগ বাসনার মুক্তি স্বরূপ রমণীগণ নানা প্রকার ভাব ভঙ্গি ও বিদ্রূপ বাক্য প্রয়োগ করত তথা হইতে চলিয়া গেল ; কারণ, তাহাদের সংস্কার ও শিক্ষার ভাবে নববিবাহিত বর কল্পা ধর্মালোচনা করিবে এটা একেবারে নূতন ও হাঙ্গ জনক ব্যাপার। রমণীগণের ব্যবহারে অতিশয় ব্যথিতরূপে প্রবেশ বলিতে লাগিলেন, হায় ! সুপারিত্র

আর্থ সূমাজের কি অধঃপতন ঘটয়াছে ! নিজেরা নিজের মঙ্গলঘট পর্দাঘাতে ভাস্কিতেছে ? আর্থ সন্তানেরা ব্রহ্মচর্যের অভাবে কি কুসংস্কারেরই বশবর্তী হইয়াছে যে, আপন আপন ধর্ম পত্নীকে এক একটী ভোগের পুত্তলিকা সাজাইয়া অবাধে তাহাদের স্বাধীনতা প্রদান করিতেছে ! একবারও কি ইহার পরিণাম ফল চিন্তা করে না ? একবারও কি তাহাদের মনে আসেনা যে, এ ভোগ এ বিলাস এ চাক্চিক্য ক্ষণভঙ্গুর ও মহাদুঃখের হেতু । সমাজ কি ভয়ানক বিষকুস্তপয়্যা মুখের ত্রায় বাহিক চাক্চিক্যে অন্ধরে অসংভোগের হলাহল পোষণ করিতেছে। এই রমণীগণ কি মানুষী না পিশাচী ? আর অবাধে বাসর ঘরে পুরুষের সহিত অসদালোচনার জন্ত অবসর দাতা পুরুষেরা কি একবারও ইহাদের সতীত্ব রক্ষার প্রীতি দৃষ্টি করে না, কখনও কি সতী-ধর্মের পবিত্রতা শ্রবণ করে নাই ? সতীর পতি হইয়া কি পরমানন্দে সংসার করত ইহ পরকালে পরাশাস্তি লাভের প্রত্যাশাও করে না ? যাহারা স্বভাবত বিলাস প্রিয় অসংযত ও অশিক্ষিত সেই স্ত্রীজাতির এরূপ স্বাধীনতা যে আত্মোন্নতির একান্ত অন্তরায় তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । দেখি যদি মঙ্গল ময়ের রূপায় তাহারই ইচ্ছায় বিবাহ করিয়া থাকি, আর পত্নী কথান্ন বাধ্য হয়, আর গুরুদেবের রূপায় এখন যেমন ভাবে আছি এইরূপ মনো ভাব যদি থাকে, তবে দেখাইব—কিরূপে সংসার করিতে হয়, কিরূপে পতি পত্নী সংসার করে এবং পতি পত্নীর ভালবাসার মধুরতা ও পরিপতি কিরূপ ।

এইরূপে অনেক কথা বলিয়া প্রবোধ চন্দ্র পত্নীকে বলিলেন, দেখ ! আমাদের এই বিবাহ সম্মিলন গার্হ্যস্থ ধর্মের জন্ত, ধর্ম পত্নীর সহিত একত্রে বাস করতঃ পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে পবিত্র ধর্মের উন্নতি কল্পে সংসার করে বলিয়া এই আশ্রমকে গৃহস্থাশ্রম বলে । এই বিষয়ে মনু বলিয়াছেন—

ন গৃহং গৃহ মিত্যাহ গৃহিণী গৃহ মুচ্যতে

তয়াহি সহিতঃ সর্কান্ পুরুষাৰ্থানি সমঞ্জুতে ।

অর্থাৎ পণ্ডিতেরা গৃহকেই গৃহ বলিতেন না, গৃহিণীকেই প্রকৃত গৃহ বলিতেন, কারণ গৃহিণীকে অবলম্বন করিয়া গৃহস্থ—ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চতুর্কর্গরূপ রূপার্থ লাভ করে, ভাল গৃহের মধ্যে থাকিলে যেমন বহিরের বাতাস রৌদ্র হীম

ও বর্ষা প্রভৃতিতে বিধিবিধি জন্মাইয়া কষ্ট দিতে পারে না, সেইরূপ ধার্মিক শাস্ত্র স্বভাবে পতিপরায়ণা পত্নীকে সহায় করিয়া যাহারা পবিত্র ভাবে থাকিতে যত্ন করে, তাহাদের বাহিরের কামিনী কাঞ্চন প্রভৃতিতে অতিশয় আসক্তি আসিয়া সাধনের হানি করিতে পারে না, চতুর্ভুজ ফল নিরাপদে লাভ করত ধন্য হইবার জন্যই গৃহস্থ পত্নীকে ধর্ম্মানুকূলে সংশিক্ষায় শিক্ষিতা ও নিজের অনুগতা করিতে যত্ন করিবে, আবার এই জগৎই বিবাহিতা পত্নীর নাম সহধর্ম্মিণী পতি পত্নী দুইজনে পরস্পর পরস্পরের সহায়তায় ধর্ম্মলাভ করিবে। উভয় উভয়কে সুখী করিতে যত্ন করিবে। এই প্রত্যাশায় তুলসী, কুশ, গঙ্গাঙ্গল, তাম্র, ব্রাহ্মণ, নারায়ণ এবং সমাজের যোগ্য যোগ্য লোক সংক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক বেদ মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ যে পরস্পর পরস্পরকে দেহাত্ম সমর্পণ পূর্ব্বক গ্রহণ করায় তাহাই বিবাহ শব্দের তাৎপর্য্য। পত্নী পতির অনুগতা থাকিবে, পতি পত্নীর অভাব মোচন করতঃ সর্ব্বদা প্রীতির সহিত পালন করিবে। এইরূপ হইলে, পতি পত্নীর সুখ দুঃখের ভাগী ও পত্নী পতির সুখ দুঃখের ভাগিনী হইবে। পতির বশুতে পত্নীর অধিকার এবং পত্নীর ভব্যে ও দেহে পতির অধিকার, এইরূপে পরস্পর পরস্পরের ধর্ম্মে ধনে, পাপে পুণ্যে, মানে, অপমানে, তুল্যধিকারী হইয়া উভয় উভয়কে আত্মোন্নতির পথে প্রেরণ করতঃ প্রীতির সহিত একত্র থাকিবে। কখনও এই দাম্পত্য ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইবে না, এরূপ প্রতিজ্ঞা ও প্রার্থনা বিবাহের শব্য মন্ত্রের অর্থ। পবিত্র ভাবে থাকিয়া আত্মার উন্নতি করতঃ সময়ে সময়ে সন্তান উৎপাদন করিয়া গৃহস্থকে পিতৃ ঋণ হইতে মুক্ত হইতে হইবে। কাম ও প্রেম এক সছে। অনেকে না জানিয়া কাম ও প্রেম এক মনে করে। পতি পত্নীর ভালবাসা যদি প্রেমে পরিণত হয়, তবে উহা শাস্তি প্রদ হয়। আর পতি পত্নীর ভালবাসা যদি কামে পরিণত হয় তবে উহা হইতে কাহারও মঙ্গল ও উন্নতি হয় না। কাম আত্মসুখলাভসাজনিত ইন্দ্রিয় ভোগের ইচ্ছা; আর প্রেম ভোগ বাসনা শূন্য হইয়া নিঃস্বার্থ ভাবে তাহার সুখের জগৎ তাহাকে ভালবাসা। এ বিবয়্য তোমাকে পরে বলিব। অথবা ইন্দ্রিয় ব্যবহারই মানব জীবনের প্রধান তমলক্ষ্য নহে। পতি ও পত্নীর মধ্যে একের মনে, অসৎ প্রবৃত্তির উত্তেজনা হইলে অপরে শাস্ত্র ভাবে প্রিয় বাক্য দ্বারা সেই ধর্ম্ম বিরুদ্ধ ভাব হইতে তাহাকে প্রতি নিবৃত্তিত করিতে যত্ন করিবে। আবার

যখন একের ধর্ম প্রবৃত্তি হইবে তখন অপরে তাহার অনুকূলে কার্য করিয়া ঐ ধর্ম প্রবৃত্তি যাহাতে বর্ধিতা হয় তাহা করিবে। এইরূপে পত্নীর সাহায্যে পতি অধর্ম বাসনা ত্যাগ করতঃ ধর্ম পথে সুচালিত হইয়া সুখী হইবে। পত্নী পতির দ্বারা শালিত পালিত ও অধর্ম পথ হইতে প্রতিবর্তিতা এবং ধর্ম পথে সুরক্ষিত হইয়া আনন্দ লাভ করিবে, যেখানে এইরূপ সুনিয়ম সেই গৃহের নিশ্চয় মঙ্গল। ইহার অশ্রদ্ধা হইলেই গৃহস্থ গার্হস্থ্য ধর্ম চ্যুত হইয়া অধঃ পতিত হয়। এই বিষয়ে মনু বলিয়াছেন—

সম্বষ্টো ভার্ঘ্যয়া ভর্তা ভত্রী ভার্ঘ্যা তথৈবচ

যত্রৈবচ কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবং ॥

যে সংসারে ভার্ঘ্যর সং ব্যবহারে স্বামী সম্বষ্ট থাকে, স্বামীর কর্মে ও ব্যবহারে ভার্ঘ্যা আনন্দে, থাকে সেই সংসারে নিশ্চয় মঙ্গল ও সং সন্তান জন্মিয়া বংশ উজ্জ্বল করে, ভগবৎ সত্তা উপলব্ধির প্রধানতম উপায় সন্তোষ, সন্তোষের শ্রায় আর ধন নাই, যে নরনারী সন্তোষ ধনে ধনী, সেই নরনারী মর্ত্যভূমিতে থাকিয়াই স্বর্গ সুখ লাভ করে।

পতিভ্র ভাব ইচ্ছা ও ধর্ম বৃত্তির ধারণ ও পোষণ করে বলিয়া পত্নীর নাম ভার্ঘ্যা। যে স্ত্রী হইতে পতির ধর্ম ও আত্মোন্নতির ব্যাঘাত হয় সে স্ত্রী ভার্ঘ্যা নামের অযোগ্য ও অসতী। সর্বদা পতির অনুগতা থাকিয়া পতির সুখে সম্বষ্টা ও দুঃখে বিমনা হওয়া সতীর লক্ষণ। পতি ভিন্ন অস্ত্র পুঙ্গবে ভোগ বাসনা যাহাতে না আসে তাহার নিমিত্ত শাস্ত্র বিধি অনুসারে পতিকেই পরম দেবতা বোধে সেবা পূজা করা আর্ঘ্য রমণীগণের সতী-ধর্ম। গৃহীজাতী এই সতী ধর্মের অনুকূলে, চলিয়াই জগৎপতি জগদীশ্বরকে লাভ করিতে পারে। ইহা তুমি ক্রমিক অনুভব করিতে পারিবে। দেধ তোমাদের দেশে অনেকে প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে দেব ভাব আরোপ করত আরাধনা করিয়া নান্দ লাভ করিয়াছেন ও করেন। প্রতিমাত্তে দেব ভাব আরোপ করিয়া যদি সিদ্ধি লাভ করিতে পারে তবে সতী পতিতে জগৎপতির ভাব আরোপ করিয়া কেন সিদ্ধি লাভ করিবে না। আবার ঐরূপ দেবতার আরোপের দ্বারা পত্নীর ক্ষমতায় সন্তোষের অধিক বিকাশ হইলে রজঃ ৩ তমোংশের ক্রিয়া ক্রমিক

হ্রাস হইতে থাকে। সুতরাং ভোগ বাসনা ও কাম ক্রোধাদি ক্রমে ক্রমে কমিয়া যায়। অঔএব পত্নীর পতিতে দেব ভাব রাখা যে ঐহিক ও পারত্রিক স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই কল্যাণকর তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

নিজের সুখের জ্ঞান কখনও পত্নী পতিকে উৎপীড়ন করিবে না। পতি যখন যেমন আদেশ করেন, ধর্ম বিরুদ্ধ না হইলে অবিচারে পত্নী তাহাই প্রতিপালন করিবে। ধর্ম বিরুদ্ধ হইলে শান্তভাবে অবলম্বনপূর্বক অধর্মের পরিণাম যে, মহা দুঃখ, তাহা পতিকে বুঝাইয়া অধর্ম পথ হইতে পতিকে প্রতি নিবর্তিত করা ধর্ম পত্নীর প্রধান কর্তব্য। পতি যাহা বলিবেন তাহাই করিতে হইবে; এইরূপ ধারণার বশবর্তিনী হইয়া অনেক পত্নী পতির সাময়িক অধর্ম ভাবের উত্তেজনার অমুকূলে কার্য করিয়া পতির আত্মোন্নতির ব্যাঘাত করতঃ মহা অপরাধে নিপতিতা হয়। এই জ্ঞান পত্নীকে সুশিক্ষা প্রদান করা পতির একটা অবশ্য কর্তব্য কর্ম। অশিক্ষিতা রমণী ভাল বাসার উচ্চ পরিচয় দিতে গিয়া অনেক সময় পতি স্বাভিনী হয়; কারণ পতির অনিষ্টকর কর্ম হইতে তাহাকে প্রতি নিবর্তিত করিতেও পাপ মনে করে, সুতরাং ঘরে আশ্রয় লাগিলে তাহাতে বাতাস দিয়া বাড়াইবার মতন পতির ভোগাধি বাড়াইয়া অজময়ে পতিকে রুগ্ন ভয় ও বিপন্ন করিয়া ধর্মের পরিবর্তে মহাপাপই সঞ্চয় করে। আবার পতিপরায়ণা সতীর ধর্মাত্মকূলে যখন যাহা ইচ্ছা হইবে পতি তাহা সম্পাদন করিয়া পত্নীর সন্তোষ বিধান করিবেন, যুক্তির দ্বারা অধর্ম ভাব নষ্ট করিবেন। এইরূপে পতি পত্নী উভয়ে উভয়ের সাহায্যে, ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ভুজ সাধন করিতে পারে বলিয়া আর্ধ্যেরা উভয়কে দাম্পত্যী শব্দে অভিহিত করিয়াছেন।

দাম্পত্য প্রেম অতি পবিত্র; উহাতে কাহারও কেবল নিজের ইন্দ্রিয় লালসা থাকিবে না, উভয়কে শান্তিতে রাখিবার বাসনার সন্তুষ্ণানুসারে চেষ্টা করার পতি পত্নী ক্রমিক নিবৃত্তি পথের পথিক হইতে পারে। এ বিষয়ে তোমাকে এক্ষণে সংক্ষেপে এই পর্য্যন্ত উপদেশ করিলাম। পরে যে যে বিষয় তোমার জানিতে বাসনা হইবে, নির্ভয়ে সরল অন্তঃকরণে আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া তত্ত্ব জানিতে চেষ্টা করিবে। অগ্র আমরা একটা নূতন ভাব লইয়া উপস্থিত হইয়াছি, যদি আমরা পরমেশ্বরের কৃপায় পবিত্র ব্যবহারে ও পবিত্র আলোচনার ছন্দকে

পুত্র রাথিতে পারি তবে আমরা নিশ্চয় শাস্ত পাইব। এস, আমাদের হৃদয়ে  
ভার ভক্তি ও ধর্মবল লাভ করিবার জন্য প্রাণ খুলিয়া সেই বিশ্বজীব-জীবন  
মঙ্গলময় শ্রীভগবানকে ডাকি। এই বলিয়া প্রমোদচন্দ ভক্তিতরে বিশ্বরূপ হরির  
শ্রোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। সুশীলা স্বামীর কথা ও ভাবের প্রতি লক্ষ্য  
রাখিয়া কৃতাজ্জলিপুটে স্তব শ্রবণ করিতে লাগিলেন। শ্রোত্র পাঠ—

বিশ্বরূপ বিশ্বনাথ বিশ্বজীব-বিশ্রহং  
নারদাদি-যোগিবৃন্দ-বন্দিতং জনার্দনং  
দীনবন্ধু-সর্বদেব-পূজাপাদপল্লবং  
ত্বাং নমামি দেবদেব দীননাথ মীশ্বরং । ১ ।  
ভূত-ভব্য-বর্তমান-সর্ব-কর্ম-কারকং  
কর্ম-পাশ-মোচকং স্মৃশ্ম-কর্ম-দায়কং  
কংসলোক-সাক্ষিণং ভবাক্তি-তারকং হরিং  
ত্বাং নমামি দেবদেব দীননাথ মীশ্বরং । ২ ।  
ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্শ-প্রেম-ভক্তি-দায়কং  
ভক্তিযোগ-গম্য-রূপমাদি-ভূত-কারণং  
পাদ-পদ্ম-সক্ত-চিত্ত-ভক্ত-বিন্ত-বর্জনং  
ত্বাং নমামি দেবদেব দীননাথ মীশ্বরং । ৩ ।  
ভক্তি-মুক্তি-দায়কং বিপত্তি-বিঘ্ন-বারণং  
ধর্ম-সেতু-পালকং তুধর্মবুদ্ধি-নাশকং ।  
রোগ-শোক-দুঃখদৈত্য-পাপ-তাপ-নাশনং  
ত্বাং নমামি দেবদেব দীননাথ মীশ্বরং । ৪ ।  
বাসুদেব-মিষ্টবুদ্ধিদায়কং জনার্দনং  
শার্ক-সর্ব-দুঃখহারি-দীনস্বস্ত-পালকং ।  
চক্রপাণি-ধোরশক্র-পাপ-চক্র-নাশনং  
ত্বাং নমামি দেবদেব দীননাথ মীশ্বরং । ৫ ।  
কংসদর্প-স্বদনং পাপিষ্ঠ-দুষ্ট-হাতকং  
দৈত্য-বংশ-নাশকারি-দেব-বৃন্দ-পালকং

শ্রীপতি প্রহ্লদমূর্তি বেণু বাণবাদকং  
 ত্বাং নমামি দেবদেব দীননাথ মীশ্বরং । ৬ ।  
 আশ্বরাম-রামরূপ-ধারিণং নিরাময়ং  
 তন্ত্র-মন্ত্র-বেদ-শাস্ত্র-ভিন্ন-বুদ্ধি-ভেদকং  
 নিস্কিকার-শাস্ত্র-বিষ্ণু-বিপ্ৰভূত-ভাবনং  
 ত্বাং নমামি দেবদেব দীননাথ মীশ্বরং । ৭ ।  
 গাণপত্য-শোর-শাক্ত-শৈব-বৈষ্ণবেশ্বরং  
 পঞ্চদেব-মূর্তিরূপ-পার্বজন্য-বাদকং  
 শঙ্খ চক্র দণ্ড পদ্ম-ধারিণং নিরঞ্জনং  
 ত্বাং নমামি দেবদেব দীননাথ মীশ্বরং । ৮ ।

স্বপ্ন শেষ হইলে উভয়েই ভূমিতে মস্তক অবনত করিয়া শ্রীভগবানের উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। পদে সুশীলা ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, এইবার আমি বুঝিলাম বিবাহ সংস্কারটা কি, সত্য সত্যই আমরা কেবল ধী পুরুষের মিলনই বিবাহ সংস্কারের উদ্দেশ্যে বৃত্তি। এক্ষণে বুঝিলাম এই শুভ সংস্কারের নিগূঢ় রহস্য অতি পবিত্র, এই পবিত্রতার জ্ঞান ছিল না বলিয়া বিবাহের কথা হওয়া অবধি আমার মনে বড়ই ভয় ও লজ্জা হইত, কারণ আমি কিছুদিন পূর্বে স্বপ্নে কোন দেব মূর্তির দর্শন পাই এবং সেই অবধি আমি তাঁহাকে নমস্কার ও তাঁহার নাম জপ ও কীর্তন না করিয়া জল গ্রহণও করিতাম না। একদিনও নিয়মিতরূপে তাঁহার নাম কীর্তন করিতে ভুলি নাই। আজ কয়েক দিন যাবৎ বিবাহ হইলে স্বামী অধীন হইব— আর পরমেশ্বরের নাম করা চলিবে না, এই ভাবিয়া আমার বিবাহ হওয়া আমার নিতান্ত দুঃখেরই জন্ম হইয়া মনে ভাবিতাম। পুরুষীগণও “আর ধর্ম্ম চলিবে নহ, এক্ষণে বরের অনুগত থাকিতে হইবে” ইত্যাদি বাক্যে আমার আরও ভীষণ হস্তিয়া দিত। আমি তখন নির্জনে বসিয়া কান্দিতাম ও বলিতাম হে মঙ্গলময় বিবাহ হইলেই যদি আমার দেবতা পূজা, আমার সদাচার, আমার হস্রিনাম জপ ও আমার পবিত্র আচারাদির শেষ হয়, তবে কেন আমার স্বপ্নে দেখা দিয়া তোমার মঙ্গলময় নাম জপ করিতে আদেশ করিলেন? কেনই বা

সঙ্গিনীগণের সহিত আমোদ প্রমোদ ও নানাপ্রকার উপ কথায় থাকি-আমার কষ্টকর হইত। কেনই বা তোমার নামে তোমার গুণ কীর্তনে ও কাহারও নিকট তোমার দয়ার কথা শুনিলে প্রাণে আনন্দ পাইবার শক্তি দিয়া ছিলে? যদি কৃপা করিয়াছ, তবে যাহাতে তোমায় ভুলিতে না হয় তাহা করিও, এইরূপ ভাবে অনেক কাঁদিয়াছি। আমার এ ধারণা একেবারে অসঙ্গত নয়, কারণ সাধারণ রমণীগণকে ও বাড়ির বধূদের যেমন দেখিয়াছি, বিবাহের পরই যদি আমাকে সেইরূপ অসার বিলাস ভোগে মজিতে হয়, তবে ধর্ম ও ভগবৎ প্রেমধনে চিরজীবনের তরে বঞ্চিত হইব এইরূপই বিগাস ছিল। বিবাহ করিলে যে ধর্ম রক্ষা হয়, স্বামীর সহিত যে পবিত্র ভাবে ধর্ম ও পরমেশ্বরের বিষয় আলোচনা করা যায়, ইহাও আমার ধারণা ছিল না। সুতরাং বিবাহ শব্দ কাণে শুনিলেই আমার বুক কাঁপিত। বিবাহের সময় আমি কাঁদিয়াছি কারণ, স্বভাবতঃ ঐরূপ ধারণা; তাহাতে আবার কেবলমাত্র দুই চারি খানা বাসুলা বই পড়িয়াছি বলিয়া সংস্কৃত বাক্যের অর্থ বুঝিবার সক্তি না পাওয়ায়, বিবাহের সময় পুরোহিত মহাশয় যে সকল মন্ত্র পাড়াইলেন তাহারও অর্থ মনে মনে কেবল ভোগের অনুকূল ভাবেই ধারণা করিয়াছি। এক্ষণে বিবাহ যে কি ব্যাপার, বিবাহ করিয়া যে একটা পবিত্র আত্মার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার সাহায্যে পরমেশ্বরের আরাধনা করিয়া কৃতার্থ হওয়া যায়, তাহা বুঝিয়া পুনর্জন্ম লাভ করিলাম। যথার্থই বিবাহ তত্ত্ব না বুঝিয়া কেবল স্ত্রী পুরুষের মিলন ভোগপরায়ণ পশুর মিলন অপেক্ষা যে কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নয়, তাহা এইবার ধারণা হইল। আমি জ্ঞানহীনা-অশিক্ষিতা, আমাকে সত্বদেশ প্রদান করতঃ আপনার ভাবের অনুকূলে চালিতা করুন। আমি বধাসাধ্য আপনার আজ্ঞা প্রতিপালনে ধর্মসাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইলাম।

প্রবোধ। হুশীলা তোমার দোষ কি? আজকাল আমাদের আর্ধ্য সমাজের যেকোন অধঃপতন হইয়াছে তাহা আর বলিবার নয়; সুতরাং সেই অধঃপতিত সমাজস্থ নরনারীকে তুমি যেমন দেখিয়াছ, তোমার মনে সেইরূপ ধারণা হওয়া দোষের নহে। দেখ তুমি যদি আমার আদেশ মতন চলিতে পার। ভগবান যদি তোমাকে ও আমাকে নির্ভিক্ষেপে রাখেন, তবে তোমার দ্বারা আমি বহু স্ত্রীলোককে সতীধর্ম শিখাইয়া সুখী হইব। এক্ষণে ভগবৎ কৃপাই



আমাদের স্বহায় সম্পদ ও বল ভরসা। আমার বিশ্বাস, তুমি যখন স্বপ্ন যোগে সেই বিধ বিধাতার মঙ্গলময় দিব্য মূর্তি দর্শন করিয়াছ, তুমি যখন আমার উপদেশ পাবার বহু পূর্বে হইতে মঙ্গলময়ের নাম জপ করিয়া আনিতেছ, আর তুমি যখন কুসংস্কার ও পশুত্বকে আন্তরিক ঘৃণা কর, তখন তোমার আমার এই মিলন সুখেরই হইবে। এস আমরা দুইজনে অন্তরে অন্তরে মঙ্গলময়কে মরণ করিয়া আবার তাঁহার নিকট ভাব ও ভক্তি প্রার্থনা করি দেখ। ভগবৎ প্রার্থনায় অসম্ভব সম্ভব হয়, ভগবৎ প্রার্থনায় জীব অসংখ্য দোষবাশি হইতে ক্ষণ কালের মধ্যে মুক্ত হইতে পারে। ভগবৎ প্রার্থনায় দূরতিক্রমণীয় বিপদ ও বিক্ষেপ অনায়াসে অতিক্রম করিতে সক্ষম হয়; ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমরা কেবল বাসনাই করিতে পারি; কিন্তু বাসনা পূর্ণ করিবার একমাত্র কর্তা শ্রীভগবান। অতএব তুমি তোমার অভ্যস্ত স্তবাদি পাঠ করতঃ শ্রীভগবানের নিকট ভাব প্রার্থনা কর। আমি তোমার শ্রায় পবিত্র হৃদয়। ধার্মিক। পত্নী তাঁহারই রূপায় লাভ করিয়াছি বলিয়া একটু প্রার্থনা করি। এই বলিয়া প্রবেশচন্দ্র পরামনে বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন।

সুশীলা কৃতাজ্জলিপুটে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভাবগদগদ স্বরে গাহিতে লাগিলেন—

জগত জীবন,	জগত পালন,
জগত জীবের গতি।	
জীবনে মরণে,	শয়নে সপনে,
তোমাতে থাকুক মতি।	
সম্পদে বিপদে,	নাথ তব পদে,
থাকে যেন মম মন।	
তোমার রূপায়,	ওহে প্রেম ময়,
পেয়েছি জীবন—ধন।	
ভাবে সর্ব্ব ক্ষণ,	রাধে নারায়ণ,
তোমাতে করে মগন।	
তুমি ধন মান,	তুমি ভক্তি জ্ঞান,
তুমি জীবন—জীবন।	

তব কৃপাবলে,                      অবনী মণ্ডলে,  
                     লালিত পালিত জীব ।  
 মঙ্গল বিধাতা,                      তুমি বিশ্বপাতা,  
                     তুমি জ্ঞান দাতা শিব ।  
 তোমার স্মরণে,                      তোমার স্তবনে,  
                     শক্তি নাহিক মোর ।  
 বক্ষ কৃপাময়,                      হইয়ে নিদয়,  
                     সম্মুখে সংসার ঘোর ।  
 পাপ প্রলোভনে,                      যেন কায় মনে,  
                     বিষের মতন ত্যাজ ।  
 শুদ্ধ শাস্ত মনে,                      ভক্তি ভরা প্রাণে,  
                     তব পদ যেন ভজি ।  
 তব ভাল বাসা,                      পাব মনে আশা,  
                     বঞ্চিত ক'রনা হরি ।  
 যাবত জীবন,                      তোমাতেই মন,  
                     থাকে এ মিনতি করি ।

একেবারে আত্মহারা ভাবে সুশীলা উচ্চকণ্ঠে সুরসংযোগে স্তব পাঠ করি-  
 তেছিল সহসা লজ্জা আসিয়া সুশীলার কণ্ঠ রোধ করিল, আর বলিতে পারিল না,  
 ভীতা লজ্জিতা ও অপরাধিনীর ন্যায় স্বামীর মুখপানে দৃষ্টি করিয়াই অধোবদনে  
 বসিয়া রহিল ।

প্রবোধ—

সুশীলা! বেশ স্তব পাঠ করিয়াছ, আমিও এই ভাবই চাই, ধর্ম্য কর্মে লজ্জিতা  
 ও কুন্তিতা হইবার কোন কারণ নাই, পাপ কর্মে ঘৃণা লজ্জা ও ভয় করিবে । আমি  
 কপট লজ্জার পক্ষপাতী নহি, তোমার প্রাণখোলা ঈশ্বর প্রার্থনা শুনিয়া আমি কত  
 সুখী কত আনন্দিত ও কত প্রীতি লাভ করিলাম তাহা বলিতে পারি না,  
 মঙ্গলময় শ্রীভগবান তোমার ভাবের উন্নতি করুন ইহা প্রার্থনা করি । তুমি কোন

অন্যায় কর্তৃ কর নাই সুতরাং ভীত না হইয়া আনন্দমনে থাক, আর আমার নিকট যদি অন্য কিছু জানিতে ইচ্ছা কর তবে বল, সং প্রসঙ্গ করিয়া বসের জাগিয়া তোমাদের রীতি রক্ষা করি ॥

শ্রীদীনবন্ধু শর্মা ।

ক্রমশঃ ।

## পুরাণপ্রসঙ্গ ।

( ক্ষমার মহত্ব । )

—:—

মনুষ্যের যত প্রকার গুণ আছে, তন্মধ্যে ক্ষমা একটী শ্রেষ্ঠ গুণ। ক্ষমার মহত্বের সীমা নাই, সকল দেশের সাধু পুরুষেরা ক্ষমার মহত্বের প্রশংসা করিয়াছেন। পরম জ্ঞানী বুদ্ধদেব তাঁহার শিষ্যবর্গকে বলিতেন “আমার যদি কেহ অনিষ্ট করে আমি তাহাকে অনুরাগ দিয়া ঘেরিয়া রাখিব, আমার প্রতি কেহ বিদ্বেষ করিলে, আমি ভালবাসা দিয়া তাহার মন হইতে বিদ্বেষ ভাব দূর করিব, প্রেমাভতার মহাত্মা যীশুর উপদেশ বাণী এই, “কেহ এক গণ্ডে আঘাত করিতে আসিলে, অপর গণ্ডে তাহার নিকট প্রসারিত করিয়া দাও।” হৃদয়ের কি উচ্চ ভাব! ক্ষমার মহত্বের কি জীবন্ত উদাহরণ! আবার ঐ দেখ ভাই, পাপী জগাই মাধাই “কলসীর কানা” লইয়া মারিতে যাইতেছে, ক্ষমার অবতার পরম দয়ালু নিত্যানন্দ তখন আনন্দে গদ গদ হইয়া বলিতেছেন—

“মেরেছিঁ ম কলসীর কানা, তা বলে কি প্রেম দিব না”—(মাধাইরে)

ক্ষমা ধর্মের একমন সুন্দর পরিচয়, বল দেখি! ক্ষমা গুণের মহত্ব কিরূপ, তাহা কিঞ্চিৎ পরিমাণে দেখাইবার জন্য আমরা নীতি মূলক একটী সুদ্র প্রস্তাব সঙ্কলন করিতেছি পাঠকগণের অন্তর্নিহিত ক্ষমা গুণের উদ্বোধন করাই আমাদের উদ্দেশ্য। উপাখ্যানটী এইঃ—

কোশল দেশে দীর্ঘশোক নামে এক রাজা বাস করিতেন। ব্রহ্মদত্ত নামে এক প্রতিবেশী রাজা তাঁহার ষোল শত্রু ছিলেন। ব্রহ্মদত্ত দীর্ঘশোককে পরাজিত করিয়া দিলেন। দীর্ঘশোক পরাজিত হইয়া ব্রহ্মদত্তের রাজধানী কাশীতে ছদ্মবেশে পত্নীর সহিত বাস করিতে লাগিলেন। তথায় তাঁহার একটা পুত্র হইল। পুত্রের নাম দীর্ঘায়ুঃ। কিছুকাল অতিবাহিত হইবার পর একদিন গুপ্তচর দীর্ঘশোকাদির ছদ্মবেশের বিষয় রাজা ব্রহ্মদত্তকে অবগত করিল; তিনি ইহা শুনিয়া অতি ক্রুদ্ধ হইলেন এবং দীর্ঘশোক ও তাঁহার পত্নীকে ধরাইয়া আনিলেন। অবশেষে দম্পতীকে শৃঙ্গল বদ্ধ করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করাইয়া শিরশ্ছেদের আদেশ দিলেন।

রাজ পুরুষেরা, রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘশোক ও তদীয় পত্নীকে শৃঙ্গল বদ্ধ করিয়া পথে পথে ঘুরাইয়া বেড়াইতে লাগিল। পুত্র দীর্ঘায়ুঃ দৌড়িয়া পিতা মাতার নিকটে গিয়া গলা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পিতা দীর্ঘশোক পুত্রকে আশ্বস্ত করিয়া বলিতে লাগিলেন “বাপ দীর্ঘায়ুঃ শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ ভাব হৃদয়ে পোষণ করিও না, বিদ্বেষ দ্বারা শত্রুতা যায় না, শত্রুকে ভালবাসা দিয়া, জয় করিতে হয়”।

শত্রুর প্রতি পিতার এই ভাব দেখিয়া পুত্র দীর্ঘায়ুঃ অতি বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহার হৃদয়ও উচ্চভাবে পূর্ণ হইল। তিনি শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ ভাব কদাপি পোষণ করিবেন না বলিয়া পিতার নিকট প্রতিজ্ঞা করিলেন।

অবশেষে ব্রহ্মদত্তের নিষ্ঠুর অত্যাচার সহ্য করিবার পর দীর্ঘশোকের মৃত্যু হইল। দীর্ঘায়ুর মাতাও তাঁহার অনুগমন করিলেন। শোকে দুঃখঃ দীর্ঘায়ুর প্রাণ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তিনি সংসারে একাকী, বন গমনই তাঁহার পক্ষে শ্রেয়ঃ, এই ভাবিয়া, বনে গিয়া তিনি কিছুদিন অতি বাহিত করিলেন। বিজন বনে বাস করিতে করিতে পিতার প্রতি ব্রহ্মদত্তের নৃসংশ অত্যাচারের বিষয় তিনি যত ভাবিতে লাগিলেন, প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা ততই প্রবল হইতে লাগিল। কিন্তু পরক্ষণেই পিতার শ্রেয় কথার মনে হইল; তিনি ভালবাসা দ্বারা শত্রুজয়ে প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়াছেন, মনোমধ্যে এই কথা জাগিয়া উঠিল তাই তিনি প্রতিশোধের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলেন।

বনবাসে কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া দীর্ঘায়ুঃ পুনরায় ব্রহ্মদত্তের রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়া তাঁহার ভৃত্যের পদে নিযুক্ত হইলেন। দীর্ঘায়ুঃ বেশ বাঁশী বাজাইতে পারিতেন ; রাজা ব্রহ্মদত্তও বাঁশীর গান শ্রুতিতে ভালবাসিতেন। বাঁশীর গানে মোহিত হইয়া ব্রহ্মদত্ত একদিন দীর্ঘায়ুকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং তাঁহাকে নিজ রক্ষকের পদে নিযুক্ত করিলেন।

দীর্ঘায়ুঃ এক্ষণে সামাগ ভৃত্যের পদ হইতে দেহ রক্ষকের পদে আরুঢ়, তাঁহার প্রতি রাজার অসীম বিশ্বাস, একদিন রাজা ব্রহ্মদত্ত সদলে শিকারে বহির্গত হইলেন। শিকার করিতে করিতে তিনি গভীর বনमध्ये গিয়া পড়িলেন দীর্ঘায়ুঃ ব্যতীত সকলেই রাজার অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। রাজা ছুটিয়া আত ক্লান্ত হইয়া এক বৃক্ষতলে আশ্রয় লইলেন এবং দীর্ঘায়ুর কোলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পেলেন।

বিজন অরণ্য—নীরব নিস্তরু ; রাজা ব্রহ্মদত্ত দীর্ঘায়ুর কোলে ঘুমাইতেছেন। দীর্ঘায়ু নিদ্রিত রাজার মুখেরদিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন “এই সেই ব্রহ্মদত্ত যিনি আমাকে পিণ্ডম্নেহ ও মাতৃম্নেহ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, যাহার অত্যাচারে আমি নিজ রাজ্য হইতে চ্যুত হইয়াছি ; ইহার প্রতি এক্ষণে কি করা উচিত ? প্রতিশোধ ! দারুণ প্রতিশোধ লইবার এই সুসময় উপস্থিত”। এই সকল ভাবিতে ভাবিতে তিনি নিজ কটিদেশে বন্ধ খড়্গা নিক্ষেপিত করিয়া জার মস্তক ছেদ করিবার জন্ত যেমন উহা উত্তোলন করিয়াছেন, অর্মান পিতার সেই শেষ কথা, ভালবাসা দ্বারা শত্রুজয়ের কথা, তাঁহার মনে উদ্ভিত হইলে। তিনি উত্তোলিত তরবারি সংঘত করিয়া রাখিলেন ; হস্তের তরবারি কিছুক্ষণ হস্তেই থাকিল। সহসা রাজার নিদ্রাভঙ্গ হইল, দীর্ঘায়ুর ভাব দেখিয়া রাজা চমকিয়া উঠিলেন। তখন দীর্ঘায়ুঃ মনের সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। দীর্ঘশোকের ক্রমা শিকার গুণে, আজ দীর্ঘায়ুর হস্ত হইতে নরপতির প্রাণ রক্ষা হইল। রাজা ব্রহ্মদত্ত, তখন দীর্ঘায়ুকে প্রেমালিঙ্গন পাশে বদ্ধ করিয়া বলিলেন “দীর্ঘায়ু, আজ তুমি কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে। তোমার পিতৃ ভক্তি জগতের আদর্শ স্থানীয় হইয়া থাকিবে। তুমি আত্ম যে ক্রমাগুরেণ পরিচয় প্রদান করিলে, তাহার উপযুক্ত পুরস্কার কি দিব, জানি না। “যাহা হোক, অবশেষ উভয়েই অকৃত্রিম প্রণয় শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া কাঙ্ক্ষাপন করিতে

লাগিলেন। এস ভাই, এই উপাখ্যানোক্ত ক্রমা শিকার জীবন্ত উদাহরণ আমাদের মানস চক্ষে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিয়া শরীর প্রতি প্রতিশোধ দিবার জন্য প্রাণে ভালবাসা লইয়া অগ্রসর হই।

দীনঃ—শ্রীরসিকলাল দে।

## সংপ্রসঙ্গ ।

( পূর্ব প্রকাশিতের পর । )

—:—

চ। রূপ রসাদি ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়গুলি নিবেদন করিয়া ভোগ করিবার উপায় বুঝিলাম, কিন্তু ইহার মধ্যে আমার যে কয়টি বিষয়ে সন্দেহ আছে তাহার মীমাংসা আবশ্যিক, আমার প্রথম জিজ্ঞাস্য এই যে, চৈতন্যের অধ্যাসতো সকল প্রাণীতেই আছে, তবে অপরকে স্পর্শ করিলে আনন্দ বোধ হয় না কেন ?

র। অজ্ঞান জনিত অহংকারের কুহকে বহির্গুণ মন প্রবৃত্তির অধীন হইলে তাহার ভাব সীমাবদ্ধ ও বিকৃত হইয়া যায় ; তখন সেই সীমাবদ্ধ ভাবের বাসনা হইতে যে বিকৃত সংস্কার ও সংস্কার হইতে আসক্তির উদ্ভব হয়, তাহার লক্ষ্য সম্পূর্ণ বাহ্যিক হওয়ায় সংকীর্ণ ভাব ধারণ করে এবং অবিজ্ঞা প্রভাবে মন যে ভাবে যে আধারের উপর সেই সংকীর্ণ আসক্তি প্রয়োগ করে, উহা সেই ভাবানুযায়ি তাহার সুখপ্রদ বলিয়া বোধ হয় এবং এই জগুই মায়িক আকর্ষণ বশতঃ সত্ত্ব ও অস্তরঙ্গ বন্ধু প্রভৃতিকে স্পর্শ করিলেও সুখ বোধ হয়, তবে ভাব ভেদে এই সুখের প্রকার ভেদ হয় মাত্র।

চ। তুমি বলিয়াছ যে মন যাবৎজীবী ভাবে মগ্ন থাকে, তাবৎ ইন্দ্রিয় সমন্বিত দেহে ভ্রমবশে আত্ম বুদ্ধি আরোপ করে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সহিত আমার পার্থক্য থাকিলে ইন্দ্রিয়ের সূখে আমার সুখ বোধ হয় কেন ?

র। প্রথমতঃ দেখে যে তুমি কে, তুমি নিত্য জ্যোতীশ্মান আনন্দময় আত্মা, পরমাত্ম স্বরূপে তোমার নিত্য অবস্থিতি, সুখ বা দুঃখ অনুভব করে মন, মন রূপ রসাদি বিষয়ের বর্ণে রঞ্জিত হইলে আত্মাতে তাহার আভাস পড়ে মাত্র ; কিন্তু বিভিন্ন বর্ণের সান্নিধ্যে ক্ষটিকের বর্ণ বৈচিত্রের স্থায় আত্মাতে প্রতিবিস্মিত এই সুখ দুঃখ বাস্তব নহে, শাস্ত্র মনকে আত্মার পুত্ররূপে কল্পনা করিয়াছেন, পুত্রের শারিরিক সুখ দুঃখের আভাস পিতাতে প্রতিবিস্মিত হইলেও যেমন তাহা পিতার নহে সেইরূপ মন ভ্রমজ্ঞান বশতঃ ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা বিষয় হইতে যে সুখ দুঃখের মগ্নিতা আহরণ করে তাহা আত্মার নহে, আত্মা পরমাত্মার পুত্র, মন পৌত্র, সুপুত্র আত্মা কখনই পিতৃ সান্নিধ্য অর্থাৎ পরমাত্ম স্বরূপ হইতে দূরে অবস্থান করিতে পারেন না, এই জন্ত সর্ব শক্তিমান পরমাত্মার সচ্ছিদানন্দ ভাব ও শক্তি তাহাতে অব্যাহত থাকে, মন আত্মা হইতে দূরে অবস্থান না করিলেও যদবধি তাহারদিকে পশ্চাত ফিরিয়া বাসনার আকর্ষণে মায়া পরিধির মধ্যে ছুটাছুটি করে, তদবধি ভ্রমজ্ঞান বশতঃ আপনার স্বরূপ ভুলিয়া বিষয় মালিন্তে আপ্ত হইয় এবং তাহার এই ভ্রমজ্ঞান অপগত হইলে যখন সে আত্মার সহিত মিলিতভাব তিরোহিত হয়, তখন আত্ম সম্পদের অধিকারি হওয়ায় তাহার ভ্রমজ্ঞান জনিত জীবভাব অপগত হয়। ভাই ! ইহার নামই মুক্তি। পুত্র পিতার আজ্ঞাধীন ভাবে চালিত হইলে যেমন সে পিতৃ শক্তিতে শক্তিমান থাকে, পিতৃ সম্পদ তাহার সচ্ছিদানন্দ লাভের অনুকূল হয় সেইরূপ মন আত্মার অধীনভাবে চলিলে মুক্তি চৈতন্য প্রভৃতি ঐশ্বর্য লাভ করিয়া প্রকৃত স্বাধীনতার আনন্দ ভোগ করিতে সমর্থ হয়।

এক্ষণে সোধ হয় বুঝিয়াছ যে ভ্রমজ্ঞান বশতঃ মনই সুখ দুঃখ ভোগ করে এবং আত্মাতে তাহার প্রতিবিস্ম পড়ে মাত্র, ষট বিভিন্ন স্থানে নীত হইলে ষটকাস যেমন ষটের অনুসরণ করে, সেইরূপ বাসনার আকর্ষণে মন মায়িক পরিক্রমের মধ্যে ইতঃস্তত ভ্রাম্যমান হইলে দ্রষ্টা স্বরূপে আত্মা তাহার অনুসরণ করেন মাত্র।

বালকপুত্র খেলা করিতে করিতে উঠিতেছে পড়িতেছে, কখন বা ছুটিতে ছুটিতে দূরে যাইতেছে, পিতা দ্রষ্টারূপে অনুসরণ করিতেছেন মাত্র, এইরূপে খেলা করিতে করিতে পতনের আঘাত গুরুতর হওয়ায় যখন পুত্র পিতৃ উদ্দেশে ক্রন্দন

করে তখন পিতা যেমন তাহাকে ক্রোড়ে লন, সেইরূপ অজ্ঞানীশূদ্র মন আনন্দ লাভের বাসনায় ভ্রমবশে মায়ী মরিচীকার মধ্যে ভ্রমণ করে কিন্তু পরিণামে বিষয় গহ্বরে পতিত ও মোহ কণ্টকের আঙ্কুতে জর্জরিত হইয়া যখন ব্যাকুল ভাবে আত্মার উদ্দেশে কাঁদিয়া উঠে, তখন আত্মা তাহাকে নিজের ব্যক্ত স্বরূপের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া তাহার সকল দুঃখের অবসান করিয়া দেন, ফলে যতদিন মন নাবালক বা অজ্ঞানীশূদ্র থাকে ততদিন তাহার দুঃখের সাময়িক নিবৃত্তি হইলেও আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না, সাবালক হইলে অর্থাৎ জ্ঞানলাভ করিলে যখন আত্মার স্বরূপ শক্তি ও ঐশ্বর্যের অধিকারি হয়, তখনই সে আত্ম স্বরূপ হইয়া নিত্যানন্দ ভোগ করে জানিও ।

এখন ইন্দ্রিয়ের সুখ দুঃখের সহিত মনের কি সম্বন্ধ তাহাই আলোচ্য ; পূর্বে বলা হইয়াছে যে মন বাসনার আকর্ষণে মায়ী পরিধির মধ্যে নীত হইয়া ভোগের পথে ভ্রমণ করিতেছে, তৃপ্তি ভিন্ন এই বাসনার নিবৃত্তি হইবে না, কেন না যত দিন না তৃপ্তিলাভ হইবে ততদিন ঐ বাসনা হইতে সংস্কার ও সংস্কার হইতে প্রবৃত্তির উদ্ভব হইবে ও কলুর বলদের শ্রায় তাহার জ্ঞান চক্ষু আবরিত করিয়া সংসার চক্রে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইবে কিন্তু তৃপ্তিলাভ করিতে হইলে ইন্দ্রিয়গণের সাহায্য আবশ্যক অতএব সুচালিত হইলে এই ইন্দ্রিয়গণ যেমন মনকে ভোগের পথ পার করিয়া তৃপ্তিলাভের সাহায্য করে, সুচালিত হইলে সেইরূপ অতৃপ্তির দাবান্নি জ্বলাইয়া মনকে নিরস্তর বন্ধ করিবার কারণ হয় জানিও ।

তেজস্বী অর্শ যেমন কেবল আশ্রাবলে আবদ্ধ থাকিতে চাহে না, নিয়মিত ধাবনে তাহার সুখ বোধ হয় এবং অসংযত ভাবে চালিত হইলে অশ্বহীন ও ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া দুঃখ ভোগ করে, আরোহীর ভ্রমণ বাসনা সত্ত্বেও অশ্বের অকর্মণ্যতা হেতু সেই বাসনা পূর্ণ না হওয়ায় সে দুঃখ অনুভব করে, সুপথে সুচালিত হইয়া অশ্ব সুখী হইতেছে এবং আরোহী রথে বসিয়া সুখে বায়ু-সবন করিতেছে, এখানে অশ্বের সুখের সহিত আরোহীর সুখের যেমন সম্বন্ধ, সেই-রূপ ইন্দ্রিয়ের সুখের সহিত মনের সুখের সম্বন্ধ জানিবে, অতএব এই ভোগের পথে ভ্রমণ করিতে হইলে উত্তম চালক আবশ্যক, কেন না এই পথে গভীর মোহ পঙ্কপূর্ণ রূপ রসাদি পঁচাটী বিষয় গহ্বরে আছে মন আত্মার অসংযত



হইয়া এই পথে ভ্রমণ করিলে তিনি বুদ্ধিকে তাহার বাসনা রথের সারথি, বিচার কে সহচর ও অহঙ্কার কে সহস্ করিয়া দেন, অহঙ্কার বুদ্ধির অহুগত হইয়া মনের পশ্চাতে অবস্থান করে, ফলে সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন হইয়া ইন্দ্রিয়রূপ অশুণ্ডিলির পালন ভার লয় এবং বুদ্ধি পরিদর্শক ও চালকরূপে স্বকর্তব্য পালন করে, ভোগ পথের অবস্থা ভালরূপ অবগত থাকায় বুদ্ধি সাবধানে মনকে এই পথে ভ্রমণ করাইয়া তৃপ্তিদান পূর্বক যখন আত্ম সন্ধানের পৌছাইয়া দেন, তখন মন আত্মানন্দের নিকট ভোগানন্দের তুচ্ছতা উপলব্ধি পূর্বক আপন ভ্রম বন্ধিতে পারে, সুতরাং সংপুত্রের স্থায় সে আর আত্ম সকাশ হইতে দূরে যাইতে চাহে না, ফলে চুম্বক সহবাসে লৌহ পিণ্ড যেমন চুম্বক হইয়া যায়, সেইরূপ সে আত্মার চৈতন্য শক্তিতে শক্তিমান হইয়া আত্ম স্বরূপ হইয়া যায় এবং ইহারই নাম মুক্তি, নচেৎ যে মূঢ় মন অবাধ্য পুত্রের স্থায় আত্মার আদেশ অবহেলা করিয়া অহঙ্কারকে চালক, ভ্রমকে সহস ও আসক্তিকে সহচর করিয়া ভোগের পথে ভ্রমণ করে, তাহার ভ্রম বাসনার কদাচ তৃপ্তি হয় না, রূপ রসাদি বিষয় গহ্বরে পতিত ও 'সোহ কর্দমে আপ্নত হইয়া নিয়ত অহৃপ্তির কষাঘাতে জর্জরিত হয় ফলে জন্ম মরণ ও রোগ শোকাদির তরঙ্গ সংকুল সংগার সাগরে ভাসমান হইয়া নিরন্তর যাতনা ভোগ করে, সুতরাং মুক্তির অতুল আনন্দ তাহার পক্ষে সুদূর পরাহত বলিয়া অনুমিত হয়।

চ। একটি কথা আমি বুদ্ধিতে পারিতেছি না, তুমি কখন আত্মাকে আমি বলিতেছ, আবার কখন মনকে আমি বলিয়া আত্মাকে পিতৃ সম্বোধন করিতেছ, ফলতঃ প্রকৃত আমি কে এবং ভগবানের স্থানই বা কোথায়, তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দাও।

ৱ। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন পুরুষ তিন প্রকার ভাবাপন্ন, ক্ষর, অক্ষর ও উত্তম। খাল, নদী ও সমুদ্র, একই জলের অবস্থা ভেদে ত্রিবিধ উপাদি সম্পন্ন হইলেও মূলে যেমন অনন্ত বারি-সমুদ্র ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপে সর্বব্যাপী সেইরূপ অদ্বিতীয় পরমাত্মা আত্মারূপে জ্ঞেয়াতীতন শ্রীভগবান ও মনরূপে জীব, মনের জীবভাব বিনাশশীল বলিয়া ইহাকে ক্ষর বলা হইয়াছে, ভগবত্তা গুণ—বাচক, আত্মা গুণাতীত বা ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির প্রভূ হইলেও জীবভাব সম্পন্ন সগুণ মন তাহার ধারণা করিতে পারে না বলিয়াই তাহাকে মহান গুণের

আরোপ করা হয়, অথচ গুণাতীত বা প্রকৃতির প্রভু না হইলে মন ভগবত্না লাভ পূর্বক ঐ মহান গুণ সকলের চালক হইতে পারে না—এবং এই ভগবত্না লাভ করিয়া আপন স্বরূপে উন্নতী হইবার জগ্গই মন আত্মা বা শ্রীভগবানের শক্তি আশ্রয় পূর্বক তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল হয় ; ফলতঃ আত্ম ভাবই, মনের প্রকৃত স্বরূপ ভাব, জীব ভাব তাহার ভ্রম জ্ঞানের ফল মাত্র, অন্তর বাহ্যে নদীর সহিত যুক্ত থাকায় নদীর স্রোত বলে, খালের কলেবর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইলে যেমন সে নদী উপাধি প্রাপ্ত হয় সেইরূপ আন্তরিক একাগ্রতা বলে জ্ঞান লাভ করিয়া যখন মন ভাবের দ্বারা আত্মা বা শ্রীভগবানের সহিত যুক্ত হয় তখন ভগবচ্ছক্তি বলে ক্রমশঃ প্রকৃতির অতীত ভূমিতে উন্নীত হওয়ায় তাহার জীব ভাব অপসৃত হয় এবং শিবভাব লাভ করিয়া অর্থাৎ ভগবৎ গুণ সম্পন্ন হইয়া অক্ষর পদে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভাই! ইহাই মনের প্রকৃত স্বরূপ এই স্বরূপ ভুলিয়াই মন জন্ম মরণশীল জীবভাবে আচ্ছন্ন থাকে ও ভ্রমজ্ঞান বশতঃ মিথ্যাকে সত্য মনে করিয়া বুঝা যাতনা ভোগ করে এবং এই যাতনা অসহ হইলে যখন তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার জগ্গ আকুল হয়, তখন আত্মরূপী শ্রীভগবানকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার আদিষ্ট পথে চলিবার প্রয়াস পায় এই প্রয়াস আন্তরিক হইবা মাত্র তিনি বুদ্ধিরূপে সারথি হইয়া তাহাকে তাহার স্বরূপে উন্নীত করিয়া দেন এবং এই জন্যই শাস্ত্রে ঋষিরা জীবকে পদে পদে স্বরণ ফিরাইয়া দিয়াছেন যে “তুমি আত্মা, ভ্রমজ্ঞান বশতঃ আপন স্বরূপ হইতে বিচ্যুত থাকিও না, “উত্তীষ্ঠত জাত্রত, প্রাপ্য বরান্নিবোধত ।” এক্ষণে পরমাত্মা, আত্মা ও জীবের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিলে কি ?

চ। আত্মা ত সর্বশক্তিমান, তিনি নিজের শক্তির দ্বারা মনের এই ভ্রম নাশ করিয়া দেন না কেন ?

র। মন স্বীয় ভ্রম নাশ করিয়া দিবার জন্য আন্তরিক ভাবে প্রার্থনা করিলেই তিনি তাহা পূরণ করেন, কিন্তু মায়ায় ঐমনি কুহক যে, যতক্ষণ না মন ভ্রমের চরমফল অনুভব করে, উতক্রণ তাহার “এ ইচ্ছা হয় না, সুতরাং তিনি সাক্ষী” স্বরূপ কেবল তাহার কৰ্ম্মের ফল দান করিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে মঙ্গলের পথে লইয়া যান, ফলে কৰ্ম্ম মালিগের অনুপাতে ফলের কঠোরতা যখন অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, তখন সহ্য করিতে না পারিয়া মন মুক্তির আকাঙ্ক্ষা

করে এবং যাবৎ এই আকাজক্ষার ফল স্বরূপ জ্ঞানোদয়ে প্রারম্ভ হয় না, তাবৎ জন্ম মরণের অঙ্কুর নষ্ট হয় না বলিয়া তিনি মনের এই অপক্লাবস্থায় তাহাকে সংসার বন্ধ হইতে উন্মোচন করেন না; নতুবা তিনি দয়াময়, তাঁহার কি ইচ্ছা যে মন জীব ভাবে আচ্ছন্ন হইয়া কষ্ট পায়? তিনি তাহাকে ফিরাইবার জন্ত শাস্ত্র মুখে সাধু মুখে কত উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু মন তাহা শুনিয়াও শুনিতেছে না বিষয়ের স্বরূপ না বুঝিলে তাহার শুনিবার বা উপলক্ষ্য করিবার উপযোগী শক্তির উন্মেষ হইবে না জানিয়া যাহাতে সে জ্ঞানলাভপূর্বক তৃপ্তির পথে অগ্রসর হয় ও ভোগেবু অব্যক্ত সীমা পার হইয়া ব্যক্ত চৈতন্তের আনন্দময় রাজ্যে উপস্থিত হইতে পারে, তাহার উপায় নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। পুত্র সুখ চায়, পিতা তাহাকে সেই সুখেরই পথ বলিয়া দিতেছেন কিন্তু অবাধ্য পুত্র যেমন অসংস্কার কুহকে ভ্রান্ত হইয়া বিপরীত পথে সুখ অন্বেষণ করিতে চায়, শেষে ক্রমিক সুখের পরিণাম স্বরূপ দুঃখের কষাঘাতে বারংবার জর্জরিত হইয়া যেমন পিতৃ উপদেশ উপলক্ষ্য করিতে পারে, সেইরূপ মন অবিচার কুহকে ভ্রান্ত হইয়া প্রথমতঃ আশ্রয় উপদেশ উপলক্ষ্য করিতে পারে না, শেষে দুঃখ যখন জন্ম মরণ ব্যাধি প্রভৃতি আকারে তাহাকে নিয়ত আক্রমণ করে তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া আশ্রয় উদ্দেশে আবুল ভাবে কাঁদিয়া উঠে, ফলে ঐ আকুলতার দ্বারা আশ্রয় করণ কটাক্ষ আকর্ষিত হওয়ার সে তৎপ্রেরিত বুদ্ধির সাহায্যে তাঁহার আদিষ্ট পথে চলে ও বিষয়ের স্বরূপ বুঝিয়া তৃপ্তলাভ পূর্বক মুক্ত হয়।

চ। মনের বিষয় এখনও আমার জিজ্ঞাসা করিবার আছে কিন্তু মাশ্ব খানে একটি প্রশ্ন মনে পড়িয়া গেল, এই সময়ে তাহা জিজ্ঞাসা না করিলে আবার ভুলিয়া যাইব, তুমি পূর্বে বলিয়াছ যে, সাত্ত্বিক দ্রব্যই নিবেদিত হইবার যোগ্য, কিন্তু পশুবলি দেওয়ার সাত্ত্বিক নহে, তবে শাস্ত্রে ইহার নিয়ম আছে কেন?

ৱ। আমাদের হিন্দু শাস্ত্রের এই খানেই বিশেষতঃ, কেননা 'দাগা বুলান' হইতে বিচার চরম সীমা পর্যন্ত অধিকারি ভেদে উপদেশ এমন আর কোন শাস্ত্রে নাই, এই যে জীব জগৎ দেখিতেছ, ইহার মধ্যস্থ চৈতন্ত মায়ী উপস্থিত হওয়ার অব্যক্ত, এই অব্যক্ত চৈতন্তকে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করার নাম সাধনা, ও ব্যক্ত চৈতন্তের অনুভব করার নাম সিদ্ধি, আবার অব্যক্ত চৈতন্তের বিভিন্ন

স্তর আছে, জীবের দেহভাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র মানচিত্র স্বরূপ সুতরাং জীব-  
 দেহের মধ্যেও বিভিন্ন স্তর আছে যাহার মন যত নিম্নস্তরে অবস্থান করে  
 তাহার চিত্ত তত অজ্ঞানান্ধন থাকায় তাহার মধ্যস্থ চৈতন্যও তদনুযায়ি অব্যক্ত  
 থাকে, সুতরাং তাহার ভাব ও সেই পরিমাণে মলিন হয়, কিন্তু ভগবান দয়াময় !  
 জীব কর্তৃফলে যতই মলিন ভাবাপন্ন হউক না কেন, তিনি ভাব ভেদে ফল  
 দান পূর্বক শাস্ত মুখে তাহার ও উন্নতির উপায় নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন,  
 ফলে মলিন ভাবাপন্ন জীব যদি তাঁহারদিকে লক্ষ্য করিয়া ভাবের খেলা খেলে,  
 তাহা হইলে ক্রমশঃ জন্ম মরণাদি বিভিন্ন অবস্থার মধ্যদিয়া উন্নতির পথে  
 অগ্রসর হইতে পারিবে বলিয়াই অসং পুত্রের নিকট যেমন পিত্তা ভয়ঙ্কর  
 সেইরূপ অহুর ভাবাপন্ন নিয়াধিকারির নিকট তিনি রাক্ষসী ভাবাপন্ন হইয়া  
 বিহার করেন ও কর্মানুযায়ি ফল প্রদান করিয়া ক্রমশঃ তাহার মলিন ভাব  
 ধৌত করিতে থাকেন, ফলতঃ যাহারা মদ্য মাংসাশী ও তমোগুণ সম্পন্ন নরাধম  
 তাহাদের ক্রমশঃ উন্নতির পথে লইয়া যাইবাব জগত্ই এই বিধান, যদি তাহারা  
 মদ্য মাংসাসক্তির সহিত একটু ধর্ম্য ভাবের সম্বন্ধ রাখে, তাহা হইলে বিভিন্ন  
 অবস্থার মধ্য দিয়া কালে সেই ভাব বৃদ্ধি পাইয়া প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধানের ইচ্ছাকে  
 জাগরিত করিয়া দিবে, এবং ইহাই অজ্ঞানীদের জগত্ পশু বলির স্থূল সর্গ।  
 নতুবা হিংসার দ্বারা কি কখন ধর্ম্য লাভ হয় ? সন্তাবের আকর্ষণে স্থূল বিশেষে  
 হইলেও যেখানে লালসার আকর্ষণে উদর পরিতৃপ্তির জগত্ হিংসা, ধর্ম্য সেখানে  
 হইতে দূরে প্রস্থান করেন, যাহা হইক এইস্থলে আরও একটি কথা বলা  
 আবশ্যক এই যে, কেবল স্থূল অর্থ ই শাস্ত্রাদেশের চরম লক্ষ্য নহে। অধিকারি  
 ভেদে অর্থ ভেদ ; জ্ঞানিগণ আত্মারদিকে লক্ষ্য রাখিয়া মনোঃ পশুভাব অর্থাৎ  
 জীবভাব কে নষ্ট করেন, ফলে মন চৈতন্যময় হইলে সোহহং জ্ঞানের উদয়  
 হয়, যোগীগণ দেহাত্ম বুদ্ধিকে পাশব বা অজ্ঞানের খেলা গোধে উহা আত্মোদ্দেশে  
 উৎসর্গ করেন এবং মনস্থির পূর্বক আত্ম সান্ধ্য লাভ করিয়া সিদ্ধ কাম  
 হন, ভক্তগণ অহংকারের রজস্তম গুণকে পশু ও সশু গুণকে নর কল্পনা পূর্বক  
 উহা চৈতন্যময় শ্রীভগবানের উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া তন্ময় প্রাণে সাধনার ধনকে  
 লাভ করেন, এক্ষণে শাস্ত্রাদেশের লক্ষ্য সম্বন্ধে কিছু বুঝিলে কি ?

চ। ভূমি পূর্বে বলিয়াছ যে, সাম্বিক দ্রব্য নিবেদিত হইবার যোগ্য, এবং সন্তুগণ অবলম্বন করিয়া সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হয়, কিন্তু এখন বলিতেছ সন্তুগণকেও উৎসর্গ করিতে হইবে, ইহার কারণ কি ?

র। ভাই! সাধনার পথে সন্তুগণকে অবলম্বন করিলেও সিদ্ধিলাভের পরে প্রকৃতির অতীত স্থানে পৌঁছিলে আর উহাও থাকে না, এজন্ত সাধকগণ সিদ্ধিলাভের প্রাক্কালে শ্রীভগবানের উদ্দেশে উহাও উৎসর্গ করিয়া চৈতন্য ভূমিতে উন্নীত হন এবং প্রাকৃত গুণত্রয়ের অতীত হইয়া ভগবৎ স্বরূপে অবস্থান করেন।

চ। মনের ভূমি কাহাকে বলে ও কোন ভূমিতে মনের কিরূপ অবস্থা হয় এবং কিরূপেই বা মন উন্নীত হয় তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও।

র। ভূমি অর্থে গ্রাম, সুরের যেমন তিন গ্রাম, মনের সেইরূপ তিন ভূমি, সুর যেমন সুরে সুরে উঠে, সাধনের দ্বারা মন সেইরূপ সুরে সুরে উর্দ্ধগামী হয় ও শেষে প্রাকৃত সীমার পারে গিয়া মুক্তি লাভ করে, তাপ পাইলে ধারম-মেটারের পারা সুরে সুরে উর্দ্ধগামী হয়, সাধারণ তাপে নবম্যাল পর্য্যন্ত উঠে এবং তাপের যত আধিক্য হয় ক্রমশঃ তত উর্দ্ধগামী হইয়া একশত দশ ডিগ্রি উঠিলে যেমন আর জীবন থাকে না, সেইরূপ ভগবদ্ভাবের সাধারণ তাপে মন অধিকা ভূমির শেষ সীমা চতুর্থ সুরে অবস্থান করে, তাপের নূনতায় নিম্নে চলিয়া যায় ও আধিক্য হইলে মন জ্ঞানভূমির মধ্যদিয়া ক্রমশঃ উর্দ্ধে গমন করে এবং জ্ঞানের মাত্রা পূর্ণ হইলে উহার সীমা পার হইয়া যখন চৈতন্য ভূমিতে উন্নীত হয়, তখন আর জ্ঞান থাকে না, ফলতঃ পূর্ণজ্ঞান না হইলে মুক্তি হয় না, কেবল জ্ঞানের আধিক্যানুসারে প্রকৃতির অস্তর্গত সুরে উন্নীত হয় মাত্র, কিন্তু জ্ঞানের পূর্ণতা লইলে যখন মন প্রাকৃত সীমারূপে চলিয়া যায়, তখন আর তাহাকে সাধন মার্গের আশ্রয় স্বরূপ জ্ঞানের মুখাপেক্ষা করিতে হয় না, পরন্তু জ্ঞান ও অজ্ঞানভয়ী প্রকৃতি দাসী ভাবে তাহারই মুখাপেক্ষা করে।

এক্ষণে বোধ হয় বুঝিয়াছ যে, স্বভাবরূপ তাপের হুন্যাধিক্যানুসারে মনের উত্থান পতন হয়, মনের ভূমি প্রধানতঃ তিনটি, অজ্ঞান ভূমি, জ্ঞানভূমি ও চৈতন্যভূমি, সুরের উদারা, মূদারা ও তাঁরা গ্রামের অস্তর্গত যেমন পরদা

আছে সেইরূপ মনের তিন ভূমির অন্তর্গত সপ্তম স্তর আছে, ইহার মধ্যে চতুর্থ স্তরের শেষ সীমা পর্যন্ত অজ্ঞান ভূমির অন্তর্গত, পঞ্চম হইতে ষষ্ঠ স্তর পর্যন্ত জ্ঞান ভূমির অন্তর্গত ও ষষ্ঠ হইতে সপ্তম পর্যন্ত চৈতন্যভূমি। এই স্তরগুলির মধ্যে আবার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ আছে, ইহার মধ্যে প্রধানতঃ দুইটি বিভাগের বিষয় উল্লেখ করিব, যের অন্ধকারময় সুদৃঢ় হইতে বাহির হইবার জন্য যত অগ্রসর হওয়া যায়, বাহিরের আলোক নিকটবর্তী হওয়ার ততই যেমন অন্ধকারের নিবীড়তা কমিয়া আসে ও ক্রমে আলোকের আভাস পাওয়া যায়, সেইরূপ অজ্ঞান ভূমির প্রথম স্তর হইতে অগ্রসর হইয়া যখন মন চতুর্থ স্তরে স্থিতি লাভ করে তখন জ্ঞানালোকের একটু আভাস পায় মাত্র, পরে চতুর্থ হইতে পঞ্চমের পথে অগ্রসর হইতে হইতে উহার প্রথম বিভাগ পার হইয়া দ্বিতীয় বিভাগে উপস্থিত হইলে সেই আভাস স্পষ্টতর বলিয়া বোধ হয় এবং এইরূপে পঞ্চম স্তরে পৌঁছিলে জ্ঞানস্ব্যোদয়ের প্রাক্কালীন উহার আলোক দৃষ্ট হয়, পরে পঞ্চম হইতে ষষ্ঠের উদ্দেশে মন যত ধাবমান হয়, ততই জ্ঞানালোকের উজ্জলতা আধিক্য অনুভব করে, যদিও ষষ্ঠ স্তরে জ্ঞানের পূর্ণতা উপলব্ধি হয়, কিন্তু পঞ্চমের প্রথম বিভাগ উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিতীয় বিভাগে পৌঁছিলে মন চৈতন্যের আভাস পায় পরে ষষ্ঠে উন্নীত হইয়া চৈতন্যের স্বরূপ জ্যোতি বা ব্যক্ত ভাবের মধ্যগত হইলে চুম্বকের ভাবে লৌহ পিণ্ডের চুম্বকত্ব প্রাপ্তির ন্যায় মন আত্ম স্বরূপ হইয়া নিত্যানন্দ ভোগ করে এবং ইহাই মনের প্রকৃত স্বরূপ ; ফলতঃ চতুর্থের শেষ সীমা পর্যন্ত অবিচার অধিকার, ইহার প্রথম বিভাগে অর্থাৎ দ্বিতীয় স্তর পর্যন্ত মন যত ও দ্বিতীয় বিভাগে অর্থাৎ চতুর্থ স্তরের শেষ সীমা পর্যন্ত কিন্তু ভাব ধারণ করে, পরে পঞ্চম হইতে ষষ্ঠ পর্যন্ত নির্মলা প্রকৃতি বা বিদ্যাশক্তির অধিকার, যদি মন চরম লক্ষ্যে উপনীত হইয়া কৃতার্থ হইতে চায় তাহা হইলে ইনি তাহাকে আত্মোপলব্ধি করিবার উপযোগী পূর্ণজ্ঞান লাভের সুহায্য করেন, নদীগর্ভে সম্তরণকালে বিপদের সম্ভব আধিক্য থাকিলেও তীরে উঠিয়া পথ ভ্রান্ত হইলেও যেমন, বিপদের সম্ভাবনা থাকে, সেইরূপ অবিচার অধিকারে অবস্থানকালে অধঃপতনের অধিক সম্ভাবনা থাকিলেও বিচার অধিকারে পদার্পণ করিয়া ভ্রান্তলক্ষ্যে অগ্রসর হইলে পুনরায় অধঃপতনের আশঙ্কা থাকে, কেবল যে সাধকের চৈতন্য কেন্দ্রস্থ আত্মাকে লাভ করিবার লক্ষ্য

স্থির থাকে, তাঁহার পথ ভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকেনা, বিশ্বাস ও ভক্তির  
 বিহীনতালোকবৃত্ত শ্রীভগবানের কৃপারথ তাহাকে লক্ষ্যস্থলে লইয়া যাইবার জন্য  
 অপেক্ষা করে নচেৎ পাস না লইয়া পররাজ্যে উপস্থিত হইলেও যেমন আবদ্ধ  
 হইতে হয়, সেইরূপ তৎ ভাবে অহংকারে রঞ্জিত না করিয়া রাজস অহং-  
 কারের সহায়ে ভ্রান্ত লক্ষ্যে অগ্রসর হইলে শক্তি ও সম্মানের আকাজক্ষা এবং  
 জ্ঞানভিমানের মোহে আবদ্ধ হইতে হয়, ফলে সেই বন্ধন তাহাকে আকর্ষণ  
 করিয়া পুনরায় অবিচার্য অধিকারে নামাইয়া দেয় ফলতঃ পঞ্চমের প্রথম বিভাগে  
 মন বিক্ষিপ্ত ভাব ধারণ করে, এ জন্য এই সময়ে প্রকৃত লক্ষ্য স্থির রাখিয়া  
 সাবধানে এই পথ অতিক্রম করা আবশ্যিক, কেননা এই বিভাগ অতিক্রম পূর্ক ক  
 দ্বিতীয় বিভাগে উপস্থিত হইয়া চৈতন্য জ্যেষ্ঠীর আভাস উপলব্ধি না করিলে  
 মনের এই বিক্ষিপ্ত ভাব অপর্গত হয় না এবং এই বিক্ষেপ নষ্ট করিয়া পঞ্চমের  
 দ্বিতীয় বিভাগে একাগ্র অবস্থায় উন্নীত হইবার একমাত্র উপায় সংস্কার  
 দ্বারা জ্ঞানকে অর্জিত ও বিশ্বাসকে দৃঢ় করা। কেননা বিশ্বাস বলে তৎ শক্তির  
 আবাহন পূর্কক সেই শক্তিবলে সাধনার পথে অগ্রসর হইলে আর পতনের  
 ভয় থাকেনা, মন ক্রমতবে বৃষ্টস্তরে উন্নীত হইয়া সমাধি অবস্থা লাভ করে  
 \*ও আরহুলার কাঁচপোকা হওয়ার ন্যায় তন্ময় ভাবে আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, ভাই !  
 আমাদের দেহ এই ব্রহ্মাণ্ডের মানচিত্র স্বরূপ, এবং ব্রহ্মাণ্ডের স্তরের সহিত  
 মনের স্তরের সম্বন্ধ আছে জানিও, এজন্য যে স্তর পর্যন্ত উঠিয়া মন দেহ  
 ত্যাগ করে, দেহান্তে ব্রহ্মাণ্ডের সেই স্তর পর্যন্ত তাহার গতি অব্যাহত থাকে,  
 রাজা যেমন ইচ্ছা করিলে দরিদ্রের নিকট যাইতে পারেন, কিন্তু দরিদ্র ইচ্ছা  
 করিলে রাজসাক্ষাৎ পাইতে পারে না, সেইরূপ উর্দ্ধস্তরের জীব ইচ্ছা করিলে  
 নিম্নস্তরে আসিতে পারে কিন্তু নিম্ন স্তরে জীব ইচ্ছা করিলে উর্দ্ধস্তরে যাইতে  
 পারে না ফলে যত উর্দ্ধস্তরে গমনোপযোগী সাধন করিয়া জীব দেহত্যাগ করে  
 সুখের মাত্রাধিক্য তত ভোগ ভূমিতে করিলেও যে পর্যন্ত প্রকৃতির অতীত চৈতন্য  
 উন্নীত হইতে না পারে, তদবধি পতনের সম্ভাবনা দূর হয় না। যুগ্ম হউক মনের  
 ভূমি সম্বন্ধে বলা হইল, এক্ষণে কোন ভূমিতে মনের কিরূপ অবস্থা হয় উপমা  
 শাস্ত্রীয় প্রমাণের দ্বারা তাহা আরও বিশদ ভাবে বলিতেছি শ্রবণ কর।

মন যাবৎ চতুর্থ স্তরের নিম্নে অবস্থান করে, তাবৎ তাহার স্বভাব বিষ্ঠা-  
কৃমিবৎ, বিষ্ঠাকৃমিকে মধুর পাত্রে রাখিলে যেমন তাহার স্বভাব নোথ হয় সেই  
রূপ তাহার ভগবৎ প্রসঙ্গ ভাল লাগে না, ভূতগ্রন্থ ব্যক্তি যেমন রাম নাম  
শুনিলে পলাইয়া যায়, সেইরূপ সংপ্রসঙ্গ হইলে সে স্থান হইতে সে উঠিয়া  
যায়, এই সময়ে তাহার বুদ্ধি তমোগুণে আবৃত থাকায় তাহার জ্যোতী মনের  
উপর কণামাত্র প্রতিফলিত হইতে পারে না, এইরূপ তামস বুদ্ধি সম্পন্ন জীব  
সম্বন্ধে ভগবান গীতায় বলিয়াছেন—

অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্ততে তমসাবৃত।।

সর্কার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥

অর্থাৎ তামস বুদ্ধি সম্পন্ন জীব অধর্ম্মকে ধর্ম্ম মনে করে এবং ভাব অশুদ্ধ  
ধাকায় সকল কথার বিপরীত অর্থ গ্রহণ করে ।

খাদ যুক্ত স্বর্ণকে যতবার দন্ধ করা যায় ততই যেমন তাহার মলিনতা অপগত  
হইতে থাকে সেইরূপ রোগ শোকাদি অশান্তির তাপে দন্ধ হইয়া মন অপেক্ষা-  
কৃত মার্জিত হইলে যখন চতুর্থস্তরের প্রথম বিভাগে আরোহণ করে, তখন  
উহা বিষ্ঠা মক্ষিকার ত্রায় স্বভাব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ বিষ্ঠামক্ষিকা দৈবক্রমে  
সন্দেহে বসিলেও যদি নিকটে বিষ্ঠার গন্ধ পায় তবে তৎক্ষণাৎ সন্দেহ ছাড়িয়া  
যেমন বিষ্ঠার উদ্দেশে ধাবমান হয়, সেইরূপ এই অবস্থায় মন সংপ্রসঙ্গ শ্রবণ  
করিলেও বিষয় প্রসঙ্গের আভাস পাইবামাত্র তাহার দিকে ধাবমান হয়, কিন্তু যে  
মুখের আশায় সে বিষয় মরিচীকার উদ্দেশে ছুটাছুটি করে তৃহাতে শান্তি  
না পাইয়া ক্রমে যখন অশান্তির মাত্রা বৃদ্ধি পায়, তখন বাহ্যে প্রকৃত শান্তি  
আছে, স্বভাব বশে তাহার দৃষ্টি সেই দিকে পতিত হয়, ফলে এইরূপে চতুর্থ  
স্তরের দ্বিতীয় বিভাগে উন্নীত হইলে সে মক্ষিকার ত্রায় স্বভাব প্রাপ্ত হয়,  
মক্ষিকার যেমন বিষ্ঠার সহজ লভ্য হইলে আর বিষ্ঠার দিকে লালসা থাকে  
না, সেইরূপ এই অবস্থায় সংপ্রসঙ্গ শ্রবণের সুযোগ উপস্থিত হইলে সে সময়ে  
সে বিষয় প্রসঙ্গ হইতে দূরে থাকিতে চায়, এই অবস্থায় তাহার বুদ্ধি রজোগুণে  
আবৃত থাকে এবং রজোগুণ তমোগুণ হইতে অপেক্ষাকৃত সচ্ছ হওয়ায় সে  
জ্ঞানালোকের আভাস পায় মাত্র, কিন্তু তাহা স্পষ্ট না হওয়ার প্রকৃত ভাব



বুঝিবার সীময়িক চেষ্টা করিলেও ধারণা করিতে পারে না। অথচ কামদিত্য চাকল্য বশতঃ বুঝিবার চেষ্টা অধিকক্ষণ স্থির রাখিতেও অক্ষম হয়, এই সীময়িক ভাব সম্বন্ধে ভগবান গীতায় বলিয়াছেন—

যয়া ধর্ম্ম মধর্ষ্মং চ কার্ষ্যং চা কার্ষ্য মেব চ ।

অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসৌ ॥

অর্থাৎ রাজস বুদ্ধি সম্পন্ন জীব ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারে না। কিন্তু এই অবস্থায় বুঝিবার চেষ্টা স্থায়ী না হইলেও সাময়িক আবেগ বশতঃ তাহার সংসঙ্গ করিবার ইচ্ছা হয় এবং তাহার ফলে সংপ্রসঙ্গের রস অনুভব করিবার যখন অপেক্ষাকৃত স্থির ভাবে উহাতে নিপু থাকে, তখন জানিও যে তাহাতে জ্ঞান সৃষ্টিদায়ের প্রাক্কালীন উন্নত আলোক পতিত হইয়াছে, এবং ইহাই ভক্তিব্যোগ সিদ্ধির পূর্বলক্ষণ, এই অবস্থাপন্ন জীবের সম্বন্ধে শ্রীভগবান ভাগবতে বলিয়াছেন—

যদৃচ্ছয়া মং কথাদৌ জাতপ্রকৃত্ত যঃ পুমান্ ।

ন নির্কিরৌ নাতি সন্তো ভক্তি যোগোহস্য সিদ্ধিদঃ ॥

অর্থাৎ যাহার বিষয়াশক্তির তীব্রতা কমিয়াছে এবং আমার প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ স্নেহা জন্মিয়াছে, তাহার ভক্তিব্যোগে সিদ্ধি লাভ হওয়া সম্ভব।

মনের গতি এই সময়ে একটু দ্রুত হইলে শীঘ্রই সে পঞ্চম স্তরের প্রথম বিভাগে আরোহণ করে এবং এই সময়ে চিত্তশুদ্ধি জনিত জ্ঞানের উন্মেষ হওয়ার বিশ্বাস দৃঢ় হইলে সে মধুমক্ষিকার স্থায় স্বভাব প্রাপ্ত হয়, মধুমক্ষিকা যেমন মধু ভিন্ন অল্প কিছুতে বসে না, সেইরূপ সে যেখানে সংপ্রসঙ্গ ভিন্ন অপর বিষয়ের আলোচনা হয়, সেখানে অবস্থান করিতে পারে না, বিশ্বাসজনিত নির্ভরতার উদয় হওয়ায় এই সময়ে শ্রীভগবান তাহার চিত্ত কামশঃ চিহ্নস্তির সঞ্চার করিয়াছেন, তিনি গীতায় বলিয়াছেন—

তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্ ।

দদামি বুদ্ধিযোগন্তং যেনমানুপযাঙ্ক্তি তে ॥ •

অর্থাৎ যে সতত যুক্তভাবে প্রীতির সহিত আমার ভজনা করে, সে বাহ্যতে আমাকে প্রাপ্ত হয় আমি তাহাকে তদনুযায়ী বুদ্ধি দান করি।

ফলে এই সময়ে বুদ্ধি সত্ত্বগুণাবৃত থাকায় সত্ত্বগুণের সচ্ছ আবরণের মধ্য দিয়া বুদ্ধির জ্যোতী মনের উপর প্রতিফলিত হয় সুতরাং মন সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন হইয়া যায়। গীতার সাত্ত্বিকী বুদ্ধি সম্বন্ধে ভগবান বলিয়াছেন—

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ কার্যাকাৰ্য্যে ভয়াভয়ে ।

বদ্ধং মোক্ষং চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥

অর্থাৎ বুদ্ধি সাত্ত্বিকী ভাবাপন্ন হইলে, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি জনিত ফলাফলে অভিভূত, কৰ্তব্যাকৰ্তব্য মোক্ষ এবং বদ্ধ ও মোক্ষের জ্ঞানোদয় হয় অর্থাৎ কোন কার্য্য করিলে বদ্ধ ও কোন কার্য্যে মুক্তি হয় তাহা বুঝিতে পারে।

ফলতঃ এই সময়ে তাহার জ্ঞান লাভ হওয়ায় সে আপন স্বরূপ ও কর্ম্মের কৌশল অবগত হয় সুতরাং চিহ্নজি বলে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া সম্বন্ধে নিয়মিত করিয়া ভোগের প্রভুরূপে প্রারম্ভ ক্ষয় করে, রূপ রসাদি বিষয় সকল তাহার জ্ঞান দৃষ্টির সম্মুখে আর আত্ম জ্যোতীকে ঢাকিয়া রাখিতে পারে না, মন তখন প্রত্যেক বিষয়ের আবরণ খুলিয়া তন্মধ্যস্থ আত্ম জ্যোতীকে সন্তোষ করে, সর্গভূতের মধ্যে সে চৈতন্য সত্ত্বাকে অনুভব করিতে সক্ষম হয়। মরিচীকার স্বরূপ অবগত হইলে যেমন তাহার দ্বারা পথিক আর অভিভূত হয় না; সেইরূপ বিষয়ের স্বরূপ অবগত থাকায় আর সে বিষয়ের দ্বারা অভিভূত হয় না, এই সময়ে অহঙ্কারের মলিনতা অপগত হওয়ায় সে মনকে নিয়াভিমুখে আকর্ষণ না করিয়া বরং উদ্বিগ্নমনের সাহায্য করে, ফলে এইরূপে উন্নতির পথে ক্রমত অগ্রসর হইয়া ষষ্ঠস্তরে সংলগ্ন হইলে সে পতঙ্গের স্থায় স্বভাব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ পতঙ্গ যেমন লন্টনের মধ্যে আলোক দেখিয়া তাহাতে পতিত হইতে চায়, কিন্তু কাঁচের আবরণ থাকায় সফল কাম হইতে পারে না, এইরূপ সে স্বদয় মধ্যে চৈতন্যময় আত্ম জ্যোতী বা জ্যোতীখন ভগবদ্ভুক্তি শর্শন করিয়া ভগ্নয় ভাবে সেই সাধনার ধনকে স্পর্শ করিতে চেষ্টা পায়, কিন্তু নির্মূল প্রকৃতির আবরণ থাকায় সক্ষম হয় না, কারনিক স্পর্শে প্রতিবিদিত আনন্দ উপভোগ করে মাত্র, এই অবস্থার তাহার পূর্ণ নির্ভরতার উদয় হওয়ায় ভগবান তাহার সমস্ত ভার লন, তিনি গীতার বলিয়াছেন—

অন্যান্যামিন্দ্রিয়স্তোমাং যে জনাঃ পথ্যুপাসতে ।

ভেষ্যং সিত্যাভিগুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং ॥

অর্থাৎ যে অনন্যভাবে আমার চিন্তা করে অর্থাৎ যাহার ভাবস্থায়ী হয় তাহার সমস্ত ভার আমি বহন করি।

এইরূপে ক্রমে ষষ্ঠস্তরের উপরে উন্নীত হইলে মন যখন প্রকৃতির অতীত স্বরূপচৈতন্যের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন চুম্বক সহবাসে লৌহের চুম্বকত্ব লাভের ন্যায় আত্ম সংস্পর্শে আত্মভাবাপন্ন হইয়া যায়, বন্ধ বারি শীঘ্র বিয়ত ও শুষ্ক হয় কিন্তু মুক্তবারি অর্থাৎ যে নদীর বারি স্বরূপ সমুদ্রের সহিত যুক্ত তাহা যু যেমন বিকৃতি বা ক্ষয় হয় না, সেইরূপ মন আত্মভাবাপন্ন হইয়া পরমাত্ম স্বরূপে অবস্থান করায় নিত্যযুক্ত ভাবে অনন্ত আনন্দ সম্ভোগ করে, এখন মনের ভূমিগত অবস্থান্তর সম্পর্কে বুঝিলে কি ?

ভাই! মনে ভূমির সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হইল, তাহা কেবল কৌতু-  
হলের বশবর্তী হইয়া শুনিয়া গেলে কোন ফল নাই, কার্যের দ্বারা পরীক্ষা  
কর, তোমার মন কোন ভূমিতে আছে অনুসন্ধান কর ও ক্রমশঃ উত্থাকে স্তরে  
স্তরে উন্নীত করিবার প্রয়াস পাও, কিন্তু সাবধান! যেন ভাবের স্বরে চুরি  
করিয়া আত্ম বঞ্চনা করিও না, উন্নতির অকপট ইচ্ছা কখনও বিফল হয় না বটে  
কিন্তু লোক দেখান ভাবে আত্ম বঞ্চনা হয় মাত্র, সময় তোমার জন্য অপেক্ষা  
করিতেছেন, নিত্য সুখের অন্বেষণ কর, তিনদিনের মধ্যে চিরকাল হারাইও  
না, অনন্ত সুখ তোমার সম্মুখে, অশ্রম হও, কাপুরুষের ন্যায় মৌহাচ্ছন্ন চিন্তে  
বিষয়ের জ্ঞেয় হইয়া ইহপরকালের শাস্তি হারাইও না, সর্বদা লক্ষ্য রাখিবে যে  
মন কোন স্তরে ভ্রমণ করিতেছে, নগর বাহ্য বিষয়ের সম্বন্ধ বশতঃ পূর্ব সংস্কারের  
আকর্ষণে যদি কোন সময়ে মন নামিয়া যায়, তৎক্ষণাৎ তাহাকে তুলিয়া দিবে,  
অধিক্ষণ বেহঁস হইয়া থাকিও না, এইরূপে যখন কুসংস্কার গুলি নিস্তেজ হইয়া  
ক্রমে শুধাইয়া যাইবে তখন আর নিম্নাকর্ষণ না থাকায় মন দ্রুতবেগে উন্নীত  
হইবে, সংস্কারের নগ্নতা ও ত্রীভগবানের সর্বব্যাপী অলুভব করিবার জন্য  
মনকে সর্বদা উন্মুখ করিয়া রাখ, অধিক আর কি বলিব, যদি নিজের প্রকৃত  
উন্নতি চাও, তবে বৃথা সময় নষ্ট করিও না, মনকে উন্নীত করিবার যে উপায়  
বলা হইল কেবল শ্রবন করিয়া বসিয়া থাকিও না, তদনুযায়ি কার্য করিয়া  
কৃতার্থ হও, চেষ্টা আন্তরিক হইলে নিঃসন্দেহ ঐশ্বরিক সাহায্য লাভ করিবে।

জানিও, আমরা সংসারের জীব, ভাব অব্যাহত করিবার চেষ্টাই আমাদের যোগ মাধন, ও ভাবের স্থায়িত্বই যোগ সিদ্ধি। তবে জ্ঞানের আধারুভিন্ন এই ভাব-বারি সঞ্চিত হয় না, এ জন্য সংসার ও সংগ্রহ অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞানার্জন কর। তীত্র চেষ্টাই সাফল্যের জনক স্বরূপ। প্রথমতঃ একটু কঠোর বা নীরস হইয়া পশ্চাৎপদ হইও না। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—“সর্কারস্তোহি দোষণে ধূমেনাগ্নি রিবাবৃতঃ” আগুন জ্বালিতে হইলে ধূমোদগার জনিত কষ্ট সহ্য করিতেই হয়। অতএব প্রথম অবস্থায় শ্রীভগবানের স্বরূপ না জানিলেও কঠোর বিধিগত পূর্বক সেই সর্কার্যাপী সত্তার আশ্রয় লও, তিনি তোমাকে এই ধূমোদগার জনিত কষ্ট সহ্য করিবার শক্তি দিবেন এবং সময় হইলে নিজের আবরণ উন্মোচন করিয়া তোমাকে কৃতার্থ করিবেন, নিরাশ হইও না, সফলতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া অগ্রসর হও ।

হরেন্দ্র শর্মা ।

## গীত ।

—:০:—

মন কি চিন্তায় চিনবে তাঁরে !

ধীরে ধৌগীজন চিন্তে,

চিন্তায় নারেন চিন্তে,

তুমি অচিন্তায় চিন্তে,

পারিবে কি ক'রে ॥

ব্রহ্মা বিধু ধীরে নাহি পান চিন্তে,

ধীর চিন্তা লাগি শিব পদ প্রাপ্তে,

তুমি ল'য়ে কোন চিন্তে,

করিবে তাঁর চিন্তে,

পারিবে কি চিন্তে,

আনন্দ নয়ীন্দ্রে ॥

ধাকিতে বিষয় বিভবের চিন্তা,

আসিবেনা কভু ত্রময়ের চিন্তা,

মিটাইয়ে চিন্তা,

গুরু পদ চিন্তা,

করিলে সুচিন্তা,

পাইবে অন্তরে ॥

একাগ্র মনেতে করিলে চিন্তা,  
 দূরে যাবে ভব মায়া মোহ চিন্তা,  
 যুচাতে কুচিন্তা,                      কর নাম চিন্তা,  
 চিনিবি অচিন্তায়,                      চিন্তামনী মা'রে ॥  
 সূচিন্তায় সদা চিন্ত মন তারা,  
 চিন্তা জরে আর কত হবে জ্বরা,  
 চিন্তামনি পুরে,                      মা মোর অন্তরা,  
 চিন্তাতে রাখিলে,                      দেবেন দেখা তোরে ॥  
 শচী কয় মা গো তুমি আদ্যাশক্তি,  
 শক্তি হীন প্রাণে দাও গো মা শক্তি,  
 থাকিতে মা শক্তি,                      বিষয়ে আসক্তি,  
 দিও গো মা মুক্তি,                      দীনে দয়া ক'রে ॥  
 দীন—শ্রীশচীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

## প্রার্থনা ।

—:0:—

হুরি হুরি আর ক'বে,                      হেন শুভ দিন হ'বে,  
 দূরে যাবে কু-বাসনা মোর ।  
 ত্যজি আত্মমুখ আশ,                      সাধু-সনে করি বাস,  
 নাম গানে হইব বিভোর ॥  
 প্রেম-রসামৃত ধাম,                      শ্রীরাধা গোবিন্দ নাম,  
 বলিতে-শুনিতে কবে মোর ।  
 প্রাণ মন পুলকিত,                      হইবেরে প্রবাহিত,  
 প্রেমানন্দে ছনয়নে-লোর ॥

তেরাগিয়ে অভিমান, আপনাকে হীনজ্ঞান,  
করিব, সত্য মনে মনে ।

একান্ত ভকতিভরে, মনে প্রাণে ঐক্য করে',  
ডাকিব ত্রীশচীর নন্দনে ॥

শ্রু মোর গৌররায়, রূপা করি এজনায়,  
করিবেন ভবকূপে দ্রাণ ।

প্রেমাবেশে কুতুহলে, রাধে দয়া কর বলে,  
ব্রজপুরে করিব পয়ান ॥

শিব, ব্রহ্মা আকাজিকত, রজে হব বিলুপ্তিত,  
নরতনু হইবে সফল ।

হেরিব নয়ন ভরি, বসু সিংহাসনোপরি,  
যুগলের চরণ কমল ॥

রূপা করি এই দীনে, রসিক ভকত জনে,  
ত্রীচরণে দিবেন আশ্রয় ।

কৃষ্ণ কথা রসামৃত, পিব স্থখে অবিরত,  
বিন্দু হবে এ পোড়া হৃদয় ॥

ও হে শ্রু গোঁর হরি, ভক্ত বাহ্য পূর্ণকারী,  
প্রেমময় পতিত পাবন ।

ভক্তি আমি সকাতরে, করুণা নয়নে হেঁটে,  
কর মোর অভীষ্ট পুরণ ॥

ত্রীশশিভূষণ সরকার ।

গীত ।

—:০:—

জগত সুরো জগত বন্ধো জগত পিতা জগত আমি,  
সকলে আরাধে তেয়ার আরাধ্যের ধন হরি তুমি ॥

কেহ তন্ত্রে কেহ মন্ত্রে কেহ সাধে মন যন্ত্রে,  
 তারে তারে তার মিলিয়ে, মন প্রাণের টানে টানি ॥  
 কেহ ধ্যানে, কেহ জ্ঞানে, কেহ তব গুণ গানে,  
 প্রেমামন্দে নাচে কেহ হৃদয়ে তোমারে জানি ॥  
 ভাবে যারা ভাবে ভাবে, তারাত নাথ তোমায় পাবে,  
 সাধন ভজন বিহিনা ভবের মাঝে একা আমি ॥  
 যে ভাব দিয়েছ আমার, সেই ভাবে নাথ ভাবি তোমায়,  
 প্রেম ভাব নাই এ ভাবে, তন্ত্র মন্ত্র নাহি জানি ॥  
 না জানি গতি কি হবে, দয়াময় কি দেখা দিবে,  
 ( তোমায় ) পতিত অধম তারণ সাধু শাস্ত্রে বলে শুনি ॥  
 সেই নাম সার করে, পড়ে আছি তব দ্বারে,  
 নিজগুণে জ্ঞানদারে, ( যদি ) দাও রাক্ষা চরণ হুখানি ॥

জ্ঞানদা ।

রাক্ষা পাতু'খানি ।\*

—:০:—

( ১ )

( রাগিণী বেহাগ ধামাজ একতারা। )

[ শ্রীকৃষ্ণ পদ । ]

জনলো সজনী, সে রাক্ষা পা'তু'খানি

অপরপ শোভা ধরে ।

পেয়ে রবি ইন্দু-পদ ভাতি বিন্দু  
 উজ্বরে বিশ্ব মাঝারে ।  
 শুনিয়াছি কানু কুম্ম শেজে ;  
 চন্দনে চর্চিত শ্রীপদ পঙ্কজে,  
 বতনে ধরিলু হৃদি-সর মাঝে,  
 জুড়া'তে হিয়া-জ্বালা রে ।  
 হেরিলু কানুর করণ যুগল,

[ \* রাক্ষা পা হু'খানির চিত্র গম্বিহিত সুবুল্লিত চিত্রপট সন্দর্শনে শ্রীত হইয়া ভক্ত প্রবর  
 সুধোপাধায় মহাশয় দুইটি উশাদের গান লিখিয়া এ দীনহীনকে উপহার স্বরূপ পাঠাইয়া  
 দিয়াছিলেন। আমি তাঁহার এই কৃপাদত্ত প্রেমের ডালি অতীব আনন্দে ও কৃতজ্ঞতা  
 লব্ধকরে গ্রহণ করিয়া বস্তু হইয়াছি। ভক্তির ভক্ত-ভজন-পরায়ণ প্রেমিক পাঠক বৃন্দ  
 এই দুঃখের সংগীত ধরের বনাম্বাদন করুন। দীন—ঐরসিকলাল দে, সোনামুখী ।

উনবিংশ চিহ্ন তাহে ঝলমল,  
ধব, চক্রে, ছত্র, অক্ষুশ, কমলী,  
মরি কিবা সুসমা রে ।

আর অষ্ট কোণ, চক্রে উর্দ্ধ রেখা,  
অস্তিক চতুষ্টিয়, ধ্বজা পতাকা,  
জম্বুফল চারি, অশনি সুরেখা,  
দক্ষিণ পদ তলে রে ।

আকাশ, ধনুক, গোম্পদ, ত্রিকোণ,  
অর্ধ চন্দ্র, শঙ্খ, চারিকুন্ত, মীন,  
বাম পদ তল করিছে শোভন,  
যাহে মুনি মন হরে ।

বিমল রাতুল চরণ আভায়,  
বিমোহিত চিত হইল তন্ময়,  
পাপ তাপ হারী ( সে ) চরণ চিন্ময়  
অনন্দা সদা ভাব রে ।

[ শ্রীরাধা পদ । ]

( ২ )

( ঝিঝিট একতালা । )

মহাভাবাবেশে বিগলিত কেশে  
বিবশা কিশোরী নিধুবনে ।  
সে ভাব নিরখি বিমোহিত আঁখি  
অবশ মানস সেরূপ ধ্যানে ।

সাদরে ধরিসু সাধনের ধনে,  
হৃদয় মাঝারে আকুল পরাণে,  
হেম কমলিনী নিষ্পন্দ নয়নে  
নিরখে নীরবে আমা পানে ।

বালাকুণ জিনি রাই-পদ তল,  
উনবিংশ চিহ্নে করে ঝলমল,  
তার মাঝা দিয়া নয়ন কজ্জল  
স্মৃতিতরে লিখিবু স্বনামে ।

যব, চক্রে, ছত্র, বলয়, নলিন,  
ধ্বজ, পতাকা অক্ষুশ, প্রস্নন,  
উর্দ্ধরেখা, অর্ধ রজনী ভূষণ,  
কুসুমিত লতা বাম চরণে !

দক্ষিণ চরণে মংস্য, কুণ্ডল,  
বেদী, রথ, শক্তি, হুশঙ্খ, মুঘল,  
কিবা সে মাধুরী স্তন হে সুবল,  
জাগিছে সতত মম মনে ।

পরমা প্রকৃতি ফ্লাদিনী রুপিণী,  
গুণাতীতা রাধা সর্ব গুণ খনি,  
যাচিছে অনন্দা রাস্তা পা'ছুখানি  
রাখ রাস্তা পা'রাই স্বগুণে ॥

দীন— শ্রীঅন্নচরণ মুখোপাধ্যায় ।



# শ্রী শ্রী গুরুর চরণ দর্শনে হৃদয়োচ্ছ্বাস ।

১

শুষ্ক মরুভূমি সম ছিল যে হৃদয় ।  
বিষাদ বালুকা ভরা,  
নিরাশা শূন্যেতে ঘেরা,  
অশান্তি উত্তপ্ত বায়ু বহিত যথায় ॥  
কিন্তু একি অসম্ভব,  
হেরি আজ অভিনব,  
কোথা গেল সে কঠোর দৃশ্য সমুদয় !  
তার পরিবর্তে একি !  
আনন্দ সাগর দেখি,  
বহিছে মধুর রবে প্রাবিয়া হৃদয় ॥  
আনন্দ তরঙ্গ রত,  
উঠিতেছে অবিরত,  
বহিছে শীতল বায়ু শুধু শান্তিময় ॥

২

অকস্মাৎ কি কারণে এ পরিবর্তন ।  
ঘটিল ক্ষমত্রে মম,  
আশান্তিতে অনুপম,  
জানিবারে বড় ইচ্ছা এস শুভ কারণ ॥  
এই যে, এই যে, হেরি,  
ভুবন উজ্জল করি,  
সম্মুখে নগ্ন মনঃ প্রাণ বিমোহন ।

অতুল্য অমূল্য ধন,  
ভক্তের আরাধ্যতম,  
শোভিছে রাতুল ঐ শ্রীগুণ চরণ ॥  
তাই এ কঠিন চিত্ত,  
হর্বনীরে দ্রবীভূত,  
লভিয়াছি এবে যেন নতন জীবন ।

৩

পুনঃ ঐ শ্রীচরণে,  
হেরি বড় সাধ মনে,  
হতেছে হৃদয়ে করি ও পদ স্থাপন ॥  
কিস্ত এ বাসনা মম পূরিবে কেমনে ?  
উত্তম সামগ্রী লোকে,  
কতই যতনে রাখে,  
না রাখে উত্তম বস্তু কভু মন্দ স্থানে ॥  
তবে আমি কেমনেতে,  
মোহ মলিন চিন্তেতে,  
রাখিব নিশ্চল ঐ যুগল চরণে ।  
কঠিন হৃদয়ে মম,  
ফুল কোকনদ সম,  
কোমল চরণ ধানি রাখিব কেমনে ॥  
পাপ তাপ কঙ্করাদি,  
পরিপূর্ণ আছে হৃদি,  
বাজিবে যে ব্যথা তাহে কোমল চরণে ।  
অতিশয় সুশীতল,  
ঐ যে পদ যুগল,  
তপিত হৃদয় মাকে রাখি কোন প্রাণে ॥

কাম ক্রোধ লোভ আর,  
হিংসা ঘেব অহঙ্কার,  
কত দহুগণ সদা ফিরিছে বেখানেে ।  
অমূল্য রতন ছুটী,  
তাহলে লইবে লুটি,  
কেমনে রাখিব সেথা ভয় হয় প্রাণে ॥

৪

শ্রীপদের তুলনায় আছে কোন স্থান ।  
স্বর্গ মর্ত্য ত্রিসংসারে,  
যোগ্য স্থান হতে পারে,  
ঐ সারাংসার বস্তু করিতে ধারণ ॥  
ভবে কি সাহসে আর,  
আশা করি পাইবার,  
দেবের হুলভ ঐ যুগল চরণ !  
কাজ নাই দূরে থাকি,  
নয়ন ভরিয়া দেখি,  
চির আকাঙ্ক্ষিত ঐ যুগল চরণ ॥  
দেখিতে দেখিতে যেন,  
হারাইয়া বাঞ্ছা জ্ঞান,  
মিশায় শ্রীপদে চিরতরে প্রাণ মন ।  
এ আকাঙ্ক্ষা কবে মম হইবে পূরণ ॥

শ্রীমতী নীলনালিনী দাসী ।

# জয় দেব গোস্বামী ।

( পূর্ব প্রকাশিতের পর । )

—:—

“মালীর দুহিতা নিজ বাতাকুর খেতে ।  
পড়ে গীতগোবিন্দ মুঞি গেলাম শুনিতে ॥  
ধাইতে পশ্চাতে বাতাকুর কাটা লাগে ।  
তুষ্টহৈ বড় তাঁরে আন মোর আগে ॥  
শ্রীগীত গোবিন্দ পাঠ যেখানে যে করে ।  
অবশ্য সেখানে মুঞি যাই শুনিবারে ॥”

ভক্তমাল ।

রাজ্য পরদিন প্রত্যুষে সেই মালীর কথাকে শিবিকারোহণ করাইয়া  
বহু সন্মানের সহিত আনাইলেন, এবং জগন্নাথ দেবের সন্মুখে ঐ কথ্য  
গীত গোবিন্দ পরমানন্দে গাইতে লাগিলেন। এখনও ঐ মালিনীর বংশ  
ধরগণ প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় শ্রীগীত গোবিন্দ পাঠ করেন।

একদিন জয়দেব গোস্বামী রাধা মাধবের পর্ণশালাটী ভগ্ন হইয়া, ঠাকুরের  
সুন্দর বদনে রৌদ্র লাগিয়াছে দেখিয়া, পদ্মাবতীকে কহিলেন “এই কুটির  
এখনই মেরামত করিতে হইবে, কারণ রাধা মাধবের সুন্দর বদন রৌদ্রে  
কালিমা প্রাপ্ত হইতেছে, অতএব তুমি ভিতর হইতে গেরো কুড়িয়া দাও,  
আমি উপর হইতে ঝাঙ্কিতেছি। তাহা হইলে এখনই কার্য সমাধা হইবে”  
কিয়ৎকাল পরে পদ্মাবতী কার্যান্তরে গমন করিলেন। জয়দেব গোস্বামী  
তাহাকে লক্ষ্য না করিয়া পূর্ববৎ ফোঁড়া গেরো পাইতে লাগিলেন। অন্তর  
পদ্মাবতীকে কার্যান্তর হইতে আসিতে দেখিয়া, সংশয় চিত্তে কহিলেন, “তুমি  
দূরে গিয়াছিলে, তবে ভিতর হইতে কে গেরো কুড়িয়া দিতেছে ?” তিনি  
চাল হইতে নিম্নে আসিয়া দুই মধ্যে দেখিলেন, কেহ কোথাও নাই।

অবশেষে রাধা মাধবের হস্তে ঝুল ও ময়লা দেখিয়া বুঝিলেন যে প্রভু আমার রৌদ্রে কষ্ট হইতেছে ইহা দেখিয়া যাহাতে শীত কার্য্যশেষ হয় তাই গিরা ফুড়িয়া দিতেছিলেন।

জয়দেব গোস্বামী ঠাকুর সেবার জন্ত অর্থাৎ অনাটন দেখিয়া ভিক্কার দেশান্তরে গমন করিলেন। কিছুদিন তিফা করিয়া অর্থ সংগ্রহ হইলে, গৃহান্তিমুখে ফিরিলেন। পথি মধ্যে কয়েক জন দস্যু মিলিয়া অর্থ সকল কাড়িয়া লইল, এবং তাঁহাকে বিনাশ করিবার উদ্যোগ করিল। তিনি দস্যুগণকে কহিলেন, ভাই! অর্থ সকলত লইলে আমাকে বিনাশ করিবার কি প্রয়োজন? দস্যুগণ কহিল তুমি গ্রামে গিয়া আমাদিগকে ধরাইয়া দিবে। কেহ তাঁহাকে বিনাশ করিতে বলিল, কেহ তাহার নাক কাটিয়া দিতে বলিল, কেহ বা হস্ত পদাদি কাটিয়া দিতে বলিল। অবশেষে দস্যুগণ তাঁহার হস্তপদ কাটিয়া বন মধ্যে এক কূপে ফেলিয়া দিয়া পলায়ন করিল। দুই তিন দিন মধ্যে একরাজা ঐ বন মধ্যে হুগয়া করিতে আসিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। রাজা তাঁহার সপীয় কাষি দেখিয়া ও কৃষ্ণ কৃষ্ণ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কূপ হইতে উত্তোলন করিলেন এবং তাঁহার হস্ত পদ ছিন্নের বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি কিছু মাত্র বেদনা বা ক্লোভ প্রকাশ না করিয়া কেবল “শীতের ইচ্ছা” বলিলেন। রাজা তাঁহাকে ভক্তি ভাবে প্রণাম করিলেন। অনন্তর রাজা ইচ্ছাকে শিবিকা-বোহণ করাইয়া নিজ গৃহান্তিমুখে লইয়া চলিলেন। রাজা তাঁহাকে বহু আদরে সুন্দর স্থানে রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “প্রভু! আপনার যদি কোন আদেশ থাকে আজ্ঞা করুন।” তিনি কহিলেন “আমার অর্থ অভিলাষ কিছুই নাই! কেবল বৈষ্ণব সেবা করাইব এই অভিলাষ আছে অতএব তাহার উপায় করুন।”

অনন্তর রাজা তাহার আদেশ ক্রমে মহানন্দে আনন্দিত হইয়া, নানাবিধ চব্য চোষ্য লেহণ পেয় খাদ্য সামগ্রী আনাইতে লাগিলেন। প্রতিদিন শত সহস্র বৈষ্ণব আহার করাইতে লাগিলেন। রাজাও প্রত্যহ বৈষ্ণব দর্শনে পবিত্র হইয়া নতন উৎসাহে উৎসাহিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর একদিন সেই কপটাচারী দস্যুগণ বৈষ্ণবের বেশধারণ করিয়া ছহবেশে রাজ্য ভবনে উপনীত হইল। জয়দেব গোস্বামী ছহবেশী দস্যুগণকে আসিতে

দেখিয়া রাজাকে, তাহাদিগকে অত্মপেক্ষা বহু সমাদরের সহিত সেবা করিতে কহিলেন। রাজা নানা প্রকারে তাহাদের সেবার জগু ভূত নিযুক্ত করিলেন। তাহারা রাজসেবার ভয়ে ভীত হইয়া স্থির হইতে পারিল না; আবার দেখিল যে ইতি পূর্বে যাহাকে হস্তপদ কাটিয়া কূপে ফেলিয়া দিয়াছিল সেই ব্যক্তিই রাজগৃহে গুরুরূপে সম্মান প্রাপ্ত হইতেছেন। কপটাচারী ছুরাঙ্গারা যতই চিন্তা করিতে লাগিল, ততই ভয়ে ভীত হইতে লাগিল; তাহারা কিছুতেই স্থির হইতে না পারিয়া রাজার নিকট হইতে বিদায় প্রার্থনা করিল। রাজা কহিলেন বাবাজীর অনুমতি বিনা তোমাদিগকে যাঁহাতে বলিব কিরূপে।

“রাজা কহে বাবাজীর অনুমতি বিনে।

যাইবারে তোমী সবায় কহিব কেমনে ॥”

ভক্তমাল।

অনন্তর রাজা একদিন জয়দেব গোস্বামীর নিকট ঐ বৈষ্ণবগণের বিদায় প্রার্থনা করিলেন। গোস্বামী প্রভু কহিলেন “ঐ বৈষ্ণবগণকে বহু অর্থ ও ধনাদি দান কর, সঙ্গে বহনাদি করিবার লোক দিও”। রাজাও তাহা দিগকে বহুবিধ ধন বস্তাদি দান করিয়া সন্মানের সহিত বিদায় করিলেন। ছুরাঙ্গাগণ হস্ত চিন্তে কিয়দূর আসিয়া বাহকগণকে কহিল “আর তোমাদের সঙ্গে যাইবার প্রয়োজন নাই আমরা বাটীর সন্নিকট আসিয়াছি”। বাহকগণ কহিল, “আমরা রাজাজ্ঞায় তোমাদের ভৃত্য হইয়া কার্য করিব, যাহা হউক ঐ বাবাজির নিকট অনেক বৈষ্ণব আসেন, কিন্তু আপনাদিগকে এরূপ সম্মান প্রদর্শন করিবার কারণ কি?” দৃশ্যগণ মধ্যে একজন ছলনা পূর্বক কহিল; “ইতি পূর্বে আমি কোন রাজার নিকট জমাদারের কার্য গ্রহিতাম, তথায় ঐ ব্যক্তি কোন অপরাধে অপরাধী হওয়াতে রাজাজ্ঞায় আমি উহার হস্ত পদাদি কাটিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, এখানে পাছে আমরা উহার সম্মান নষ্ট করি, সেই জগু আমাদিগকে এরূপ সম্মানের সহিত বিদায় করিয়াছেন।” অতর্কিত ভগবান কোন স্ত্রে কাহাকে বেদন অপরাধে কিরূপে দণ্ডিত করেন তাহা মনুষ্য বুদ্ধির অগম্য। ঐ সময়ে ষোরতর ভূমিকম্পে মেদিনী কম্পাঘাত হইয়া বিদীর্ণ হইয়া গেল, ঐ ছুরাঙ্গাগণও ভূগর্ভে পতিত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইল।

“হেন কালে পৃথিবী ফাটিয়া দহ্যগণে ।

মৃত্তিকা ভিতরে নিঞাযাবে ক্রোধ মনে ॥

ভক্তমালা ।

সাধুদেবী দুর্ভাগ্যগণের সহসা ধ্বংস দেখিয়া, রাজা ভূতাগণ ধন রত্নাদিলইয়া রাজার নিকট ফিরিয়া আসিল, এবং তাহাদের মৃত্যু ঘটনা সবিশেষ বলিল। রাজা গোস্বামী প্রভুর নিকট ইহার তথ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি তাঁহাকে আত্মোপাস্ত ঘটনা বলিলেন। রাজা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাদিগকে এতাদৃশ সম্মান ও অর্থাদি দিবার কারণ কি ?

গোস্বামী কহিলেন “দুষ্টের প্রতি সমধিক কৃপা করাই কর্তব্য, এবং উহাদের অর্থ সঞ্চিত হইলে দক্ষ্য ব্যবসা ত্যাগ করিবে, এই মনে করিয়া দেওয়াইয়া ছিলাম,” জয়দেব গোস্বামী যখন রাজ সন্নিকটে এতাদৃশ চিন্তের উদারতার কথা বলিতেছিলেন, সহসা তাঁহার দ্রুত বিকৃত হস্ত পদাদি পূর্ববৎ হইয়া গেল।

গোস্বামী প্রভুর এইরূপ দেহের সহসা পরিবর্তন হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নহে। করুণাময় পরমেশ্বর অনন্ত শক্তির বলে যখন বাহা ইচ্ছা করিতে পারেন, তখন এরূপ ভক্তের মাহাত্ম্য বুদ্ধি করিবার জন্ত যে এই সামান্য কার্য করিতে পারেন না কি প্রকারে বলিব। বিশ্বাস চক্ষে দর্শন করিলে এরূপ ঘটনা শুনিতেও পাওয়া যায়, দেখিতেও পাওয়া যায়। ভগবান শ্রীগৌরানন্দদেবের অদ্ভুত শক্তিবলে, কদুরসাপ্লুত সনাতন গোস্বামী ও ব্যাধিগ্রস্ত চাপাল গোপালের দেহ পূর্বভাবে ধারণ করিয়াছিল। ইহা শাস্ত্র প্রমাণের দ্বারা কখন বিশ্বাস করান যায় না। যাহার জন্মার্জিত পুণ্যবল আছে, তাঁহার সহজেই বিশ্বাস হইতে পারে। রাজা গোস্বামী প্রভুর গৃহিণী পদ্মাবতীর প্রজ্ঞা ও ভক্তির বিষয় অবগত হইয়া সমাদরে তাঁহাকে আনিলেন। কিয়ৎকাল পরে, একদিন রাণী ডাক্তার মৃত্যু ও তাহার স্ত্রী সহমৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পদ্মাবতী তাঁহাকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিতে করিতে বলিলেন, “প্রিয়ধীন প্রাণ প্রীয়হীন হইবা স্বজন্মেই বাহির হইয়া যায়, এবং প্রিয়প্রেম ভাবে সহমৃত্যু হয়”।

পদ্মাবতীর কথা রাণীর মনে আগ্রহ হইয়া রহিল। ইহা প্রমাণ করিবার জন্ত নান্ন উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। একদিন ঠাকুর জয়দেব গোস্বামী

ও রাজা কিয়দূরে একটি উদ্ভানে প্ৰমত্ত করিলেন। তদ্বার তাঁহার উভয়ে কৃষ্ণ কথা প্রসঙ্গে কাল যাপন করিতেছেন। কয়েক দিন পরে রাজা গৃহে প্রত্যাগত হইলে রাণী পদ্মাবতীর প্রেমোক্তির কথা কহিলেন; এবং প্রমাণের জন্ত গোস্বামীর মিথ্যা মৃত্যু সমাচার পাঠাইতে অনুরোধ করিলেন। রাজা অসুচিত অনুরোধ অপরাধ ভয়ে কিছুতেই স্বীকার করিলেন না। অবশেষে পুনঃ পুনঃ অনুরোধে বিরক্ত হইয়া বলিলেন, তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর'। রাণী পদ্মাবতীর নিকট দাসীর দ্বারা গোস্বামীর মিথ্যা মৃত্যু সংবাদ পাঠাইলেন, এবং পূর্ক হইতে উৎকণ্ঠিত চিত্তে তথায় অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। পদ্মাবতী গোস্বামী প্রভুর মৃত্যু সংবাদ শুনিবা মাত্রেই প্রাণত্যাগ করিলেন। রাণী তাঁহার হটাৎ মৃত্যু দেখিয়া হাহাকার করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, এবং ভয়ে কম্পাবিতা হইয়া রাজার নিকটে সংবাদ পাঠাইলেন। রাজা আসিয়া তাঁহাকে বহুতিরস্কার করিতে লাগিলেন। তিনি গোস্বামী প্রভুর শ্রীচরণে পড়িয়া আত্মোপাত্ত ঘটনা জানাইলেন। গোস্বামী প্রভু কহিলেন "ইহাতে আর চিন্তা কি, কৃষ্ণ নামা মৃত-সাল্লবনী মন্ত্র, ইহা কর্ণে প্রবেশ করিলে প্রাণের সঞ্চার হয়।" অনন্তর রাজা ও গোস্বামী প্রভু উভয়ে অস্তঃপুরে গমন করিলেন। গোস্বামী প্রভু পদ্মাবতীর কর্ণ কুহরে বারম্বার "কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ কহ" বলিতে বলিতে তিনি নিদ্রোথিতারু ছায় উঠিয়া কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। রাজা ও রাণী তাঁহাদের এই অপার মহিমা ও অপ্রাকৃতিক কৃষ্ণ প্রেমময় স্বামীসম্বন্ধ দেখিয়া ভক্তি গদ গদ চিত্তে উভয়ে বহু স্তব স্তুতি করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে রাজার নিকট হইতে বিদায় লইয়া শ্রীজয়দেব শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন করিলেন।

অনন্তর কিছুদিন পরে শ্রীজয়দেব গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবন দর্শনেকুঞ্জ উৎসুক হইলেন; কিন্তু ঠাকুর রাধা মাধবকে কি প্রকারে লইয়া যাইবেন এইজন্য চিন্তিত হইলেন। ভক্ত বাঁধা কল্পতরু রাধা মাধব ভক্তের দুঃখে কাতর হইয়া কহিলেন, 'আমাকে বৃন্দাবন লইয়া যাইবার চিন্তা কি? আমি ক্ষুদ্র রূপ ধারণ করিয়া তোমার বুলির ভিতরে থাকিব'।

"বুলির ভিতরে করি লইয়া যাইবে।

ছোট রূপ হব কিছু তার না লাগিবে।"



কবিরাজ গোস্বামী ঠাকুরের আদেশে তাঁহাকে ঝুলির মধ্যে করিয়া বৃন্দাবন-  
 ভিত্তিতে যাত্রা করিলেন। বৃন্দাবন পৌঁছিয়া কেশী ষাটের সন্নিকটে আনন্দ-  
 কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ক্রম-মহাজন রাধা মাধবের রূপ দর্শনে  
 মোহিত হইয়া একটা মন্দির নির্মাণ করাইয়া দিলেন। বহুকাল পরে জয়পুরের  
 রাজা মুসলমানগণের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য রাধামাধবকে জয়পুরে  
 লইয়া গেলেন। অষ্টাবধি বহু ভক্ত বৈকুণ্ঠগণ রাধামাধবের ভুবন মোহন  
 চাঁদবদন দর্শন করিয়া প্রেমাদ্র' চিত্তে নয়ন ধারায় সিক্ত হন।

জয়দেব গোস্বামী যে ঠিক কোন সময়ে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কোন  
 সময়ে বৃন্দাবন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার কোন সঠিক নিদর্শন পাওয়া যায়  
 নাই। চিত্তের কলুষতা নাশ হইবে এই আশায় কবিকুল চুড়ামনি, ভক্ত  
 শিরোমণি শ্রীজয়দেব গোস্বামী প্রভুর সংক্ষিপ্ত জীবনী ভক্তমাল গ্রন্থ হইতে যথা  
 সম্ভব লিখিলাম।

শ্রীমহেশ্রীনাথ বসু ।

## লীলা রহস্য ।

( পূর্ব প্রকাশিতের পর । )

—:—

ব্রজলীলার প্রত্যেক ঘটনাই যে অতি নিগূঢ় তত্ত্ব পরিপূর্ণ তাহা সাধক  
 ভক্তগণ কেবল কথার উপর নির্ভর না করিয়া প্রাণে প্রাণে অনুভব করুন।  
 প্রথমত কংসের ক্রয় প্রদানের নিগূঢ় অর্থ দেখ রক্ষার নিমিত্ত আহার বিহার।  
 গোপগণ শব্দের অর্থ এখানে সংঘত ইন্দ্রিয়। নন্দ তত্ত্ব জানবান সার্বক স্বা-  
 যুক্ত সাধক। যখন হৃদয়ে ভাবময়ের আবির্ভাব হইল জানের বিকাশে  
 সাধক কিছুক্ষণ আত্মহার হইলেও জ্ঞানী সাধক সংঘত ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে  
 ঐ ভাব হৃদয়ে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তবে তবে দেহরক্ষার আহার বিহার করিয়া

ধাকেন। দেহ রক্ষার্থ আহার বিহার না করিলে রোগের উৎপত্তি হওয়ার সম্ভব। সহসা দেহ রুগ্ন ও ভগ্ন হইলে হৃদয়ের ভাব নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং যুক্ত আহার, যুক্ত বিহার ও যুক্ত চেষ্টা হইয়া জ্ঞানবলে সংসঙ্গ প্রভাবে সাধক সংসার করিয়াও পরমানন্দে জীবনযুক্তাবস্থায় থাকিতে পারেন। তবে সংসারে থাকিলে স্বভঃসিদ্ধ যেসকল বাধা বিঘ্ন আসিয়া সাধককে বিক্ষিপ্ত করিতে চেষ্টা করে, স্বল্পময়ের লীলায় ঐ সকল বাধা বিঘ্নই মূর্ত্তিমান্ কংসানুচর রূপে লীলার বিঘ্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছে, সে সকল ক্রমিক বলা হইতেছে। এক্ষণে উল্লেখ্য সাধকরূপী নন্দ নিজপত্নী ভালবাসার কোলে আনন্দময় শ্রীভগবানকে রাখিয়া রাজ্য রক্ষার্থ (দেহ রক্ষার্থ) কংসকে কর প্রদান (আহারাদি সমর্পণ) করিলেন। অতি সংক্ষেপে পুষ্টিকর আহারাদি করিয়াই আহারীয় দ্রব্যের দ্বারা সঞ্চিত বলবীৰ্য্য বাহাতে সম্বলগুণময় হয় তাহার অল্প সংআলাপ ও সংচিন্তার সহিত বিশ্রাম করিতে হয়; এই শিক্ষার জন্যই নন্দ বহুদেবের সহিত দেখা করিলেন, বিশুদ্ধ সম্বল স্বরূপ বহুদেবের সম্বলভ করিয়া নানা প্রকার কথোপকথনের পর বিশুদ্ধ সম্বলগুণেরই সম্বল গুরু ও ইষ্টরূপী কৃষ্ণ-বলরামের বিষয় স্মরণ করিয়া বহুদেব প্রথমে যাহা বলিলেন তাহার তাৎপর্য্য এই; হে ভাতঃ সংসারে থাকিয়া নানা প্রকার আলোচনায় বহুদিন চলিয়া যায় তাব ধন লাভের আশা প্রায় ঠাকেন না, কিন্তু পূর্বসঞ্চিত সূকৃতির বলে সং গুরুর সম্বলভ হইয়া আরাধ্যদেবের ভাব হৃদয়ে উদয় হয়, তুমি ভাগ্যবান, তাই বহুদিনের পরে ঐ ধনে আজ ধনী হইয়াছ, দেখ যেন ঐ ভাবধন কাহারও কর্তৃক অপহৃত না হয়। দেখ, তাব পাইলেই একেবারে বিচার বিবেক পরিত্যাগ করিয়া কার্য্য কর্ত্তী উচিত নহে। এই সংসারে ভাবের পুষ্টিকারক বন্ধু বান্ধব প্রায় সর্বদা মেলনা, যদিও মেলে, তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না, স্রোতে ভাসমান পদার্থের মতন কখন মিলন আবার কখনও বা বিয়োগ হয়। যখন যাহার নিকট যে ভাবটুকু পাইবে তাহাদ্বারা নিজের ভাবের পুষ্টি সাধন করিতে যত্ন করিবে, যাহাদের সহিত মিলিত থাকিবে সেই সকল বন্ধু বান্ধব ও পরিজন বর্গকেও আপন ভাবের অনুকূলে ভাবিত করিয়া স্নেহে রাখিতে যত্ন করিবে, পরিজনবর্গ যদি ভাবের অনুকূল না হয় তবে সময়ে সঞ্চিত ভাব নষ্ট হইয়া ক্রোধাদি রিপূর উদ্ভেজনা হয় সুতরাং যাহাদের সহিত আহার, যাহাদের সহিত বিহার ও যাহাদের সহিত একত্র বাস করিতে হয়

তাহার ভাবে সমস্ত থাকিলে গৃহে বসিয়াই সাধু সঙ্গের ফললাভ হয়, আর তাহার অসন্তোষ অর্থাৎ অধাৰ্মিক হইলে ঐ সহবাসকালে নিজের প্রার্থনীয় ভাবের হানি হয়। পরিজনকে ধর্ম শিক্ষা দেওয়া একটা প্রধান ধর্ম উহা যে কেবল তাহাদেরই উপকারার্থ তাহা নহে, পরিজন বর্গ ভাল হইলে সর্বদা তাহাদের সংসর্গে থাকিয়া ষত ভাবের পুষ্টতা করা যায় কখন কখন সাধু সঙ্গ করিয়া ততলাভবান হওয়া যায় না, অতএব গোকুল বাসীদিগকে সন্তোষ রাখিয়া যথা সময়ে আহালাদি করিবে। উহার সমস্ত থাকিলে ধর্ম, অর্থ, কাম এই তিন বর্গ সাধন, হয় ধর্ম, অর্থ, কাম হুন্দর রূপে অনুষ্ঠিত হইলে মোক্ষ বা পঞ্চম পুরুষার্থ ভগবৎ প্রেম লাভে আর কষ্ট হয় না। দেখ ধর্ম শব্দের অর্থ ধারণার যোগ্য গুণ বিশেষ, অর্থাৎ যে গুণ থাকিলে বিশ্বরূপী পরমানন্দময় ভগবৎ সত্তা ধারণ করা যায়। যে ক্রিয়া দ্বারা সেই গুণ লাভ করা যায় তাহারই নাম ধর্ম, নতুবা কেবল বাহ্যিক আড়ম্বর করিয়া যাগ যজ্ঞাদি করত লৌকিক যশ ও খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভের প্রত্যাশায় মানসিক উন্নতি না করিয়া কেবল কর্মানুষ্ঠান ধর্ম নহে। সংসারী ব্যক্তির প্রত্যেক কার্যে যাহাতে ভগবৎ শক্তির ধারণা হয় তাহার চেষ্টা করিয়া একান্ত কর্তব্য। অর্থ শব্দের তাৎপর্যার্থ ভাব;—ঐরূপে কর্মানুষ্ঠান করিতে করিতে ভাবের উদয় হয়, ঐ ভাব ধনে ধনী হইলেই কাম অর্থাৎ ভগবৎ শক্তিলাভের একান্ত বাসনা উপস্থিত হয়, বাসনা পূরণের নিমিত্ত ধেমন অর্থেই একান্ত প্রয়োজন, ভগবৎ প্রাপ্তি কামনা পূরণের নিমিত্ত তেমন ভাব ধনের একান্ত আবশ্যক, সাধক এইরূপে ধর্ম, অর্থ, কাম লাভ করিলে পরে মোক্ষ লাভ করিবার যোগ্য হয়। অনেকে ধর্ম অর্থ আড়ম্বর পূর্ণ অনুষ্ঠান, অর্থ শব্দে পাণ্ডি বনাদি, কাম শব্দে ইন্দ্রিয় প্রীতি মনে করেন, কিন্তু তাহা নহে তাহা হইলে কামের পরিণামে মোক্ষ লাভ হইতেই পারে না।

বহুদেবের এইরূপ সুপবিত্র উপদেশ শ্রবণে নন্দ মহারাজ আনন্দিত হইলেন বহুদেবকে বলিলেন যে, হায় ভাতঃ! তোমারও অনেক পুত্র হইয়াছিল কিন্তু কংস নষ্ট করিয়াছে, কি করিবে—যাহার বৈষ্ণব অন্তর্ভুক্ত, তাহাকে তাহাই ভোগ করিতে হয়, এই সকল বাক্যের অর্থ এই যে, বিশ্বদেব সত্ত্বগুণের অনুকূলে মধ্যে মধ্যে যে সকল সুপবিত্র ভাবের উদয় হয় তাহা ও আহালাদির দোষে দেহাস্ব বুদ্ধিরূপ কংসের অত্যাচারে নষ্ট হইয়া যায়, অনেক সময়ই সন্দেহে সাধুরও

ভাব নষ্ট হইয়া যায়, কি করিবে পূর্ক পূর্ক সঙ্কিত ও কীর্ঘ্যের ফলে যেমন দেহ পরিজন লাভ হয় তদনুকূলেই সাধককে স্থির ধীর হইয়া থাকিতে হয় ব্যাকুল হইলে চলে না। ভাই একান্ত দেহের অস্থিত্য ও পরিজন বর্গের জন্য যেটুকু ভাব নষ্ট হয় তাহার জন্য বিশেষ ক্লোভ করা উচিত নয়।

নন্দের বাক্য শ্রবণে পরিতুষ্ট ও শোক ক্লোভ ত্যাগ করিয়া পুনর্বার বহু-দেব বলিলেন, ভ্রাতঃ কংসের কর দেওয়া হইয়াছে, আমাদের সহিত দেখা হইল এক্ষণে গোকুলে যাও গোকুলে অনেক বিঘ্ন বাধা আসিবার সম্ভব। এই সকলের তাৎপর্য্য সাযং ক্রিয়া আহারের পর সং সঙ্গ ও সং আলাপাদি করিয়া নিজে কর্মেয় বিষয় আলোচনা করত আবার সাধনে রত থাক সাধন ত্যাগ করিয়া কেবল আলোচনায় থাকারই নাম মুক জ্ঞান ঐ জ্ঞান ভক্তির বিরোধী তস্ব আলোচনা করিয়া কর্তব্য স্থির করত আবার সাধনে নিযুক্ত থাকিতে হইবে। সাধনের উদ্দীপক ও পুষ্টিকারক জ্ঞানই ভক্তির বিশেষ অনুকূল। অনেকে ক্রিয়া না করিয়া কেবল বাক্যলাপে দিন যাপন করে উহা উত্তম নিয়ম নহে। আলোচনাও করিবে এবং ক্রিয়ার অনুষ্ঠানও করিতে হইবে। নন্দরাজ ঐ বাক্য সত্যরূপে স্বীকার করিয়া গোকুলে যাত্রা করিলেন ; এদিকে নন্দের অভাবে গোকুল বাসীর বিঘ্ন উৎপাদনার্থ বাল-স্বাতিনী পুতনা-দানবী প্রচ্ছন্ন মূর্তি ধারণ করিয়া গোকুলে প্রবেশ করিল কৃষ্ণের প্রতি স্নেহ পূর্ণ হৃদয় গোপীগণ ষশোদার নিকট বসিয়া গোবিন্দকে দর্শন ও লালন পালন করিতেছেন পুতনা ইত্যবসরে কৃষ্ণকে বিনাশ করিবার বাসনায় তথায় উপস্থিত হইল—

মা ষেচর্ষেকদোংপত্য পুতনা নন্দ গোকুলং ৬

ঘোষিতা মায়য়াস্মানং প্রাবিশং কাম চারিণী ।

সেই কংসের প্রেরিতা মায়াময়ী পুতনা মায়াদ্বারা নিজরূপ ঢাকিয়া অতি মনোহারিণী সুন্দরী বেশ ধারণ করত নন্দ গোকুলে প্রবেশ করিল।

অর্থাৎ হৃদয়ে আবিভূত ভাব রক্ষার জন্য সর্বদা সং সঙ্গ ও ক্রিয়ায় অনুষ্ঠান না করিলেই দেহ পেহ, ও পরিজনাদির উপর আপাতরম্য মমতা (মায়া) আসে ঐ মায়া বশীভূত হইলেই ভাব নষ্ট হয়, মায়াও প্রচ্ছন্ন ভাবে ভাব নষ্ট করিতে হৃদয়ে প্রবেশ করে। এদিকে—

বালগ্রহস্তত্র বিচিত্রতী শিশূন্ যদৃচ্ছয়া নন্দগৃহেহ সদস্তকং ।

বালং প্রতিচ্ছন্নিক্তোক্তেজসং দদর্শ তন্নেহগ্নিমিবাহিতং ভসি ॥

বাল ষাতিনী পুতনা গোকুল মধ্যে বালক অবেষণ করিতে করিতে ভ্রম্মাচ্ছাদিত বহির ন্যায় বালকরূপী শ্রীহরির দর্শন করিল ।

মায়া সাধকের নিকট আসিয়া প্রথমে অবলোকন করে সাধকের প্রথমাবস্থা কি পারিপক্যাবস্থা, পুতনা যেমন বালক নাশের জন্যই চেষ্টা করিতেছিল মায়াও সাধকের প্রথম অবস্থায়ই বিয় জনমাইতে চেষ্টা করে, সাধক যদি একান্ত নির্ভর-শীল হয় তবে ঐ সাধককে অভিভূত করিতে মায়া ভীতা হয়, আর যদি ভক্ত সাধক হয়, তবে ভক্ত বাহ্য কল্পতরু ভগবান্ ভক্তের ভাব নিজেই রক্ষা করিয়া থাকেন, সেখানে মায়া নিজ প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হয় না। এই ভাবে কখন বা মায়া সাধককে নষ্ট করে আবার কখন কখন বা সাধকের একত্রতা ও নির্ভরতার জন্য মায়া পরাজিতা হয়। প্রথমে সাধকের গুরুত্ব বিচার না করিয়া কোন স্ত্রীমুক্তি ধারণ করত মায়া সাধকের নিকট গমন করিলে উত্তম সাধক যেমন রহস্য দেখিবার জ্ঞতা তাহাকে প্রথম আশ্রয় দেন পরন্তু তাহার স্বরূপ বিচার করিয়া অন্তরে অন্তরে সাবধান হন, শ্রীভগবান্ ও তাহাই খেলিতেছেন—

বিবৃধ্য তাং বালক মারিকা গ্রহং চরাচরাত্মা স নিমীনিত্তেক্ষণঃ ।

অনন্তমারোপন্নদক মস্তকং যথোরগং সুপ্ত মবুদ্ধি রজ্জুধীঃ ॥

মূর্খ যেমন সর্পকে রজ্জু বুদ্ধিতে গ্রহণ করিয়া বিপন্ন হয়, পুতনা ও দুষ্ট দমন-কারী শিষ্ট প্রতাপালক যে ভগবান্ তাহার মহিমা না জানিয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিল 'ভগবান্ ও লীলার মধুরতা বিস্তারার্থ' উহাকে অনিষ্টকারী বলিয়া জানিয়াও কপট নিদ্রায় নিদ্রিত থাকার ন্যায় চক্ষু মুদ্রিত কুরিয়া রহিলেন ।

অকপট হৃদয়া মুক্তিমতী ভালবাসা রূপিণী যশোদার মনে কোনই সন্দেহ নাই। ভালবাসা যেমন কোন ঘোষের বিচার করে না, মা যশোদাও সেইরূপ

কপটাচারিণী পুতনার অসং স্বভাবের বিচার না করিয়া উহার বাহ্যিক ভাবেই অভিতূতা হইয়া কেবল উহার কার্য দেখিতে লাগিলেন ।

তাৎ তীক্ষ্ণচিন্তামধবামচেষ্টিতাৎ বীক্ষ্যাস্তরা কোষ পরিচ্ছদাসিৎ ।

বরদ্বিয়ং তৎপ্রভয়াবধর্ষিতে নিরীক্ষ্যমানা জননীহৃতিষ্ঠতাম্ ॥

অর্থাৎ চর্চারূত অসির ন্যায় বাহিরে প্রিয় কারিণী পরন্তু অন্তরে অপ্রিয়া ভাব যুক্তা সেই পুতনাকে দর্শন করিয়া সরল হৃদয়া মা যশোদা কিছুই বলিতে পারিলেন না কেবল তাহাকেই দেখিতে লাগিলেন ।

পাঠক পঠিকাগণ । ভগবত কৃপা শ্রোণ্ড সাধক সধিকাদের মন এতই সরল হয় যে, তাঁহারা দোষরাশি-পরিমাণও ব্যক্তিরও সামান্য গুণকে বহু করিয়া লন; অর্থাৎ অস্ত্রের দোষ একেবারেই দেখেন না, নিষ্কের যেমন সরলতা, যেমন পবিত্রতা, এবং যেমন ভগবদ্ ভাব, সকলকেই সেইরূপ ভাবে দেখেন; সুতরাং মূর্ত্তিমতী মায়ারূপিণী পুতনার আন্তরিক কপটতার দিকে একেবারে লক্ষ না করিয়া বাহিরের মাতৃবেশকেই নিষ্কের ভাবরূপ মনে করিয়া স্তনহৃৎ পান করাইবার অভিলাষে পুতনা যেমন গোপালকে লইবার জন্ত হাত বাড়াইল, অমনি মা যশোদা গোপালকে তাহার কোলে দিলেন । ইহাতে মা যশোদার অদোষ দর্শিতার ও সরলতারই উচ্চপরিচয় দেওয়া হইল । আবার এখানে সাধকের অতি উদারতারও পরিচয় লেখা যায় । সাধকেরা অপরকে কৃতার্থ করিবার জন্ত স্বয়ং প্রবর্ত্তিত হইয়া অস্ত্রের সামান্য ইচ্ছাকে বহু মান করিয়া ভগবৎ সেবার কার্যে নিযুক্ত করেন । কারণ তাঁহারা জানেন যে, ভগবৎ সেবার অমুকুল কার্যের গুণেও মনে স্বল্পগুণের উদয় হয় । যশোদানন্দন শ্রীগোবিন্দকে দেখিতে, আদর করিতে এবং বাৎসল্য প্রেম বশতঃ স্তনহৃৎ দিতে যে কেহ আসিতেছে সিদানন্দ-জননী আনন্দ ছন্দয়া যশোদা মা সিদানন্দ মনে তাহারই কোলে গোবিন্দকে দিতেছেন, আবার লইতেছেন আবার দিতেছেন, এই আনন্দ শ্রোতের মধ্যে কপট হৃদয়া পুতনাও কপট মাতৃবেশধারণ করিয়া গোবিন্দকে গ্রহণ করিল, বাহিরের কেহই জানিলনা, পুতনার ভাব কি? কিন্তু সর্কাস্তর্ঘামী শ্রীগোবিন্দ

উহার আগমন মূর্ত্তি এই হ্রদভিসন্ধির বিষয় অবগত হইয়া কৌশলে হুষ্ট দমন করতঃ সাধককে সংশিক্ষা দেওয়ার মানসে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলেন ; পুতনা বুকিল গোকুল বাসিনী গোপীগণও ক্রামায় অভিসন্ধি বুকিল না, পোশালও বুকিলনা, এইবার আমার অভিলাষ পরিপূরণের স্তম্ভ হুখোপ হইল, তাই আনন্দে ও উৎসাহে পুতনা;—

তস্মিন্‌স্তনং হুর্জয় বীর্ঘ্যমুষণং । ঘোরাক্রমাদায় শিশোদ দাবধ ।

গাঢ়ং করাভ্যাং ভগবান্‌ প্রপীড়্যতং প্রাণৈঃ সমং রোষসমবিতোহপিবং ॥

তখন চুষ্ঠাশয়া পুতনা বালকরূপী শ্রীহরিকে কোলে লইয়া অতি যত্নপ্রদ কালকূট বিষ সংযুক্ত স্তন শ্রীকৃষ্ণের মুখে প্রদান করিল। লীলাময় হুষ্টদমনকারী শ্রীহরি তখন হুই হস্তে তাহার স্তনদ্বয় ধারণ করতঃ অতিশয় বেগে নিষ্পেষিত করতঃ উহার প্রাণের সহিত স্তন্য আকর্ষণ করিয়া পান করিতে লাগিলেন।

প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ! একবার ভাবন হুষ্টদয় পুতনার অন্তরে কপট ভাব থাকায় সাধক্য ভগবত দর্শন ও স্পর্শনের অপূর্ক প্রেমামন্দ ভাব উপভোগ করিতে পারিল না; হুর্কাসনা ও বিষয় কামনারূপ বিষ মিশ্রিত সেবা অর্পণ করিল অর্থাৎ অতিশয় বিষয় কামী নরনারী কেবল বিষয়কেই ভালবাসে হুতরাং; দেহাত্ম বুদ্ধিরূপ কংশের অনুগত হইয়া পুতনার মতন-হে ভগবন! হে পরমেশ্বর! হে সর্বশক্তিমন! আমায় ধন দাও, জনদাও, গৃহ দাও, ক্ষেত্র ষ্টাও, সম্মান ও প্রতিপত্তি দাও এইরূপ প্রার্থনায় ও ভাবে কামনা সংযুক্তসেবা পূজাদি করে। ভগবান যদি স্বয়ংও উপস্থিত হইয়া বর দিতে প্রস্তুত হন, তথাপি হৃদয়ে বদ্ধহুল কামনা থাকায় ভগবানের আনন্দময় সত্তা উপভোগে বঞ্চিত থাকিয়া কেবলই যত্নপ্রদ বিষয়াদিই চাহিয়া লয়। বহুলোক ঐ ভাবেই জন্ম জন্ম দেহাত্ম বুদ্ধির অনুগত হইয়া উচ্চনীচ যোগীতে পরিভ্রমণ করে। কিন্তু যাহাকে ধার্মিক করিলে ও যুহার ভাব ভক্তিভাবাপন্ন হইলে গোকুল বাসী গোপ ও গোকুল বাসিনীর অর্থাৎ বহু উক্তের মুখ ও শান্তি হয়, শ্রীভগবান তাহাকে কামনার ফল না দিয়া তাহার ঐ বিষয়বাসনাকে এমন ভাবে ছিপদ ও বিক্ষেপ দিয়া বৈরাগ্য ভাবাপন্ন করেন যে, অবশেষে তাহার প্রাণ পর্যন্ত টানিয়ালন, অর্থাৎ প্রথমে আশাপূর্ণ করেন না বিষয়-বিভ্রাটও প্রার্থনীয় ধনজন পরিজনের রোগ

শোকাদির উদ্ভাবনায় একটু আগ্রহ করিয়া ঐ সকাম ভক্তের প্রাণে বিষয়ের নখরতা পরিজনের অনিত্যতা জাগাইয়া দেন। ক্রমে বৈরাগ্যের উদয় হওয়ার সাধক দেখিতে পায় যে, যাহাদের ভালবাসায় অনুপ্রাণিত হইয়া যে সকল বিষয় বাসনা করত ভগবানের বিশ্বব্যাপী মঙ্গল সম্ভা ভুলিয়া ছিল, তাহারা কেহই অকৃত বন্ধু নয়, সকলেই বন্ধু নামধারী আত্ম শত্রু, তাই বিপদের ও বিক্ষেপের এবং লাভ ও অলাভের তীব্র ভাবনারূপ কষাঘাতে জর্জরিত হইয়া প্রাণের ভাবের পরিবর্তন করে। তখন তাহার প্রাণ অল্প ভাবাপন্ন হয়, ইহাই প্রাণের সহিত স্তন দুগ্ধ পানের তাৎপর্য। পরে ঐ সাধক পূর্ক প্রার্থিত বিষয় বাসনাকে একেবারে হৃদয় হইতে দূর করিবার জন্ত চেষ্টা ও প্রার্থনা করে, পুতনাও তখন যে স্তম্ভ ধরাইবার নানাবিধ কৌশল করিয়া গোবিন্দকে কোলে করিয়াছিল সেই গোবিন্দের হাত ছাড়াইবার জন্ত কি বলিতেছে দেখুন।

সা মুঞ্চ মুকালমিতি প্রভামিণী নিম্পীড্য মানাহখিলজীষমর্শ্বনি।

বিরূত্যনেত্র চরণৌ ভুঞ্জৌ মুছঃ নিস্বন্নগাত্রা ক্ষিপতী রুরোদহ ॥

শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণে নিখিল মর্শ্বহান প্রাপ্তি হওয়ার সেই পুতনা “ছেড়েদে ছেড়েদে আর না আর না” এইরূপ বলিতে বলিতে নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া চরণ ও ভুঞ্জয় আঙ্কালন করত রোদন করিতে লাগিল।

পাঠক, বিষয়ের পরিণাম! ধনের পরিণতি ও পরিজনের অবস্থা ভাবিয়া ভাবিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে নির্বেদ প্রাপ্ত সাধক কামনাকে ও বিষয় ভোগকে একেবারে পরিত্যাগ করিবার মানসে আকুল প্রাণে কত ক্রন্দন, কত প্রার্থনা ও কত চেষ্টা করেন তাহার আর সীমা থাকে না। বাস্তবিক বিষয় চিত্তায় জীবের মর্শ্বহান ভেদ হইয়া যায়। দুর্ভাবনার ত্রায় যন্ত্রণাপ্রদ আর কিছুই নাই। কালকূট মাখান স্তন অর্থাৎ কাল শক্তিতে সমাক্রম্য নিরত পরিবর্তনশীল কপটতার আলয় স্বরূপ বিষয়। বিষয়ের নখরতা একবার যাহার অন্তঃকরণে অনুভব হইয়াছে সে জানে যে কালসর্পের বিষ অপেক্ষাও বিষ বিষ অতিশয় ভয়ানক, তাই বিবেকী কবি গাহিয়াছেন।—

কিষণ তীরোবিশয়ঃ কৃষ্ণসর্প বিষাদপি।

মিথং নিহন্তি ছোক্তায়ং দ্রষ্টায়ং চক্ষুষ্যায়ং ॥



অর্থাৎ কাল সুপের বিষ অপেক্ষা ও বিষয় বিষ তীব্র, কারণ সপের বিষ যে পানকরে কেবল সেই ব্যক্তিই নষ্ট হয়, কিন্তু বিষয় বিষে জর্জরিত ব্যক্তির নিকট যাহারা থাকে তাহারাও ঐ বিষে আভিভূত হয়। তখন—

তন্মাঃ স্বনেনাতি গভীররংহমা সাদ্রিম'হীত্ৰো'শ চচাল সগ্রহা।

রসাদিশাশ্চ প্রতিনেদিরেজনাঃ পেতুঃক্ষিতৌ বজ্রনিপাত শঙ্কয়া ॥

নিশাচরীখং ব্যথিতস্তনা.বাসুর্ব্যদায় কেশাং'চরণৌ ভূজাবপি ।

প্রসাধ্য গোষ্ঠে নিজরুপমাশ্চিতা বজ্রাহতো রুত্রইবাপতন্ প ॥

তাহার সেই সুগভীর গর্জনে পর্কতেল সহিত পৃথিবী, গ্রহনক্ষত্রের সহিত অন্তরীক্ষ কম্পিত হইল, এবং দিক সকল ও রসাতল প্রতি ধ্বনিত হইল, বজ্র পাতের শব্দে ত্রায় ভয়ানক শব্দ শ্রবনে অনেকে মুচ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। পাপমতি রাক্ষসী পুতনা এইরূপে প্রপীড়িত হইয়া কেশ চরণ ও ভূজ প্রসারিত করিয়া নিজরুপ ধারণ করত বজ্রাহত রুত্রাহুরের ত্রায় ভূতলে পতিতা হইল।

মায়া যখন বিবেক বুদ্ধিতে পরিণত হয় তখন তাহার বিরূপ ভাব ও আর্তনাদ হয় তাহা দেখাইবার জন্ত পুতনার আর্তনাদের বর্ণনা করিলেন, মায়িক সাধকের যখন মায়ার ভাব অপগত হয় তখন তাহার মুখোচ্চারিত বিষয় ভোগের নিন্দাবাদে দিকদিগন্ত প্রকম্পিত হয়, সে যাহাকে দেখে তাহার নিকটই ভোগের অনিত্যতা ও পরিণাম হুঃখের বিষয় বর্ণনা করিয়া অনেক সময় অনেক সকাম ও নিষ্কাম নরনারিকে মুচ্ছিত করে, পুতনা যেমন প্রাণত্যাগ করিল সেইরূপ মায়িকের মায়া নিজের স্বভাব ত্যাগকরে, তখন ঐ মায়া ভাবের অনুকূলে দিব্য মূর্তি ( ভাব ) ধারণ করে সাধকের ঐ অবস্থায় মায়ার কদাকার স্মরণ হয়, যাহাকে অতি আদরে হৃদয়ে স্থান দিয়াছিল জ্ঞানের উদয়ে জ্ঞান নেত্রে তখন তাহার জঘন্য রূপ অবলোকন করিয়া জন্ম জন্মান্তরে যাহাতে আর না মায়ায় আভিভূত হইতে হয় তাহার জন্ত চেষ্টা করে। পার্থক্য পুতনার দেহকে যেরূপ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন উহা মায়ার পক্ষে সংযোজনাকরিয়্যা দেখুন—

ইষামাত্রোগ্রদংষ্ট্রাশ্চ গিরিকন্দরনাসিকং ।

গণ্ডশৈলস্তনং রৌদ্রং প্রকীর্ত্তয় মুর্ধ্বজং ।

অন্ধকূপগভীরাক্ষং পুলিনারোহ ভীষণং

বন্ধসেতুভুজোর্কজিগ্মু শূন্যতোয়হ্রদোদরং ।

অর্থাৎ লাদলের ফলার শ্রায় বৃহৎ দস্তপূক্ত বদন, পর্কত গুহার শ্রায় নাসিকা বিবর, পর্কতের শৃঙ্গের শ্রায় অতি উচ্চ স্তন, অতি বিকটাকৃতি চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত রক্তবর্ণকেশপাশ, অন্ধকূপের শ্রায় গভীর চক্ষু দ্বয় ; নদী তট সদৃশ জঘনদেশ দ্বারা অতিশয় ভয়াবহ মূর্তি, বন্ধ সেতুর শ্রায় ভুজ, উরু ও পাদদ্বয় এবং জল শূন্য হ্রদের শ্রায় উদর এইরূপে অতি বিকট ও বিশী আকৃতি ধারণ করিয়া পুতনা পতিত হইল তাহার দেহের চাপায় বহু বহু বৃক্ষাদি চূর্ণ হইয়া গেল—

সস্তত্রেমুঃ স্ম তদ্বীক্ষ্যঃ গোপা গোপ্যঃ কলেবরং

পূর্কস্তুতমিঃ ষ্টনিড স্তিমহঃ কর্ণমস্তকাঃ ॥

বালক তস্মা উরবি ক্রৌড়স্তমকুতো ভয়ং

গোপ্যাস্তূর্ণং সমভ্যেত্য জগৃহজাতি সস্তমাঃ ॥

গোপ এবং গোপী গণের উহার চীংকারে পূর্কেই হৃদয় কর্ণ ও মস্তক ব্যাধিত হইয়াছিল, এক্ষণে গোকুল বাসী গোপ ও গোপীগণ, ঐ বিকটাকার দর্শন করিয়া ভীত ও বিস্মিত হইল, কিন্তু বালক গোপাল উহার বন্ধ স্থলে অকুতোভয়ে ক্রৌড়া করিতেছে দেখিয়া গোপ গোপীরা কথকিং আপস্ত হইল পুনঃ পুনঃ গোপালকেই দর্শন করিতে লাগিল। মা যশোদা প্রভৃতি গোপীগণ আস্তে আস্তে নিকটে খাইয়া পুতনার বন্ধস্থল হইতে বালক রূপী গোবিন্দকে গ্রহণ করিল।

কলেবরংপর শুভিশিঙ্কিতা তংতে ব্রলৌকসঃ ।

দূরে ক্ষিপ্তবয়বশোথদহন কাঠধিষ্টিতং ॥

পুতনার দেহ পরস্তর দ্বারা ধুও ধুও করিয়া ব্রজ বাসী দূরে নিক্ষেপ করত বিস্ত্রিত ভাবে কাঠ সংলগ্ন করিয়া দগ্ধ করিল।

দহমানস্ত দেহস্ত ধুমশাশুক সৌরভঃ ।

উখিতঃ কৃষ্ণ নিভূক্ত সপগ্ৰাহত পাপানঃ ॥

পুতনার দেহ দগ্ধ করিতে করিতে উহার ধুম হইতে অগুরু চন্দনের শ্রায় সুগন্ধ উঠিতে লাগিল।<sup>১০</sup> ক্রীকৃষ্ণ কর্তৃক আক্রমিতা হওয়ায় পুতনার পাপ

সত্ত্ব সত্ত্বই বিনষ্ট হইল। তখন পূতনার আত্মা দিব্য জ্যোতি রূপে অন্তরীক্ষ গত হইয়া সৰ্বজন সমক্ষে শ্রীকৃষ্ণের দেহে মিলিত হইল। সকলে এই অপূৰ্ব গতি দর্শন করিয়া শ্রীভগবানের দর্শন ও স্পর্শনের মহিমায় মহা পাপিয়সী রাক্ষসীও মুক্ত হইল এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের মহিমার জয় দিতে লাগিল। ব্রজবাসীরা বিপদ হইতে মুক্ত শ্রীগোবিন্দকে আনন্দ নয়নে দর্শন করিয়া মনের আশা পূর্ণ করিতে লাগিল।

পাঠক পাঠিকা গণ ! এক্ষণে নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করুন আমরা অজ্ঞান অবস্থায় ভগবৎ ভাবরহিতা যে মায়া বা মায়াবিনী স্ত্রীকে অতি সুন্দরী ও একান্ত আপন মনে করিয়া সকল ইন্দ্রিয় ও মন এবং প্রাণের ভালবাসা যাহার মধুর আকৃতিতে বিভোর হইয়া যাই একবার ভগবৎ রূপায় মায়ার স্বরূপ বুঝিতে পারিলে ঐ মায়া বা মায়াবিনী কে আর সুন্দরি বলিয়া মনে হয় না তাহার কথা তাহার আচরণ তাহার আকৃতি সকলই অতি বিকট ও ভয়ঙ্কর মনে হয়, এমন কি, ভাবিয়া ভাবিয়া সাধক বিস্থিত হন যে, কেন কোন স্ত্রীর আশায় এই হুঃখময়ীমায়াকে অবলম্বন করিয়া ছিলাম। আর তাহা হইয়া যায় আমি এমন জবজ্ব বস্তকে আপন করিয়া নিজ জন বোধে আশ্রয় করিয়া ছিলাম ? কিন্তু ইহার কোন একটা অঙ্গ সুন্দর নহে, কোন একটা ভাবও সুখপ্রদ নহে, মায়া কেবল দেখি দেখি রবে আমাদের হৃদয় মস্তক ও কণ বিক্রান্ত করিয়াছে আর না, এই কামনা কিব পান্নপূর্ণ হৃদয়ের ভালবাসায় আর মজিব না, ইহার কটাঞ্চে আর দৃষ্টি পাত করিবনা, ইহার ঘোর যন্ত্রনাশ্রদ কামনার বিষয় আর ভাবিবনা, ইহার উদয় জনহীন হ্রদ সহসা অর্থাৎ মায়ায় উদরে কিছুই নাই মায়ায় ভাবে যাহা করিবে যাহা ভাবিবে সকলই নিষ্ফল। এইরূপ মনে করিয়া কামনার বন্ধস্থল হইতে ভাল বাসার ধন শ্রীগোবিন্দকে ( ভাবকে ) আকর্ষণ করিয়া বন, তখন মায়া মরিয়া যায় তাহার দেহ চৈতন্য শূন্য হইয়া যায়, কেহ আর তাহার আদর করে না আমরা মায়া কে যে ভালবাসার ভাব অর্পণ করি তাহা যদি প্রকৃত বুদ্ধির অনুকূলে পৌহলের ( ইন্দ্রিয়সমূহের ) মদলাঃ হৃদয়ে রক্ষা করি তবে আমাদের ইন্দ্রিয়গণ রূপ রস সুরল শাস্ত্র সবল ও ভাবপূর্ণ থাকে। যাহার ইন্দ্রিয় মায়ায় হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে তাহার আর কৃথা কামনা ও অসং ভোগ-বাসনা আসেনা, সে সেই নিত্য সত্য পরমায়ায় ভাবে দেহ মন ও ইন্দ্রিয় গণকে পরিহৃত্ত করে, তাহার হৃদয় গোকুল মায়া শূন্য। কেবল ভালবাসার ধন গোবিন্দ কে লইয়া আনন্দে বিভোর হয়। পূতনার দেহ কে যেমন পরশুর দ্বারা ধও ধও

করিয়া দূরে নিক্ষেপ করত অগ্নিস্নাত করিল সাধকও মায়া কেবলিবেক কুঠারে ধণ্ডু ধণ্ডু করিয়া হৃদয় হইতে দূরে সরাইয়া জ্ঞানাগ্নিতে ভস্ম করে। পুতনার প্রাণ শ্রীগোবিন্দে লয় পাইল এবং পুতনার দেহ হইতে তখন সুগন্ধ বাহির হইল, ইহার তাৎপর্য এই যে পূর্বে মায়া যাহাদের অবলম্বনে হৃদয় গোকুলের অনিষ্ট করিতেছিল ভগবৎ ভাবের বলে মায়ার আশ্রয় স্বরূপ সেই সকল দেহ হইতে কেবল বৈরাগ্যের সুগন্ধই বাহির হয় অর্থাৎ সকলের সকল ব্যবহারেই ভাবের উদয় হয় যে যাহা বলে তাহার সেই কথাই ভাবের অক্ষুণ্ণে অর্থ করিয়া কেবল ভাবানন্দ বৃদ্ধি করে মায়ার প্রাণ স্বরূপ কামনা বাসনা সকলই আরাধ্যদেবের সহিত মিলিত হয় অর্থাৎ ভগবৎ সেবায় ভগবৎ সাধনে ও ভগবৎ বিষয় শ্রবণ কীর্তনেই তাহার মায়া নিযুক্ত হয় ঐ মায়া তখন সংস্কৃত লিপ্সা রূপ মধুর ভাব ধারণ করে। প্রিয় ভক্ত পার্থক্য গণ ! অতি সংক্ষেপে পুতনা মোক্ষণ লীলার নিগূঢ় রহস্যের ইঙ্গিত মাত্র করিলাম, আপনারা নিজ নিজ চিন্তা শক্তি ও ভাব বলে উহার রহস্য আলোচনা করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করুন। শ্রীভগবৎ লীলার তত্ত্ব অনন্ত যে ভাবে দেখিবেন সেই ভাবেই ইহার পূর্ণতা অনুভব করিয়া বিমল আনন্দ ভোগ করিতে পারিবেন।

আমাদের দেহের ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয় বৃদ্ধি সকলকে সংযত ও জ্ঞানানুসারে বিষয় ভোগ করিতে দিলে আর আমাদের দুঃখ থাকেনা আমরা আহারে বিহারে ও ব্যবহারে সর্বদা সকল কার্যে সদানন্দ উপভোগে ধৃত হইতে পারি। লীলাময় শ্রীগোবিন্দ সাধকের প্রাণে সদানন্দ বিধানের জন্তই নানা প্রকার লীলা কৌশলে ভাব শিক্ষা দিয়াছেন না বুঝিয়া আলোচনা না করিয়া কেবল বাহিরিক ভাব লইয়া থাকিলে সুখ পাইবেন না সংযম আসিবেনা, হৃদয় উন্নত হইবেন, হৃদয় ভাবের আধার, অনুসন্ধান করিলেই ভাব ধন মিলিবে অনুসন্ধান না করিয়া কেহ ভাবধনে বঞ্চিত থাকিবেন না ইহাই আমার সর্বিনয় নিবেদন।

পুতনা লোকবালদ্বী রাক্ষসী কুধিরা শানা,

জিহ্বাসংসর্গাপি হরয়ে স্তনং দত্তাপ সঙ্গতিং ॥

কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যা কৃষ্ণায় পরমাত্মনে

যচ্ছনপ্রিয়তমং কিং রক্তা স্তম্মাতরো যথা ॥

লোকের বালক সন্তান ষাটিনী রুধির পান কারিনী রাক্ষসী পুতনা প্রকৃত ভাল না বাসিয়া বিনাস বাসনায় শ্রীগোবিন্দ বদনে স্তন দুগ্ধ অর্পণ করত সদ্গতি লাভ করিল কিন্তু যাহারা শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে নিজের প্রিয় অর্পণ করে সেই সরল হৃদয়া গোকুল বাসিনী কৃষ্ণ সুখদায়িনী গোপীগণের যে সদ্গতি লাভ হইবে তাহা আর কি বলিব ? তাঁহারাই ধন ও তাঁহারাই সার্থক জন্ম যাহারা অকপট প্রাণে প্রীতিরসহিত শ্রীভগবান কেই আপন জানিয়া ভালবাসিতে পারেন।

হে গোকুলানন্দ দাতা শ্রীগোবিন্দ ! ভালবাসা দাও কপটতা কাড়িয়া লও গোকুল রক্ষার জন্ত যেমন স্বয়ং মায়াবিনী মায়াম্বরূপিনী পুতনাকে দমন করিয়াছ সেইরূপ আমাদের হৃদয়ের কামনা, বিষয় বাসনা ও মায়াকে দমন করিয়া আমাদের হৃদয়-গোকুল নিরাপদ কর আমরা তোমার কৃপায় অকপট প্রাণে প্রেমানন্দে তোমার সেবানন্দে কৃতার্থ হইয়া জন্ম জীবন সার্থক করি।

ক্রমশঃ—

দীনবন্ধু শর্মা।

## ভব বিকার মুক্তি প্রার্থনা।

—:~:—

এ ভব বিকায় ষোরে প্রাণ বুঝি যায় হে।

কে আর করিবে ত্রাণ হরি বিনা তার হে ॥

মোরাণ্বে বিকার ষোরে,

কত কি যে করি হরে,

হ'য়ে রোগী মোরা কিবা প্রকাশিব তার হে।

বিকার ষোরে, খুবারে প্রাণ বুঝি যায় হে ॥

হৃবৈশ্ব তুমি হে, হৃযশঃ গোকুল ময় হে ।

দাও হৃঔষধ যাহে রোগ দূর হয় হে ॥

রোগের লক্ষণ হরি, ৯

কতক বলিতে পারি,

দোষ তাহা মনোময় যদি মনে হয় হে ।

সমুদয় প্রকাশিব নাছি সে সময় হে ॥

ক্ষণেক চৈতন্ত, অচৈতন্ত পরক্ষণ হে ।

চক্রবৎ অবিরত করিছে ভ্রমণ হে ॥

অচৈতন্তে করি যাহা,

চৈতন্ত হইলে তাহা,

কৃতকর্ম হেরে কতক হয় নিরূপণ হে

অনুমানে যাহা বুঝি করিব বর্ণন হে ॥

কভু কাঁদি, কভু হাসি, কভু নারায়ণ হে ।

কত সাধাসাধি করি ধরিয়া চরণ হে ॥

যাহার অভাব যায়,

তার কাছে চাই তায়,

কেমনে সে, সে জিনিষ করিবে অর্পণ হে ।

পাইতে যে, সে জিনিষ করয় সাধন হে ॥

যাহার আছয় তার কাছে নাহি চাই হে ।

অরণ্যে রোদন করি সময় কাটাই হে ॥

কারে মাতা, কারে দারা,

কারে পুল্লী সহোদরা,

নানা ভাবে এক মূর্ত্তি আরাধি সদাই হে ।

সকলি প্রকৃতি এক, মনে ভাবি নাই হে ॥

যেই পিতা, সেই পুল্ল সেই সহোদর হে ।

অন্তর হৈতে এতাব হইল অন্তর হে ॥

মান আর অপমান,  
 বিষ্ঠা চন্দন সমান,  
 কই আর এই জ্ঞান হরি চক্রবর হে ।  
 বিকারের তাড়নায় সব হ'ল দূর হে ॥

বিকারে বিকারে হরি শরিরের কল হে ।  
 হইয়াছে কলকর্তা সকলি বিকল হে ॥

নাহি আর সে শ্রবণ,  
 নাহি আর সে স্পর্শন,  
 নাহি সে চৃষ্টি যাহে হেরি পুন্দ্র যুগল হে ।  
 হইয়াছে কলকর্তা বিবশ বিকল হে ॥

এই নিবেদন ঐভো ওহে বৈষ্ণবায় হে ।  
 এবিকার কাটে ধায় করহ উপায় হে ॥

পেয়েছি হে বড় জ্বালা,  
 হ'য়েছি হে কালা পালা,  
 আর যে না সহে কালা, নিবার ত্বরায় হে ।  
 কর কর দীন নাথ, দীনের উপায় হে ॥  
 অচৈতন্তে কালবারি, সময় কাটায় হে ।  
 ভজিতে না পারি তোমা সকল সময় হে ॥

তোমা না ডাকিতে পারি,  
 তোমা না সাধিতে পারি,  
 রূপা করি কৃপাকর, হও হে সদয় হে ।  
 ভজন সাধন হীনে হ'ওনা নিদয় হে ॥

শ্রী বসন্তকুমার প্রামাণিক ।

## সঙ্গীত ।

—:—

কই হরি ! পারিলাম তোমা জিনতে ?

পাপ-রিপুদলে জিনিতে যে নারি প্রাণান্তে ॥

দেহ-রথে বসি আশ্রা রথী রায়,

মনো-ধনুঃ বাধি প্রতিজ্ঞা ছিলায়,

যুড়ি নীতি শর ভাবিছে হিয়ায়,

এবে দুরাচারে স্মরেছে কৃতান্তে ॥

কিস্ত ওহে হরি ! যাইলে রণেতে,

সু ও কুপ্রবৃত্তি অশ্ব যুড়ি রথে,

কেহ ধায় স্থলে, কেহবা জলেতে,

সে সময় রথ না পারে চলতে ॥

যে স্নযোগে মোহ রিপুদল পতি,

ছহকার শকে আসিয়া ঝটিতি,

কটাক্ষ শরেতে ছিলা পাশ কাটি,

পাপ দাস সাজায় হানুতে হাস্তে ॥

বুঝেছি হে চক্র তব চক্রধারি !

কেন রিপুগণ ( তব ) চারি ধার ঘেরি,

তাহাদের আগে না জিনিলে হরি,

সহজে দিবেনা তোমাঙ্গ পরতে ॥

তাদের জিনিব কি সাধ্য আমার,

ধরিব তোমাঙ্গ কি সাধ্য আমার

ষশোদ্ধার মত ওহে দয়াদার,

কৃপা করে দেও শ্রীকরে বাধ্তে ।

শ্রীবসন্তকুমার প্রামানিক ।



শ্রীশ্রীরাধারামণো জয়তি ।

# ভক্তি ।

৬ষ্ঠ সংখ্যা—৮ম বর্ষ ।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী ।

ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্ত জীবনম্ ॥

## প্রার্থনা ।

তমেষু বিদ্যা বিত্তং মে বিশ্বব্যাপিন্ অগদ্ গুরো ।

বিহার ভূম্যাং হৃদয়ে বিহরস্ব প্রতিক্ষণম্ ॥

হে অগদ্ গুরো! তুমিই আমার বিদ্যা (জ্ঞান), তুমিই আমার বিত্ত (সম্পদ)। তোমার বলে নিত্য নূতন নূতন জ্ঞান পাইতেছি, তোমার বলে জ্ঞানের বন্ধ-মূল কুসংস্কার দূর করিতে পারিতেছি, তোমারই বলে হিতাহিত জ্ঞান পাইয়া কর্তব্যাকর্তব্য স্থির করিয়া কর্ম করত বিদ্ধব লাভে অভাব মোচন করিয়া সুখী হইতেছি। তুমি যখন বিদ্যারূপে ছন্দয়ে বিরাজ কর, তখন কত সুখ, কত জ্ঞান ও কত কি ভাবের উদয় হয় তাহা ভাবিয়া ও বলিয়া শেষ করিতে পারি না। আবার তুমি যখন হৃদয় হইতে সরিয়া যাও অমনি হৃদয় অজ্ঞান অন্ধকারে পূর্ণ হইয়া কলুষিত হয়। কত সন্দেহ কত কু তর্ক ও কত কি কু ভাব এবং কত অসংযোজনীয় অসং ভাব যে হৃদয়ে উদয় হয় তাহাও বলিয়া শেষ করিতে পারি না।

ভাল করিতে মন্দ হইয়া যায়, অসংকে সং, অনিত্যকে নিত্য, মন্দকে ভাল বলিয়া আশ্রয় করত মনস্বাপে দগ্ধ হই, প্রতি কর্ষে চিত্ত ভ্রম, প্রতি কর্ষে ভুল ও বিশ্বশ্রুততা আসিয়া বাহা আশা করি তাহা পাইতে দেয় না। হে বিখব্যাপিন্ ! তুমি জ্ঞানময়, তুমিই জ্ঞানদাতা এবং .তুমিই আমার জ্ঞান, যখনই তোমার বলে কোন কঠিন তত্ত্বের মীমাংসা করিতে পারি তখনই তোমার জ্ঞানময় সত্ত্বা উপলব্ধি করিয়া প্রাণে এক অনির্করচনীয় সুখ পাই। হৃদয় বিহারিন্ ! নিরন্তর অন্তরে অন্তরে বিহার কর, আমার হৃদয় তোমার বিহার ভূমি হউক, যখন অপরে আমার জ্ঞানের গৌরব করিবে তখনই যেন তুমি হৃদয়ে আছ, তোমারই কৃপায় আমার জ্ঞান, তোমারই ভাবে আমি জ্ঞানী এইরূপে প্রাণে প্রাণে তোমার সত্ত্বা অনুভব করিতে পাবি, বৃথা অভিমানে মত্ত না হইয়া তোমার গৌরবে গৌরবাবিত এবং তোমার দিব্য জ্ঞানালোকে আলোকিত, পুলকিত ও আনন্দিত হইয়া যেন প্রলোভনকে পরাজয় করত পবিত্র পথে অগ্রসর হইতে পারি।

হে অনাখনাথ ! তুমি বিগ্রাহকপী হইয়া যেসকল বিভব ( ধনাদি ) আনিয়া দিতেছ তাহাও তুমি, আমার মনে হয় তুমি ভালবাস বলিয়া অভাবের হুঃখ লক্ষ করিতে না পারিয়া আমার বিভব রূপে আবির্ভূত হইয়া আমাকে নিশ্চিত ও সুখী কর। অভাবে প্রাণ চকল হয় ভাবরূপে তোমার আবির্ভাব পাইলে প্রাণ মাতিয়া উঠে। হে ভাববপিন অভাবে বাধিও না, ভাবেই যেন নিশি দিন থাকিতে পারি, আবার সম্পদরূপে তোমারই ভালবাসা অনুভব করিয়া যেন নিরভিমानी থাকিতে পারি। আনীর্কাদ কর আমার জ্ঞান ও সম্পদকে অবলম্বন করিয়া জীব জগত আমাকে যতই প্রশংসা করিবে ততই যেন তোমার ভাব জাগিয়া উঠে, জানেও তুমি জ্ঞানকপী, সম্পদেও তুমি সম্পদকপী, এইরূপ ভাব দাও নির্দিকার ভাবে সন্ধানন্দে তোমায় ভাবিবা বাহিরে সংসার অন্তরে কর্ষ সন্ন্যাস করত যেন কৃতার্থ হইতে পারি। তোমার ভাব ব্যতীত যেন অল্প কোন সংস্কার হৃদয়ে বহনুল না হয়, দীনে প্রার্থনা পূর্ণ কর।

দীনবন্ধু শর্মা।

# লীলা রহস্য ।

( ৬ )

( পূর্ব প্রকাশিতের পর । )

—:—

রাজোবাচ ।

যেন যেনাবতারেণ ভগবান হরিরীঃৱঃ ।

করোতি কর্ণ রম্যানি মনোজ্ঞানি চ নঃ প্রভো ॥

যচ্ছৃ যতোহপোত্যরতিবিচ্ছন্না সত্যং চ শুদ্ধতাচিরেণ পুংসঃ ।

ভক্তি হরৌ তং পুরুষেচ সখ্যং তদেব হারং বদ মনুসে চেং ॥

প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ! মহারাজ পরীক্ষিত শ্রীভগবানের লীলা রহস্য যতই শুনিতেছেন ততই প্রেমানন্দে আকৃষ্ট হইয়া দেহ, গেহ, ধন, সম্পদ, ভুলিয়া যাইতেছেন; আশা মেটে না, শুনিবার আকাঙ্ক্ষার শেষ হয় না। লীলাময়ের লীলার এমনই মন প্রাণ মোহিনী শক্তি যে, একবার কর্ণে প্রবেশ করিলে আর ভোলা যায় না, তাই রাজাধিরাজ পরীক্ষিত ব্যাকুল হইয়া বলিতেছেন, হে প্রভো সর্কজ্ঞ গুরো! সর্কেশ্বর ভগবান শ্রীহরি যে যে অবতारे কর্ণের ও মনের প্রিয় যে যে লীলা করিয়াছেন, যাহা শুনিলে কর্ণের ও মনের প্রকৃত পরিতৃপ্তি সাধন হয়, আমার নিকট সেই সকল লীলা কথা বর্ণন করুন। শ্রীভগবানের লীলা বড়ই মধুর, যাহা শুনিলে ভগবানে ও ভগবৎ গুণানুবাদ শ্রবণ কীর্তনে স্বভাবত যে অনুরতি তাহা দূরে যায়, স্বতই রতি (আগ্রহ) আসে, যাহা শুনিলে বিবিধ দুর্কাসনা নাশ হয়, কোন কামনা থাকে না, যাহা শুনিলে চিত্তে বিগুহ্ব সত্যগুণের বিকাশ হইয়া মন প্রাণ পুলকিত করে, যাহা শুনিলে অতি অল্প কালের মধ্যে সর্কপাপ প্রণাশন শ্রীমধুসূদনে ভক্তি ভাবের আবির্ভাব হয়, এবং যাহা শুনিলে ভগবদ্ ভক্তের প্রতি নির্মল সখ্যা ভাব আসে, সেই মনোহারী হরি কথা বলুন। হে গুরুদেব! আমি ঐ সুপবিত্র হরিকথা শুনিতে যেস্ব্য শ্রোতা কিনা তাহা বলিতে পারি না, যদি আমার নিকট বলিতে কোন বাধা না থাকে, আর যদি আমাকে সেই সুমধুর লীলা কথায় সদানন্দে রাখিতে বাসনা করেন, তবে শীঘ্র শীঘ্র মধুময় লীলা রহস্য ব্যক্ত করুন।

যতদিন অল্প কথায় রত ছিলাম ততদিন সুমধুর লীলা কথার শ্রাপ মন বিমো-  
হিনী শক্তি অনুভব করিতে পারি নাই ; তাই বলি—

অথাত্তদপি কৃষ্ণস্ত্র তোকচরিতমভূতং ।

মানুষং লোকমাসাশ্রুতজ্জাতি মনুষ্যকৃততঃ ॥

শ্রীভগবান্ মানুষেরস্থায় মৃতি ধারণ করিয়া, মানুষের অসুগত হইয়া মানুষের  
সম্বন্ধিত মাতৃময় ভাবে যে সকল অদ্ভুত অদ্ভুত বাল্য লীলা করিয়াছেন, শুকদেব  
সেই সকল লীলার গূঢ় রহস্য ব্যক্ত করত আমায় কৃতার্থ করুন ।

পরীক্ষিতের শ্রীকৃষ্ণ কথা শ্রবণের পিপাসা ও কৃষ্ণ কথায় রতির ভাবে  
অতিশয় পীড়িত হইয়া, সদানন্দ ময়ের (ভাবানন্দে সদাই আনন্দিত, প্রেমানন্দভাবে  
একেবারে আত্মহারা, ও ভাব গদ গদ চিন্ত, মহামুনি শুকদেবও পীড়িত প্রফুল্ল চিন্তে  
বলিতে লাগিলেন—

শ্রীশুক উবাচ ।

কষাচি দৌ খানিককৌতুকাপ্রবে । জন্মক্ষ যোগে সমবেত যোধি তাম্ ॥

বাদিত্র নীতদ্বিজ মন্ত্র বাচকৈঃ চকার হৃনো রভিসেচনং সতী ।

শুকদেব বলিতেছেন, মহারাজ একদিন বালগোপালের অঙ্গ পরিবর্তনের সামর্থ্য  
হইয়াছে দেখিয়া এবং জন্ম নক্ষত্র যোগ হইয়াছে জানিয়া, সতী মা যশোদা ব্রজ  
বাসী নর নারীকে আহ্বান করত নানাবিধ বাহ্য গীত ও ব্রাহ্মণগণের পবিত্র মন্ত্র  
পাঠাদির দ্বারা মহোৎসব করিতে আরম্ভ করিলেন । আনন্দের সীমা নাই, কোথায়  
বা নৃত্য, কোথায় বা গীত, কোথায় বা নানাবিধ বেদ মন্ত্র উচ্চারণ হইতেছে ;  
মা যশোদা আনন্দময় শ্রীভগবানের ভাবে বিভোরা হইয়া সকলক্ষে সমাদর করি-  
তেছেন আর কেবল গোপালের কল্যাণ কামনা করিতেছেন, নানাবিধ মাতৃলিক  
দ্রব্য সংযোগে গোপালকে তৈল হরিদ্রা মাখাইয়া স্নান করাইয়া আদর করিতে  
ছেন, মুগ্ধ মণ্ডল মুছাইয়া পুনঃ পুনঃ দর্শন ও চুম্বন করিতেছেন । গোপাল ও  
যশোদার বাৎসল্য প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া মা যশা করিতেছেন তাহাই প্রীতি পূর্বক  
স্বীকার করিতেছেন । লীলার মধুরতা দেখাইবার নিমিত্ত শ্রীভগবান্ যেন সত্য  
সত্যই নবীন শিশু ।

নন্দস্ত পত্নী কৃতমজ্জনাদিকং বিপ্রৈঃ কৃতশস্ত্যয়নং সুপূজিতৈঃ ।

অনাত্তবাসঃ স্রগলীষ্টধেনুভিঃ সঙ্কাতনিদ্রান্মশীশয়চ্ছনৈঃ ॥

যশোদা হান কর্ম শেষ করিয়া ত্রাঙ্গগণকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন, ত্রাঙ্গগণ ও পবিত্র মঙ্গলময় বেদ বাক্য দ্বারা গোপালের মঙ্গলার্থ রক্ষা বন্ধন করিলেন, স্বভাবত মঙ্গলময় গোবিন্দ আজ বেদ বাক্যাদি দ্বারা মঙ্গল ভাবাপন্ন হইলেন। আনন্দময়ের জননী নন্দগেহিনী যশোদা অতি প্রীতির সহিত সন্তানকে কোলে করিয়া লালন করিতেছেন, দেখিতে দেখিতে পুত্রের কল্যাণার্থ সমাগত নরনারীর আদর অভ্যর্থনা কুরিবেন বলিয়া নিদ্রাবিষ্ট কৃষ্ণদনকে সামান্য শয্যা শয়ন করাইলেন, গোধন পরিমণ্ডিত গোকুলে নানাবিধ গো ও গোকট বিরাজ করিতেছে, যশোদা আনন্দে আগ্রহারা হইয়া একটী শকটের ছায়ায় গৃহের প্রাঙ্গণেই গোবিন্দকে শয়ন করাইলেন, মাদ্র মনে কোন বিধা নাই, মার মনে অহঙ্কার নাই, মার মন কেবল পুত্ররূপী গোবিন্দের আনন্দই কামনা করিতেছে। এদিকে—

ঔখানিকৌং শুক্য মনা মনপিনী, সমাগতান্ পূজয়তী ব্রজৌকমঃ ।

নৈবাণগোদৈব রুদিতং সুতস্ত মা রুদন্ স্তনার্থী চরণাবুদক্ষিপৎ ॥

পুত্রের উখান মহোৎসবে আনন্দ বিভোরা বুদ্ধিমতী মা যশোদা সমাগত ব্রজ জনকে পূজা করিতেছেন, এদিকে পুত্রের নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে, পুত্র যশোদার স্তন-হৃদ কামনায় কাঁদিতেছেন; মা যশোদা সমাগত লোক মেবায় ব্যস্ত থাকায় কিছুই শুনিতেছেন না, পুত্র পুনঃ পুনঃ রোদন করত কেবল বালক স্বভাব স্থূলত পদ দ্বয় উক্কে ক্ষেপণ করিতেছেন। বালকের এইরূপ নিরাশ্রয় অবস্থা দর্শনে কংসানু-চর অগ্র য়ে পুর্কেই শকট রূপধারণ করিয়া গোপালের প্রাণনাশার্থ অবসর প্রতীক্ষা করিতেছিল, এক্ষণে যশোদা নাই, বালক একাকী কাঁদিতেছে দেখিয়া আপন অভিমায় পুরণের এই অতি উত্তম সময় মনে করিয়া ক্রমিক অগ্রসর হইয়া গোপালের উপর চাপিতে উদ্যোগ করিল, যত অগ্রসর হইতেছে সর্কাস্ত-ঘ্যামী লীলাময় ততই অজ্ঞানীর ছায় রোদন করত চরণ ক্ষেপণ করিতেছেন, এইরূপে যেমন শকটরূপী কৃষ্ণমচর গোবিন্দের দেহের উপর নিপতিত হইবে অমনি—

অধঃ শয়ানস্ত শিশোরনল্পকপ্রবালমুষ্ণহৃতং ব্যবর্জিত ।

বিক্রমশুনানা রসকুপ্য ভাজনং ব্যত্যস্ত চক্রাক্ষ বিভিন্ন কৃবয়ং ॥

নিম্নে শারিত শিশুর মুকোমল নদাঘাতে শকট দূরে নিক্ষিপ্ত হওত চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল, উহার চাপে অনেক হৃদ দধির ভাও দ্রব্যের সহিত নষ্ট হইল, শকটের

চক্র অক্ষ ও নাভি সকলই ভাসিয়া গেল, তখন অস্তরীকে দেবগণ ও দেবধিগণ দেখিতে পাইলেন, ঐ ভয় শকট হইতে কি এক অশূর্ষ জ্যোতি আসিয়া গোপালের অঙ্গে মিশিয়া গেল। পাঠক ঐ জ্যোতি আর কিছুই নয়, গোপালের পদাধাতে মুক্ত শকটাহুরের আত্মা। অহো! শকটাহুর তুমি ধন্ত, পদাধাতে তোমার দেহ ভাসিয়া গোবিন্দ! তোমায় আত্মসাৎ করিলেন। আমরা তেমন দিন কবে পাইব ?

দৃষ্টা যশোদা প্রমুখা ব্রজস্থিয় ঔখানিকে কষ্মণি যাঃ সমাগতাঃ ।

নন্দাদয় শ্চাত্ততদর্শনাকুলাঃ কথং সয়ং বৈ শকটং বিপর্যগাং ॥

এদিকে যশোদা ও ঔখানিক কষ্ম সন্দর্শনে সমাগত অপরাপর ব্রজ স্ত্রীগণ এবং নন্দ প্রভৃতি গোপগণ ঐ অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে অতিশয় বিস্মিত হইলেন। সকলেই “কিরূপে শকট উল্টাইয়া পড়িল” এই বিষয় আলোচনা করিতেছেন স্নেহময়ী মা যশোদা ব্যাকুল প্রাণে বলিতেছেন, হে সখিগণ! তোমাদের আশীর্ব্বাদে আমার প্রিয়তম কৃষ্ণ শকট চাপা পড়ে নাই, হায়! যদি এই চক্র বালকের কোমল অঙ্গে পতিত হইত, তবে আমি কি করিতাম, হায়! আমি কেন গোপালকে রাখিয়া গিয়াছিলাম, আমি ব্রাহ্মণগণকে ও সমাগত জনগণকে সমাদর করিতে গিয়াছিলাম বালয়্যাই আমার কৃষ্ণের কোন ব্যাধাত হয় নাই। অপাপ স্বভাব ব্রজবাসীরা জানে না যে পবিত্র শর্ম্মের হস্তা হুরাশ্বা কংস চরেরা প্রতি নিয়ত অনিষ্ট আচরণের নিমিত্ত ব্রজধামে ইতস্তত বিচরণ করিতেছে; তাই ব্যাকুল প্রাণে পরস্পর জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, কি প্রকারে শকট বিপর্যস্ত হইল, এই বিষয় ভাবিয়া গোপগোপীগণ অতিশয় ব্যাকুল হইলেন। দেখিতে দেখিতে নানাপ্রকার লোক সমাগম হইল, কতিপয় বালক বলিল মহারাজ আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি যখন ঐ সুকুমার বালক কান্দিতে কান্দিতে চরণ উৎক্ষেপণ করিতেছিল তখন ঐ কুমারের পদাধাতেই শকট বিপর্যস্ত হইয়াছে; ইহাতে কোন সন্দেহ করিবেন না।

উচুসব্যবসিতমতীন গোপান গোপীশ বালকাঃ ।

রুদন্তা নেন পাদেন ক্ষিপ্তমেতং নসংশয়ঃ ॥

ন তে শ্রদ্ধ ধিরে ধোপা বাশ ভাষিত মিভ্যুত ।

অপ্রমেয়ং বলং তন্ত বালকন্ত ন তে বিদুঃ ॥

বালকগণের কথা নন্দ যশোদা প্রভৃতি গোপগোপীগণ বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, কারণ তাঁহারা ঐ বালকের অপ্রমেয় বল জানেন না। হায় হায় শ্রীভগবান তাঁহাদিগকে বাৎসল্য প্রেমে মাতোয়ারা করিয়া রাখিয়াছেন, ঐখৰ্ষাভাব কি রকমে উহাদের মনে আসিবে? লীলাময়ের কৌশল অতিক্রম করে কার সাধ্য, তিনি যখন যাহাকে যে ভাবে ভাবিত করেন তাঁহার সেই ভাব অতিক্রম করা কোন মতেই জীবের শক্তিতে হয় না। তখন—

রুদন্তং সূতমাদার যশোদা গ্রহশক্তিভা ।

কৃতস্বস্ত্যয়নং বিপ্রৈঃ সূক্তৈশ্চনমপায়য়ং ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তখন বাৎসল্য ভাবপূর্ণা যশোদা মনে করিলেন, কোন পাণ গ্রহ উপস্থিত হইয়াছে, তাই ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্ত্যয়নাদি করাইতেছেন। ভাবনিধি, মাকে বাৎসল্য প্রেমে মাতাইবার মনসে ভীতের ছায় ঈষৎ রোদন করিতে লাগিলেন, মাও বালককে কোলে লইয়া স্তন দুগ্ধ পান করাইতে লাগিলেন। ষষ্ঠ যশোদার বাৎসল্য প্রেম, যাহার প্রেমরকার দ্বিতীয় ভয়হারী শ্রীহরি আজ ভীত ভীত হইয়া রোদন করিতেছেন, আর স্তন-দুগ্ধ পান করিতেছেন।

প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ! এখন ভাবুন ইহার তাৎপর্য কি? পূর্বে শুনিয়াছেন, পুতনা মায়াবিনী, মায়ী স্বরূপিনী; মায়ী পরাজিতা হইল, মায়ীর হাত হইতে ভাবময় ভাবধন শ্রীপোষিন্দ সুরক্ষিত হইলেন, মায়ী পরাজিত হইলে পরও সাধকের পরীক্ষা শেষ হয় না, অদৃষ্ট চক্রে অর্থাৎ পূর্বে সঞ্চিত কৰ্ম ও কৰ্মফল যখন সাধকের ভাবনষ্টকারী বিপদ সম্পদ, লাভ অলাভ ও তাব অভাব প্রদানে সাধককে নিষ্পেশিত ও মর্হীভূত করিতে চায়, তখন যাহারা ক্রিয়াযোগী তাঁহারা যোগাদি ক্রিয়া দ্বারা কতক শোক দুঃখাদি নষ্ট করিতে যত্ন করেন, কতক বা সহ্য করেন। জ্ঞানীরা সমাগত প্রাক্তন কৰ্মফল ভোগ করেন, তবে জ্ঞান দ্বারা উহার তত্ত্ব জানিয়া অতিশয় বিহ্বল হন না, নিরাসক্ত ভাবে কৰ্মফল ভোগ করিয়াও ভাব ছাড়ি হন না, এখানে কিংব জ্ঞানীও না কৰ্মীও না বিস্কৃত ভক্তের ব্যপার। তত্ত্ব আরাধ্য দেবকে দেহ মন শ্রীণ সকল অর্পণ করিয়া তাঁহার ভাবে তাঁহারনাম ও গুণানুবাদে যখন পরমানন্দে থাকেন, তখন যখন অভিমান শূন্য হইয়া কামনা ও বাসনা পরিত্যাগ পূর্বেক আরাধ্যদেবের যাত্রা ও উৎসবে মাতিয়া থাকেন, তখন যখন সকল প্রাণিতে আরাধ্যদেবের আধীন জানিয়া সকলকেই সেবা করেন এবং

আরাধ্যদেবেরই নাম গুণ শ্রবণ কীর্তন করত আত্মহারা হইয়া থাকেন, তখন ভক্তের ভাব নষ্ট করিতে যদি প্রাক্তন কর্ম চক্র অগ্রসর হয় তবে ভক্তবাহু কল্পতরু তক্তবৎ-সল জ্রীহরি স্বয়ংই পদাধাতে ভক্তের অন্তত কর্ম চক্র দূরে নিক্ষেপ করেন অর্থাৎ নিত্যাত্মিযুক্ত ভক্তের যোগ ও ক্রম তিনিই বহন করেন । তিনি নিজে বলিয়াছেন-

“অনভ্যাশ্চিস্তয়ন্তো মাং দে জনাঃ পৰ্যুপাসতে ।

তেষাং নিত্যাত্মিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং” ॥

অর্থাৎ আত্মহারা হইয়া যে ভক্ত সর্বাদ্বৈতকরণে আমাতে সমস্ত অর্পণ করত আমার হইয়া যায়, তাহার পূর্ব সঞ্চিত কর্মাদি তাহার আত্ম সমর্পণের সহিত আমাতে অর্পিত হওয়ায় একেবারে নষ্ট হইয়া যায়, আমি তাহাকে সর্বাদ্বৈত আমার ভাবে ভাবিত করিয়া পরমানন্দে রাখি, এ অবস্থায় তাহাকে আর কোন কর্মের চক্রে ঘুরিতে হয় না, তবে সম্পূর্ণ আত্ম নির্ভর না হওয়া পর্যন্ত কর্ম ফল ভোগ করিতেই হয় ।

যখন ভক্ত একেবারে সকল কর্ম সকল সুখ ও সকল কর্তব্য সাধন, সেই আরাধ্যদেবে সমর্পণ করিয়া তাঁহারই কর্মে নিযুক্ত থাকেন, তখন আর তাঁহার ভাব রক্ষার নিমিত্ত তাঁহাকে ভাবিতে হয় না, তাঁহার অদৃষ্টও নানারীক্ষণ গদায় পতিত হইলে যেমন গজাঙ্গল হইয়া যায়, সেইরূপ ভগবানে অর্পিত কর্ম সকল ভগবৎ ভাবে অমৃতময় হইয়া যায়, তখন বিষ অমৃত হয়, দুঃখ সুখে পরিণত হয় ও বিশেষ সম্পদ বলিয়া গণ্য হয় ; শকট যেমন উষ্টাইয়া গেল, ভক্তের কর্ম ফলও সেইরূপ ভগবৎ কৃপায় উষ্টাইয়া যায় ।

ভক্ত পাঠক! অভিমান রাখিওনা তোমার মায়ী মোহরূপিণী পুতনা যখন দমন হইবে, অমনি তুমিও তাঁহার শাস্তিময় চরণে চির জীবনের তরে অর্পিত হইও । তোমার কর্মচক্ররূপ শকটাসুরকে তোমার অজ্ঞাতসারে তোমার আরাধ্যদেবই বিনষ্ট করিয়া দিবেন, তোমায় ভাবিতে বা হতাশ হইতে হইবে না, নির্ভর কর, মোহ বশত' নিজে কর্তৃত্বের উপর নির্ভর করিওনা তুমি নিরাপদে ভাবধনে বনী থাকিতে পারিবে ।

“ন স পুনরাবর্ততে ন স পুনরাবর্ততে”

ক্রটি স্পষ্টাকরে শিক্ষা দিতেছেন একবার যদি তাঁহার ভাবে ভাবিত, অভ্যাস শূন্য এবং আত্মহারা হইয়া তাঁহার হইতে পার, তবে আর কর্ম চক্রে



তোমাকে ঘুরিতে ফিরিতে হইবেনা; তোমার ষোড়াকেরা একেবারে শেষ হইয়া যাইবে। আত্ম সমর্পণ কর অমৃতময় হইবে।

পুরাণের ইতিবৃত্ত আলোচনায় অনেক স্থানেই আমরা দেখিতে পাই ভগবতুপাসনায় অগ্রসর হইয়া সাধক যখন একেবারে ভগবৎপদে আত্ম সমর্পণ করিতে পারে তখন তাহার নিকট কৰ্ম পরাজিত হয় এমন কি বশশক্তিও কৰ্ম করিতে পারে না। অগ্নি শীতল হয়, বিষ জীবনী শক্তি দান করে, বিপদ সম্পদ হয়, তাই প্রহ্লাদ বিষ খাইয়া মরিল না, আগুনে পুড়িল না, জলে ডুবিল না; বরং যত পরীক্ষা, যত বিপদ ও যত দুঃখ আসিল, ততই তাহার প্রাণে ভক্তবাহু কল্পতরুর তন্তুর প্রতি ভালবাসার ভাব ধারণ হইতে লাগিল। পাঠক পাঠিকগণ! দেখ, আবার অদৃষ্ট চক্রে সত্যবানের মৃত্যু নিকারিত, যমদূত আসিয়া মৃত সত্যবানের প্রাণ লইতে অগ্রসর, সত্যবান মুচ্ছিত; কিন্তু আদর্শসতী সাবিত্রীর তপস্যায় সত্যবান জীবন পাইল, সাবিত্রীর পিতা মাতার দুঃখ দূর হইল, সাবিত্রীর তপস্যায় সাবিত্রীর স্বপ্নের শাস্ত্রী চক্ষু পাইল। ভগবৎ আরাধনায় যদি কৰ্ম চক্র পরাজিত না হইবে তবে মাধনের গুণ কি ? সাধন করিয়া ভাব পাইয়া ভগবানে আত্ম সমর্পণ করিয়াও যদি অদৃষ্টদুর্ভাগী ভোগ করিতে হইল তবে আর হইল কি ? তবে একেবারে আত্ম সমর্পণ না করা পর্যন্ত কৰ্ম চক্র পরিবর্তিত হয় না ইহা সুনিশ্চিত।

যাহারা ভক্তি ভাবে শ্রীভগবানের ভাবে আত্ম সমর্পণ করেন, যাহারা একমাত্র ভগবানকে ভিন্ন আর কিছুই জানেন না যাহারা নিজের দেহ মন প্রাণে ও সেই বিশ্বজীবজীবনের পবিত্র সত্ত্বা অনুভব করেন, তাহারা কৰ্ম চক্রের হাত হইতে যে নিষ্কৃতি পান তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই, ইহাই দেখাইবার জন্য শ্রীগোবিন্দের শকট ভঙ্গন লীলা।

এখানে নিবিষ্ট চিত্তে পাঠকগণ আবার শব্দার্থে যোগে লীনার নিগূঢ় রহস্য আলোচনা করুন, শকটে আরোহণ করিয়া যেমন লোক নানা স্থানে গমন করে, সেইরূপ কৰ্মকে আরোহণ করিয়া জীব স্বর্গ নরকাদি উচ্চ নীচ নানা স্থানে পরিভ্রমণ করে, আবার গো শকট গো শব্দে ইন্দ্রিয় কৰ্ম গুলি ও ইন্দ্রিয় দ্বারাই সাধিত হয় আবার ইন্দ্রিয়গণই কৰ্মফল ভোগ করে সুতরাং যাহারা প্রত্যেক

ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ের কর্তা ইন্দ্রিয়ের বেগ ও ইন্দ্রিয়ের আনন্দদাতা রূপে শ্রীভগবানকে হৃদয় গোকুলে নিরন্তর রাখিতে পারে তাহারা সাধনার পরপারে পহুছাইয়া যায়, তাহাদের ইন্দ্রিয় ভোগ আর সাধারণ বিষয়ের ব্যাপারে থাকেনা । শ্রীভগবানের প্রত্যেক লীলার রহস্যই যে অতি মধুর ও হৃদয়ানন্দদায়ক তাহা পাঠক পাঠিকা মাত্রেই অনুভব করিতে পারিবেন, তবে যাহারা সাধনা করে না কেবল বাহিরের স্মৃল লক্ষ্য লইয়াই দিন কাটায় তাহাদিগকে আমি শত সহস্র চেষ্টা করিলেও এই নিগূঢ় লীলা রহস্য বুঝাইতে পারিব না ।

সাধন করুন আপনা আপনি ভাব রাস্তায় সংবাদ আসিবে, কেহ একটুক ভাব উদ্ভাবন করাইলেই প্রাণ ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে ।

এদিকে এক একটা বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইলে সাধক যেমন বিপদবারণ শ্রীভগবানের মহিমা কীর্তন করত ভাবের বৃদ্ধি করে, মা যশোদাও শকটাসুর হইতে সুরক্ষিত প্রিয়তম গোপালকে নানা প্রকার পবিত্র বস্ত্র দ্বারাও মন্ত্রময় ক্রিয়া যোগে মানাদি করাইয়া লালন পালন করিতে লাগিলেন ।

ক্রমশঃ

দীনবন্ধু শর্মা—

## দম্পতী দর্পণ ।

( ২ )

( পূর্ব প্রকাশিতের পর । )

শুশীলা । যদিও এক্ষণে আপনার উপদেশে বিবাহের উদ্দেশ্য ও তত্ত্ব কিছু কিছু বুঝিলাম, তথাপি আমার সেই প্রতিজ্ঞা মন্ত্র গুলির তাৎপর্য শুনিতে বাসনা হয় । যদি আপনার ক্রেশ না হয়, এবং যদি উহা শুনিবার আমি যোগ্য হই তবে মন্ত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়া আমার প্রথম প্রার্থনা পূরণ করুন ।

প্রবোধ। সুশীলা তুমি শুনিতে না চাহিলেও আমি অল্প তোমায় ঐ মন্ত্র ও মন্ত্রার্থ শুনাইতাম, তুমি যখন আপনা হইতে শুনিতে চাহিয়াছ তখন আর আমার বলিতে কোনই বাধা নাই বরং অতিশয় আনন্দ হইতেছে। তুমি একবার বাহিরে যাও তোমার পিতার নিকট হইতে বিবাহের পুস্তক ধান। এখানে আন। সুশীলা স্বামীর বাক্যে উৎসাহিতা ও আনন্দিতা হইয়া পুস্তক আনিতে বাহির হইল। সুশীলা বাহিরে যাওয়া মাত্র সুশীলার মা ও বাপ অতিশয় ভীত ও দুঃখিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, সুশীলা ওকি বাসর ঘর হইতে বাহিরে আসিলে কেন? আমাদের সকল আশা ভরসা ও আনন্দ কি একেবারেই হতাশায় পরিণত হইল? এইমাত্র কুঁচু ও জ্ঞাতি বান্ধবের পরিবারগণ ক্ষুণ্ণমনে বাসর ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া বলিল জামাতা পাগল; আবার দেখিতে দেখিতে তুই বাহিরে আসিলি? আমায় বল ব্যাপার কি? তুই আমার গুণবতী সরলা অতি প্রিয়-তমা কন্যা, তাই বড় অশা ও আন্দর করে ভালবর সংগ্রহ করিয়াছি, আমার ভাগ্যে কি সকলই বিফল হইল? হায় বিধাতঃ! আমার মেহের, অতিন্নেহের পালিতা সুশীলাকে সুখী করিও সুশীলার কষ্ট দেখিয়া আমি প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না। সুশীলার মা বলিলেন, সুশীলা বল মা কি হয়েছে, ও কি বাহিরে আসিলে কেন? বল না মা বল, প্রাণ যে ব্যায়ুল হইতেছে, বল মা কেন একাকিনী বাহিরে আসিলি, কেনই বা স্ত্রীলোকেরা নানাপ্রকার বিক্রম বাক্য প্রয়োগ করিতে করিতে চলিয়া গেল?

সুশীলা প্ৰীতির সহিত পিতা মাতার চরণে প্রণাম করিয়া সহাস্য বদনে বলিল;— মা তোমাদের আশীর্ষাদে সকলই অতি উত্তম হইয়াছে। বাবা আপনি দুঃখ করিবেন না, আপনি যখন বিচার করিয়া সুযোগ্য বরের হাতে অর্পণ করিয়াছেন, আপনার যখন সৰ্ব্বদা আমার মঙ্গল কামনা, আর আপনি যখন আশীর্ষাদ করত বৈশ্য পাত্রে আমায় অর্পণ করিয়াছেন, তখন কখনও তাহা হইতে আমার দুঃখ হইবেনা, কোন ভয়ের বা মন্দ আশঙ্কার কারণ নাই, তিনি মহাপণ্ডিত অতিশয় শাস্ত্র ও সংযমী, তাঁহার হৃদয়ের দেবভাব ও পবিত্র ব্যবহারে আশা করি আপনারা পরম প্ৰীতি লাভ করিবেন। আমাদের দেশে যেরূপ ভাবে বাসর করা হয় তাহা তিনি শাস্ত্র ও যুক্তি বিপ্লব মনে করায় এবং প্রাণ খুলিয়া তিনি পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবেন ও আমাকে সহপদেশ দিবেন

বলিয়াই সকলকে বাসর ঘর হইতে বাহিরে যাইতে বলিয়াছেন, আমোদ প্রিয়া রমণীগণ বৃথা আমোদ করিতে পারে নাই বলিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছে। তিনি আমাকে এতক্ষণ বিবাহের উদ্দেশ্য কি এবং বিবাহের পর হইতে স্বামী ও স্ত্রী কি ভাবে থাকিবে এই সকল বিষয় উপদেশ দিতে ছিলেন, আমি বিবাহের মতের অর্থ শুনিতে বাসনা করায় বিবাহের পুস্তক খানা আনিতে আমায় পাঠাইলেন। আমি বিবাহের মন্ত্রার্থ শুনিব আমায় পুস্তক দিউন। সুশীলার পিতা এই সকল কথা শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। সুশীলার মাধায় হাত দিয়া পুনঃ পুনঃ আশীর্বাদ করত বলিলেন, সুশীলা তুমি প্রকৃত সম্পতি পাইয়াছ, সাহসে লেখক ও নারসায়িক উভয়দিকের কল্যাণ হয় তাহা ভাল রূপে জানিয়া সুযোগ্য পাতের আদেশানুসারে আদর্শ সংসার কর, তোমাদের যোগ্য মি বনে সুপণিত ব্যবহারে, যোগ্য গৃহস্থশ্রমের শিক্ষা লাভের তোমর আদর্শ স্থানীয় হইবে আশাকরি। এই বলিয়া গৃহ হইতে “ভবদেব! পুস্তক বাহির করিছা দিলেন, সুশীলার মা বলিলেন যাও মা! পুস্তক লইয়া সন্মুখ বাসর ঘরে যাও, অল্প বয়স কত্না একত্র থাকিতে হয়, আর বিলম্ব করিওনা মা। সুশীলা এছ লইয়া বাসর ঘরে প্রবেশ করিল। প্রবেশ সুশীলাকে দেখিয়া সহাস্য বদনে বলিল সুশীলা এত বিলম্ব কেন, বাহিরে যাওয়ার তোমার পিতা মাতা কি অজ্ঞান বাকবগণ কিছু বলিয়াছেন কি? তোমার কোনরূপ কষ্ট হয় নাই তো?

সুশীলা। আমার কোনই কষ্ট হয় নাই তবে আমাকে বাহিরে যাইতে দেখিয়া মা ও বাবা মনে অল্প রকম সন্দেহ করিয়া প্রথমে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন, পরে আমার নিকট বাহিরে যাইবার কারণ শুনিয়া সুখী হইলেন ও আপনাকে আশীর্বাদ করিলেন। আর সেই যে কতকগুলি রমণী আসিয়াছিল তাহারা যথেষ্ট হাজি গল্প করিতে পারে নাই বলিয়া দুঃখপ্রকাশ করিয়াছে মাত্র। বোধ করি তাহারা আপনাকে পাগল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে।

প্রবেশ। সুশীলা! দেখিলে সমাজ কত নীচ ভাবাপন্ন হইয়াছে? বন্ধু বান্ধব ও পিতা মাতা আত্মার উন্নতি চায় না, ধর্মের উন্নতি কামনা করে না, কেবল শারীরিক আহার বিহারই সুখের কারণ বলিয়া মনে করে, তাহারা চায় কেবল আমি তোমাকে ভাল বাসিয়া তোমার সহিত শারীরিক প্রিয় ব্যবহারেই জীবন যাপন

করি, যাক্ ওসকল কথায় সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নাই এক্ষণে তুমি বিবাহের মস্তার্খ শুনিতে চাহিয়াছ শ্রবণ কর ।

প্রথমে আদর যত্নে প্ৰীতির সহিত কন্যার পিতা শুভ সময়ে বরকে পূর্ব মুখ করিয়া বসাইয়া বাক্য করিবে অর্থাৎ মাস তিথি উল্লেখ করিয়া একটী সংকল্প করিবে, পরে অমুক গোত্রের অমুকের প্রপৌত্রী অমুকের পৌত্রী ও অমুকের কন্যাকে অমুক গোত্রের অমুকের প্রপৌত্রকে অমুকের পৌত্রকে অমুকের পুত্রকে যথাসাধ্য আচ্ছাদন ও অলঙ্কারাদি দ্বারা অর্চনা করিয়া অর্পণ করিলাম, এইরূপ বাক্য করত কন্যা সমর্পণ করিবে, ইহার মধ্যে আর কোন বিশেষ তত্ত্ব নাই । বরও আচমনাদি করিয়া শুদ্ধ ভাবে থাকিবে কন্যার পিতা যেমন দান করিবেন অমনি “স্বস্তি” অর্থাৎ আমি আপনার প্রদত্তা কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলাম এই বলিয়া গ্রহণ করিবে, এইরূপ বাক্য শেষ হইলে পর অগ্নি প্রজ্জলিত করিবে অথবা দেশাচার মতে এই সময় স্ত্রীলোকের কতকগুলি ব্যবহার আছে তাহা শেষ করিয়া পরে অগ্নি স্থাপন করিবে । অগ্নি স্থাপন করিয়া অগ্নির মন্ত্রে অগ্নিতে ঘৃতাছতি প্রভৃতি দিবে উহা কেবল অগ্নি সংস্কারের ব্যাপার ঐ অগ্নি সংস্কার সকল কর্মেই সমান, যাহাদের সর্বদা অগ্নি স্থাপিত আছে অর্থাৎ যাহারা সাগ্নিক ব্রাহ্মণ তাহাদের তত বেশী করিতে হয় না, আর যাহাদের কর্মকালে অগ্নি স্থাপন করিয়া হোম করিতে হয় তাহাদেরই “কুশণ্ডিকা” বিধি অনুসারে অগ্নির পূজা ও অগ্নিতে ঘৃতাছতি এবং যজ্ঞীয় কাঠাদি অর্পণ করিতে হয় । পরে যখন অগ্নিই সাক্ষাৎ দেবতা এইরূপ বিশ্বাস আসিল তখন অগ্নির নিকট যে প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিতে হয় তাহার তাৎপর্য এই যে, হে অগ্নি দেব তোমাতে সকল দেবতার অধিষ্ঠান তুমি সর্বদেবময় তোমাতে আছতি দিলে সকল দেবতা পরিতৃপ্ত হন, তুমি জানিলে সকলে জানেন, তুমি প্রসন্ন হইলে সকলে প্রসন্ন হন, তুমি আমাদের (পতি পত্নী ভাবে মিলিত স্ত্রীপুরুষের) মনের মলিনতা দূর কর, কাষ্ঠ রাশিকে যেমন ভস্ম কর সেইরূপ আমাদের মনের পাপ রাশিকে নষ্ট কর, তুমি যেমন শুদ্ধ, পবিত্র ও নির্দ্বিকার, আমাদের মনকেও সেইরূপ শুদ্ধ পবিত্র ও নির্দ্বিকার কর । এইরূপে প্রার্থনা করিয়া পূর্ব্বকার বেদ মন্ত্র প্রচারক ঋষিগণের নাম উল্লেখ করত ঘৃতাছতি দিবে, উহা কেবল ঋষিদিগের আচরণ ও শিক্ষার স্মরণ করা মাত্র, পরে পতি পত্নীর বস্ত্রে হাত দিয়া বলিবে—

যা অকুন্তলবয়স্শু যা অ তহত যাঞ্চ দেবো হস্তা নভিতো অততস্ত ।

তাস্তা দেবো অরসা সংব্যস্তায়ুস্বতীদং পরিধংস বামঃ ॥

অর্থাৎ হে আয়ুস্বতি ! হে কন্যাগি ! তুমি আমার এই বস্ত্র গ্রহণ (পরিধান) কর যাহার এই বস্ত্রের স্বত্র নির্মাণ করিয়াছে, যাহার প্রস্তুত করিয়াছে, যাহার ইহার বিস্তার করিয়াছে, এবং বস্ত্রের উভয় পার্শে নানাবিধ বর্ণে চিত্রিত করিয়া যাহার এই বস্ত্র সুন্দর করিয়াছে তাহার তোমাকে চিরদিন বস্ত্র যোগাইবে। অর্থাৎ যে বিধ নিয়ন্তার বরুণায় এই বস্ত্র নির্মিত হইয়াছে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি রাখিয়া তুমি এই বস্ত্র গ্রহণ কর মঙ্গলময়ের কৃপায় কখনও তোমার বস্ত্রের অভাব হইবে না। ১।

উত্তরীয় বস্ত্র পরিধান করাইবার মন্ত্র—

পরিধত্ত্বত বাসসেনাং শতায়ুযোঃ কুণ্ড দীর্ঘমায়ুঃ ।

শতক জীব শরদঃ সুবক্তা বহুনি চার্ঘ্যে বিভূঙ্গাসি জীবনু ॥

উত্তরীয় বস্ত্র হাতে করিয়া পতি প্রার্থনা করিবেন, হে গুরুগণ ! আপনারা এই কত্তাকে বস্ত্রাবৃত করুন আপনারা ইহার আবৃত বস্ত্র প্রদানে অমুমতি করুন আর আশীর্বাদ করুন এই কত্তা শত বর্ষ জীবিতা ও দীর্ঘায়ু হউক। হে আর্ঘ্যে মনু ! তুমি এই বস্ত্রাবৃত হইয়া বহুকাল জীবিতা থাক সুন্দর কান্তি-মতী হও, বহু ধন লাভ করিয়া সুখে জীবন ধারণ কর। ২।

বহুকে অগ্নির নিকট উপস্থিত করিয়া জামাতা এই মন্ত্র পড়িবে।

সোমোহদদগন্ধর্কস্য, গন্ধর্কোহদদদধরে ।

রৈক পুত্রাং শতাদধির্গহমথোইমাং ॥

এই কত্তাকে জগ্নিমাতেই সোম দেবতা গন্ধর্ককে প্রদান করেন গন্ধর্ক অগ্নিকে দান করেন অগ্নি আবার ধনপুত্র সমন্বিতা করিয়া আমাকে অর্পণ করিলেন, অর্থাৎ হে চন্দ্র সূর্য অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ, তোমরা এতদিন ইহাকে রক্ষা করিয়াছ অগ্র হইতে আমি ইহার রক্ষক হইলাম তোমরা আশীর্বাদ কর, যেন পুত্র পৌত্র সমন্বিতা হইয়া এই বহু আমাকে সুখী করিতে পারে। ৩।

পরে নিজের দক্ষিণ দিকস্থিত কটের প্রান্তে বহুর দক্ষিণ পদ প্রক্ষেপ করাইতে করাইতে জামাতা বহুকে এই মন্ত্র পড়াইবেন।

অর্থাৎ বধু এই মন্ত্র পড়িবেন ।

প্রমে পতিয়া নঃ পত্নাঃ কল্পতাং ।

শিবাংরিষ্টা পতিলোকং গমেয়ং ॥

আমার পতি আমার জন্ম যে পথ রক্ষা করিয়াছেন তাহা আমার মঙ্গল জনক ও সুখাবহ এবং বিঘ্ন রহিত হউক, আমি সেই পথ দ্বারা নিরাপদে পতিলোকে গমন করিব ॥ ৪ ।

পরে বধু পতির দক্ষিণ দিকে উপবেশন করিবে । এবং বধু হস্ত দ্বারা পতির স্কন্ধদেশ স্পর্শ করিয়া থাকিবে পতি নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে ও ঐ মন্ত্র দ্বারা অর্জতি দিবে, এই সকল মন্ত্র পত্নী সাধরে শ্রবণ করিবে, সমর্থ হইলে পাঠ করিবে ।

অগ্নিরেতু প্রথমো দেবতাভ্যঃ সোহষ্টৈশ্চ প্রজাং

মুক্তাতু মৃত্যুপাশাং তদয়ং রাজা বরণো হনুমত্ততাং

যথেষ্টং স্ত্রী পৌত্রমবৎ ন রোদাং স্বাহা ॥

সকল দেবতার প্রধান অগ্নিদেব এখানে উপস্থিত হউন, এই বধুর ভাবী সমস্তানগণকে মৃত্যু পাশ হইতে মোচন করুন, অর্থাৎ ইহার যেন সমস্তান নষ্ট না হয় ; রাজা বরণসেবও ঐরূপ আশীর্বাদ করুন যেন এই বধু কখনও পুত্র জন্মিত হুংখ ভোগ না করে । ৫ ।

ইমামগ্নিস্ত্রায়তাং গার্হপত্যঃ প্রজান্শ্চৈশ্চ জরদষ্টিং কণোতু ।

অশুশ্চোপস্থা জীবতামস্ত মাতা পৌত্রমানন্দ মভি বুধ্যতামিয়ং স্বাহা ॥

গার্হপত্য অগ্নি এই বধুকে রক্ষা করুন, অর্থাৎ গার্হস্থ ধর্ম্মে ইহার শ্রবৃতি হউক, ইহার সমস্তানগণকে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত অগ্নি নিরাপদে রক্ষা করুন, এই বধু যেন পতি বিরহিণী না হয়, জীবিত পুত্রের মাতা হউক পুত্র সম্বন্ধীয় জ্ঞানন্দ চিরকাল অনুভব করুক । ৬ ।

ত্র্যোস্তে পৃষ্ঠং রক্ষতু বায়ুরুক্ অগ্নিনৌচ

স্তনকয়স্তে পুত্রান্ সবিতাভিরক্ণত্বাবাসমঃ ।

পরিধানান্ব হৃস্পতিবিশ্বেদেবাশ্চাভিরক্ণস্ত পশ্চাং স্বাহা ।

হে বধু ! তোমার পৃষ্ঠদেশে হ্যুলোক রক্ষা করুন, বায়ু ও অগ্নিনীকুমারদ্বয়  
তোমার উরুদ্বয় রক্ষা করুন, স্তনদুগ্ধ পায়ী সন্তানগণকে স্বর্গ্যদেব রক্ষা করুন,  
পরিধানার্থ বস্ত্র সকল বৃহস্পতি ও বিশ্বেদেবগণ রক্ষা করুন।

মাতে গৃহেয়ু নিশি ষোষ উখাদগাত্র তুক্রদত্যঃ সংবিশস্ত ।  
মা তুং কদতুর আবধিষ্ঠা জীবপত্রি পতিলোকে বিরাজ  
পশ্চাত্তী প্রজাং স্তনস্তমানাং স্বাহা ॥

হে কল্যানি ! তোমার গৃহে কখনও যেন রাত্রে কোনরূপঃশোকধ্বনি না হয়,  
রোদন কারিণী শোক শক্তি তোমার শত্রুগৃহে প্রবেশ করুক। তুমি কখনও  
রোদন করিতে করিতে বক্ষ স্থলে আঘাত করিও না। তুমি জীবপত্রী অর্থাৎ  
সধবা অবস্থায় স্তন্যদেহে সন্তানগণের সহিত পতি লোকে পরমানন্দে বাস কর। ৮।

অপ্রজস্মৎ পৌত্রমর্থাৎ পাপ্যানং উতবা অশং ।

শীর্ষঃ স্রজ মিবোমুচ্য দ্বিষদৃভ্যাঃ প্রতিমুখামি পাশং স্বাহা ।

হে কল্যানি ! তুমি কোনরূপ ভয় করিও না, তোমার পুত্র না হওয়া অর্থাৎ  
বস্ত্রাদি দোষ, পুত্র মরণ অর্থাৎ মৃতবৎসাদিদোষ অত্রাশ্র শারীরিক ও মানসিক  
পাপ এবং অশ্র যে কোন দোষ থাকুক সে সকল মস্তকের মালার স্থায় তোমার  
শরীর হইতে উন্মুক্ত করিয়া আমি অগ্নিতে ভস্ম করিতেছি তুমি নিষ্পাপ হইয়া  
স্থখে থাক। ৯।

পঠৈতু মৃত্যুরমৃতং ম আগাঈদ্বৈবপ্তোনোহভয়ং কৃণোতু ।

পরং মৃত্যোহনুপরেহি পশ্চাঃ যএনোহনুঃ ইতরো

দেবযানাস্তক্ষুণ্মতে শ্মতে তে ব্রবীমি মানঃ প্রজাং

ব্রীরিষো মোতবীরান্ স্বাহা ॥

আমাদের নিকট হইতে মৃত্যু দূরে পলায়ন করুক, (অমৃত্যু অমর ভাব) আমা-  
দের নিকট আসুক, বৈবশ্বত (যম) আমাদেরই অতয় প্রদান করুক, হে মৃত্যো তুমি  
আমাছাড়া অশ্র স্থানে যাও—অর্থাৎ আমার নিকট হইতে দূরে যাও। আমার  
পাপ সকল দেব পথ ও পিতৃ পথ হইতে অপহৃত হউক। তোমার ভ্রবণ গোচর  
ও চক্ষুগোচর করিয়া বলিতেছি হে মৃত্যো তুমি আমাদের সন্তান সন্ততিক অশ্রায়  
রকমে আক্রমণ করিও না। তাহারা বীরত্ব দেখাইলে তুমি ক্ষমা করিও। ১০।



এইরূপে আছতি দেওয়া হইলে আবার অগ্নিতে ঘৃতাহতি দিবে। পরে “অগ্নয়ে স্বাহা” এই মন্ত্রে অগ্নির উপর উত্তরাংশে পূর্বাভিমুখী ঘৃতধারা দিবে।

পুনর্বার “সোমায় স্বাহা” এই মন্ত্রে অগ্নির উপর দক্ষিণ ভাগে পূর্বাভিমুখী ঘৃতধারা দিবে।

পরে পতি পত্নীর পৃষ্ঠদেশ দ্বারা দক্ষিণ দিকে যাইবে অর্থাৎ পত্নীকে বামে রাখিয়া অগ্নির উত্তর পশ্চিমে স্থাপিত পেষণী সমন্বিত শীলা সমীপে আসিয়া উত্তরাভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া নিজের দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বধূর অঙ্গলিরূপে স্থিত হস্তদ্বয়ের নিয়ে ধারণ করিবে, পরে মাতা ভ্রাতা কিম্বা অন্য ব্রাহ্মণ বাম হস্তে শমী পত্র মিশ্রিত লাজাহতি উহাদের হস্তে অর্পণ করিবে। জামাতা বধূর দক্ষিণ পদাঙ্গ শিলার উপর আক্রমণ করাইতে করাইতে মন্ত্র পড়িবে ।

মন্ত্র।—

ইমমস্থান মারোহ অশ্বেষ ত্বং স্থিরা ভব।

দ্বিষন্তমপবাধস্য মা চ ত্বং দ্বিষতামধঃ ।

হে বধূ! তুমি এই পাষণকে আক্রমণ (পদদ্বারা স্পর্শ কর) পাষণের ন্যায় তুমি স্থিরা হও, শত্রুকুলকে দমন কর, শত্রুর নিকট অপমানিত হইও না। ১১।

পরে বধূর অঙ্গলির উপর জামাতা কর্তৃক একবার ঘৃতবিন্দু প্রদত্ত হইলে পূর্বেকর ন্যায় বধূর মাতা ভ্রাতা বা অন্য ব্রাহ্মণ ঐ অঙ্গলির উপর চারিবার চারিমুষ্টি লাজা দিবেন, ঐ লাজার উপর জামাতা দুইবার ঘৃতবিন্দু দিবেন, পরে পতি কর্তৃক মন্ত্র পাঠ হইলে বধূ পতির সংস্পৃষ্ট অঙ্গলির অগ্রভাগ দ্বারা ঐ সম্বৃত লাজ হোম করিবে। এই মন্ত্র পড়িবে।

ইয়ং নারী পত্রুতে যথৌ লাজানাবপ্তৌ দীর্ঘায়ুস্বস্তমে পতিঃ

শতং বর্ধানি জীবত্বেধস্তাং জাতয়ো মম স্বাহা ।

এই নারী অগ্নিতে লাজাতুতি দিয়া প্রার্থনা করিতেছে; হে অগ্নিদেব আমার এই বর দাও আমার পতি দীর্ঘায়ু হউক, আমার পতি শত বৎসর জীবিত থাকুক, আর আমার জাতীগণ, ধন, জন ও মান সত্ত্বমের সহিত বর্দ্ধিত হউক। ১২।

তৎপরে জামাতা বধুকে অগ্রে করিয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন, এবং উভয়ে এই সময়ে পূর্বসংস্থাপিত লাজা, শীলা ও কুল প্রভৃতি দ্রব্য সমেত অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করত এই মন্ত্র পড়িবে।

কহলা পিতৃভ্যঃ পতিলোকং যতীয় মপদীক্ষা মযষ্ঠ ।

কহা উত ত্বয়া বয়ং ধারা উদগ্ধা ইবাতিগাহেমহি দ্বিষঃ ॥ ১৩ ।

হে কহকে! তুমি পিতৃ লোক হইতে পতি লোকে গমন করত কোনরূপ শাস্ত বিরুদ্ধ কৰ্ম করিও না, ধর্ম্মানুকূলে কৰ্ম কর, হে কহকে তোমার সহিত আমি সংসার করিয়া জলধারা যেমন পিপাসা নিবৃত্তি করে সেইরূপ শত্রু কুলকে শান্ত করত সুখে থাকিব। ১৩।

পুনর্ব্বার পূর্ব্ববং উভয়ে যথাস্থানে প্রত্যাবর্তন করিয়া বধু শীলা সমীপে এবং জামাতা উত্তরাভিমুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া বধুর অঞ্জলি স্বীয় দক্ষিণ হস্তদ্বারা ধারণ করিবে, পরে আবার বধুর দক্ষিণ পদদ্বারা পেয়ণীশীলা সম্যকরূপে আক্রমণ করাইবে, জামাতা মন্ত্র পড়িবে।

ইম মখান মারোহ অশ্বেব ত্বং স্থিরা ভব ।

দ্বিষন্ত মপবাধস মা চ ত্বং দ্বিষতামধঃ ।

হে বধু! তুমি এই পাষাণকে আক্রমণ কর পাষাণের ত্রায় ক্ষমাগুণ বিশিষ্টা হও, শত্রুগণকে পরাজয় কর, কখনও শত্রু হইতে অবমানিত হইওনা। ১৪।

এই মন্ত্র পাঠ হইবার পর আবার পূর্ব্ববং লাজাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া এই মন্ত্রে আহুতি দিবে।

অর্ধ্যমণং নু দেবং কহা অগ্নিময়ক্ষত ।

স ইমাং দেবোহর্ধ্যমা প্রেতো মুকাতু মাযুতঃ স্বাহা ।

এই কহা প্রথমে অর্ধ্যমাদেবকে (সূর্য্যকে) এবং অগ্নিকে অর্চনা করিয়াছে, সেই সূর্য্য ও অগ্নি ইহাকে এই পিতৃকুল হইতে বিযুক্ত করিয়া পতিকূলে স্থায়িনী করুন, অর্ধ্যাং কখনও যেন আমাকে ত্যাগ না করে এই আশীর্ব্বাদ করুন।

পরে জামাতা বধুকে অগ্রে করিয়া অগ্নি প্রদক্ষিণ করত মন্ত্র পড়িবেন।

কহলা পিতৃভ্যঃ পতিলোকং যতীয় মপদীক্ষা মযষ্ঠ ।

কহা উত ত্বয়া বয়ং ধারা উদগ্ধা ইবাতিগাহেমহি দ্বিষঃ ।

হে কণ্ঠকে ! তুমি পিতৃলোক হইতে পতিকুলে গমন করিতে করিতে কোনরূপ শাস্ত বিরুদ্ধ কর্ম করিও না, হে কণ্ঠকে ! তোমার সহিত মিলিত হইয়া আমি সংসার করত জলধারা যেমন পিপাসা শাস্তি করে সেইরূপ শত্রুগণকে শাস্ত করত সুখে কাল যাপন করিব ॥

পরে পূর্ববৎ প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়া আবার পুষ্কের ন্যায় লাজঞ্জলি গ্রহণ করত আহতি দিবে । মন্ত্র ঐ পুষ্কের ন্যায়

ইম্মশ্বান মারোহাশোব ত্বং শিৱা ভব  
দ্বিষত্বম পবাশ্ব মা চ ত্বং দ্বিষতামধঃ ।

পরে পূর্ববৎ লাজঞ্জলির উপর হৃত বিন্দু ছইবার দিয়া আহতি করিবে ।  
মন্ত্র— পুষ্পং নু দেবং কন্যা অগ্নি যমক্ষত ।

স ইমাং দেবঃ পুশ্বা প্রেতো মুকাতু মানুতঃ স্বাহা ।

এই কন্যা প্রথমে পুষাদেবকে ( সূর্য্যাকে ) ও অগ্নিকে অর্চনা করিয়াছে । সেই পুষাদেব ইহাকে পিতৃকুল হইতে মুক্ত করিয়া পতিকুলে প্রবেশ করিতে অচূর্ণিত দিউন, আমি ইহার সহিত নিরাগদে সংসার করি । ১৭ ।

পরে জামাতা পূর্ববৎ বসুকে অগ্রে করিয়া প্রদক্ষিণ করত মন্ত্র পড়িবে ।

কন্যা পিতৃত্যঃ পতিকুলং যতীয় মপদীক্ষা মযষ্ট ।

কন্যাউত ত্বয়া নয়ং ধারা উদন্যাইবাতি গাহে মহি দ্বিষঃ ।

হে কন্যকে ! তুমি ও পিতৃকুল হইতে আমার কুলে আসিতে আসিতে কোনরূপ পাপকর্ম্ম করিও না । আমি তোমার মুহিত সংসার করিতে করিতে জলধারা যেমন পিপাসার শাস্তি করে সেইরূপ শত্রুগণকে শাস্ত করিব ।

তাহার পর বসু কিঞ্চিং লাজা সমন্বিত সূর্ণ গ্রহণ করিবেন, এবং জামাতা ঐ সূর্ণের শেষার্ধের উপর একবার পূর্ববৎ হৃত দিয়া তাহার উপর অবশিষ্ট লাজা রাখিয়া তাহার উপর দুইবার হৃতবিন্দু দিয়া পূর্ববৎ বসু হস্ত ধারণ পূর্বক “অগ্নয়ে সৃষ্টি কতে স্বাহা” এই মন্ত্র পড়িয়া সূর্ণের অগ্র ভাগ দ্বারা লাজা হোম করাইবে । পরে সপ্তপদী গমন ।

ক্রমশঃ ।

দীনবন্ধু বেদান্তরত্ন ।

## প্রার্থনা সঙ্গীত ।

—:—

৩। ললিত ভৈরব—একতারা ।

প্রাণের আশা পুরাও হরি ।  
তোমা বিনে, ত্রিভুবনে, আর কেহ নাই আমারি ॥  
আমার আমার বলে, বন্ধ হলাম মায়াজালে,  
রয়েছি তোমায় ভুলে, ওহে দানবারি ;  
অনিত্য বিষয়ে মজে, তব নামামৃত ত্যজে,  
রশাল ছেড়ে মাখাল ভজে, বিকলে দিন গেল হরি ॥  
হৃলভ জনম পেয়ে, ভূতের বেগার খাটিয়ে,  
মায়া মোহে মজিয়ে, দিন গেল হে হৃথহারী ;  
হলনা তব উপাসনা, গেলনা বিষয় বাসনা,  
দূর কর মায়ার যান্তনা, আর যে প্রভু সহিতে নারি ॥  
আর কোন সাধ নাই অন্তরে, থাক হে হৃদয় মাঝারে,  
খেকো না আর অন্তরে, ওহে হৃদয় বিহারী ;  
ঘুচাও হরি যাওয়া আশা, শ্রীপাদ পদে দাও হে আসা,  
প্রাণের এই পিয়াসা, পূর্ণ কর বংশীধারী ॥

৪। ললিত ভৈরব—একতারা ।

সহেনা প্রাণে আর যাওনা ।  
সংসার জালায় জলে মলম গেলনা অর্থের ভাবনা ।  
প্রাতঃকালে উঠি যখন, অর্থ চিন্তায় হই হে মগন,  
হয় না সাধন ভজন একি হে বিড়ম্বনা ;

এমনি আমার কপাল পোড়া, গলায় কশা মায়ী দড়া,  
 দ্বিতে গেলে পাশ মোড়া. (মায়ী) দড়ার টানে প্রাণ বাঁচে না।  
 সবাই বলে সুখের সংসার, ধন জন সংসারে সার,  
 বলি সদা আমার. আমার, "আমি কে" তার নাই ঠিকানা ;  
 কৰ্মফলে ভাগ্য দোষে, সুখ পেলাম না ভবে এসে,  
 দিন কাটলাম ব'সে ব'সে, হলোনা তব আরাধনা।  
 সংসার সুখে কাজ নাই, ধন জন আর নাহি চাই,  
 এই প্রার্থনা তব রাজ্য পায়, বুচাও মরম বেদনা ;  
 ( যেন ) তোমার নাম গানে, মধু থাকি নিশি দিনে,  
 দেখো যেন বৃন্দাবনে, তরাতে রুপণ হয়োনা ॥

শ্রী বৃন্দাবন ভট্টাচার্য ।

## প্রার্থনা-পুষ্পাঞ্জলি ।

—:—

( গীতি-কবিতা । )

—:—

(১)

হে আরাধ্য !

আমি. সংসার সন্তাপে তপ্ত অতিথি ছয়ারে ;  
 তব রেণু মুখমিত কুঞ্জের কর হে আহ্বান।  
 বিষাদ ভিমিরে ভ্রাস্ত, ডাকিছি কাতরে ;  
 প্রীতির পত্রিকালোকে জুড়াও পরাণ।  
 প্রবেশে কুঞ্জের মার্কে যুগল\* মাধুরী  
 সুধারস পিতে সাধ হ'তে বহুদিন !

বঞ্চিত ক'র না, বাঞ্ছা দাও পূর্ণ করি;  
পারি না এ বেশে আর থাকিতে মলিন ।  
ওহে বরণ্য ! হই হে ধন্য,  
সেবিয়ে পদ দুখানি ।

আমি, চরণ পরশে, বিখুল হরষে—  
জীবন সফল মানি ॥

(২)

হে আরাধো !

বল, মোর প্রতি হবে কবে তোমার করুণা ?  
সে আলোকে দূরে যাবে হৃদয় আঁধার ।  
স্নানাদিনী শক্তির তব, পাব এক কণা ;  
প্রেমরসে হবে সিক্ত অন্তর আগার ।  
সেই রসে হবে হিয়া নিকুঞ্জ কানন ;  
ফুটিবে সৌরভময় কুসুম নিচয় ;  
প্রবাহিত হবে, ধীরে শান্তি সমীরণ ;  
দাসী ভাবে, লব, আমি চরণে আশ্রয় ।

হে কৃষ্ণ মোহিনী ! নারী শিরোমণি !

শ্রীপদ কবে বা দিবে ?

শিরেতে তুলিয়া, বৃকেতে ধরিয়া,

( দাসী ) আনন্দে ডুবিয়া রবে ॥

দীন শ্রীরসিক জাল দে ।

# রাজা পা দুখানি ।

—:0:—

কিবা শোভা !!

কিবা শোভা ! পাদপদ্ম কমল আসনে ।  
কিবা শোভা ! পাদপদ্ম চর্চিত চন্দনে ॥  
কিবা শোভা ! পাদপদ্ম অলঙ্কৃত রাগে ।  
ব্রজধামে রজ 'পরে' কিবা ভাব জাগে ॥  
সংকীর্ণনে নাচে যবে নব নটবর ।  
তখন শোভা, মরি কি সুন্দর ॥  
কার্ঠের তরনী কিবা পামাণ উপরে,  
পাদপদ্ম, অপকৃপ কত শোভা ধরে ।  
পাদপদ্ম হ'তে বহে সুর শৈবলিনী ।  
মরি কি সুন্দর ভাব, বলিতে না জানি ॥  
এ সকল শোভা বটে, অতি মনোহর ।  
কিন্তু এর চেয়ে শোভা আছে প্রীতিকর ॥  
হৃদিপদ্মে, পাদপদ্ম, মধুর উজ্জ্বল ॥  
ভক্ত হৃদে পাদপদ্ম, কি তরঙ্গ ময় ।  
ভক্তের অনুভব যোগ্য শুধু হয় ॥  
ভক্ত হৃদে পাদপদ্ম ! নাহি সরে বাণী ।  
অন্তরে অস্বাচ্ছ শুধু রাজা-পা দুখানি ।

দীন শ্রীরসিকলাল দে ।

## সংপ্রসঙ্গ ।

পূর্বপ্রকাশিতের পর ।

—:—

চ। তোমার কথাগুলি শ্রবণ করিলে হৃদয়ের মধ্যে যেন এক প্রকার অব্যক্ত যাতনা উপস্থিত হয়, মনে হয় এত দিন করিলাম কি ? কেবল আলেয়ার অনুসরণ করিয়া জীবনের কণস্থায়ি অথচ অমূল্য সময় বৃথা নষ্ট করিলাম ! কলতঃ তোমার সংস্রবে আসিবে, ই তোমার ভাব আমার হৃদয়ে প্রতিফলিত হওয়ায় আত্মোন্নতি বাসনা উদ্দীপিত হয়, কিন্তু উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার শক্তি না থাকায় অনুশোচনার তীব্র জালা মনকে দগ্ন করে মাত্র, যাহা হউক তুমি পূর্বে বলিয়াছ যে ভগবদ্ভাবের তাপে মনের গতি উর্দ্ধমুখী হয়, এক্ষণে কিরূপে এই ভাব সম্পত্তি লাভ করিতে পারি তাহার উপায় বলিয়া দাও ।

র। দেবতাদের অভ্যুদয়ে অহরগণ যেমন সম্মুখে ধ্বংসের করাল মূর্তি দর্শনে বিচলিত হয়, সেইরূপ সংপ্রবৃ্ত্তির উন্মেষে অসংপ্রবৃ্ত্তির মধ্যে ধও প্রলয় উপস্থিত হওয়ায় মরণোশ্বাস কুবৃ্ত্তিগণের হতাশের দীর্ঘবাস অনুশোচনার আকারে তোমার মনকে বিচলিত করিতেছে, তাই ! ইহা শুভ লক্ষণ জানিবে, প্রজ্জ্বলিত হইবার পূর্বে কাষ্ঠ যেমন ধুমোদগার করে, সেইরূপ জ্ঞানানল সংযুক্ত হওয়ায় অজ্ঞান সমুত্ত কুবৃ্ত্তিগণের অস্থিম যাতনাই এই অনুশোচনার নামান্তর মাত্র, কিন্তু সাবধান ! পুনরায় মোহ বারি সিকন করিয়া যেন এই জ্ঞানোশ্বাস অনল নির্কাণ করিওনা, স্থির জানিও যে ইহা চরম ফল লাভ করিবার একমাত্র বীজ স্বরূপ । যে ভাব লাভ করিবার জন্ত আকুল হইতেছ, তাহা এই জ্ঞানের তিস্তি তিস্তি স্থায়ী রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় না এবং প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহাই সাধকের মনে চৈতন্ত-শক্তি সঞ্চার করিয়া তাহাকে সমাধির আনন্দময় অবস্থায় উন্নীত করে, আবার এই ভাবরত্ন লাভ করিবার একমাত্র উপায় সংসঙ্গ, এই সংসঙ্গের দ্বারা ভগবৎ তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিলে তবে আসক্তির স্রোত সংসারের নগর ভাব হইতে প্রত্যাহত হইয়া প্রকৃত লক্ষ্যে ধাবমান হইতে পারে ।

ক্রমশঃ—

শ্রীহরেন্দ্রনাথ শর্মা ।



শ্রীশ্রীরাধারমাণো জয়তি ।

# ভক্তি ।

৭ম সংখ্যা—৬ম বর্ষ ।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী ।

ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্ত জীবনম্ ॥

## প্রার্থনা ।

তববিক্রৌড়িতংদেব ভক্তাদিত্যঃ কথনন ।

জ্ঞাতুংদ্রষ্টুং চ সংস্মৃতুং শ শকোতি স্বকর্ম্মসু ॥

ভক্তিংদেহিপদান্তোজ্ঞে তবসকল সুখপ্রদে ।

যথাতবৈব মাহাত্ম্যং জ্ঞাতু মর্হামি সর্কদা ॥

হে দেব ! প্রত্যেক জীবের সহিত প্রতিনিয়ত কতই যে খেলিতেছ তাহার সীমা নাই । তোমার খেলা তোমার প্রিয় ভক্ত ভিন্ন অস্ত কেহ বুঝিতে ভাবিতে এবং প্রত্যক্ষ করিতে পারে না । হে সর্কজীব পালক ! তুমি সর্ক মঙ্গলময় তোমার শ্রীচাকচরণে দেহ, মন ও প্রাণ সমর্পন করিবার ভাব এবং তোমায় ভাল বাসিবার সামর্থ্য দাও, যেন তোমার প্রীতি ভাব ধনে ধনী হইয়া, প্রত্যেক কার্যে তোমার মঙ্গলময় মহিমা অনুভব করিতে পারি । হে ভগবন্ ! তোমার শক্তি ভিন্ন কোন একটা মুক্ত কার্য্যও কেহ সাধন করিতে পারে না ; তুমি সর্কদাই শক্তি

সকাল করিতেছ তাই জীব বাঁচিয়া আছে ও আপন আপন কার্য করিতেছে। অজ্ঞানকে জীব তোমায় যানে না। সর্বদাই সকল ইন্দ্রিয়ে শক্তি বিধান করতঃ প্রাণে প্রাণে প্রাণরূপে তুমি বর্তমান রহিয়াছ, তবু তোমার চিনিতে পারি না। আমরা অভক্ত তাই তোমায় ভাবিনা ও ভজিনা, তোমায় ভাবিনা বলিয়াই তোমার মহিমা অনুভব করিতে অক্ষম; সুতরাং নানাপ্রকারে দুঃখভোগ করি। প্রতিদায়িত প্রত্যেক ব্যক্তির প্রত্যেক কার্য তোমারই অপূর্ব কৌশল কেবল ভক্তই অনুভব করিতে পারে। তাই ভক্তের হৃদয়ে তোমার সর্বদা স্মরণ থাকিতে পারেন।

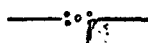
হে দেব! সেই সদানন্দদায়িনী, ভক্তিই প্রার্থনা করি, ভক্তি দাও যেন সুখে সুখে সর্বদাই তোমার শ্রীপাদপদ্মে ভক্তি রাখিয়া, ভক্তি বলে তোমার লীলা খেলা অনুভব করিতে পারি তোমার শক্তি ভিন্ন আমার আর কিছু সাধন ভজনের বল নাই; ভক্তি দাও, ভক্তি ভরে তোমার পূজা করি, ভাব দাও, আত্মহারা হইয়া তোমায় ভাবি, অভিমান শূন্য শক্তি ও জ্ঞান দাও, তোমার আদেশ বুঝিয়া অকারে তোমার কার্য করি। ভাব ছাড়া প্রাণে কার্য করিয়া কেবল অনুভবপা-নলে দন্ধ হই, ভাব ছাড়া প্রাণে তোমায় ডাকিয়াও প্রাণ মন সুশীতল হয় না, শতচেষ্টা করিয়াও ভাবহীন প্রাণে তোমার ভালবাসার কণামাত্র উপলব্ধি করিতে পারি না। তোমায় পূজিব, তোমায় ভাবিব, তোমায় দেখিব, তোমার পাদপদ্মই একমাত্র ধন সম্পদ ভাবিয়া হৃদয়ে রাখিব, কোনরূপ অভাবেরও প্রলোভনের ভাব আসিতে দিব না ইহাই সর্বদা আশা করি, দীনের আশা পূর্ণ কর।

দীনবন্ধু শর্মা।

## লীলারহস্য ।

পূর্বপ্রকাশিতের পর ।

( ৭০ )



প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ! সংসারী সাধক সাধিকারা লীলাময়ের লীলা রহস্য ভাবিয়া রক্তস্রবের বিকার যে মোহ ও কামাদি তাহার হাত হইতে মুক্ত হইয়া, সদা

আনন্দে থাকিবে, শ্রীভগবানের লীলার প্রকৃত উদ্দেশ্য ধারণা করিয়া অধ্যাত্ম জগতে উন্নত হইবে, যে বিক্ষেপ হইতে উন্নত হইবে আর তাহাতে অভিভূত হইবে না ; লীলাময়ের মঙ্গলময় লীলার ইহাই প্রকৃত লক্ষ্য । সেই সৰ্বস্বীকল্যাণকর লক্ষ্য সাধনের জন্তই যে যে ভক্ত সর্স্বাস্ত্রকরণে ভগবানে আত্ম সমর্পণ করিয়া ভগবানকে আপন করিয়া একেবারে সকল সাধন, সকল কর্ম, এবং সকল লৌকিক ব্যবহারের অতীত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহাকেও সময় সময় কর্তব্যযুক্ত অভিমানী অথবা রজস্তমোগুণে আকৃষ্ট সাজাইয়া আবার তাঁহাদিগকে বিক্ষেপ হইতে মুক্ত করিয়াছেন, এই সাজান কেবল লীলার পুষ্টির জন্ত, নতুবা সাধকের, বিশেষত বৃন্দাবনবাসী ও বৃন্দাবনবাসিনীর বাধা বিঘ্ন কোন প্রকারেই সম্ভব হয় না । আবার ভগবানেরই লীলার উদ্দেশ্য না থাকিলে সাধকের এক একটা প্রবল বিক্ষেপ সহসা পূর্ণ সঞ্চিত সাধনার অভাবে যেন বিপরিত হয় । বিনা সাধনে বিনা ভগবৎ রূপায় অমনি ভগবৎ সাক্ষাৎ হইবে কেন ? যথার্থ যাহারা অভিমানী, প্রকৃত যাহারা রজোগুণে বা তমোগুণে ক্রিয়ালীল, সত্যসত্যই যাহারা মায়াচ্ছন্ন বা স্নানভিমানী, শ্রীভগবান সহসাতাহাদেরই পোচর হইবে কেন ? লীলাময় নিজলীলার পুষ্টি সাধন মানসে, শুদ্ধকে অশুদ্ধ, জ্ঞানীকে অজ্ঞানী, মুক্তকে বদ্ধ, এমন কি ধার্মা একেবারে আত্ম সমর্পণ করিয়া তাঁহার হইতেছে, তাঁহাদিগকেও বিরহ প্রদানে বিরহী ও দুঃখিত সাজাইয়াছেন । ইহা কেবল যে জীবশ্রেষ্ঠ নরনারীকেই তত্ত্বশিক্ষার জন্ত তাহাতে কোন সন্দেহ আছে বলিয়া বলা যায় না ।

প্রিয় পাঠক ষাঠিকাপণ ! আপনাদের নিকট যে মা যশোদাকে সময় সময় বিক্ষিপ্ত ও চকলার স্থায় দেখাইতেছি উহাও সেইরূপ । মা যশোদাকে কেহই সামান্য মনে করিয়া অপরাধি হইবেন না । মা যশোদাকে অবলম্বন করিয়া লীলাময় শিক্ষা দিবেন বলিয়াই মা যশোদাকে সাধকের মতন সময় সময় চকলা, জ্ঞানহীন ! ও কর্তব্য কর্মে বিমূখ করিয়া লীলা করিয়াছেন । আমাদের কর্মক্ষয়ের প্রধানতম অবলম্বনীয় ভাব একান্ত ভগবৎ নিষ্ঠা ও কায়মনোবাক্যে যাহা করা হয় তাহার ফল শ্রীভগবানেই অর্পণ করা, ইহা শকটায় দমন লীলায় বুঝাইয়া আমাদেরই সাধনের অলসতা ও অভিমান দমনের নিমিত্ত মা যশোদাকে অবলম্বন করিয়া আবার যে একটা খেলার অবতারণা করিয়াছেন তাহা এই ।

একদারোহমারুঢংলালয়ন্তী হুতং সতী ।  
 গরিমাণংশিশোকোর্ষোঢং ন মেহেগিরিকুটবং ।  
 ভূমৌনিধায়তং গোপীবিন্মিতাভার পীড়িতা ।  
 মহাপুরুষমাদধোজ্ঞাতামাসকশ্মহু ।

একদিন মা যশোদা পুত্ররূপী গোবিন্দকে কোলে করিয়া লালন করিতে করিতে পুত্রের ভার রাখিতে অসমর্থ হইলেন। পুত্র যেন তখন পর্কসতের শৃঙ্গের স্থায় অতিশয় গুরুভার যুক্ত হইলেম, পুত্রের ভারে অতিশয় পীড়িত হুতরাং বিন্মিতা মা যশোদা উপায়ভুর না দেখিয়া পুত্রকে ভূমিতেই রাখিলেন, এবং পুত্রের কল্যাণার্থ মহাপুরুষ শ্রীবিষ্ণুকেই ধ্যান করিতে লাগিলেন। গোপালকে শয়ন করাইয়া, গোপাল মিত্রিত হইয়,ছে দেখিয়া মা যশোদা ভাবিত্তেছেন, নিত্যই গোপালকে কোলে করিতেছি আমার স্তনপায়ী শিশু দেখিতে দেখিতে এত ভারি হইল কেন ? হে মঙ্গলময় ! যদি আমার প্রাণ গোপালের কোন গ্রহ দোষ ষটিয়া থাকে তবে গ্রহরূপীজনর্দীন তাহা দূর করিয়া দাও, যদি পুত্রের কোন রোগ হইয়া থাকে তাহাও আরোগ্য করিয়া দাও, আমি ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারি না আকৃতিতে পুত্র বড় না হইলেও ভারে অতিশয় গুরু হইল কেন ? স্নেহময়ী ভাবিয়া অস্থির আবার ভাবিতে ভাবিতে লীলাময়ের কৌশল ও সকল দুর্ভাবনা ভুলিয়া গোকুলের অত্যাশ্র সখীগণের সহিত গোপালেরই কল্যাণার্থ অশ্রুকার্যে নিযুক্ত হইলেন। মা যশোদা গোপালকে ছাড়িয়া অশ্রু কার্যে নিযুক্ত হইয়াছেন জানিয়া, তখন—

দৈত্যোনাগ্নোত্ণাবর্তঃ কংসভৃত্যঃ প্রণোদিতঃ ।

চক্রবাত স্বরূপেণ জহারাসীনমর্ভকমু ।

কংস কর্তৃক প্রেরিত তুরাঙ্গী লীলাময়ের লীলা বিঘ্নকারী কংসানুচর ত্ণাবর্ত সহসা আসিয়া চক্রবাতরূপে ( ঘূর্ণিপাক বায়ুরূপে ) বালকরূপী শ্রীহরিকে অপহরণ করিয়া লইল। লীলার পুষ্টির নিমিত্ত দৈত্যকে জানিয়াও লীলাময় ত্ণের ন্যায় লঘু হইলেন, দৈত্য কক্ষকে অতি লঘু অনুভব করতঃ মদগর্বে গর্ভিত হইয়া অতি উর্কে উড়িতে লাগিল, ভগবান ৮ প্রাচীন মূর্তি ধারণ করত, চুষ্ট দমন ও শিষ্ট পালন করিবার মানসে ত্ণাবর্তের গলা জড়াইয়া ধরিলেন। ত্ণাবর্ত ভগবানকে ভীত মনে করিয়া—

গোকুলং সৰ্বমাবুধ্বন মুকুংচক্ষুংঘিরেণুতিঃ ।  
 ঈরয়নুসুমহাঘোর শকেন প্রদিশো দিশঃ ॥  
 মুহূর্তমুদ্রবংগোষ্ঠং রজসা তমসাবুতং ।  
 সূতং যশোদানাপশ্রুং তস্মিন ব্রহ্মবতীৰতঃ ॥  
 নাপশ্রুংকশ্চনাস্মানং পরকাপিবিমোহিতঃ ।  
 তৃণাবর্তবিন্ধুষ্ঠাভিঃ শৰ্করাভিরুপক্রমতঃ ।

আরও উৎসাহের সহিত অতি ভীষণ স্বপ্নে বায়ু সঞ্চালিত করত উড়িতে লাগিল, প্রবল বায়ুর বেগে কেহ স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না ভীষণ শব্দে দিক্‌বিদিক পরিপূর্ণ হওয়ায় একে অন্যের কথাও স্তনিতে পায় না, কেহ কাহার দিকে চাহিবে এমন সাধ্য হইতেছে না, ধূলিকণা দ্বারা সকলের চক্ষু নষ্ট হইতে লাগিল, মুহূর্ত মধ্যে গোষ্ঠধাম ধুলির দ্বারা ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্নের ন্যায় হইল। কেহ কাহাকে দেখিতে পায় না একন কি নিজেকে নিজের অঙ্গ ও দেখিতে পায় না; এই প্রকারে তৃণাবর্ত কর্তৃক নিষ্কিপ্ত ধূলি দ্বারা ব্রজবাসীরা অতিশয় প্রসীড়িত হইতে লাগিলেন, সকলেই ভয়ে বিময়ে একপ্রকার আত্মহারা ভাবে ভাবিতেছেন কি হইল ?

ইতিথরপবনচক্রপাংশুবর্ষে সূতপদবীমবলাবিলক্ষ্য মাতা ।

অতিকরণমনুসংস্বরস্ত্যশোচভুর্নি পতিতামৃতবংসকা যথা গোঁঃ ।

এতক্ষণ মা যশোদা স্থির ভাবে ছিলেন, এক্ষণে যেখানে পুত্রকে রাখিয়াছিলেন অশ্বের ন্যায় সেই স্থানে অনুসন্ধান করিয়া যখন পুত্রকে দেখিতে পাইলেন না, তখন মৃতবংসা গাভীর ন্যায় অতি কাতরা ও ভূপৃষ্ঠে নিশতিত হইয়া কাতর স্বরে রোদন করত শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মা যশোদার নিকট গোপাল যেমন আদরের বস্ত্র অমন আর কিছুই নহে, তাই গোপালকে দেখিতে না পাইয়া যত শোক, যত রোদন অত আর কিছুতেই হইল না। সূতরাং মা যশোদা একেবারে জগৎ শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন অতিউচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, এবং থাকিয়া থাকিয়া মুচ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইতেছেন।  
 তখন—

রুদিতমহুনিশম্যতত্রগোপো ভূশমনুতপুধিয়োহক্ষপূর্ণমুখ্যঃ ।

রুকচুরনুপলভ্য নন্দমহুং পবন উপরতপাংশুবর্ষবেগে ॥

পবনবেগ কিছু উপশমিত হইল, ধূলিধূষরিত ভাবও কথঞ্চিৎ বিদূরিত হইলে যশোদার রোদন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া গোপীগণ অতিশয় ব্যস্ততার সহিত যশোদার নিকট আগমন করিলেন, সকলেই ব্যাকুল প্রাণে নন্দনন্দন শ্রীগোবিন্দকে অনুসন্ধান করিতেছেন, কাহার মুখে অন্য কোন কথা নাই কেবল শোকাশ্রুধারা নিপতিত হইয়া সকলেরই বদন মণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল । অনুতাপানলে দগ্ধ হৃদয়া গোপীগণ তখন কি যে দুঃখ অনুভব করিতেছেন তাহা বিরহী সাধক সাধিকা ভিন্ন অন্য কেহ অনুভব করিতে পারিবে না । এমন কোন ভাষা নাই যাহা দ্বারা আমরা সেই কৃষ্ণ বিরহ শোক বর্ণনা করিয়া বুঝাইব । সকলেই উচ্চকণ্ঠে রোদন করিতেছেন, বিশেষত মা যশোদা একেবারে মৃত প্রায় । গোপীগণকে অনন্যাগতি দেখিয়া এবং মা যশোদার প্রাণে অতিশয় শোক সন্তাপে দগ্ধ হইতেছে জানিয়া, লীলাময় শ্রীগোবিন্দ আর এক রকম খেলা খেলিতে আরম্ভ করিলেন ।

তণাবর্তঃ শাস্তরয়ো বাত্যারুপধরোহরন ।

কৃষ্ণনভোগতোগস্তংনাশক্ৰোদ্ভূরিভারভুং ।

তমশাস্তং মহামান আস্থনোঙ্করমস্তয়া ।

গলে গৃহীতং উৎসৃষ্টং নাশক্ৰোদ্ভূতাৰ্ভকং ।

গলগ্রহন নিশ্চেষ্টো দৈত্যোনির্গতলোচনঃ ।

অব্যক্তরাবোত্তপতংসহবালোব্যসূর্বজে ।

দেখিতে দেখিতে তণাবর্তের বেগ শাস্ত হইল যে অম্বর ক্ষণকাল পূর্বে কৃষ্ণকে তৃণের ন্যায় লঘু ভাবে হরণ করিয়া আকাশ মার্গে উড়িতেছিল এক্ষণে আর সে গগনে গমন করিতে সমর্থ হইতেছে না । কৃষ্ণ যেন অতিশয় ভারি হইতেছেন, দৈত্য ক্রমিক কাতর হইতেছে, তাহার মনে হইতেছে যেন একটা পর্বত তাহার পৃষ্ঠে নিপতিত, বহন করিতে না পারিয়া ভূতলে ফেলিয়া দিতে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু লীলাময় উহার গলদেশে ক্রমশঃ ভাবে ধরিয়াজেন যে তাহা ছাড়াইয়া ফেলিতে পারিতেছে না । ক্রমিক দৈত্য কাতর হইতেছে উহার চক্ষু বাহির হইয়া পড়িল । কৃষ্ণ যেরূপ ভাবে গুলাচাপিয়া ধরিয়াজেন তাহাতে দৈত্যের কণ্ঠও রোধ

হইয়া আসিল, দেখিতে দেখিতে দৈত্যবিকৃত ভাবে শব্দ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করত কৃষ্ণের সহিত ব্রজ মধ্যে পতিত হইল।

তমস্তুরীক্ষাং পতিতং শিলায়াং বিশীর্ণ সর্কাবয়বং করালং ।

পূরং যথাক্রম শরৈশ্চ বিদ্ধং প্তিয়ো রুদন্ত্যো দদৃশুঃসমেতাঃ ॥

যশোদার সহিত সমবেদনায় গোপীগণ একত্র সমবেত ভাবে রোদন করিতেছেন ; আর হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস করিতেছেন, এমন সময় সহসা আকাশ হইতে শিলার উপরে ঐ দৈত্য দেহ নিপতিত হইল। পতনের বেগে উহার সকল অবয়ব চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল কেহই কিছু কারণ বুঝিতে পারিল না। সকলেই বিস্মিত, অদ্ভুত রূপ যাহা পূর্বে কখনও দেখেন নাই অথচ আপনা আপনি পতিত হইয়া থণ্ড থণ্ড হইল সকলেই বিস্মিত ভাবে চাহিয়া আছেন, তখন দেখেন ইহার উপর নিরাপদে শ্রীকৃষ্ণ খেলা করিতেছেন, তখন—

আদায় মাত্রে ঐতিহ্যবিম্বিতাঃ কৃষ্ণকৃতস্যোরসি লম্বমানং ।

তং স্বস্তি মন্তুং পুরুষাদনীতং বিহায়সা মৃত্যু মুখাং প্রমুক্তং ॥

সহসা ব্যস্ত সমস্ত ভাবে গোপীগণ দৈত্যের বক্ষ স্থানে সহাস্র বদনে ক্রীড়া-কারি শ্রীকৃষ্ণকে গ্রহণ করিয়া, বিরহ কাতর কণ্ঠে রোদনকারি যশোদার কোলে গোপালকে অর্পণ করিয়া মায়ের দুঃখ দূর করিলেন, আকাশ মার্গে রাক্ষস কর্তৃক-নীত অথচ নিরাপদে অক্ষুর শরীরে সমাগত পুত্রকে প্রাপ্ত হইয়া যশোদার আনন্দের সীমা নাই। যাহারা যশোদার দুঃখে দুঃখিত হইয়াছিল তাঁহারা এক্ষণে যশোদার আনন্দে আনন্দিতা ও পুলকিতা হইতে লাগিলেন। তখন সকলে মিলিত হইয়া কৃষ্ণের মঙ্গলার্থ নানা প্রকার মাতুলিক ক্রমের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। সকলেই ধর্মের জয় অধর্মের ক্ষয় ঘোষণা করিয়া বলিতে লাগিলেন ; হায় হায় রাক্ষস নিজের অসং ব্যবহারের জন্ত আপনা আপনি পড়িয়া চূর্ণ হইল, বালক ধর্ম বলে নিজেই সুরক্ষিত হইল। এইরূপে সকলেই গোবিন্দকে আরও যত্ন করত মনের সাধ মিটাইতেছেন আর ধর্মের জয় অধর্মের ক্ষয় ঘোষণা করত শ্রীভগবানের নাম কীর্্তন রূপ মঙ্গল কর্ম করিতেছেন। তৃণাবর্ত দমিত হইল দেবগণ আকাশমার্গে থাকিয়া আনন্দ ধ্বনি ও পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

প্রিয় পাঠক পার্থিকাগণ একবার নিবিষ্টচিত্তে ভাবুন ভগবান কেন ভারি হইলেন, কে উড়াইল, কেইবা ধূলি দ্বারা ব্রজধাম অন্ধকার করিল, ধূলিই বা কি, মাতৃগণের ক্ষাতর ক্রন্দনে শ্রীগোবিন্দ আবার কেনই বা নিরাপদে আসিলেন ।

এখানে সাধকের সাত্ত্বিক অলসতা কৃষ্ণের ভারি হওয়ার অর্থ অর্থাৎ সাধন করিতে করিতে এক সময় সাধকের সাধন বিষয়ে অলসতা আসে “আর ভাল লাগেনা আজ থাক সময়ান্তরে করিব” এইরূপ ভাবে যেমন অলসতা আসে অমনি সাধন অতিশয় কঠিন বলিয়া বোধ হয়। যে সাধন পূর্বে উৎসাহের সহিত বিনাকষ্টে করিতে পারিত অলসতার জন্ত সেই শ্রিয় ও প্রীতিকর সাধন অতিশয় কঠিন ও কষ্টকর হইয়া উঠে। তখন যেমন সাধক সে দিনের মতন সাধন না করিয়া অল্প কষ্টে গমন করে সাধন জনিত অভিমান অর্থাৎ আমি এত সাধন করিয়াছি আর না করিলেও চলে, এইভাবে অমনি অসিয়া সাধনার ধন (ভাব নির্ধিকে) অপহরণ করে অর্থাৎ সাত্ত্বিক তমোগুণের বিকারে ভোগবাসনা ও ভোগ্য বস্তুতে একান্ত মোহ আসে সাধনের ধনকে তৃণের মতন লবু মমেকরে হৃদয় ব্রজধাম, বিষয় বাসনা রূপ ধূলি দ্বারা অন্ধকার হয়, অসং সঙ্গ বায়ু প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে থাকে, একেবারে মোহে অভিজুত হইয়া ভোগ বাসনায় অধির হইয়া যায় অজ্ঞান অন্ধকারে আপনাকে আপনি দেখিতে অর্থাৎ বিচার করিয়া বুদ্ধিতে পায় না, এইরূপে কিছুকাল ব্যতিব্যস্ত হইয়া যখন অতিশয় হুঃখিত ও প্রপীড়িত হয় আর সুখ পায় না সাধনায় যে সুখ পাইয়াছিল সেই মধুময় প্রাণানন্দ কর ভাব আর হয় না তখন পূর্বের সাধনায় কথা এবং হৃদয়ের ভাব ধনের ভালবাসা প্রবল হয় এদিক ঔদ্ধিক করিয়া সেই হারানিধি ভাবকে অনুসন্ধান করিতে থাকে। ক্রমিক যত অনুসন্ধান করে ততই সাধকের ব্যাকুলতা আসে, যত ব্যাকুলতা থাকে ততই সে উচ্চৈশ্বরে রোদন ও আর্তনাদ করত ভাব প্রার্থনা করিতে থাকে এইরূপ প্রার্থনার বলে যেমন অসং সঙ্গ বায়ু প্রশমিত হয় অমনি বিষয় বাসনা ধূলিও সরিয়া যায় তখন সাধক বুদ্ধিতে পারে আমার অভিমানে কিছুই হইবে না আমি তাঁহাই বলে বলী এই বিচাররূপ শিলার উপর পড়িয়া অভিমান চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়, নিবিষ্ট চিত্তে ভাবিতে ভাবিতে সাধক ঐ অভিমানের বৃকেই ভাবময় হরিকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হয় অর্থাৎ অজ্ঞান অবস্থায় “আমি জানি, আমি কার্যাক্ষম, আমি



অনেক সাধন করিয়াছি” এইরূপে যে অভিমান আসে তাহাতে ভগবদ্ভাব একেবারে থাকে না। জ্ঞান আসিলে ঐ অভিমানের বুকেই ভগবানকে দেখে, অর্থাৎ আমি যাহা বুঝি তাহা সেই জ্ঞানময়েরই কৃপায়, আমি যাহা করি তাহাও সেই বিশ্বনিয়ন্ত্রার ক্রিয়া শক্তি বলে; তিনি করান, বলান ও চালান, তাই আমি করি, বলি ও চলি, এইরূপে প্রত্যেক ব্যাপারে ভগবদ্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া ভক্ত সাধক কৃতার্থ হন ও ভাবধন লাভে ভক্তের অসং অভিমান চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়; তখন ভক্ত আবার ভাবানন্দে আনন্দিত হইয়া, অভিমান জনিত বিক্ষেপ ও হতাশ ভুলিয়া পরমানন্দে কাল যাপন করেন। আমরা এমন সাধক দেখিয়াছি যে প্রথমে অতি উৎসাহে সাধন ভজন করিয়া কথঞ্চিৎ মায়ামুক্ত ও ভাবুক হইয়া পরে কেমন একটা অভিমানের বাতাস আসায়, সাধন ভজন ছাড়িয়া আয়াস গ্রিয় হয়; সাধন ভজনের প্রতি আর তাদৃশ মনোযোগ থাকেনা, অলসতার ভাব আসায় কিছুদিন সাধন না করিয়া, পরে আর সাধনের ক্রেশ কিছুতেই সহ্য করিতে পারেনা সুতরাং সাধন হইতে বঞ্চিত হইয়া, কেবল রুথা “আমি সাধক, অনেক সাধন করিয়াছি” পরের নিকট এই ভাবে রুথা বাক্য ব্যয় করত রুথা অভিমান বৃদ্ধি করে। ঐ সাধকভিমাণে পূর্বসম্বন্ধিত ভাবধন ভণের মতন উড়িয়া যায়; তখন অতিশয় প্রতিষ্টাকামী হইয়া, অর্থ ও শিষ্য সংগ্রহই জীবনের লক্ষ্য হইয়া বসে। স্থানে স্থানে মঠ প্রতিষ্ঠা ও নিজের শক্তি প্রচারের ব্যাপার আরম্ভ করিয়া এমনই মত্ত হয় যে, আপন পর জ্ঞান থাকে না, এমন কি নিজের স্বরূপ একেবারে ভুলিয়া যায়; এই সময় কেহ কেহ একটা গুরুতর ব্যাপারে বিক্ষিপ্ত হইয়া পূর্বস্মৃতি স্মরণ করত সকল ছাড়িয়া আবার বিশ্বাসের সহিত সাধন আরম্ভ করে; এবং আরাধ্য দেবের নিকট নিজকৃত ভাবচ্যুতির জন্য পুনঃ পুনঃ অনুতাপ ও উচ্চ কণ্ঠে রোদন করত আবার ভাব লাভে কৃতার্থ হয়। আর অনেকে পুনঃ পুনঃ বিক্ষিপ্ত, অবমানিত, লজ্জিত এবং বঞ্চিত হইয়াও আপন অভিমান ত্যাগ না করিয়া বাস্তবশীল মতন পূর্বভক্ত ধনজনকেই শ্রেষ্ঠ মনে করত তাহাতেই মজিয়া থাকে। শ্রীভগবান ভক্তের উন্নতি ও সতর্কতা বিধানের জন্ত এই যশোদার নিকট ভারি হওয়া ও তৃণাবর্ত মোক্ষণ লীলা করিলেন। লীলাময় যেন লীলা মুখে সকলকে বলিতেছেন; সাধকভক্ত যদি কখন কখন তোমার শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতার জন্ত সাধন করা তোমার কষ্টকর বোধ

হয় তবে সাবধান, একেবারে সাধন ছাড়িয়া অতিশয় আয়াসপ্রিয় হইওনা, অভ্যাস রাখিবে, কষ্টকর বলিয়া সাধন ছাড়িয়া দিলেই বুধা অভিমান আসিয়া ভাব নষ্ট করিবে। যদি অসংস্কৃত ও নিজের সংযমের অভাবে ভাব ছাড়া হও তবে পূর্বে ভাবলাভে যেরূপ আনন্দে ছিলে সেই আনন্দ স্মরণ করিয়া আরাধ্য দেবের নিকট কাঁদিয়া কাঁদিয়া অনুতাপ ও বিচার দ্বারা অভিমানকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাতর প্রাণে ভাব লাভে যত্ন করিও। তোমার অভিমান শূন্য সকাতির প্রার্থনায় ভগবান সন্তুষ্ট হইয়া আবার ভাব দিবেন, আবার 'শান্তি পাইবে, আবার আরাধ্যবস্তুর সন্দর্শনে সকল অভাব, সকল অশান্তি ও সকল হতাশ দূর হইয়া যাইবে, সরল প্রাণে প্রার্থনা করিতে ভুলিও না।

ক্রমশঃ

দীনবন্ধু শর্মা।

## ভাবোচ্ছ্বাস ।

—:—

( ১ )

উঠিতে গোবিন্দ                      বসিতে গোবিন্দ

গোবিন্দ গলার হার ।

শয়নে গোবিন্দ                      স্বপনে গোবিন্দ

( আমি ) গোবিন্দ ক'রেছি সার ॥

গোবিন্দ করুণা                      সাগরে পশিয়া

হৃদয়ের অঙ্ককার ;

ঘুচিয়া গিয়াছে                      ত্রিভাপ বাওনা

সহিতে হবেনা আর ॥

গোবিন্দ চরণে                      বাধিয়াছি আমি

হৃদয় বিনার তার ।

তাই এ হৃদয়ে            নাহিক গো আর  
শমনের অধিকার ॥

মোহের ছলনে            এ হৃদয়ে মম  
ভরস্ক খেলে না আর ।

স্বরগের সুখ            নাহি গনি কিবা  
বিষয় বাসনা ছাড় ॥

গোবিন্দ রূপের            মোহন মাধুরি  
হৃদয়ে লেগেছে যার ।

কামনার মলঃ            মুছায়ে তাহাকে  
করিয়াছি আপনার ॥

অবহেলে যদি            হতে চাও কেহ  
এ ভব সাগর পার ।

ভাবময় প্রাণে            গোবিন্দের নাম  
গান কর অনিবার ॥

হরেন্দ্র—

## সৎপ্রসঙ্গ ।

—:০:—

( পূর্ব প্রকাশিতের পর । )

চ। এইখানেই সমস্তা, কেননা প্রথমতঃ সাধুসঙ্গ পাওয়াই হৃৎট, দ্বিতীয়তঃ পাইলেও চিনিতে পারা আরও হৃৎট ।

ৱ। ভাস্ত মনের প্রক্ষে হৃৎট বোধ হইলেও প্রকৃত পক্ষে হৃৎট নহে, পূর্বেই বলিয়াছি যে, মনে তত্ত্ব জিজ্ঞাসার ভাব প্রবল হইলেই সাধুসঙ্গ লাভ হয় তবে এই সঙ্গের প্রকার ভেদ আছে । ফলতঃ যাহাকে দেখিলে হৃদয়ে সন্তাবের উদ্দেশ্য হয়, ভগবানকে মনে পড়, যাহার সম্বন্ধিত হইলে মস্তক আপনা ;

হইতে নত হয়, বাঁহার বাক্শক্তি ধলে সংসারের নগরতা ও ভগবানের সর্বব্যাপিত উপলদ্ধি হয়, আধ্যাত্মিক উন্নতীর তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক ধমনিতে বহিতে থাকে, কপটতার কালিমা রেখা বাঁহার প্রশান্ত বদনে অঙ্কিত নাই, তাঁহাকেই তুমি সাধু বলিয়া জানিও, আর ইহাও মনে রাখিও যে জ্ঞানের প্রকৃতি স্বরূপ সত্ত্বাবাদৌপক গ্রন্থ পাঠ ও সংস্বরূপ আত্মা বা শ্রীভগবানের চিন্তাকে সংসঙ্গ বলে, এমন কি সত্ত্বাবে আশ্রয় বাহু যে কোন কৰ্ম্ম করা যায় তাহাও সংসঙ্গের অন্তর্গত, এইরূপ বিভিন্ন প্রকারে সংসঙ্গ দ্বারা চিন্তা শুদ্ধ হইলে জ্ঞানের উন্মেষ হয় এবং এই জ্ঞান প্রবণ মননাদির ফলে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া বিজ্ঞানে পরিণত হইলে ইহা চালকরূপে মনকে ভক্তিরূপ অখোজিত ভাবের রথে আরোহণ করাইয়া অনন্ত আনন্দময় চৈতন্য ভূমিতে লইয়া যায়।

চ। ভাবে ও ধ্যানে প্রভেদ কি ?

র। প্রভেদ কেবল আকারে, স্ত্রী ও পুরুষের আকার ভেদ থাকিলেও উভয়ের সংযোগ ভিন্ন যেমন সন্তান উৎপাদিত হয় না, সেইরূপ ইহাদের একের সাহায্য ব্যাতীত অপরের গতি শক্তি বন্ধিত হয় না, অতএব দত্ত ও জিহ্বার স্থান ইহারা পরস্পর সাপেক্ষ, এবং মনকে তাহার আপন স্বরূপে উন্নীত করা উভয়েরই লক্ষ্য; তবে ভক্তিযোগে ভাবের ও জ্ঞানযোগে ধ্যানের প্রাবল্য লক্ষিত হয় মাত্র।

চ। সংস্বরূপ শ্রীভগবানের ধ্যান কি উপায়ে সিদ্ধ হইতে পারে? তুমি পূর্বে বলিয়াছ যে কৰ্ম্মের কৌশল না জানিলে যোগের অবস্থা লাভ করা যায় না, ফলতঃ কিরূপে ভগবানের ধ্যান করিব! ও কি কৌশল অবলম্বন করিলে শিষ্য ধ্যেয় বস্তুকে প্রত্যক্ষ্য করিতে সক্ষম হইব? তাহা আমাকে বিশদ রূপে বুঝাইয়া দিয়া সাধিত কর।

র। ভাই! সদ্গুরু লাভের চেষ্টা কর, চিত্ত ক্ষেত্রকে ব্যাকুলতা রূপ হলের দ্বারা কর্ণ করিতে আরম্ভ করিলে অবিলম্বে যখন তাহাতে গুরুরূপী শ্রীভগবানের রূপা বীজ রোপিত হইবে, তখন কৰ্ম্মের কৌশল আপনা হইতেই হৃদয়-জন্ম হইবে জানিও, পরে সাধনরূপ বারি সেচনের দ্বারা ঐ বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বহুমূল হইলে অর্থাৎ ভাস স্থায় হইলে, সিদ্ধিরূপ নিত্যানন্দ ফললাভ করিতে

বিলম্ব হইবে না। ফলতঃ আমি না হয় বন্ধুতার খাতিরে তোমার জিজ্ঞাস্তা বিষয় বুঝাইয়া দিলাম, কিন্তু গুরুশক্তি সঞ্চারিত না হইলে তোমার তদনুযায়ী কার্য্য করিবার শক্তি কোথায়? অতএব ব্যাকুল ভাবে সেই সৰ্বব্যাপী গুরু সত্ত্বার উদ্দেশে নিজের প্রকৃত উন্নতির জন্ত প্রার্থনা কর, তাহা হইলে কিছু দিনের মধ্যে অনুভব করিবে যে ধীরে ধীরে তোমার অভ্যন্তরস্থ শক্তির বিকাশ হইতেছে ও সেই শক্তি বলে তুমি ক্রমশ উন্নীত হইয়া আপন স্বরূপের সন্নিহিত হইতেছ, এই সময়ে বাহির হইতেও তুমি অনুভব করিবে যে স্তিমিত আলোকের উজ্জ্বলতা সম্পাদনের ত্রায় সেই মহান শক্তি গুরু বা সাধু ভক্তদিগের মূল আধারের মধ্য দিয়া তোমার অন্তর্নিহিত শক্তির উন্মেষ করিতেছেন, নতুবা টিকিট খরিদ করিয়া রেল গাড়িতে না উঠিলে যেমন গন্তব্য স্থানে পৌঁছান যায় না, সেইরূপ কেবল শ্রবণ করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য না করিলে সিদ্ধি লাভ হয় না। ভাই! প্রথমতঃ পরোক্ জ্ঞানে শ্রীভগবানকে জানিতে হইবে, তাহার পর সাধন লক্ষ্য অপরোক্ জ্ঞানে বা বিজ্ঞানে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া প্রেমের পথে অগ্রসর হইলে তবে সেই সাধনার ধনকে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে সক্ষম হইবে।

চ। তুমি যাহা বলিলে তাহা সাধনের ভিত্তিস্বরূপ হইলেও আমার প্রকৃত প্রঃটা চাপা দিয়া যাইতেছ, আমি এই ভিত্তির মাল মন্ডলা ও কিরূপ ভাবে মিশাইলে ঐ মন্ডলাগুলি ভিত্তিকে দৃঢ় করিবে তাহাই জানিতে চাই অর্থাৎ ধ্যানের কার্য্যকরি উপায় ও আমার ত্রায় মুচ্যক্তি যাহাতে সেই উপায় উদ্দেশ্যের অভিমুখে চালনা করিতে পারে এরূপ সহজ কৌশল বুঝিতে চাই এবং ভরসা করি যে তোমার মত বন্ধুর নিকট আমার দাবী অগ্রাহ হইবে না।

র। ভাই! ব্যস্ত হইও না, প্রথমকার কর্তব্য ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম কর। কোন বস্তুর স্বরূপ না জানিলে যেমন তাহাকে দেখিবার বা লাভ করিবার অগ্রহ হইতে পারে না, সেইরূপ প্রথমতঃ ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞান অর্জন না করিলে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ বা লাভ করিবার জন্ত হৃদয়ে প্রকৃত ব্যাকুলতার উন্মেষ হইতে পারে না, অতএব এঞ্জিন চালাইতে হইলে যেমন তাহা প্রথমতঃ স্তীমে পূর্ণ করিয়া পরে চালনা করিবার বেগ প্রয়োগ করিতে হয়, সেইরূপ সদৃশ্রম অধ্যয়ন ও সংপ্রসঙ্গাদির ফলে পরোক্ জ্ঞান যুক্তি বিচারের মধ্য দিয়া অস্থি মজ্জাগত

হইলে, পরে ব্যাকুলতার আকর্ষণে সাধকের হৃদয়ে গুরুশক্তি সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে সাধনার সোপানে উন্নীত করে। তাই! অন্তরে এই শক্তির বিকাশ হইলে সে আপন প্রকৃতি অনুযায়ী ধ্যানের কৌশল আপনা হইতেই অবগত হয়। অতএব এই ধ্যানের কৌশল সকলের পক্ষে একরূপ নহে, তবে আমি তোমার সহিত ব্যবহার করায় তোমার প্রকৃতির বিষয় যতদূর অবগত আছি এবং অধিকাংশ ব্যক্তির পক্ষে যে উপায় সাফল্য জনক, সেইরূপ ভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

প্রথমতঃ শ্রীভগবানের চৈতন্যময় প্রকৃতির ভাব বুঝিয়া লও, পূর্বে তোমাকে এ সম্বন্ধে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছি সুতরাং এক্ষণে সংক্ষেপে বলিগেই চলিবে মুক্তিকা বারি হইতে উৎপন্ন ও ইহার কলেবরে বারি অব্যক্ত ভাবে বিদ্যমান সত্ত্বও ইহার দ্বারা যেমন ব্যক্ত বারি আবর্তিত থাকে, সেইরূপ শ্রীভগবান চৈতন্য স্বরূপে অপরা প্রকৃতি বা মায়ার মধ্যে অব্যক্ত ভাবে বিদ্যমান থাকিয়া আপন কৃত স্বরূপ বা পরা প্রকৃতিকে আবর্তিত করিয়া রাখিয়াছেন এবং ব্রহ্মাণ্ডের মানচিত্র স্বরূপ এই দেহের মধ্যেও তাঁহার জ্যোতী এই ভাবে বিরাজিত, অতএব বারি লাভ করিতে হইলে যেমন মুক্তিকা ভেদ করিতে হয়, সেইরূপ চৈতন্যজ্যোতীর স্বরূপ বা ব্যক্ত ভাবে প্রত্যক্ষ্য করিয়া জীবমুক্ত হইতে হইলে অব্যক্ত প্রকৃতি বা মায়ী ভেদ করা আবশ্যিক এবং এই ভেদ করিবার একমাত্র উপায় “ধ্যান” বা একাগ্র ভাবে চিন্তা। ভাবের বেগ বিরূপে এই ধ্যানকে চালনা করিয়া তাহাকে প্রবৃত্ত লক্ষ্যে পৌছাইয়া দেয় এবং এই ধ্যানকে অবলম্বন পূর্বক বিরূপে মন স্তরে স্তরে উন্নীত হইয়া চৈতন্যময় শিবভাব লাভ করে তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে।

এখন কথা হইতেছে এই যে, লক্ষ্য স্থির না হইলে ধ্যান হয় না এবং রূপ ভিন্ন লক্ষ্য নির্ণীত হইতে পারে না। অরূপে লক্ষ্য নির্ণয় করা অসম্ভব, জ্ঞানীরা যে জ্যোতী কল্পনা করেন তাহাও রূপ, ভক্তেরা ভাবের তীব্রতা লাভ করিয়া মনকে ঋত উন্নীত করিবার জগত্ৰী রূপে আপন ভাবানুযায়ী আকার আয়োগ করেন মাত্র এবং এই জগত্ৰী জ্ঞানপথের আনন্দ প্রশান্ত ও ভক্তিপথের আনন্দ উচ্ছ্বাস ময়, ফলতঃ রূপ কল্পনা ভিন্ন কিছুতেই ধ্যান হইতে পারে না। কিন্তু তুমি যাহা কখন লেখ নাই তাহার ধ্যান করিবে কিরূপে? চৈতন্য সত্ত্বার

তুলনায় মন অপেক্ষাকৃত স্থূল এবং চক্ষু তদপেক্ষা স্থূল, প্রধামতঃ মনের যে তিন ভূমি আছে, সেই তিন ভূমিতে মন বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয় অজ্ঞান ভূমিতে অবস্থান কালে স্থূল, জ্ঞান ভূমিতে সূক্ষ্ম ও চৈতন্য ভূমিতে কারণ রূপ ধারণ করে, এই অবস্থার বিভিন্নতার সহিত তাহার ভাবেরও পরিবর্তন হয়। স্থূলাবস্থায় সে জীবভাবে, সূক্ষ্মাবস্থায় ভক্তভাবে ও কারণাবস্থায় শিবভাবে লাভ করে, এখানে একটি কথা মনে রাখিও যে স্থূল দেহের স্থূল ইন্দ্রিয়ের ত্রায় মনের ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় আছে এবং তাহাই স্থূল ইন্দ্রিয় পথে জগৎ পরিদর্শন করে, প্রকাশ ভাবাপন্ন সূর্যালোককে চক্ষু ঝলসিত হওয়ায় পেচক যেমন অন্ধকারের সাহায্য ভিন্ন দেখিতে পায় না, সেইরূপ যাবৎ মন জীবভাবে অজ্ঞান থাকে তাবৎ সে স্থূল ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে স্থূল বস্তু ভিন্ন সূক্ষ্মের ধারণা করিতে পারে না, কিন্তু জ্ঞানোদয় হইলে সে সূক্ষ্ম বস্তু ধারণা করিবার শক্তি লাভ করে, তথাপি অরূপারূপ না থাকিলে দর্শনেন্দ্রিয় যেমন ক্ষণেকের জগৎ সৃষ্টির মহানু জ্যোতী ধারণা করিতে পারিত না সেইরূপ এই জ্ঞানের অবস্থাতেও নির্মূল প্রকৃতির আবরণ ভিন্ন সাধক চৈতন্যের স্বরূপ জ্যোতী উপলব্ধি করিতে পারেন না, ফলতঃ স্থূল ও সূক্ষ্ম ভাব অতিক্রম পূর্বক কারণে প্রবেশ করিয়া অক্ষর পদ বা শিবভাব লাভ না করিলে মন অনাবরিত চৈতন্য জ্যোতী প্রত্যক্ষ করিতে পারে নাই কিন্তু ইহা অতি দূরের কথা। সুতরাং ধূমের সাহায্যে বায়ুর গতি অনুভব করার ত্রায় সাধনার অবস্থায় জ্ঞানের সাহায্যে চৈতন্যকে উপলব্ধি করিতে হয়। কেননা মন যাবৎ প্রকৃতির অন্তর্গত থাকে তাবৎ সে কিরূপে প্রকৃতির অতীত বস্তু ধারণা করিতে সক্ষম হইবে? অতএব জ্ঞান লাভ হইলে কাচের আবরণে বিদ্যুতালোক দর্শনের ত্রায় নির্মূল প্রকৃতির আবরণে চৈতন্য জ্যোতী প্রত্যক্ষ হয় জানিও।

এখন বোধ হয় বুঝিয়াছ যে, ধ্যান করিতে হইলে রূপ বা আকার কল্পনা করিতেই হইবে, কিন্তু এই রূপ বা আকার দৃষ্ট বস্তুর তাবানুযায়ী না হইলে কল্পনা করা যায় না এবং ইহাকেই প্রতীক উপাসনা বলে। জ্ঞানীরা সৃষ্টি জ্যোতির ভাব অবলম্বন পূর্বক উহা চৈতন্যে আরোপ করিয়া আত্ম স্বরূপ বোধে ধ্যান করেন এবং ভক্তেরা জল জমাইয়া বরফ করায় ত্রায় ভক্তিমিম প্রয়োগ পূর্বক ঐ জ্যোতীস্বরূপকে ধনীভূত করেন ও তাহাতে আপন তাবানুযায়ী আকার

আরোপ করিয়া উহাকে চৈতন্যজন শ্রীভগবান বোধে ধ্যান করেন। ভাই! শ্রীভগবান যদিও নিরাকার বা নির্কিংশেষ আকার সম্পন্ন কিন্তু ভাবের অতীত হওয়ায় মন এই নির্কিংশেষ আকারের ধারণা করিতে পারে না, পূর্বে নিরাকার শব্দের যে অর্থ বলিয়াছি তাহা যদি মনে না থাকে তাহা হইলে শ্রবণ কর। “নিঃ” শব্দের অনেক অর্থ আছে, তন্মধ্যে এখানে তাহার অর্থ নির্কিংশেষ বা অনন্ত; জলের যেমন কোন বিশেষ আকার নাই অথচ অনন্ত আধারে অনন্ত আকারে আকারিত হয় সেইরূপ চৈতন্য স্বরূপে সর্বব্যাপী শ্রীভগবানের বিশেষ কোন আকার না থাকিলেও ভক্তের ভাবাধারের আকারে আকারিত হন অর্থাৎ ভক্তের ভাবানুযায়ি আকার ধারণ করেন এবং এই জগতই তাহার রূপ গুণ ও নামের অন্ত নাই, কিন্তু মন এই অনন্তের ভাব অনুভব করিতে পারিলেও ইহার ধারণা করিতে পারে না, ফলতঃ পৃথিবীতে বারি সর্বব্যাপী ভাবে থাকিলেও সমগ্র পৃথিবী খনন করা অসম্ভব, এজন্ম নিজের আবণ্ণক মত বারি লাভ করিতে হইলে যেমন এক লক্ষ্যে কুপাদি খনন করিতে হয় সেইরূপ ধারণানুযায়ি লক্ষ্যস্থির না করিলে মায়া ভেদ করিয়া স্বরূপ চৈতন্যের অনুভব লাভ করা যায় না, অতএব তিনি নাম রূপাদির অতীত হইলেও বৃক্ষ হইতে ফল পাড়িতে হইলে যেমন আকৃষির আবণ্ণক হয়, নদী হইতে ক্ষেত্রে জল আনয়ন করিতে হইলে যেমন খনন রূপ আকৃষির প্রয়োজন হয়, সেইরূপ প্রকৃতির মধ্যে অবস্থান করিয়া চৈতন্য স্বরূপ শ্রীভগবানকে প্রত্যক্ষ করিতে হইলে নামরূপাদির আকৃষি আবণ্ণক, ফলে কাষ্ঠাদির দ্বারা যেমন অগ্নির উদ্দীপন হয় সেইরূপ এই নাম রূপাদি আনন্দ রনময় ভাবের উদ্দীপক মাত্র এবং অগ্নির দ্বারা জল বাষ্পীভূত হইয়া যেমন এঞ্জিনকে গতি-যুক্ত করে, সেইরূপ ভাবের দ্বারা ধ্যান শক্তিমান হইয়া মনকে উন্নগামী করে; ফলতঃ ভাবের উদ্দীপনা করিবার জগতই শ্রীভগবানে নাম রূপাদির আরোপ করিতে হয়। পুত্র, পত্নী বা পিতামাতার নাম রূপাদি যেমন স্নেহ, মধুর ও ভক্তি ভাবের উদ্দেগ করে, সেইরূপ সর্বজন স্বর্গিণের যে সকল বিভিন্ন নামরূপ শ্রীভগবানের প্রতি আরোপ করিয়াছেন, তাহা বিভিন্ন শ্রেণীর সাধকগণের অধিকার ও ভাবের অনুযায়ি অর্থ বোধক ও অনন্ত ভাবময় শ্রীভগবানের বিভিন্ন ভাবের উদ্দীপক। ক্ষুদ্র মেঘও যেমন স্বজাতীর ভাবের আকর্ষণে বৃহৎ মেঘের সহিত যুক্ত হয় অথবা পর্বতগৃহ হইতে বহির্গত হইরা নদী যেমন স্বজাতীর ভাবের আকর্ষণে সমুদ্রের



সহিত মিলিত হয়, সেইরূপ শ্রীভগবানের যে কোন ভাব অবলম্বন কর না কেন, একাগ্র হইলে উহাই গনকে অজ্ঞান ভূমি হইতে চৈতন্য ভূমিতে উন্নীত করিয়া অনন্ত ভাবে বিলীন হইয়া যায়। কিন্তু ধনুক যেমন বাণকে চালনা করিতে পারিলেও অলক্ষ্যে প্রযুক্ত হইলে ফলপ্রদ হয় না, সুতরাং লক্ষ্যনির্ধারণ করা আবশ্যিক; সেইরূপ রূপের দ্বারা লক্ষ্য নির্ণয় না হইলে ভাব ধনুকের দ্বারা মনবাণকে প্রয়োগ করিবে কোথায়? অতএব ইহাই প্রথমতঃ স্থির করা আবশ্যিক যে, চৈতন্যজন শ্রীভগবানকে লক্ষ্য পথে আনিবার সহজ উপায় কি। যে রূপ ভূমি কখন দেখে নাই তাহা চিন্তার দ্বারা চিত্তে প্রতিফলিত করিতে পার না, সুতরাং এই চৈতন্য সত্ত্বাকে এমন রূপের ছাঁচে ঢালিতে হইবে যাহার আকার ভূমি সহজে মানসপথে আনিতে পার। জল খাইবার সুবিধার জন্ত যেমন পাত্র আবশ্যিক, সেইরূপ চৈতন্য রস পান করিয়া অনন্ত তৃপ্তিলাভ করিবার জন্ত আধারের আবশ্যিক; আধার আধারকে নিজের প্রিয় ভাবের অনুযায়ী করিয়া লওয়া চাই।

সদগুরু ও সাধু মহাত্মা দিগের নির্মূল আধার এ বিষয়ে সন্দেহপূর্ণ উত্তম, কেননা এইরূপ আধারের দ্বারা সহজে কার্য সিদ্ধি হয়, তবে যদি ভাগ্যদোষে তাহা না পাও তাহা হইলে যে ভাব তোমার প্রবল, সেই ভাবানুযায়ী পিতা, মাতা, সন্তান বা অন্তরঙ্গ বন্ধুর আধারের সাহায্য লইতে পার, কিন্তু ইহা মনে রাখিও যে মায়িক ভাবে ধ্যান ফলপ্রদ হয় না, উহা প্রেমের ভাবে হইবে। এই ভাগবাসার বাহ্য প্রয়োগকে মায়ী ও আন্তর প্রয়োগকে প্রেম বলে অর্থাৎ মূল শরীরকে সর্বশ্রম মনে করিয়া সেই লক্ষ্যে ভাগবাসার চালনা করাকে মায়ী বলে ইহাতে ক্ষণস্থায়ি বাহ্য মিলন হইলেও অনন্ত বিচ্ছেদ অবশ্যস্তাবী এবং শরীরকে লক্ষ্য করিয়া সেই জ্যোতির্শ্রয় সত্ত্বায় ভাগবাসার প্রয়োগ করাকে প্রেম বলে, এই প্রেমের ক্ষণস্থায়ি ভৌতিক বিরহ অনুভূত হইলেও ইহা অনন্ত আধ্যাত্মিক মিলনের বীজ স্বরূপ, কিন্তু জীববুদ্ধিতে এই সত্ত্বাকে চিন্তা করিলে অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে না। বাহ্য আকারের ছাঁচ ঢালিয়া এই সত্ত্বাকে শিব বুদ্ধিতে চিন্তা করিতে হইবে, ফলে চন্দ্র বা সূর্যের মেঘাবরণ যত ক্ষীণ হইতে থাকে তেমশঃ ততই যেমন ইহাদের জ্যোতির্শ্রয় আকার প্রত্যক্ষের বিষয়িত হয়, সেইরূপ ধ্যান যত গাঢ় হইবে, শ্রীভগবানকে ক্রমশঃ ততই স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতররূপে প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হইবে, এবং এইরূপে পরিণামে ভগবদর্শন লাভে জীবমুক্ত হইয়া যদি

প্রেমের টানে আরও অগ্রসর হও তাহা হইলে সেই সাধনার ধনকে লাভ করিতে পারিবে, মহামুক্তি করতলগত করিয়া শিব ভাবে অনন্ত কাল চৈতন্য স্বরূপ নিত্যানন্দ ভোগ করিতে সক্ষম হইবে ।

অতঃপর এই পর্যন্ত থাকুক, যাহা বলিলাম তাহা ধারণা করিতে চেষ্টা কর ; যদি পার তাহা হইলে বারাহসুরের ধ্যানের গূঢ়তন্ত্র আরও বিশদ ভাবে বুঝাইয়া দিব এবং যদি সেই উপায় অবলম্বন করিয়া সাধনা কব তাহা হইলে শূল চক্ষুর দ্বারা দর্শন করার আশা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যেয় বস্তুকে প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হইবে, ইহাকে যোগদৃষ্টি বলে, ইচ্ছা করিলে ইহার দ্বারা বহু দূরের ব্যাপারও সম্মুখে দেখা যায় ।

ক্রমশঃ

হরেন্দ্র শর্মা ।

## দম্পতী দর্পণ ।

( পূর্ব প্রকাশিতের পর । )

—:০:—

সপ্তপদী গমন —

জামাতা সীলার উপর দণ্ডায়মান। বধুকে সম্মুখে (ঈশান কোণে) অঙ্কিত সপ্তমণ্ডলীকার যথাক্রমে দক্ষিণ পাদদ্বারা আক্রমণ করাইবেন, এবং ক্রমশ দ্বিতীয় প্রভৃতি সমীপবর্তী মণ্ডলে পদ সংস্থাপন হইলে অব্যবহিত পূর্ববর্তী মণ্ডলে বামপদ সংস্থাপন করাইতে হইবে। প্রত্যেক মণ্ডল দক্ষিণ পদদ্বারা আক্রমণ কালে জামাতা বধুকে মন্ত্র শুনাইবে। মন্ত্র—

একমিষে বিষ্ণুস্তানয়তু ।

হে বধু! তোমার ইষ্ট লাভের জন্ত বিষ্ণু তোমার এক পদ আক্রমণ করুন। এই মন্ত্রে প্রথম মণ্ডল আতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় মণ্ডলে—

দ্বৈউর্জে বিষ্ণুস্তানয়তু ।

হে বধু! তোমার বল লাভের জন্ত বিষ্ণু তোমার দুইপদ আক্রমণ করুন।

ত্রীণি ব্রতায় বিষ্ণু স্ত্ৰানয়তু ।

হে বধু ! তোমার যজ্ঞাদি ব্রত রক্ষার্থ বিষ্ণু তোমার তিনপদ আক্রমণ করুন ।

চত্বারি মায়ে ভবায় বিষ্ণু স্ত্ৰানয়তু ।

হে বধু ! সকলের সহিত সুখে থাকার নিমিত্ত বিষ্ণু তোমার চারিপদ আক্রমণ করুন ।

পঞ্চ পশুভ্যো বিষ্ণু স্ত্ৰানয়তু ।

হে বধু ! গৃহস্থের আবশ্যকীয় পশু সকলের প্রাপ্তির জন্ত বিষ্ণু তোমার পাঁচপদ আক্রমণ করুন ।

ষড়ায়স্পোষায় বিষ্ণু স্ত্ৰানয়তু ।

হে বধু ! তোমার ধন লাভের নিমিত্ত বিষ্ণু তোমার ছয়পদ আক্রমণ করুন ।

সপ্ত সপ্তভ্যো হোত্ৰভ্যো বিষ্ণু স্ত্ৰানয়তু ।

হে বধু ! তোমার সপ্ত সপ্ত পুরোহিত অর্থাৎ উপদেষ্টা প্রাপ্তির নিমিত্তও বিষ্ণু তোমার সপ্ত পদ আক্রমণ করুন । অর্থাৎ সকল কার্যে শ্রীভগবান্ তোমার সহায়শ্চউন ইহা প্রার্থনা করি ।

এইরূপে যথাক্রমে সপ্তপদী গমন হইলে সেই স্থানে অবস্থিতা বধু নিমিত্ত জামাতা প্রার্থনা মন্ত্র পড়িবেন যথা—

সখা সপ্ত পদীভব সখ্যন্তে গমেযং

সখ্যন্তে মাধোবাঃ সখ্যন্তে মাযোষ্ঠ্যঃ ।

হে কন্তকে ! তুমি আমার সখা ( সহচারিণী ) হও, আমি তোমার সখ্য ভাব অঙ্গীকার করিলাম অর্থাৎ আমি তোমার প্রিয় সহচর হইলাম । তোমার সহিত আমার এই সখ্য ভাব যেন কোন স্ত্রীলোক নষ্ট না করে । আর সকল সাক্ষী স্ত্রীলোকেরা তোমার আমার এই পবিত্র সখ্য ভাব বর্ধিত করুক ।

পরে জামাতা বিবাহ দর্শক জনগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিবে ।

সুমঙ্গলী রিয়ং বধু ক্রিমাং সমেত পশ্যত

সৌভাগ্য মমৈস্য দদ্যু যথাস্তং বিপরেত ন ।

হে সন্ত্যগণ ! আপনারা দেখুন এই বধু শুভ বিবাহ ধর্ম্মে বিবাহিতা হইয়াছে, আপনাবা প্রীতিব সহিত ইহাকে অবলোকন করুন, ইহাকে শুভ আশীর্বাদ করুন

যেন ইহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়, আপনারা ইহার প্রতি ক্রোধ না করিয়া আশীর্বাদ করত মিজ নিজ গৃহে গমন করুন।

পরে পূর্ব স্থাপিত কুস্ত হইতে পুরোহিত বরের মস্তকে জল দিয়া অভিষেক করিবেন। মন্ত্র (বরই মন্ত্র পড়িবে)—

সমগ্ৰস্ত বিশ্বেদেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ

সম্মাতরিখা সন্ধাতা সমুদেধীদধাতু নৌ ॥

হে বধু! আমাদের উভয়ের হৃদয় বিশ্বেদেবগণ সুনির্মূল ও মিলিত করুন এবং জল সকল, বায়ু, প্রজাপতি, এবং উপদেশ প্রদাতা দেবগণ সকলেই শুভ আশীর্বাদ করত মিলিত রাখুন! কখনও যেন আমাদের হাতের না হয়।

জামাতা পুনঃশ্রেী মন্ত্র পাঠ করিয়া বধুর মস্তকে জল দিবে (আচার বশত পুরোহিত ঐ জল দেয় বাস্তবিক বর কচারই পরস্পর জল দেওয়া উচিত)।

পাণি গ্রহণ—

জামাতা দক্ষিণ হস্তদ্বারা বধুর হস্ত ধারণ করত মন্ত্র পাঠ করিবে। মন্ত্র—

গৃভ্ণামি তে সৌভগস্যায় হস্তং ময়া পত্যা জরদর্শির্ঘথাসঃ।

ভগোহর্যমা সবিতা পুরন্ধি মর্হ্যং হ্যাহ গার্হ পত্যায় দেবাঃ।

হে বধু! ভগ, অধামা, সবিতা ও পুরন্ধি সকলে আশীর্বাদ পূর্বক তোমাকে গৃহস্থাস্রম করার জন্ত আমার অর্পণ করিয়াছেন, অতএব তোমার সৌভাগ্য ঘর্ষনের জন্ত আমি তোমার হস্ত ধারণ করিতেছি তুমি বৃদ্ধকাল অর্থাৎ মরণ কাল পর্য্যন্ত আমার সহিত স্থখে একত্র বাস কর।

অশ্বোর চক্ষুরপতিয়েধি শিবা পশুভ্যঃ সুমনাঃ সুবর্চাঃ।

বীরহু জীবহু র্দেব কামা স্তোনা শংনো ভবদি পদেশং চতুষ্পদে।

হে বধু! তুমি কখনও ক্রোধদৃষ্টি ও পতির প্রাণে ব্যথা দায়িনী হইও না, গবাদি গৃহপশু গণের প্রতি প্রসন্ন থাকিবে। সর্কদা প্রসন্নমনা ও তেজস্বিনী থাকিবে, বীর পুত্র প্রসব করিবে, জীবহু (অর্থাৎ অমর পুত্র প্রসবিনী) হইবে, দেব কামা (পঞ্চ ঘজরতা) এবং আমার হৃৎকারিণী হইবে, আমার দ্বিপদ (দাস দাসীদিগের প্রতি) চতুষ্পদ (গবাদি পশুর প্রতি) প্রসন্ন থাকিবে।

আনঃ প্রজাং জনয়তু প্রজাপতিরাজরসায় সমনক্তু, ধ্যমা ।  
ত্বাহুমঙ্গলীঃ পতিলোক মাণিশ শমোভব দ্বিপদেশং চতুষ্পদে ।

হে কণ্ঠকে ! বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত প্রজাপতি আমাদের সংপ্রজা প্রদান করুন ।  
অর্ঘ্যমা তোমাকে গুণবতী করুন । মঙ্গলবতী দেবতার। তোমাকে আমার অর্গণ  
করিয়াছেন অতএব তুমি প্রসন্ন মনে পতিলোকে প্রবেশ কর, আমাতে ও  
আমাদের দাস দাসী এবং পশুগণের প্রতি প্রসন্ন ভাবে থাক ।

ইমাং হুমিস্ত মীঢ়ঃ সূপুত্রাং দুভগাং কৃধি ।

দশাস্যাং পুত্রানাধেহি পতি মেকাদশং কুরু ।

হে ইন্দ্র ! আপনি আমাদের অর্চনায় তুষ্ট হইয়া এই বিবাহিতা কণ্ঠাকে  
সূপুত্রা, এবং পতি প্রিয়া করুন, ইহার গর্ভে যাহাতে দশটী পুত্র হয় এরূপ  
আশীর্বাদ করুন এবং ইহার পতি যেন একাদশ অর্থাৎ দশ পুত্রের রক্ষক  
হইয়া ইহার সুখপ্রদ হয় এই আশীর্বাদ করুন ।

সম্রাজ্ঞী শশুরেভব সম্রাজ্ঞী পশুয়াং ভব ।

ননন্দরি চ সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অপি দেবসু ॥

হে প্রিয়ে ! তুমি তোমার শশুরের প্রতি শশুরীর প্রতি, এবং ননদিনীর  
প্রতি ও দেবর গণের প্রতি হৃদক্কা ও সরলা ও প্রসন্না হইয়া সুখে সংসার  
কর । কাহারও সহিত যেন তোমার কসহ না হয় ।

মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু মম চিত্ত মম চিত্তং তে হস্ত ।

মম বাচমেকমনা জুমস বৃহস্পতি স্থানিগুনক্তু মহং ॥

হে প্রিয়ে ! আমার কার্য্যে তুমি তোমার মনকে নিযুক্ত কর, তোমার চিত্ত  
আমার চিত্তের অনুসরণ করুক । আমার বাক্যে তুমি একমনা হও অর্থাৎ আমি  
যাহা বলিবি তুমি প্রসন্না হইয়া তাহা প্রতিপালন করিবে । দেবগুণ বৃহস্পতি  
আমার সুখের জন্ত তোমাকে সং বুদ্ধি প্রদান করুন ।

পরে উত্তর বিবাহ—

অর্থাৎ জামাতা বধুর সহিত উপবিষ্ট হইয়া অগ্নিতে আহুতি দিবে এবং প্রত্যেক  
আহুতির পর ক্রমে ( কুশিতে ) সংলগ্ন হৃত বিন্দু বধুর মস্তকে দিবে । এইরূপে

ছয় বার দিবে । ১ম—মন্ত্র—

লেখা সন্ধিসু পক্ষস্বাবর্তেষু চ যানিতে ।

তানি তে পূর্ণাহত্যা সর্কাণি শময়াম্যহং স্বাহা ॥

হে প্রিয়ে! তোমার লেখা সন্ধিতে; চক্ষুর পাতায় ও আবর্তিতে যে সকল অমঙ্গল রেখা আছে তাহা আমি অগ্নিতে পূর্ণাহতির দ্বারা প্রশমন করিতেছি, তুমি মূলক্ষণা হও ।

২য়—কেশেষু যচ্চ পাপক মৌক্ষিতে রুদিত্তে চ যৎ ।

তানিতে পূর্ণাহত্যা সর্কাণি শময়াম্যহং স্বাহা ।

হে প্রিয়ে! তোমার কেশে, দর্শনে (চক্ষুতে), রোদনে যে সকল অলক্ষণ আছে তাহা আমি পূর্ণাহতির দ্বারা প্রশমিত করিতেছি, তুমি মূলক্ষণা হও ।

৩য়—শীলেচ যচ্চ পাপকং ভাষিতে হসিতে চ যৎ ।

তানিতে পূর্ণাহত্যা সর্কাণি শময়াম্যহং স্বাহা ।

হে প্রিয়ে! তোমার চরিত্রে, তোমার বাক্যে এবং তোমার হাশ্বে যাহা কিছু অলক্ষণ আছে আমি পূর্ণাহতির দ্বারা তাহা প্রশমিত করিলাম, তুমি সুখিনী হও ।

৪র্থ—আরোকেষুচ দন্তেষু হস্তয়োঃ পাদয়োঃ চ যৎ ।

তানিতে পূর্ণাহত্যা সর্কাণি শময়াম্যহং স্বাহা ॥

হে প্রিয়ে! তোমার দস্তছিদ্রে, দন্তে, ওষ্ঠে ও অধরে, হস্তে এবং পাদদ্বয়ে যে সকল অলক্ষণ চিহ্ন আছে তাহা 'দূর করিবার নিমিত্ত আমি পূর্ণাহতি প্রদান করিলাম তুমি সুখিনী হও ।

৫ম—উর্কোঁরুপশ্বে জ্জ্বয়োঃ সন্ধানেষু চ যানি তে ।

তানি তে পূর্ণাহত্যা সর্কাণি শময়াম্যহং স্বাহা ।

হে প্রিয়ে! তোমার উরুদ্বয়ে, উপস্থহন্দ্রিয়ে, জ্জ্বাদ্বয়ে এবং সন্ধিস্থানে যে সকল অশুভচিহ্নাদি আছে তাহা প্রশমনের নিমিত্ত আমি পূর্ণাহতি দিতেছি, তুমি শুভ লক্ষণ যুক্তা হইয়া আমার আনন্দ বদ্ধন কর ।

৬ষ্ঠ—যানি কানিচ ষ্ণোঁরাণি সর্কাণ্ডেষু তবাভবন্ ।

পূর্ণাহতিস্তিরাঙ্ক্যস্ত সর্কাণি তাত্তশীশমং স্বাহা ॥

হে প্রিয়ে ! তোমার অশ্রু সর্বাঙ্গে যে কোন অন্ততচিহ্ন থাকে, তাহা প্রশমনের নিমিত্ত আমি অগ্নিতে পূর্ণাভূতি প্রদান করিলাম, তোমার অন্তত লক্ষণ সকল নষ্ট হইল, তুমি প্রসন্ন হইয়া সুখিনী হও ।

পরে জামাতা বধুকে ধ্রুব নক্ষত্র দেখাইয়া এই মন্ত্র পড়াইবেন—

ধ্রুবমসি ধ্রুবাং পতিকূলে ভূয়াসম্ ।

অমুকম্ অমুকী । ( অর্থাৎ পতির ও নিজের নাম উল্লেখ করিবে )

হে ধ্রুব ! তুমি যেমন নিশ্চল আশীর্বাদ কর আমিও যেন পতিকূলে সেইরূপ নিশ্চল (শাস্ত্র প্রকৃতি) হইয়া আনন্দে থাকিতে পারি আমি অমুকী আমার স্বামির নাম অমুক । ‘

পরে অরুক্ষতী নক্ষত্র দর্শন করাইয়া পড়াইবেন—

‘অরুক্ষত্যবরুদ্ধাহ মস্মি’ ॥

হে অরুক্ষতি ! আমি যেন তোমার স্থায় কায়মনোবাক্যে পতির সেবা করিয়া পতির আদরণীয়া হইতে পারি আমায় আশীর্বাদ কর ।

তৎপরে বধুকে অবলোকন করত জামাতা মন্ত্র পড়িবে—

ধ্রুবাদৌ ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবাং বিশ্বমিদং জগৎ ।

ধ্রুবাসঃ পর্কতাইমে ধ্রুবাং পতি কূলে ইয়ং ।

যেমন স্বর্গলোক স্থির, যেমন পৃথিবী স্থির, যেমন এই বিশ্ব সংসার বিধাতার সূন্যমে স্থির আছে, যেমন পর্কত সকল স্থির আছে, সেইরূপ এই স্ত্রী পতিকূলে স্থির হইয়া যশস্বিনী হউক ।

তৎপরে বধু পতির গোত্র উচ্চারণ পূর্বক স্বামিকে অভিবাদন করিবে—

অমুক গোত্রা ত্রীঅমুকী দেবী অহং ভো অভিবাদয়ে ।

আমি আপনাকে অভিবাদন করি আমার নাম ত্রীঅমুকীদেবী ।

পতি বধুকে প্রত্যভিবাদন করিবে—

আয়ুস্বতী ভব সৌম্যে ত্রীঅমুকী দেবী ।

ওহে তুমি দীর্ঘায়ু হও ; সরলা ও শাস্ত্র স্বভাবা হও ; আমি তোমাকে আন্তরিক আশীর্বাদ করি ।

পরে কোন সধবা নারী পূর্ব স্থাপিত জল পূর্ণ কুন্ত হইতে আম্র পঞ্চবারা জল লইয়া বধু ও বরকে অভিষেচন করিবে। পরে জামাতা সমিধ প্রক্ষেপ পূর্বক মহাব্যাছতি হোম করত কার্য সমাপন করিবে।

ভোজনাদি—

জামাতা অন্নান্তিমরণ নিমিত্ত মন্ত্র পড়িবেন—

অন্নপাশেন মণিনা প্রাণ সূত্রেণ পূমিতা ।

বদ্রামি সত্য গ্রহিণী মনশ্চ হৃদয়কতে ॥

হে বধু! অগ্র হইতে আমি সত্যরূপ গ্রহণিয়ুক্ত অন্নরূপ পাশে তোমার আত্মার সহিত তোমার দেহ, মন, প্রাণ ও হৃদয়কে বন্ধন করিলাম। অর্থাৎ আমি ধর্ম্য সাক্ষী করিয়া অগ্র হইতে প্রতিজ্ঞা পাশে বদ্ধ হইলাম, তোমার আত্মাকে ও দেহ মন প্রাণকে আমি অন্নদ্বারা পরিপোষণ করিব। (এখানে প্রাণের অন্ন ধর্ম্য ও সত্য, দেহের অন্ন যব ও তুল্লাদি; সূতরাং পতি পত্নীকে যেমন শারীরিক অন্ন দিবে তেমন মানসিক অন্নরূপ ধর্ম্য সত্য ও প্রদান করিবে।)

যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম ।

যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব ॥

হে বধু! অগ্র হইতে এই যে তোমার হৃদয় তাহা আমার, ও আমার হৃদয় তোমার হইল, তোমার দেহে আমার অধিকার, ও আমার দেহে তোমার অধিকার জন্মিল, তোমাতে আমি, আর আমাতে তুমি সর্বদা সংযুক্ত (ভাবাসক্ত) থাকিব ও থাকিবে ॥

অন্নং প্রাণস্ত পঙ্ক্তিশ স্তেন বদ্রামি ত্বা স্বাহা

(ত্বা এখানে অনুকী দেবীং বলিবে) ॥

হে বধু! অন্নই প্রাণের রক্ষক, অন্নই দেহের রক্ষক সূতরাং অন্নদ্বারা অগ্র হইতে তোমাকে আমি আপন করিয়া বন্ধন করিলাম।

পরে জামাতা বধুকে লইয়া যেন যানে আরোহণ করিতেছেন এইরূপ ভাবিয়া মন্ত্র পড়িবে।

ক্রমশঃ ।

দীনবন্ধু শর্মা ।



শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি ।

# ভক্তি ।

৮ম সংখ্যা—৮ম বর্ষ ।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী ।

ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্ ॥

## প্রার্থনা ।

জানামি ভূমন্ তব সংজগদ্বপুঃ

তথাপি চিন্তং ভবতীহ চঞ্চলম্ ।

তন্মূলমজ্ঞানবিনাশকারণং

প্রযচ্ছ ভাষিৎ ত্বয়িদেব নিশ্চলম্ ॥

হে ভূমন্ ! তোমার রূপায় তোমার বিশ্বব্যাপীত্ব, তোমার সর্ব কারণকারণত্ব এবং তোমার বিশ্বনিয়ন্তৃত্ব প্রতিক্ষণই অনুভব হইতেছে । তোমায় মঙ্গলময়, সর্বব্যাপীত্ব স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারি না । তোমারই প্রদত্ত জ্ঞানশক্তি বলে এই বিশ্বাস লাভ করিয়াছি যে, তুমি মঙ্গলময়, তুমি বিশ্বসাক্ষী, তুমি সর্বাস্তর্ঘ্যমী এবং তুমিই একমাত্র বিশ্বের নিয়ন্তা ।

হে ভগবন্ ! সংসার চক্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নানাপ্রকার ভাগ মন্দ, সং অসৎ এবং লাভ ও অলাভ ব্যাপারে ভুগিয়া ভুগিয়া ইহাও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছি

যে, তোমার রূপায় আশার অতীত ফল ফলে, তোমার রূপায় ক্ষুদ্র মহান হয়, তোমার রূপায় মানবের বুদ্ধি, বিদ্যা ও বিচারের অতীত কার্য অনায়াসে সংসাধিত হয়, তোমার রূপা হইলে এক মুহূর্তের মধ্যে মহাপাপী পুণ্যাত্মা হইতে পারে, তোমার রূপায় চিরঅপরাধী মূর্থলোকও ভাব লাভ করিয়া এই সংসারে প্রবৃত্তির অক্ষুণ্ণে কার্য করিতে করিতেও আত্মার উন্নতি সাধন করিয়া সদানন্দে থাকিতে পারে। হে মঙ্গলময়! বিশ্বাস আছে—তথাপি চিন্তের বিক্ষেপ দূর হয় না। সময় সময় তোমার সর্বব্যাপীত্ব অনুভব হইলেও চিন্তের সংশয় একেবারে বিদূরিত হয় না। জানিয়া এবং প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াও বিশ্বাসকে হৃদয় এবং অনুভবকে সর্বক্ষণস্থায়ী আর তোমার ভাবনন্দকে স্বভাবগত করিতে পারিতেছি না; সর্বদাই প্রায় চিন্তা চঞ্চল, সর্বদাই বিক্ষিপ্ত ও সর্বদাই সন্দিক্ত; তাই কাতর প্রাণে তোমার নিকট প্রার্থনা করি; হে দেব! চঞ্চলতার কারণ স্বরূপ যে অজ্ঞান, তাহা বিদূরিত করিয়া তোমাতে অক্ষুণ্ণ ভাব দাও। বিশ্বাসকে হৃদয় করতঃ চিন্তাবিক্ষেপ নিবৃত্তি করিয়া অসংশয় চিন্তে তোমাতে আত্ম সমর্পণ করি; একান্ত নির্ভরতা শিখাইয়া দাও, সম্পদে বিপদে, লাভে অলাভে সদাই যেন তোমাতে ভাব থাকে, “তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক” এই নির্ভরতা বড়ই শাস্তি প্রদ, আজ দীনহীন তোমার নিকট ইহাই ভিক্ষা করিতেছে। দীনহীনকে চিন্তের স্থিরতা ও একান্ত নির্ভরতা রূপ প্রার্থিত ধন দানে বাঙ্কাকল্পতরু নামের সার্থকতা কর। দেখ যেন অহুগত ভাবপ্রার্থী, তোমার দ্বারের ভিখারী, তোমার অহুগত, তোমার ভাব চাহিয়া আশার নিরাশ হয় না।

শ্রীদীনধনু শর্মা।

# লীলারহস্য ।

( পূর্ব প্রকাশিতের পর । )

শ্রীকৃষ্ণ বদনে বিশ্ব দর্শন । ৮ ।

—:—

একদ্বার্ডকমাদায় সাক্ষ মারোপ্য ভাবিনী ।

প্রমুত্তং পায়য়ামাস স্তনং মেহ পরিপ্লুতা ।

একদিন বাৎসল্য-প্রেমে আশ্বহারা মেহময়ী মা যশোদা গোপালকে কোলে করিয়া অতিশয় আগ্রহের সহিত গোপালকে স্তন-দুগ্ধ পান করাইতে লাগিলেন । গোপাল মার কোলে থাকিয়া মাতৃ মেহ-সার স্তনদুগ্ধ গ্রহণ করতঃ মাকে কৃতার্থ করিতেছেন । এদিকে—

পীতপ্রায়শ্চ জননী সূতশ্রুচি রম্মিতং ।

মুখং লালয়তী রাজন্ জ্জ্বততো দদৃশে ইদং ।

শুকলেব বলিতেছেন, হে মহারাজ পরীক্ষিত ! মা যশোদার মেহের কথা আর কি বলিব, গোপালকে স্তন-দুগ্ধ পান করাইতেছেন আর হস্তধারা গোপালের মস্তক ও অঙ্গাদি সন্দাহন করিতেছেন, মুখে হাত দেওয়া মাত্র যখন গোপাল জ্বস্তগ্ন করিলেন ( হাই তুলিলেন ) অমনি গোপালের মুখমধ্যে মা যশোদা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকলই দর্শন করিলেন । প্রথমে মার মনে চমৎকার ভাব হওয়ার ব্যৱবার নিরঙ্কণ করিতেছেন, মা দেখেন—

খংরোদসী জ্যোতিরনৌকমাশাঃ ।

সূর্য্যেন্দুবহ্নিঃস্বনাসনাভূবীং শ্চ ।

দ্বীপান্ নগাং স্তুদুহিত্বর্নানি

ভূতানি যানি স্থির জঙ্গমানি ॥

মা যশোদা পুত্রের মুখ মধ্যে আকাশ মণ্ডল, স্বর্গধাম, পৃথিবী, জ্যোতিঃশক্রেসু গ্রহ নক্ষত্রাদি, দিক্ সকল, সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, সমুদ্র, দ্বীপ, পর্ব্বত, নদী, অরণ্য এবং চরাচর ভূত সকল বিরাজ করিতেছে দেখিলেন ।

সাবীক বিধং সহসা রাজন সজ্জাতবেপথুঃ ।

সম্মীল্য মৃগশাবাকী নেত্রে আমীং সুবিস্মিতা ।

হে রাজন! মৃগশাবক নেত্রী (অতি সরলতা পূর্ণদৃষ্টি) মা যশোদা সহসা পুত্রের মুখমণ্ডল মধ্যে বিধমণ্ডল অবলোকন করিয়া কম্পাধিত কলেবরা হইলেন। কি হইল, কেন এরূপ দেখিতেছি এরূপ ভাবনা হওয়ায় বিস্ময় সহকারে কিছু সময় নেত্র মুদ্রিত করিয়া রহিলেন, যশোদা কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন না। শিশুর মুখ মধ্যে কি প্রকারে চুরাচর ব্রহ্মাণ্ড অবস্থান করিতেছে, কি হইল, কেনই বা সহসা এরূপ দেখিতেছি, একি কোন রকম পুত্রের বিকার? না দেব মায়া? মাতৃস্নেহে শ্রীভগবান্ ক্ষুদ্র বালক সাজিয়াছেন, মা যশোদাকে নিজে সর্বস্বপ্নরত্ন ও পূর্ণত্ব অনুভব করিতে দিতেছেন তাই মা যশোদা এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে অস্থিরা হইলেন আর পুত্রের মুখ পানে চাহিতে পারিলেন না। নেত্র মুদ্রিত করিয়া ইষ্টদেবকে স্মরণ করত গোপালের মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন। লীলাময় শ্রীভগবান্ মা যশোদার বাৎসল্য প্রেম অক্ষুণ্ণ রাখিবার জগু ঈশং হস্ত করতঃ যেমন মার মুখপানে চাহিয়াছেন অমনি যশোদা সকল ভুলিয়া গোপালের ভালবাসায় আকৃষ্ট হইলেন।

প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ! একবার ভাবুন কি অপূর্ব খেলা, এই ভাব বড়ই মধুর। শ্রীভগবানকে কাঁহার। যে ভাবে ভাবেন শ্রীভগবান্ তাঁহাদিগকে সেই সেই ভাবেই ভাবিত রাখেন; কাঁহার খেলার ভাব অতিক্রম করিবার কাহারও সাধ্য নাই। এদিকে সাধকের একনিষ্ঠা দেখাইতে ও বাড়াইতে লীলাময় এই ছল পাতিয়া সর্বাস্তঃকরণে আত্মনির্ভরী অকপটাত্মীল সাধককে দেখাইতেছেন যে, আমাছাড়া কোন বস্তু, কোন দেবতা ও কোন প্রাণী নাই, আমি সর্বময়, আমি সর্বব্যাপী, আমি সকলের প্রাণের প্রাণ এবং সকল বস্তুর অন্তরে ও বাহিরে আমিই নিরন্তর বর্তমান, আমাতে বিশ্ব, আমিই বিশ্বে নিরন্তর অনুপ্রাণিত রহিয়াছি। যে ব্যক্তি আমাতে আত্ম সমর্পণ করিয়া আমাকেই ভাল বাসে, তাহার সকল কাৰ্য্যেই আমি শাস্তি বিধান করি ও আমি সর্বময় এবং সকলই যে আমাতে বর্তমান ইহা দেখাইয়া তাহার একনিষ্ঠা বৃদ্ধি করি। বাস্তবিক এক নিষ্ঠাই প্রাপ্তির প্রধানতম অবলম্বন। একনিষ্ঠার অভাবে অনেকেরই সাধন করিয়াও সাধনের ফল (সিদ্ধি) লাভে

বঞ্চিত হয়। যাহাদের ইষ্টদেবে অচল ভক্তি, যাহারা ইষ্টনিষ্ঠ অর্থাৎ ইষ্টদেবের পীতিভিন্ন আর কিছুই প্রার্থনা করেন না, এমনকি যাহারা মুক্তিকেও ইষ্টপীতির মিকট হয় জ্ঞান করেন, তাহারা একভক্তি বলে সর্বদেব ও সকল অভিলষিত পুণ্য কৰ্মাদি প্রাপ্তি একমাত্র ইষ্টদেবের পীতিতেই অনুভব করেন—

মাতৃভক্তরামপ্রসাদ বলিয়াছেন—

“কাজকি আমার গিয়ে কাশী। আমার মায়ের পদনখে প’ড়ে কত গয়া গঙ্গা  
বারানসী” ইত্যাদি—

বাস্তবিক যাহার ইষ্টদেবে পরানিষ্ঠা তাহার আর বহু প্রকার ভজন ও নানা কৰ্ম করিতে হয় না। আজ ৮কালীষাটে কাশী দর্শন ও কাশী পূজা করিলাম, কল্যা নকুলেশ্বরে নকুলেশ্বরশিবের পূজা করিলাম, পরশু তারকনাথে যাইব, পরে আবার বৃন্দাবন যাইব, এইরূপে এক এক তীর্থে যাব আর সে তীর্থ ছাড়িয়া ক্রমক্রমে অপর তীর্থে যাবার মানস করে, যাহাদের এক নিষ্ঠা নাই তাহারা এইরূপে চিরকাল ঘুরিয়া ঘুরিয়া কেবল অপরিতৃপ্ততাই সঞ্চয় করে। কোন স্থানেই আশ্রয় পরিতৃপ্তি লাভ করে না। শ্রীভগবান নিজ বদনে নিখিল দেবতা ও নিখিল ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করাইয়া মা যশোদাকে যেন বলিতেছেন ; মা যদি আমায় পাইয়াছ, আমায় ভাল বাসিয়াছ, আমার সেবার জন্ত ক্ষীর, সর, নবনীতাদি প্রস্তুত করিতেছ, তবে আর অন্নের মন দিও না আমারই মুখ পানে চাহিয়া থাক তোমার সকল পুণ্য ও সকল ধর্মের সার্থকতা একমাত্র আমার ভালবাসাতেই হইবে।

প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ! আরাধ্য দেবে একান্ত নিষ্ঠাকর, সতীর যেমন এক পতি নিষ্ঠা; সাধকেরও তেমন একনিষ্ঠা হওয়া চাই, এক নিষ্ঠা রাখিয়া অনন্ত দেবতার কিম্বা মনুষ্যাদি জীব জন্তুর মধ্যে তাঁহার সত্তা প্রত্যক্ষ করিয়া তিনিই বিশ্বের প্রাণ, তিনিই বিশ্বময় ইহা অনুভব করিয়া পরামিদ্ধি লাভে জীবশূন্য অবস্থায় ভগবানের সেবা কর অতুলনীয় আনন্দ অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইবে। মুখ বিবরে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করান লীলার ইহা একটা নিগূঢ়তত্ত্বোপদেশ।

ক্রমশঃ

দীনবন্ধু শর্মা।

# প্রার্থনা ।

—:—

( গীতিকা । )

ওহে গৌর হরি, এস কৃপা করি,  
এস মোর হৃদয় মন্দিরে ।  
বহুদিন হ'তে, চাহি আছি পথে,  
আছি বিপুল আশাটা ধরে ॥  
আশা কি মিটিবে না হে ?  
বাসনা কি সফল হবে না হে ?

( আমার ) বহু দিনের সাধ কি পূরিবে না হে ?

তুমি প্রাণের দেবতা ! প্রাণ দাও আলো ক'রে ॥  
আঁধারে ঢেকেছে অন্তর আমার,  
কলুষ কালিমা হয় একাকার,  
শুধু বিষাদের ঝোর হাহাকার,  
শুভাগমে থাক দূরে ॥

তব প্রেমোজ্জ্বল রূপ খানি হেরি,  
আমি ভুলে যাই নাথ মায়া'র চাতুরী,  
রাঙ্গা পা দু'খানির অতুল মাদুরী—  
পিয়ে অকুলেতে যাই ত'রে ॥

বারেক দাও হে চরণ-পরশ ;  
আর কিছু পাইতে নাই মোর আশ ;  
জীবনে মরণে হয়ে থাকি দাস ;

( ওহে ) ঠেঙ্গো না ঠেঙ্গো না অন্তরে ॥

দীন—রমিৎলাল দে ।

# অশ্রুহার ।

—:—

( গীতিকা । )

গৌর হে !

( তব ) • রাজা প! দু'খানি পুজিবার তরে,  
প্রীতি অর্থ্য লয়ে এসেছে সকলে ।

কোর, বিদগ্ধ অন্তর অশান্তি আলয় ;  
অনুর্কর ক্ষেত্র, ভাব কি উথলে ?  
কি দিব হে আমি চরণে তোমার,  
কোন ধন আছে দিতে উপহার ?  
দুঃখ-মেঘে ঢাকা হৃদয় আগার ,  
আঁপি ভরিছে জলে ।

ওহে, বিষাদের হৃদে সেই অশ্রুধার,  
করিয়ে চয়ন গাঁথিয়াছি হার ;  
অশ্রুজলে গাঁথা এ অপূর্ণহার,  
শোভিবে কি চরণ তলে ?

আমি, শক্তিচিহ্ন আছি দাঁড়ায়ে,  
তুমি, ভকতবৎসল লওহে তুলিয়ে ;  
ত্রীপদ পঙ্কজ পরশের যোগে,  
অমৃত করহে গরলে ।  
যদি হয় তব করুণা সঁকার,  
নব ভাব লয়ে আশ্রিব আগার,  
হ'য়ে কুতূহলী লবে পুষ্পাঞ্জলি  
দিব হে রাতুল চরণ কমলে ।

কর্ম দোষে ছিন্ন ভিন্ন এ হৃদয়,  
 ফুটে না ভাবের কুসুম নিচয় ;  
 রমের সিকনে কর রসময়  
 মম, ভক্তি লভিকার মূলে ।

তব রূপা বিনা আশা কিছু নাই,  
 একে একে সব হ'ল মোহে ছাই,  
 দুঃখের সংসার হে গৌর গৌসাই !  
 আছে, সর্ম্ভ ভাবে প্রতিকূলে ।

আর, পারি না সহিতে এ দুঃখের ভার,  
 নামাইয়া লও করুণা-আধার  
 জাগে, আকুল পরাণে বাসনা আমার,  
 পূজি প্রেম-পারিজাত ফুলে ॥

দীন—রসিকলাল দে ।

## গীতিকা ।

—:~:—

কোথা ওহে হরি, গোবর্দ্ধনধারী,  
 ব্রজ গোপী-মনোরঞ্জন ।

আমি, বিনয়ে কাতরে, ডাকিহে তোমারে,  
 ( একবার ) জুদি মাঝে দাও দরশন ॥

বড় সাধ মোর হইয়াছে মনে,  
 শাস্তি সুখপ্রদ যুগল চরণে,  
 দিব উপহার প্রীতির চন্দনে,  
 মাখাইয়ে ভাব প্রশ্নন ।



না আছে আমার প্রেম ভক্তি বল,  
শোকে তাপে প্রাণ সতত বিহ্বল,  
এ দীন জনার ভরসা কেবল,  
তব নাম দীন শরণ ।

নিজ গুণে রূপা করি এই দীনে,  
মহাভাব স্রুপিণী রাধা সনে,  
বারেক দাঁড়াও হৃদি সিংহাসনে,  
হইলো যুগল মিলন ।

মানস মোছন যুগল মাধুরী,  
হেরিব মানসে প্রাণ মন ভরি,  
( তাহে ) প্রেমের সাগরে, আনন্দ লহরে,  
ভাসিব, জুড়াবে জীবন ॥

দীন—শ্রীশশিভূষণ সরকার ।

## দাস ।

—৩০—

বর্তমান সময়ে “দাস” লইয়া যে মারামারি, তৎসম্বন্ধে বাধা হইয়া হই চারি  
কথা আমাকে লিখিতে হইল ।

পিতামাতা আমার নাম রাখিয়াছিলেন “কালীহরবহু” । অতঃপর গুরুদেব  
রূপা পরিশ্রম হইয়া নাম করিলেন “কালীহর দাস বহু”, অর্থাৎ কালীহরের দাস ।  
তিনি আমাকে বুঝাইলেন, জীব কখনও কালীহর হইতে পারে না, কালীহরের  
দাস । আমি তদবধি ভক্ত সমাজে আনন্দের সহিত এই গুরুদত্ত নাম ব্যবহার  
করিয়া থাকি । “দাস” কথাটী বড় মিঠা লাগে । “দাস” বলিতে, দাস সাজিতে  
পারিলে যেন কি পিপাসার তৃপ্তি হয় ; কিন্তু তাতেও অদৃষ্ট দোষে বৃদ্ধ ষটে ।

হে দেব ! হে সখা ! মোরে কর আশীর্বাদ ।  
 দাস হয়ে থাকি যেন না ঘটে প্রমাদ ॥  
 পিতৃদত্ত “দে”র পাশে “দাস” সাজে ভাল ।  
 দে-দাস হইয়ে যেন থাকি চিরকাল ॥

দীন রসিক ।

রাজা পা যোহার সর্বস্ব নিধি, ভক্তকবি সেই রসিকের প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া  
 আমি অধমও গাইঃ—

দাস বহু হয়ে যেন থাকি চিরকাল ।

বুদ্ধি নির্মল ও সুপক্ব না হইলে দাস্ত্র মাধুরীরসাস্বাদ হয় না। মহতের  
 অনুকরণে, মহতের ভাবে ভাবিত হইয়া, যে অনুভব ফলিয়াছে, তৎপ্রভাবেই  
 এই সিদ্ধ ভাবের চিত্তাক্রমে বা আভাস প্রদানে লেখনী প্রয়োগ করিতেছি।  
 দাসের অবমাননা না হয়, এজন্য দাস্যে যৎকিঞ্চিৎ বর্ণ ফলাইব ।

কাস্ত্র ক্ষত্রিয় হউন আফ্রাদের বিষয়, কারণ বীরপনা জাগ্রত হইবে; কিন্তু  
 ভগবদাস্যই প্রকৃত বীরপনা, যেহেতু মায়ী ও কামাদির আধিপত্য নষ্ট করিয়া  
 নিজের ব্রহ্মণ্য ভাব বদ্ধিত করিতে হয়। ব্রহ্মণ্যভাব ক্ষত্রিয়েরও হেয়ত্ব  
 প্রমাণ করে। কালিদাস, হরিদাস, কৃষ্ণদাস লিখিতে কোনও জাতিবিশেষের  
 আপত্তি চলিতে পারে না ।

সুরতনাথ তেহ শুদ্ধদাসিকা বরদ নিয়তো নেহ কিং বধঃ ।

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ।

গোপীগণ বলিতেছেন, “হে সুরতনাথ, বরদ ! আমরা বিনা মূল্যে তোমার  
 দাসী হইয়াছি, ইত্যাদি ।” রতিবিলাস মন্দিরে সখীবৃন্দের প্রবেশাধিকার না  
 থাকিলেও ঋগ্বীরগণের সেবা পরিচর্য্যা রুদ্ধ হয় নাই। সুতরাং দাস্য আদি  
 নিত্যভাব, দাস্যজীব জীবনের ভিত্তি, মূল, দাস্ত্র জীবের লক্ষ্য, আরাম, সুখ,  
 সুখা, অমৃত, এবং সার্থকতা, দাস্ত্র জীবের দূরিত নাশন চিত্ত শোধক পঙ্গোদক,  
 ও দাস্ত্র প্রেমপ্রদীপ শিখার স্নেহ ( তৈল ) মাধা শলিতা । জীব শ্রীভগবানের  
 নিত্যদাস ; জীবের আরাধ্য, শাস্তি মিদান, শরণ্য সেই দেব দাস্ত্রের প্রতি জীবের

হিংসাবিষেব, এ আবার কোন ভাব ? ভক্তগণের, বৈকুণ্ঠগণের গৌরব করিবার এই এক সামগ্রী দাশ, যাহা বিনয়ের একমাত্র অমৃতোৎস, তৎপ্রতি বৈকুণ্ঠগণেরই অনাদর, এর রহস্য কি ?

দেহাভিমান জাতিত্বের মূল—জাতি দেহের। ভক্তের জাতি বুদ্ধি নাই। ভক্ত চিন্তাবাগ্ন সর্কজীবের দাস, দাশ জ্ঞানেরই পরিণাম; সুতরাং উহা জীবের অতীষ্ট সম্পদ।

নিত্য সিদ্ধ ভগবদাশ্রয়দ্ব্যাস্বকং জ্ঞানম্ ।

“দাশ” কথারই রঞ্জিত হুচিত্র :—

“তৃণাদপি হুনীচেন তস্মৈরিষ সহিষ্ণুনা।”

এতদূরো সেবা, লক্ষণ, দৈন্য ও সহিষ্ণুতা প্রকটিত হইয়াছে। এসব ভক্তের প্রাণ স্বরূপ।

কাহারও নিকট দাস লিখিতে চিন্তে গুমান আশে কি না এ বড় পরীক্ষা। যিনি অকার্পণ্যে উহার ব্যবহার করিতে পারেন, তিনিই অমানী মানদ যথার্থ ভক্ত। জাতির প্রতি লক্ষ্য করিয়াই আমরা অনেক সময় দাস হইতে সঙ্কুচিত হই। কিন্তু ভক্ত এই পাঁচটার অতীত।

জ্ঞাতিবিদ্যামহত্ত্বক রূপং যৌবনমেব চ।

বর্জয়েন্তু সুষত্বেন পকৈতে ভক্তিকণ্ঠকাঃ।

জাতি, বিদ্যা, মহত্ত্ব, রূপ ও যৌবনের অভিমান ভক্তিকণ্ঠক বলিয়া বর্জনীয়।

ভক্তচিন্তে এই ভাবটা প্রবল থাকিবে :—

নাহং বিপ্রো নচ নরপতিনাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো

নাহং বর্ণী নচ গৃহপতিন বনস্থো যতির্বা ॥

কিন্তু প্রোদমিখিল পরমানন্দ পূর্ণমৃত্যু

গোপীভক্তুঃ পদকমলয়োদ দিদদান্দাসঃ ॥

শ্রদ্ধাবলী ।

আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র নহি; আমি ব্রহ্মচারী, কি গৃহস্থ, বানপ্রস্থ কি সন্ন্যাসীও নহি; আমি নিখিল পরমানন্দপূর্ণ আনন্দ সিদ্ধস্বরূপ গোপীভর্তা শ্রীকৃষ্ণের দাসের দাসানুদাস। ভগবদ্ব্যস্তই আমার জাতি, আমার ধর্ম। এহেন ভাবপ্রভাব খাহার চিত্তকন্দরে বহিতে থাকে, তিনিই বিশুদ্ধ ভক্ত, তিনিই অভিমানশূন্য নিতাইচাঁদের রূপা-কৌমুদী-কণা-স্নাত! মনুষ্য মাত্রের জন্যই এইটি পরমাদর্শ থাকিল। ভক্ত হও বা অভক্ত হও, সকলেরই জীবনের উচ্চতম লক্ষ্য এক সাধারণ।

\* \* \* \* \*

জাতিভেদ, বর্ণভেদ দেহের মাত্র; উহা গুণবিক্রীড়িত গুণাবিক্রিয়া। কিন্তু নিগুণ ভক্তিদ্বারা অন্তর্কর্ষিতশোচ সাধিত হইলে, তাহার জাতিত্ব থাকে না। ভক্তসব ভক্তিগুণে একবস্ত সুতরাং ভক্ত এক অভিনব বিশিষ্ট জাতি। ভক্তের জাতিভেদ, জাতিবুদ্ধি নাই পূর্কেই বলা হইয়াছে। বধায় জলপ্লাবনে যেমন পবিত্র অপবিত্র সব জলাশয় এক হয়, ভক্তির প্রবাহেও তাহাই ঘটে, উত্তমাদম, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, একসম হইয়া যায়। কীর্তনস্থলী ভাবময় হইলে, কে কাহার পদগুলি তুলিয়া অঙ্গে মাখে, মস্তকে দেয়, ঠিক নাই। ব্রাহ্মণও চাণ্ডেলর পদরজঃ গ্রহণে কৃতার্থ হয়। ব্রাহ্মণ জাতিগুণে শ্রেষ্ঠ হইয়াও, অপর কোনও অপার্থিব দৈববস্তুর অভাবে চণ্ডেলের নিকট হীন হইয়া পড়িল। এই দুর্ভব বস্তুই বস্তুত মানবেন্দ্র গুরুত্বের ও শ্রেষ্ঠত্বের হেতু। এখন উহার স্থায়িত্বাবচ্ছু চিত্তে ভাবিয়া লউন্। এখন ব্রাহ্মণও দাস হইয়া কৃতার্থ হইলেন। সুতরাং এই দাস্ত্যভাব ব্রাহ্মণেরও উপরে।

দাস্ত্যজ্ঞানযুক্ত ভক্তির উত্তরোত্তর বিকাশে ভুবভক্তি মধুরে পরিণত হয়। দাস্য-তরুর মুকুল, ফুল, ফল সখ্যবাসল্যকান্ত। যে ভক্ত এতদূর উঠিয়াছেন তিনি বৈষ্ণব, তিনি দাস জ্ঞানের পুরিত মধুররসাস্বাদ করিয়া মত্ত থাকেন। দাস্ত্য যেন ঠিক চকোরের সুধাপান। হে "প্রভু! তুমি চন্দ্র, আমি চকোর" এই সম্বন্ধটাই দাস্ত্য। যাহার চিত্ত সমস্ত দাস্ত্যময় বিনীতভাবে পূর্ণ ও নত তাহারই জীবন সফল। প্রভুগো? কবে সর্কজীবনের দাস হইতে পারিব, তাহাদের সেবা ও হিতে রত থাকিব কবে ব্রাহ্মণের ও ভগবদ্ভক্তের দাস হইয়া শ্রীভগবদ্ব্যস্তে প্রলীক হইব?

শ্রীকালীহর দাস বহু।

# দম্পতী দর্পণ ।

( পূর্বপ্রকাশিতের পর । )

—:০:—

( ৪ )

শুক্লিঃ শুকং শাক্যালিং বিশ্বরূপং সুবর্ণ বর্ণং হরুতং হুচক্রং ।  
আরোহ সূর্য্যেহমৃতম্ নাভিং স্ত্রোণং পত্যে বহন্তং কণ্ঠম্ ॥

হে সূর্য্যে ! (বধু) পতির প্রতি প্রসন্না হইয়া পতিকে সুখী কর, সূর্য্যের পত্নী যেমন সূর্য্যের সহিত রথে আরোহণ করে তুমিও সেইরূপ সুপবিত্র সুবর্ণ বর্ণ পলাস পুষ্পাত নানাবর্ণে চিত্রিত অমৃতের উৎপত্তি স্থান সরপ রথে আরোহণ কর অর্থাৎ এই সংসার চক্রে ধর্ম্মরথে আরোহণ করিয়া পতির সহিত চিরকাল সুখে বিচরণ কর ।

চতুষ্পথ আক্রমণের মন্ত্র—

মাবিদন্ পরিপহিনো য আমীদন্তি দম্পতী ।  
সুগেভি হুর্গমতীতামপযাস্তুরাতয়ঃ ।

হে পথসকল ! তোমরা আমাদের সুগম্য হও, আমরা দম্পতী ( স্বামী স্ত্রী ) যখন গমন করিব তখন কোন রকম বিঘ্নকারী চোর সকল যেন জানিতে পারে না, যাহারা অবরোধ করে, যাহারা বন্ধন করে ও যাহারা ধনাদি হরণ করে এবং যাহারা প্রাণ নাশ করে সেই সকল অরাতির দূরে পলায়ন করুক, আমরা হুর্গম পথ সুখে চলিয়া যাই ॥

পরে-বধু ও জামতা অগ্নিকে সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞানে উভয়ের কল্যাণের নিমিত্ত প্রার্থনা করত আছতি দিবে ।

ইহধৃতিঃ স্বাহা । ইহ স্বধৃতিঃ স্বাহা ।  
ইহন্নতিঃ স্বাহা । ইহন্নমঃ স্বাহা ।

ময়ি ধৃতিঃ স্বাহা । ময়ি স্বধৃতিঃ স্বাহা ।

ময়ি রমঃ স্বাহা । ময়ি রমস্ব স্বাহা ।

হে অয়ি ! তুমি প্রত্যক্ষ দেবতা এই বধূকে আশীর্বাদ কর, যেন এই আমার বংশে ও আমার পরিজন বর্গের প্রতি ইহার ধৃতি (ধারণা) আত্মীয় বোধ হয়, ইহার আত্মীয়গণও যেন আমাদিগের প্রতি আত্মীয়তা করে। ইহার এই সংসার যেন সুখ প্রদ হয়, এই বধু যেন এই সংসারে প্রীতিলাভ করে। আমার প্রতি যেন ইহার ধৃতি হয়। আমার প্রতি ইহার বন্ধুগণের যেন প্রীতি থাকে। আমার দ্বারা যেন এই বধু শান্তি পায় আমাতে যেন ইহার প্রীতি থাকে।

অর্থাৎ হে বধু ! তুমি আমার আত্মীয়কে আপন জন, আমার গৃহকে আপন গৃহ মনে করিও তোমার আত্মীয়গণ যেন আমার আত্মীয় হয়, আমার আত্মীয়গণ তোমার আত্মীয় হউক, তুমি আমাতে প্রসন্না থাক, আমিও যেন তোমাকে লইয়া প্রীতি লাভ করি।

হে সুশীলা ! এইরূপ অনুষ্ঠানের পর জামাতা বধূকে বামে লইয়া কুশপুষ্প সমর্পিত জলপাত্র দক্ষিণে রাখিয়া শিখিনামক অগ্নিকে অর্চনা করিয়া অগ্নিতে আছতি দিবে। আছতির মন্ত্র এই :—

অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ।

ব্রাহ্মণস্তানাথকামাউপধাবামি যাস্তাঃ পাপীলক্ষ্মীস্তামম্মা অপজহি স্বাহা ।

হে অগ্নে ! তুমি প্রায়শ্চিত্তে অর্থাৎ দোষ হরণ বিষয়ে দেবগণের দোষ নাশক শক্তি সম্পন্ন, অতএব আমি ব্রাহ্মণ তোমার নিকট প্রার্থনা করি, এই স্ত্রীর যে কিছু পাপ চিহ্ন আছে তুমি তাহা হরণ কর। এই স্ত্রীর অন্তরে পবিত্র ভাব ও বাহিরে পবিত্র ভেঙ্গঃসম্পন্ন শ্রী প্রদান কর। ইহার পাপ নাশ কর। ১।

বায়ো প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তি রসি ব্রাহ্মণস্তা

নুাথকামা উপধাবামি যাস্তাঃ পতিদ্বীতনুস্তামম্মা অপজহি স্বাহা । ২।

হে বায়ো ! পাপ নাশ বিষয়ে তুমি ইন্দ্রাদি দেবগণের মধ্যে শক্তি সম্পন্ন দোষহারী, অতএব আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি, এই স্ত্রীর পতি

নাশক যে কিছু মন্দ রেখা ও লক্ষণ আছে তাহা দূর করত ইহাকে সৌভাগ্য শালিনী কর। ২।

চন্দ্র প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি

ব্রাহ্মণস্তানাথকামা উপধাবামি যাত্নাঃ অপূত্রাতনুস্তামশ্চা অপজাহি স্বাহা। ৩।

হে চন্দ্র ! তুমি পাপ নাশ বিষয়ে দেবগণের অনুমোদিত পাপ হস্তা, অতএব আমি ব্রাহ্মণ তোমার নিকট প্রার্থনা করি এই স্ত্রীর অপুত্রক বা পুত্রহাতক যে সকল চিহ্ন ও পাপ আছে তাহা দূর কর আর আশীর্বাদ কর যেন এই স্ত্রী সং পুত্রবতী হইয়া ভাগ্য শালিনী হয়।

সূর্য্য প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি

ব্রাহ্মণস্তানাথকাম উপধাবামি যাস্যা অপশব্যা

তনুস্তামশ্চা অপজাহি স্বাহা। ৪।

হে সূর্য্য ! আপনি সর্ক পাপ প্রণাশক, দেবগণেরও দোষ নাশ করিতে আপনি সমর্থ অতএব আমি ব্রাহ্মণ আপনার নিকট প্রার্থনা করি আপনি এই স্ত্রীর পশু নাশক যে সকল অশুভ চিহ্ন আছে তাহা নাশ করত ইহাকে পবিত্র করুন। ৪।

অগ্নি-বায়ু চন্দ্র সূর্য্যঃ প্রায়শ্চিত্তয়ো যুয়ং দেবানাং

প্রায়শ্চিত্তয়ঃ স্থ ব্রাহ্মণো বোনাথকাম উপধাবামি

যাস্যাঃ পাপীলক্ষ্মীর্ষা পতিব্লীষা অপূত্র্যা যা অপশব্যা

,তনুস্তামস্যা অপহত স্বাহা। ৫।

হে অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য ! তোমরা অতি পবিত্র, তোমরা সর্কপাপপ্রণাশক দেবগণেরও অশুভ নাশ করিতে তোমরা যোগ্য, অতএব আমি তোমাদিগের নিকট এই স্ত্রীর মঙ্গলার্থ প্রার্থনা করি তোমরা ইহাকে আশীর্বাদ কর ইহার পতি পুত্র ও পবিত্র পশুর হানি কারক যে সকল অশুভ চিহ্ন বা ছুরাদৃষ্ট আছে তাহা নাশ কর।

(এই মন্ত্র কয়েকটা দ্বারা চারিবার আহুতি করিলেই বিংশতি আহুতি হইবে।)

এইরূপ হোম করত পত্নীর শুভ প্রার্থনা করিয়া জামাতা বধুর প্রতি সন্তোষ দৃষ্টি করিবে এবং আচার বশত কপালে ও মস্তকে সিন্দুর প্রভৃতি দিয়া গুরুজনকে প্রণাম পূর্বক বধুর সহিত গৃহে গমন করিবে ।

সুশীলা ! এইবার ভাবিয়া দেখ বিবাহ সংস্কার কত কঠিন এবং ইহার মধ্যে কিরূপ শুভ বাসনা রহিয়াছে। যে কোন প্রকারে স্ত্রী পুরুষ মিলিত হইলেই বিবাহ হয় না, রীতিমত সংস্কার হওয়া চাই। প্রকৃত সংস্কার হয় না বলিয়াই যে বহু সংসারী প্রকৃত সুখ লাভে বঞ্চিত থাকে তাহা আমি বিশ্বাসের সহিত বলিতে পারি।

সুশীলা ! ভগবৎ রূপায় আমায় এই সকল তত্ত্ব জানা হইল এইবার বুঝিলাম দ্বন্দ্বী স্ত্রী সম্বন্ধ কত গুরুতর আমারও এখন বিশ্বাস হইল যে, মানুষ না বুঝিয়াই পাপ কর্মে রত হয়। প্রথম হইতে যদি এইরূপে পবিত্র ভাবে স্ত্রী পুরুষের মিলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিয়া লয়, তবে সর্কর্দাই শুভ বাসনা হৃদয়ে উদ্ভিত হয়, না বুঝিয়াই পাপ পঙ্কে নিমগ্ন হয়। আমার মনে হইতেছে আমাকে সুখী করিবার মানসে যে সকল যুবতীরা এখানে আসিয়াছিল তাহারা যদি থাকিত, তবে আমাদের এই আলোচনা হইতে তাহাদের হৃদয়েও একটা পবিত্র ভাব লাভ করিতে পারিত, সুধু তাহারা কেন, আমি যদি আমার মাকে এখানে ডাকিতাম, তবে মাও এই সকল মন্ত্রের অর্থ শুনিয়া সুখ পাইতেন। হায় ! হায় ! যুবা যুবতী না জানিয়া দুখা অমোদ ও দুখা কথা অমৃত বোধে হৃদয়ে পোষণ করে! প্রত্যেক কর্মে যে জ্ঞান দ্বারা পরমানন্দ লাভের সম্ভবনা আছে, তাহা অনেকে ভাবেনা। এইরূপ বলিতে বলিতে সুশীলা যোগ্য পতি পাইয়াছেন বলিয়া যে আন্তরিক আনন্দ ভাব তাহা মুখের ভাবে প্রকাশ করত পতির প্রতি ভক্তি ভাবে দৃষ্টি করিলেন, প্রবেশও সুশীলার সুবুদ্ধি ও শান্ত স্বভাবের পরিচয় পাইয়া অন্তরে অভিশয় আনন্দ লাভ করত পরমেশ্বরের রূপার জয় দিয়া বলিলেন।

প্রবেশ। সুশীলা ! আর রাত্র নাই, তোমাদের দেশে বিবাহের রাত্রে নিদ্রা করিতে নাই, আবার প্রাতে কতকগুলি স্ত্রী আচার আছে সুতরাং তোমার মাকে বা অম্ম যে কেহ তোমাদের গৃহকর্ত্রী থাকে তাহাকে এখন অম্মাদের কি আচারে থাকিতে হইবে তাহা বলিতে বল তত্ত্ব জানিয়া নিজের কর্তব্যের হানি না হয় এরূপ ভাবে দেশাচার স্ত্রী আচার ও লোকাচার প্রতিপালন করিতে আমার



কোন আপত্তি নাই। তুমি কতকটা তত্ত্ব বুঝিতে পারিয়াছ, আজ আর অধিক বলার প্রয়োজন নাই, এক্ষণে স্ত্রী আচার প্রতিপালন করিতে পারি, আবার প্রত্যুষে আমি স্নান ও প্রাতঃসন্ধ্যাদি করিতে যাইব। স্ত্রী আচারের অনুরোধে আমি প্রাতঃক্রিয়ার বাধা করিতে পারিব না। তোমাকে বলিবার ও বুঝাইবার অনেক আছে, এখন অনেকদিন সে সব বুঝাইতে হইবে, গ্রামাভাবশ্লভ লজ্জার ভান করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে বিমুগ্ধ হইও না, ইহাই আমার বিশেষ কথা। প্রবোধের এই কথা শুনিয়া সুশীলা দ্বার দেশে যাইয়া দিদিমা, দিদিমা বলিয়া যেমন ডাকিল অমনি দিদিমা আসিলেন, দিদিমাকে সকল বলিল। স্ত্রীগণ তখন ক্রমে ক্রমে আমিরা সেই রাত্রির করণীয় কাৰ্য্য দেশাচার মতে যাহা করা উচিত তাহা সম্পন্ন করিতে লাগিল; প্রবোধ চন্দ্র ও ধর্ম্মের অবিরোধী ভাবে যাহা যাহা তাহারা বলিতে লাগিল তাহা প্রসন্নবদনে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে যথাসম্ভব স্বীজাতিকে লক্ষ্য করিয়া মহূপদেশ দিতেও বাধা করিলেন না, তখন সকলেই প্রবোধের প্রতি মন্থিত হইল। এইরূপে প্রাতঃকাল হইল প্রবোধ গুরুজনকে প্রণাম করিয়া প্রাতঃস্নানে বহির্গত হইলেন।

এদিকে প্রবোধ যেমন চলিয়া গেলেন যুবতী ও বৃদ্ধা গমনীয় সুশীলাকে কেহ বা ব্যঙ্গচ্ছলে কেহ বা ভালবাসিয়া বলিতে লাগিল "বেশ সুশীলা নিজে যেমন পণ্ডিতা, বরও তেমন পণ্ডিত হইয়াছে। হাঁপা! রাত্রে ঘুম না চক্ষা হইল, বিচারে তুমি হারিলে না বর হারিল? আমরা প্রায় এক বৎসর পরের সহিত কথা বলিতে সাহস পাই নাই, তুমি বিবাহের রাত্রেই বিচার হারত্ব করিয়া দিলে; ভাল ভাল! তোমাদের দেখিয়া অনেকে শিথিবে" এইরূপে স্ত্রীগণ নানা কথায় সম্বলিত করিতে লাগিল, সুশীলা সহাত্ব বদনে সকলের কথায় সাধারণ শুনিতে লাগিল, পরের বিদ্রূপবাক্যে সুশীলার মনে কোন রকম বিবিকিত ভাব আসিল না, বৃদ্ধারা বলিলেন, ওগো! তখনকার আমরা এক রকম ছিলাম, এখন আর এক রকম সমাজ হইয়াছে, তা বেশ বরটী ভালই হইয়াছে, উভয়ে স্থখে দুঃখের করিয়া শাস্তি লাভ করুক আশীর্ব্বাদ করি।

প্রিয় পাঠক পাঠিকগণ! এখানে আমাদের বক্তব্য এই যে, সমাজের বর্তমান অবস্থার উপর নির্ভর করিয়া প্রবোধ ও সুশীলার এই আলোচনাতে বিশেষত

বিবাহ-রাত্রেই নব বিবাহিতা বধূ স্বামীর নিকট বিবাহের মন্ত্রার্থ শ্রবণ কামনা অস্বাভাবিক কিন্মা অতি রঞ্জিত বলিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পেরেন, এবিষয়ে অধিক কথা বলিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিব না; কেবল মাত্র প্রবোধ ও সুশীলার তত্ত্ব আলোচনার হেতুভূত হই একটী কারণ দেখাইব।

প্রথমতঃ আর্ধ্যসন্তানের সরল প্রাণে বিবাহের সময়েই যে বর ও কস্তার কথোপকথন হওয়া উচিত, এবিষয়ে পূর্বকথিত মন্ত্রই প্রধান প্রমাণ। অনেক মন্ত্রে দেখা যায় যে, পতি পত্নীকে ও পত্নী পতিকে সম্বোধন করিয়া ও পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রকৃত্ত ভাবে শুভদৃষ্টি করিয়া মন্ত্র পাঠ করিবে। পূর্বে শুনিয়াছেন পত্নী নিজের নাম উচ্চারণ করিয়া প্রণাম করিবে। এবিষয়ে যেমন মন্ত্রার্থ প্রমাণ, তেমন—অদ্বিক্ষিও অনন্যসা, কর্দম ও দেবহৃতি, শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণগী, সুভদ্রা ও অর্জুন, নল ও দময়ন্তী, শ্রীরাম ও সীতা, বসুদেব ও দেবকী, সাবিত্রী ও সত্যবান ইত্যাদি অসংখ্য দৃষ্টান্ত আর্ধ্যশাস্ত্রে প্রমাণরূপে বিরাজ করিতেছে। দ্বিতীয় কারণ, সুশীলার পিতা সুপণ্ডিত, সুশীলা পিতার অতি মেহে প্রতিপালিতা একমাত্র কন্যা সম্ভতি, সাধারণের বিবাহের পূর্বে যতদূর সুশিক্ষালাভ করা সম্ভব, সুশীলা পিতার যত্নে তদপেক্ষা অনেক বেশী শিখিয়াছে। তৃতীয়ত অতিশুশিক্ষিত মহাতেজস্বী প্রবোধ যখন সুশীলাকে লজ্জা পরিহার পূর্বক মনের কথা বলিতে বিশেষ রূপে আদেশ করত বিবাহিত নরনারীর কতব্য সম্পক্ষে অতি সুললিত ভাষায় ভাবোদ্দীপক বক্তৃতা করিয়া তত্ত্ব আলোচনা না করিলে তাহার সহিত মিলিত হইয়া শান্তিলাভ করিতে পারিবে না, ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন তখন ভয়ে, আগ্রহে, এবং নিজের প্রার্থনীয় শান্তি সংরক্ষণের কামনায় সুশীলার স্বামীর সহিত কথোপকথন করা কোন রকমেই অস্বাভাবিক বা অতি রঞ্জিত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে ভয়ি, ভ্রাতৃবধু প্রভৃতির প্রেরণায় বাসর গৃহে যদি নব বিবাহিতা কন্যার গান করা এবং পতির নিকট টাকা চাহিয়া লওয়া পাঠক পাঠিকাগণের শিলাস যোগ্য হইতে পারে, তবে সুনির্মল শাস্ত্রোক্ত ধর্ম রক্ষার নিমিত্ত শাস্ত্র বাক্য শ্রবণের ইচ্ছা প্রকাশ করা কোন রকমেই অসম্ভব হইতে পারে না, অধিকতর কেবল স্ত্রী-আচার পরায়ণ তত্ত্ব জ্ঞানহীন সমাজ ভিন্ন সকল সমাজেই বিবাহ রাত্রে কথোপকথন প্রথা বিশেষরূপে প্রচলিত দেখা যায়। পরস্পর বাক্যালাপ না করিয়া অতিশয় লজ্জা

প্রকাশ করাই ধর্ম্য ধর্ম, এবিষয়ে আস্ত অধিক কথা না বলিয়া মন্ত্রার্থ শ্রবণের পর প্রবোধ ও হুশীলা কি করিল সেই প্রস্তাবিত বিষয় আলোচনা করা যাউক।

প্রবোধ অক্ষয়দয় কালে বাহিরে গিয়া শৌচাদি কর্ম সমাপন করিয়া প্রাতঃস্নানে গমন করিলেন, গন্ত রাত্রের ব্যবহারে এবং প্রবোধের শান্ত স্বভাব ও অসাধারণ পাণ্ডিত্যে দেশের যুবা যুবতী ও বৃদ্ধ বৃদ্ধা সকলেরই কি যেন একটা চমক ভাবিয়া গিয়াছে। ধর্ম্য ভাবোদ্দীপক মূল্যবান ও সতেজ বাক্যে সকলেই আপন আপন ব্যবহারের বিষয় ভাবিয়া অনুতাপ করিতে লাগিল, প্রবোধের কার্যে বাধা দেওয়া দূরে থাকুক, বরং সহায়তা করিয়া সংশ্লিষ্ট লাভের প্রত্যাশা অনেকের বলবতী হইতে লাগিল, সকলের মুখে জামাতার প্রশংসা শুনিয়া হুশীলার মাতা ও পিতা অতিশয় আনন্দ লাভ করিতে লাগিলেন, সমাগত নরনারী যতই প্রবোধকে প্রশংসা করিতে লাগিল যতই প্রবোধের রূপ ও গুণের আলোচনা করিতে লাগিল এবং যতই উপযুক্ত পাত্র হুশীলাকে সম্প্রদান করার নিমিত্ত হুশীলার পিতাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল ততই তাঁহারা আনন্দে বিশ্ববিদ্যার নিকট কন্যা ও জামাতার কল্যাণ কামনা করিতে লাগিলেন। এদিকে যাহারা আপন আপন কচি অনুসারে অসম্মত প্রমোদ করিতে না পারিয়া রাত্রে জামাতাকে পাপল বলিয়াছিল, তাহারী অতিশয় লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া নিঃশব্দে রহিল। সহর অঞ্চল অপেক্ষা পল্লীগ্রামের লোকের ধর্ম্য প্রবৃত্তির ও সংকথা ভাবে প্রবৃত্তি অনেকটা বেশী, বিশেষত পল্লীগ্রাম বাসিন্দাদের সময়ও যথেষ্ট হুতরাং দেখিতে দেখিতে অনেক লোক পণ্ডিতের বাড়ী উপস্থিত হইল। ( হুশীলার পিতার নাম জ্ঞানেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ, দেশের লোক তাঁহাকে ষাণ্ডিতমহাশয় বলিয়াই ডাকে) এদিকে প্রবোধচন্দ্র প্রাতঃস্নান সমাপন করত পবিত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া দেব মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, প্রবোধ প্রথমে আসনে বসিয়া আচমন করিয়া পদ্মাসনে বসিলেন, কিছুক্ষণ ধ্যান-যোগ, পরে প্রার্থনায় তাহার পর ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া নিজের প্রকৃতিগত স্তম্ভের প্রার্থনা ও স্তব্ধাধি পাঠ করিয়া প্রকৃত্ত ভাবে দেবমন্দির হইতে বাহিরে আসিলেন। বাহিরে আসিবামাত্র বহু শিক্ষিত সজ্জন তাহার নিকটে আসিলেন, প্রবোধ সকলকেই যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া শিষ্ট ব্যবহারানুযায়ী নাম গোত্রাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তখন সকলের মনিস্বীকৃত অনুরোধে ইচ্ছা না থাকিলেও মধ্য

স্থানে অপেক্ষাকৃত উচ্চ ও পবিত্র আমনে প্রবোধ উপবেশম করিয়া প্রশান্তবদনে বলিতেলাগিলেন :—

প্রবোধ । মহাশয় আমি এক রকম বাল্য জীবন হইতেই মহাত্মা পণ্ডিতগণের নিকট ছিলাম, সংপ্রতি নিজদেশে আসিয়াছি সামাজিক ব্যবহারে আমি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ সুতরাং কেবল শাস্ত্রগ্রন্থে যাহা আলোচনা করিয়াছি তাহা ভিন্ন সামাজিক রীতি নীতি আমি কিছুই জানিনা, গত দিবস হইতে এ পধ্যস্ত কোনরূপ আপনাদের মনঃপীড়া দায়ক ব্যবহার করিনি তো ? তবে খুব সম্ভব দেশাচার ও স্ত্রীআচারের পক্ষপাতী না হইয়া আমার কতব্যবোধে আমি যাহা যাহা করিয়াছি ও বলিয়াছি তাহাতে অনেকে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, এবিষয়ে আমাকে ক্ষমা করিতে হইবে, কারণ যাহাতে আমার ধর্ম পথে চলিবার বাধা হয় এবং যাহা যুক্তি ও শাস্ত্র বিরুদ্ধ সোবিধে আমি দেশাচারের পক্ষপাতী হইতে পারিব না, এবং ধর্ম ছাড়িয়া বাহিক আচারে মত্ত হওয়া উচিত বলিয়াও মনে করি না, আর যে বিষয়ে শাস্ত্র যুক্তি ও নিজের ধর্মের কোনরূপ হানি না হয় অথচ বহুলোকের সন্তোষ ও আনন্দ হয় সে বিষয় আমি সকলের সহিত একমত হইতে পারি । ধর্মই আমার প্রকৃত বন্ধু, ধর্মই আমার একমাত্র সুখের নিদান, ধর্মই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক সুতরাং ক্ষণিক আমোদের জন্ত সেই চিরসুখের হেতুভূত যে ধর্ম তাহা নষ্ট করিতে পারিব না, আপনারা সম্ভ্রাত ও আমার পূজ্য, আধক বলা আমার ধুঁটতা; তবে এইমাত্র বলি যে, আর্থ্য সম্বন্ধে যাহা যাহা কতব্য তাহা না করিয়াই যে আর্থ্য সম্বন্ধে দুর্বল চঞ্চল ও সন্দেহা দুঃখিত তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । এখন আমাদের ইহাই বিশেষ দুঃখের কারণ হইয়াছে যে, আমরা আমাদের প্রকৃত যাহা কতব্য তাহা বুঝি না বা বুঝিতে চেষ্টা করি না, না বুঝিয়া কতব্য ভ্রষ্ট হইয়া ক্ষীণমস্তিষ্ক ও হীনবীর্ঘ্য হইয়াছি, এখনও যে টুকু আছে তাহাও যদি আমরা পূর্বতন ঋষিদের আচরণীয় আচার ব্যবহারের অনুসরণ না করি তবে এক্ষণেই মানুষ ন্যামধারী পশুও নিকৃষ্ট জীববিশেষ হইয়া যাইবে । আমরা যদি এক্ষণে আমাদের আর্হাণে বিহারে ও ব্যবহারে পূর্বতন আর্থ্য ঋষিগণের আচরণ ও অনুমতির অনুসরণ করিয়া চলি তবে আবার সেই নিশ্চিন্ত আনন্দ, নিকৃষ্টচিত্ত এবং শারীরিক ও মানসিক সত্ত্বগুণময় বলবীর্ঘ্য লাভ করিয়া সুখী হইতে পারিবা

আমি শারীরিক মঙ্গলকেই প্রকৃত মঙ্গল বলি না, মানসিক মঙ্গল মানসিক বল মানসিক পবিত্রতা না হইলে স্থূলশারীরিক মঙ্গল কেবল পর পীড়নে এবং অযথা ভোগেই পর্য্যবসিত হয়। মনকে উন্নত করিয়া শারীরিক উন্নতি করিতে পারিলে প্রত্যেক কার্য হইতে বিপ্ননিয়ন্তার মঙ্গলময় ভাব অনুভব করত শান্তি পাইতে পারি। অনেকে মনুষ্যজীবনের যথার্থ কি লক্ষ্য তাহাই বোঝে না, আবার কেহ কেহ যদিও কিছু কিছু বোঝে তাহা কেবল বাহ্যিক আড়ম্বরেই পরিণত হয়, প্রতিক্ষণই বাহ্যিক সুখের অনিত্যতা উপলক্ষি করিতে পারিলেও সংস্কারের অভাবে অন্তঃকরণ সংযত না হওয়ায় ঐ অনিত্যতা ধারণা করিতে পারে না, অনিত্য বস্তু ও অনিত্য ভোগ সুখকে নিত্য জ্ঞানে আশ্রয় করিয়াই আমরা নিত্য সুখ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছি। আশা করি যতক্ষণ আপনাদের নিকট থাকিব ততক্ষণ সদালোচনা দ্বারা আপনারা ও সময়ের সার্থকতা সম্পাদন করিবেন আমিও আপনাদের সঙ্গগুণে সুখী হইব।

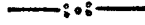
প্রবোধের বিনয় নম্র ব্যবহারে ও যুক্তি যুক্ত বাক্যে আর কাহারও কোনরূপ অভিমান রহিল না। কতকগুলি বৃদ্ধলোক আছেন যাহারা নাটী জামাই প্রভৃতির সহিত ভুল্লীল ভাষার প্রয়োগ করিয়া তামাসার ছলে অতি জঘন্য আলাপ ব্যবহারে সময় নষ্ট করেন তাহারাও আর দিক্‌ক্তি না করিয়া প্রবোধের তেজস্বিতা ও বাগ্মিতার প্রশংসাকরিতে লাগিলেন। যাহারা যুবা ও প্রৌঢ় স্ততরাং কুসংস্কারে একেবারে চিত্ত ক্লুষিত হয় নাই তাহারা অতি আগ্রহের সহিত বলিতে লাগিল, মহাশয় সংক্ষেপে যদি আমাদের (গৃহস্থের) নিত্য কর্তব্য কার্য গুলির বিষয় কিছু উপদেশ দেন তবে আমরা বিশেষ উপকৃত হই। কেবল আমরা নয় ইচ্ছা করি যে, আমাদের পরিজনবর্গকেও ঐ সকল সহপদেশ শ্রবণ করাই; অদ্য এ বিষয়ে বিশেষ সুযোগও হইয়াছে কারণ আপনারা বিবাহোপলক্ষে অদ্য দেশের সকলেরই এখানে নিমন্ত্রণ স্ততরাং নান আত্মিক সমাপ্ত করিয়া সকলেই একত্রে মিলিত হইতে পারিবে এদিকে আপনারাও বিবাহ সংস্কারে আনুসঙ্গিক যাহা একান্ত করণীয় তাহা সম্পন্ন হউক আমরা সকলে মিলিত হইতে যত্ন করি। এই বলিয়া সকলে চলিয়া গেল, প্রবোধও সকলের যত্নে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ক্রমশঃ

দীনবন্ধু বেদান্তরত্ন।

## সংপ্রসঙ্গ ।

( পূর্ব প্রকাশিতের পর । )



চ। তুমি বলিলে যে সংসারে যাহার সহিত যে ভাবের আকর্ষণ অধিক সেই বহিমুখীন আকর্ষণ অন্তঃমুখে চালনা করিয়া ও তাহার বাহ্য রূপের ছাঁচে জ্যোতির্ময় চৈতন্য সত্ত্বাকে চালিয়া ভগবদ্বুদ্ধিতে সেই রূপের চিন্তা করিলে প্রেমোদয় হয় এবং এই প্রেমের উদয়ে শ্রীভগবানকে প্রত্যক্ষ্য ও আধিক্যে লাভ করা যায়, কিন্তু গতকল্য আমি তোমার উপদেশ মত ধ্যান করিয়াছিলাম, ফলে বাহিরে যাহাদের মুখ সর্কদা দেখি, অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহাদের মুখ ঠিক ঠিক মনে আনিতে পারিলাম না। এখন কথা হইতেতেছে এই যে, যদি কিছু দিন চেষ্টা করিয়া মনে আনিতে পারি তাহা হইলেই বা তৃপ্তি হইবে কিরূপে ? চাক্ষুষ দর্শনের স্থায় চক্ষু মুদিয়া শ্রীভগবানের জ্যোতির্ময় রূপ দেখিতে না পাইলে কি দর্শনের অনন্দ পাওয়া যায় ? কিন্তু চক্ষু মুদিলে অঙ্গকার ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাই না এবং দেখিবার সম্ভব আছে বলিয়া বোধ হয় না, যদি থাকে তবে তাহার উপায় বলিয়া দাও।

র। হৃৎ পান করিলে দেহ পুষ্ট হয় ; কিন্তু এক দিন একটু খাইয়াই কি তুমি পুষ্ট হইবার আশা করিতে পার ? হায় শিক্ষার অভাবে সংসার পরিবর্তিত হওয়ায় আজ ভারত সন্তানের মুখে এরূপ হাস্যকর প্রশ্ন শুনিতে হইল ! এমনই দুদিন পড়িয়াছে যে, মরীচিকার স্থায় অনিত্য সুখের কথা আশায় লোকের ধৈর্য ধারণ পূর্বক নিবিষ্ট চিন্তে কার্য করিতে পারে, কিন্তু নিত্য সুখের নিশ্চিত আশায় চিন্তস্থির রাখা তাহাদের পক্ষে হরুহ বলিয়া বোধ হয়। ভাই ! বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি, যে সামান্ত একটা ভাষা শিক্ষা করিতে

---

\* পূর্ব মাসের লিখিত সংপ্রসঙ্গের সহিত এক যোগে পাঠ করিলে ভাল হয়।

কত দিন লাগে। অনিত্য সুখজনক অর্থোপার্জনের অনিশ্চিত আশায় “এটাস” পাশ দিবার জ্ঞান তুমি পাঁচ বৎসর অধ্যয়ন করিতে পার, কিন্তু নিত্যানন্দ জনক ভগবন্নাভের নিশ্চিত আশায় সকল বিজ্ঞান সার ব্রহ্মবিজ্ঞা লাভ করিবার জ্ঞান কি ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক সাধন করিতে পার না? সাধন মার্গে পদার্পণ করিতে না করিতে কি সিদ্ধি লাভ হয়? সংকল্প স্থির করিয়া প্রকৃত পথে কিছুদিন সাধন করিয়া দেখে দেখি যে, আনন্দের আভাস পাও কিনা, এবং সেই আভাসই তোমাকে সাধন মার্গে অগ্রসর হইতে উৎসাহ দেয় কিনা, ফলে এইরূপে কিছু দূর অগ্রসর হইলে যখন আনন্দ গর্ভ শান্তির অমিয় স্পর্শে ত্রিতাপ আবার উপশম হইতে থাকিবে তখন সংসারের কোন অনিত্য প্রলোভনই তোমাকে এই নিত্যানন্দের পথ হইতে বিচ্যুত করিতে সক্ষম হইবে না; তৃপ্তির আশ্বাদ পাওয়ার তুমি অবিজ্ঞা মায়া ভেদ করিয়া অনন্ত তৃপ্তির আনন্দ ময় রাজ্যাভিমুখে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইবে।

কিন্তু এই যে আনন্দের কথা বলিলাম তাহা সাধনের প্রথমাবস্থায় পাওয়া যায় না, বরং অনভ্যাস থাকার জ্ঞান একটু কষ্টকর বলিয়া বোধ হয় এবং এই জ্ঞানই শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন, “সর্কারস্তা হি দোষণে ধূমোদগ্নিরিবাবৃত্তা” অতএব অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে হইলে ধূমোদগ্নির জনিত কষ্ট সহ করার ছায় সাধনের প্রথমাবস্থায় একটু কষ্ট অনুভব করিলেও ইহার পরিণাম বড়ই উজ্জ্বল ও আনন্দময়; অথচ কোনরূপে এই প্রথমাবস্থায় পার হইয়া দ্বিতীয়াবস্থায় উন্নীত হইলে যখন লক্ষ্য স্থির হয় তখন এই কষ্ট আনন্দগর্ভ হওয়ায় ইহার বেগ প্রশমিত হইয়া যায়, অর্থাৎ গুণধনের স্থান নির্ণিত হইলে উহা বাহির করিবার জ্ঞান মৃত্তিকা ধননের পরিণামে যেমন আনন্দের সংযোগ থাকায় কষ্টের আধিক্য অনভূত হয় না সেইরূপ প্রকৃত লক্ষ্য স্থির হইয়া গেলে অর্থাৎ জ্ঞানলব্ধ হইলে, সাধন-অধ্যয়ের মধ্যে কেমন একটা অপার্থিব আনন্দের সত্তা জড়িত থাকায় আর কষ্টের বেগ অনুভূত হয় না, এই সময়ে সাধক অন্তর্দৃষ্টির অবস্থার যোগে ভোগানন্দ ও বহির্দৃষ্টির অবস্থার ভোগে যোগানন্দ অনুভব করিতে থাকেন, সুতরাং এই স্থায়ি ভাবে, দ্বারা তাঁহার কল্প মালিন্য বিনষ্ট হওয়ায় মোক্ষ প্রাপক ভাবদেহ গঠিত হইতে বিলম্ব হয় না।

ফলতঃ সাধনের প্রথমাবস্থায় ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্বক হৃদয়ময়ের প্রতীক্ষা করা উচিত আর তুমি যে বলিতেছ চক্ষু মুদিলে অন্ধকার দেখ, তাহা তোমার ভ্রম মাত্র জানিও, কেননা সাধন পথে অনেকটা অগ্রসর হইলে তবে চক্ষু মুদিলে অন্ধকার দেখা যায়, নতুবা বর্হিজগতের শত শত চিন্তা পৃক্ষীভূত হইয়া মনকে আবরিত করায় সে অন্ধকারও দেখিতে পায় না. কারণ সুলচক্ষু মুদ্রিত থাকায় মন এ সময়ে চক্ষুর চক্ষু বা অন্তঃচক্ষুর সাহায্যে দর্শন করে ; কিন্তু সুলচক্ষে-অবিরত জলের ঝাপটা দিলে যেমন তাহা অস্থির হইয়া দর্শন করিতে অক্ষম হয়, সেইরূপ বিষয় চিন্তার অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ যদি অন্তঃচক্ষুকে আহত করিয়া তাহাকে স্থির হইতে না দিল তবে দর্শন করিবে কে ? ফলে বর্হিবিষয়ের চিন্তা প্রবাহ হইতে মনকে রক্ষা করিয়া শ্রীভগবানের অব্যক্ত ভাব বোধে যদি এই অন্ধকারের একলক্ষ্যে মন-স্থির করিতে পার তাহা হইলে হৃদয় মগ্ন করিলে যেমন মাখনের অস্তিত্ব দেখা যায়, অথবা যত মাটি খনন করা যায় ততই যেমন জলের অস্তিত্ব অনুভব হয়, পরে খনন শেষ হইলে জল দেখা যায়, সেইরূপ অন্ধকারের যে লক্ষ্যে মনঃস্থির করিবে তাহা হইতে ক্রমশঃ বৃত্তাকারে আলোকের আভাস পাইবে এবং ঐ আভাসের লক্ষ্যে কিছু দিন মনকে একপ্রভাবে চালনা করিলে দেখিবে যে ঐ আলোক ক্রমে অস্পষ্ট হইতে স্পষ্ট হইয়া আসিতেছে, এইরূপে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্বক ধ্যান করিতে থাকিলে কিছু দিনের মধ্যে জ্যোতী দর্শন হইবে, ফলে ধ্যান যত তীব্র হইবে, সফলতা ততই নিকটবর্তী হইবে জানিও, যাহারা ভগবদর্শনের প্রয়াসী, মূর্ত্তিকারূপ উপাদান পাইলে প্রতিমা প্রস্তুত করার ন্যায় জ্যোতী দর্শন হইলে তাঁহাদের জ্যোতীষন ভগব মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিতে বিলম্ব হয় না।

ক্রমশঃ ।

শ্রীহরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ।



শ্রী শ্রীরাধারমণো জযতি ।

## ভক্তি ।

৯ম ও ১০ম সংখ্যা—৮ম বর্ষ ।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমপরূপিনী ।

ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্ত জীবনম্ ॥

## প্রার্থনা ।

•আশা পীড়য়তি নিত্যং অনিত্যার্থ জনাদিষু ।

•আশা ন জায়তে দেব কথং ত্বদ্ ভজনার্চনে ॥

কদাশা রহিতে চিন্তে দ্রুক্ষ্যামি ত্বাং কদাবিভো ।

কদা বা বাসনা হীনো ভবিষ্যামি রূপানিধে ॥

হে দেব! একমাত্র তুমিই নিত্য, তোমা ভিন্ন আর সকলই অনিত্য, ইহা বুঝিয়াই বুঝিতেছি না, সর্বদাই অনিত্য ধন, মান ও পরিজনাদির কামনা চিন্তকে ব্যাকুল করিতেছে। আশা মেটেনা, যতই ভোগ্য বস্তু পাইতেছি ততই আশার বৃদ্ধি হইয়া নিরন্তর মনকে চঞ্চল ও কামনাসক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে। অনিত্য বস্তুর প্রতি যেমন অনায়াসে মন ধাবিত হয়, বারণ মানে না, বা সংযম করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয়, তোমার অর্চনা, তোমার ভজনা ও তোমার বিষয় ভাবনায় কৈ সেরূপ চিন্ত যায় না কেন? বিশেষ যত্ন করিয়াও সর্বদা তোমাতে মনকে

সংযত রাখিতে পারি না, হায় হায় ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। নিত্য বস্ত্র ছাড়িয়া অনিত্যে মজিয়া আছি। হে রূপানিধে! রূপা কর, বাসনা অনল রূপা বারি সেচনে নিভাইয়া দাও, হে বিভো! বাসনা রহিত হৃদয়ে কত দিনে তোমার দিব্য মূর্তি দর্শন করিব, কত দিনে চক্ষু কর্ণের বিবাদ মিটিবে, কর্ণে যাহা শুনিয়াছি বাসনা রহিত হৃদয়ে কবে তাঁহা দর্শন করিয়া মনের সংশয় ও অনিত্যবস্তুর ভাবনা নিবৃত্তি করিব, কবে তোমার রূপায়, তোমার ভাবে প্রাণ মাতাইয়া সকল বাসনা হইতে মুক্তি লাভ করিব জানি না। শুভ আশা দাও, অনিত্য বস্তুর অনিত্য ভোগের আশা না করিয়া নিত্য বস্তুর আশায় প্রাণ মন শীতল করি, আশা দাও আকাজক্ষা দাও তোমায় ডাকিতে, তোমায় ভজিতে ও তোমায় পূজিতে প্রাণ যেন ব্যাকুল হয়, তোমার রূপাই তোমার ভাব পাইবার ও ছুরাশা নিবৃত্তি করিবার একমাত্র সম্বল বুঝিয়া তোমাকে ডাকিব, ভজিব ও ভাল বাসিব বলিয়া তোমারি নিকট ভাব ভিক্ষা করিতেছি, ভিক্ষুকের দোষের দিকে লক্ষ্য না করিয়া প্রার্থিত ভিক্ষা দানে আশা পূর্ণ কর। আশার পীড়নে প্রপীড়িত হইয়া আশাই প্রার্থনা করিতেছি, তোমার ভজনের আশা দাও। কণ্টকের দ্বারা যেমন কণ্টক তুলিয়া থাকে, কানে জল প্রবেশ করাইয়া যেমন কানের জল তুলিয়া শাস্তি লাভ করে আমিও সেইরূপ তোমার প্রেমের আশায়, তোমার দর্শনের আশায় এবং তোমার ভাবের আশায় অনিত্য ধনজনাদির কুংসিত আশা হৃদয় হইতে বাহির করিব, তাই বলি দেব! আশা নাশিতে আশা দাও।

শ্রীদীনবন্ধু বেদান্তরত্ন।

## দম্পতী দর্পণ ।

( পূর্বপ্রকাশিতের পর । )

( ৮ )

—:—

প্রবোধ বাড়ীর মধ্যে যাইয়া দেখেন বহু স্ত্রীলোক হুশীলাকে ঘিরিয়া বসিয়া কেবল প্রবোধের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। প্রবোধের প্রশান্ত মূর্তি ও সহাস্য বদনমণ্ডল হইতে স্বতই যেন ধর্ষের জ্যোতি বাহির হইতেছে।

প্রবোধ গুরু জনকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের যত্নে ও ইচ্ছায় শূশীলার দক্ষিণ পার্শ্বে বসিলেন, তখন স্ত্রীগণ যথা যোগ্য স্ত্রীআচার সমাধা করিলেন, মধ্যে মধ্যে ছুই একটা যুবতী ও বৃদ্ধা যে সকল পরিহাস বাক্য প্রয়োগ করিলেন প্রবোধ এমন অল্প কথায় তাহার উত্তর প্রদান করিলেন যে, তাহাদেরও আনন্দ হইল, আর অশ্রু স্ত্রীগণও সংশিক্ষা পাইল। প্রবোধের জ্ঞানগর্ভ উত্তরে সকলেই মুগ্ধ হইলেন, সকলেই এক বাক্যে প্রশংসা ও আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, আমরা রূপে, গুণে ও কথায় এমন সুপাত্র আর দেখি নাই, যেমনই শূশীলা পণ্ডিতের অতি আদরের এক মান কন্যা তেমনই বিধাতা জামাই মিলাইয়াছেন এ রূপ যোগ্য সমাগম প্রায় দেখা যায় না।

এইরূপ কথোপকথনের পর স্নান করাইবার উদ্যোগ হইল, স্ত্রীগণ হরিদ্রা মাখাইয়া বর কন্যাকে স্নান করাইলেন; পরে চারিদিকে প্রোথিত কদম্বী বৃক্ষের মধ্যে বর কন্যাকে শিলার উপরে বসাইয়া কৃত্রিম পুষ্করিণীর ভাবে চতুষ্কোণ পর্বে জনদিয়া তাহার মধ্যে অঙ্গুরীয়ক খেলা অর্থাৎ কখন বর ঐ জনে অঙ্গুরী লুকাইয়া রাখে কন্যা খুঁজিয়া বাহির করে, আবার কন্যা রাখে বর বাহির করে। (প্রায়ই কন্যার পক্ষ সমর্থন কারিণী কোন সুচতুরা যুবতীই কন্যার হাত ধরিয়া কার্য করায়) এইরূপে খেলা ও বরণ প্রভৃতি স্ত্রীআচার সমাপন হইলে বর কন্যাকে গৃহে লইয়া গেল, তথায় শয্যার উপর বসাইয়া স্ত্রীআচার ও নানাপ্রকার রহস্যলাপের পর মিস্ত্রী ভোজন করিতে দিল, প্রবোধ ইষ্টদেবকে অর্পণ করিয়া ভোজন করিতে বসিলেন। \*আজ আর প্রবোধ স্ত্রীআচারে কোনরূপ আপত্তি করিলেন না, কারণ তাহারি বিশ্বাস তত্ত্বজ্ঞানের পর রহস্যলাপে কোন ক্রটি হয় না। প্রবোধের বিশ্বাস, শূশীলা যখন বিবাহের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও লক্ষ্য বিষয়ে সঙ্গুদেশ পাইয়াছে, তখন আরা স্ত্রীআচারে বা পরিহাস শ্রিয়া স্ত্রীজাতির ঐক্যলাপে ও ব্যবহারে চিত্ত চঞ্চল হইবে না। তত্ত্বজ্ঞান না হওয়ার পূর্বে বিকারভাবোদ্দীপক কার্যই নর নারীকে বিকৃত করে, ভার্জিত বীজে যেমন অঙ্কুর হয় না সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানের মনে প্রলোভন জনিত চঞ্চলতা স্থান পায় না।

মিষ্ট দ্রব্যাদি দ্বারা প্রবোধ জল্পযোগ করিলেন, পরে সকলের সহিত সং ব্যবহারে সকলকে প্রদত্ত করিয়া বাহির বাটীতে গমন করিলেন।

প্রবোধের মুখে তত্ত্বকথা শুনিবার নিমিত্ত পূর্ব হইতেই বহু ভদ্রলোক বসিয়া ছিলেন, প্রবোধ যাওয়া মাত্র তাঁহারা বহু সম্মানের সহিত নিদিষ্ট আসনে প্রবোধকে বসাইলেন। পরস্পর দুই একটা কথার পরই সভ্যগণ পূর্ব প্রস্তাব স্বরণ করাইয়া প্রবোধকে গৃহস্থ আশ্রম সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় উপদেশ ও বিধিবাক্য বলিতে অনুরোধ করায় প্রবোধ বলিতে লাগিলেন।

প্রবোধ। মাননীয় মহোদয়গণ! আমাদের বর্তমান সামাজিক রীতি নীতির আলোচনা করিয়া এবং আপন আপন ব্যবহারের বিষয় পধ্যালোচনা করিয়া অনুতাপ করত যখন আপনারা আমাকে গৃহস্থের কর্তব্য সম্বন্ধে কিছু সহুপদেশ-দিতে অনুরোধ করিতেছেন, তখন আমি আশাকল্পি ধর্মের অনুভূলে যে সকল বাক্য ব্যবহার করিব তাহাতে কেহ ছুৎখ বা আমার ধুৎখতা মনে করিবেন না। দেখুন আমরা আলোচনার অভাবে যেমন কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়াছি; আবার যদি সং আলোচনার দ্বারা আপন কর্তব্যচ্যুতির বিষয় জানিয়া সংপথে চলিতে পারি অবশ্যই উন্নত হইতে পারিব। ক্রমিক সদাচারের অনুষ্ঠান করিলেই ধর্মের আলো জ্বলিবে, আলো জ্বলিলে যত কালের অন্ধকারই হউক না কেন তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইবেই হইবে। অনেক ব্রাহ্মণ সন্তান কর্ম দোষে শূদ্র প্রাপ্ত হইয়াছে। আপনারা শূদ্র ও ব্রাহ্মণকে কেবল জাতিতে না রাখিয়া গুণ গত করিয়া বিচার করত নিজেদের মধ্যে যে আচারের দোষে শূদ্র প্রবেশ করিয়া কর্তব্য কর্ম হইতে বিচ্যুত করিতেছে তাহা দূর করিবার মানসে বিশেষরূপে শাস্ত্রের আলোচনা করিবেন। সংস্কারের অভাবে দেহ, মন ও ইন্দ্রিয় তমোগুণ প্রধান হইয়া পাপাসক্ত হয়; আবার সংস্কারের প্রভাবেই দেহ মন ও ইন্দ্রিয় পবিত্র হয়। মনু বলিয়াছেন—

“জগনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারৈঃ দ্বিজ উচ্যতে।

বেদজ্ঞানাং ভবেৎ বিপ্রঃ ব্রহ্ম জ্ঞানান্তু ব্রাহ্মণঃ” ॥

অর্থাৎ কেবল মাত্র গর্ভ হইতে জন্ম হইলে মানব জ্ঞানের ও সংস্কারের অভাব বশত প্রথমে শূদ্রবৎ থাকে, সংস্কার হইলে কিছু সত্ত্বের উদয় হয় বলিয়া দ্বিজ প্রাপ্ত হয়, বাস্তবিক যখন সত্ত্ব গুণের উদয়ে জ্ঞানী হইয়া বিশ্বব্যাপী ভগবানের সর্বব্যাপী ধারণা করিতে পারে তখন তাহাকেই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বলে।

বেদ অর্থ বিশুদ্ধ জ্ঞান বা জ্ঞানময় শাস্ত্র, যে শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য পরমাত্মা ভগবান তাহা জানিলেই ভগবানকে জানা যায়। ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞান বিহীন মানবকে প্রকৃত জ্ঞানী বা ব্রাহ্মণ শব্দ দ্বারা অভিহিত করা যায় না। আমরা অনেকে ইচ্ছা করিয়া এমন অনেক অত্যাচার করি যাহাতে নিজের বন্ধু বান্ধবের কোনই উপকার হয় না, অধিকন্তু এক একটা কুসংস্কার রূপ ঝটিকা আসিয়া জ্ঞানের আলো নিভাইয়া দেয়। এরূপ কুসংস্কারের নিমিত্তই মন নিম্নদিকে ধাবিত ও অসংকর্মাঙ্গত হয়। ভালও করিব না, মন্দও করিব না, আমি যেমন আছি থাকিব ইহাও ভাল, কিন্তু ভাল যখন করিতে পারিতেছিলাম তখন মন্দটা শত প্রযত্নে করিতেই হইবে এরূপ জঘন্য ধারণা বা সংস্কার যে সমাজের ও আত্মার একান্ত অধঃপতনের মূল কারণ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বন্ধুর কর্ম বন্ধুর যাহাতে সুখ তাহা করা, অজ্ঞানী কুসংস্কারযুক্ত নর নারী তাহা না বুঝিয়া পাপ কর্ত্তে যেমন নিজেরা আসক্ত সেইরূপ পরকেও আসক্ত করিয়া বন্ধুতার পরিচয় দিতে যাইয়া বিশেষ অনিষ্টই করিয়া থাকে।

ভদ্র মহোদয়গণ! আপনারা সকলেই গৃহস্থ, গৃহস্থাত্মসকল আশ্রমের আশ্রয় দাতা ও ভরণপোষণ কর্ত্তা, গৃহস্থাত্ম অপবিত্র হইলে সকল আশ্রমই অপবিত্র হইয়া যায়, গৃহস্থাত্ম পবিত্র থাকিলে ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী, যথা বিধি সুরক্ষিত হয়। এ বিষয় মনু লিখিয়াছেন—

যথা বায়ু সমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ক জন্তবঃ ।

তথা গৃহস্থ মাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ক আশ্রমাঃ ॥ (৩য়, ৭৭)

যেমন বায়ুকে অবলম্বন করিয়া সকল পশু পাঁচিয়া থাকে, সেই প্রকার একমাত্র গৃহস্থাত্মকে আশ্রয় করিয়া অপরাপর আশ্রম সকল সজীব থাকে, গৃহস্থ হইতেই অন্যান্য আশ্রমীর জন্ম হয়। আরও বলিয়াছেন—

যস্মা ভ্রয়োপ্যা শ্রমিণো জ্ঞানে নানেনচা ম্হং •

গৃহস্থেনৈব ধার্যন্তে তস্মাং জ্যেষ্ঠাত্মমী গৃহী ।

প্রতি দিন বৈদিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা এবং ভিক্ষাদি প্রদান করত গৃহস্থই ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুক এই তিন আশ্রমীকে প্রতিপালন করেন বলিয়া

আর্থেরা গৃহস্থাত্মকেই সকল আশ্রমের আশ্রয় গুরু, প্রতিপালক এবং জ্যেষ্ঠ বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন, গৃহস্থাত্ম নিন্দনীয় বা অন্যান্য আশ্রম হইতে নিকৃষ্ট নহে কেবল আমাদের ব্যবহারের দোষে, আমরা কীর্ণবীর্ষ্য ও অসংযত, অলস এবং জ্ঞানহীন হইয়াছি বলিয়া সাধারণের ধারণা যে, গৃহস্থের কোন ধর্মই হয়না, অনেকেই বলেন সংসার করিতে গেলে ধর্ম ভাব রক্ষা করা যায় না, গৃহস্থ হইলেই কেবল আহার বিহারে দিন কাটাইতে হইবে এই কুসংস্কারের দোষেই অনেকে উন্নত হইতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতে তাই দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে,

নিদ্রয়া হ্রীয়তে নক্তং, ব্যাঘ্যেন চ বা যয়ঃ ।

দিবা চার্থে হয়্য নিত্যং কুটুম্ব ভরণে ন বা ।

অসংযত গৃহস্থেরা কেবল বহু নিদ্রায় ও স্ত্রীর সহিত হাস্য পরিহাসে রাত্রিকাল অতিবাহিত করে, অর্থ চিন্তা ও কুটুম্ব ভরণ ব্যাপারে দিনের সময় নষ্ট করে, একবারও ভাবে না যে, জীবনের লক্ষ্য কি, একবারও বিচার করে না যে, কেবল ভোগ সাধক কর্ম দ্বারাই মনুষ্য জীবনের কাল অতিবাহিত করা উচিত নয়, আর একবারও নিবিষ্ট চিন্তে চিন্তা করে না যে, মনুষ্য জীবনের কাল যদি অসংযত ভাবে অতি বাহিত করি তবে পুনর্বার আর মানুষ হইতে পারিব না। এইরূপে অসংযত ভাবে নিজেরাও অধঃপতিত হয়, আর স্ত্রীজাতি-কেও একেবারে নারকীয় জীবের ন্যায় জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক ও ধর্ম কর্ম হীন জন্তু বিশেষ সাজায়। তাই সমাজ নীতির প্রথম শিক্ষা দাতা মনু লিখিয়াছেন যে—

স সন্ধার্থ্যঃ প্রযত্নেন স্বর্গ মক্ষয় মিচ্ছতা ।

সুখকে হেচ্ছতা নিত্যং যোধার্থ্যো দুর্কলেঞ্জিতৈঃ । ৩য় ৭৯ ।

যে ব্যক্তি পরোলোকে অক্ষয় স্বর্গ এবং ইহলোকে পরিজনাদির সহিত পরম সুখ কামনা করে, সেই ব্যক্তি যত পূর্কক সংযত অন্তঃকরণে গৃহস্থাত্ম রক্ষা করিবে; কিন্তু এই আশ্রম অসংযত লোক রক্ষা করিতে পারিবে না। সংযমই সুখের প্রধান উপায় স্বরূপ। প্রথম হইতে যে স্ত্রীপুরুষ সংযমী হইয়া বিধি পূর্কক সংসারাত্ম রক্ষা করে তাহারা দীর্ঘজীবী সুস্থ দেহ ও শান্ত মন

হইয়া পরমানন্দে সংসার করে, আমার মনে হয় যে, গৃহস্থের যত সংযমের আবশ্যক অন্ত্যপ্রমীর তত আবশ্যক নহে। নিজের প্রাণে সুখ না থাকিলে কিছুতেই সুখ পায় না, সুতরাং সংযমের অভাবে যাহাদের প্রাণে সর্বদা পাপচিন্তা ও হা হতাশ ভাব, তাহারা নিজের চকলতার জন্ত এই সংসার দুঃখময় দেখে, নিজেদের দোষে চির জীবন নিজেরা অশুখী থাকে, সুতরাং তাহাদের নিকট সকল বিষয়ই অশান্তি জনক হয়। সংগৃহস্থ সর্ব জীবে সমান দয়ারূপ পরম ধর্ম রক্ষা করিতে যত্ন করিবেন এই নিমিত্তই গৃহস্থের প্রতিদিনই পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হয়, এই পঞ্চ যজ্ঞে ঋষিগণ, দেবগণ, ভূতগণ, ও অমিত্রি সকলকে যথাযোগ্য পূজা করিতে হয় সংগৃহস্থ হইতে সকলেই সুখ প্রার্থনা করেন। মনু বলিয়াছেন—

ঋষয়ঃ পিতরো দেবা ভূতান্ভতিথয় স্তথা।

আশাসতে কুটুম্বিভ্য স্তেভ্যঃ কার্যং বিজানতা। ৩য় ৮।

গৃহস্থের নিকট হইতে দেবগণ, পিতৃগণ, ঋষিগণ, অতিগিগণ ও অন্ত্যপ্রাণী সকল আপন প্রয়োজনীয় স্বচ্ছন্দতা প্রার্থনা করেন, সুতরাং শাস্ত্রের মর্ম্মজ সং-গৃহস্থ কায়মনোবাক্যে ঐ সকলের প্রার্থনা পূরণ করিতে যত্ন করিবেন।

পঞ্চ স্থনা গৃহস্থস্ত চুল্লী পেষণ্য পঙ্করঃ।

কণ্ডনী চোদ কুস্তশ্চ বধ্যতেযাস্ত বাহয়ন।

অর্থাৎ গৃহস্থ মাত্রের প্রতি দিনই পাঁচ প্রকার হিংসার সম্ভাবনা থাকায় ঐ পাঁচ রকম হিংসা জনিত পাপ নাশের জন্ত ঋষিরা পঞ্চ যজ্ঞের ব্যবস্থা করিয়া ছেন, কি রকমে অনিচ্ছা সত্ত্বেও হিংসা হয় তাহা বলিতেছেন, চুল্লী (উনন) পেষণী (শীল নোড়া) সমাজনী (বাঁটা) কণ্ডনী (উদুখল মুষল) ও জল কুস্ত ইহার ব্যবহারে প্রাণি বধের আশঙ্কা থাকায়—

তাসাং ক্রমেণ সর্কাসাং নিষ্কৃত্যর্থং মহর্ষিভিঃ।

পঞ্চ ক্যপ্তা মহাযজ্ঞাঃ প্রত্যাহং গৃহমেধিনাং।

ঐ সকল পাপ নাশের নিমিত্ত প্রতিদিন গৃহস্থের পঞ্চ মহা যজ্ঞ করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞস্ত তপর্ণং

হোমো দেবো বলি নর্ভোতো যজ্ঞোহতিথি পূজনং।

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণের অর্থাৎ জীবিত পিতা মাতার বাক্য পালনাদির দ্বারা, এবং মৃতের প্ৰীত্যর্থ অন্নাদি দান দ্বারা যে পিতৃ প্ৰীতি সম্পাদন তাহার নাম পিতৃযজ্ঞ, হোমের নাম দেব যজ্ঞ, খাদ্য দ্রব্য দান করত নিঃস্বার্থ ভাবে পশু পালনের নাম ভূতযজ্ঞ, অতিথি সেবার নাম নৃযজ্ঞ ।

পঠৈ তান্ যো মহা যজ্ঞান্ নহাপয়তি শক্তিতঃ ।

স গৃহেহপি বসন্নিত্যং স্নাদোষৈনুলিপ্যতেঃ ।

যথা শক্তি যে ব্যক্তি এই পঞ্চ মহা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে, সে ব্যক্তি গৃহে থাকিয়াও স্নান ( হিংসা ) দোষে লিপ্ত হয় না । কেবল যে হিংসা দোষ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে তাহা নয়, এই পঞ্চ যজ্ঞানুষ্ঠানে গৃহস্থ অশ্বেষের সহানুভূতি পাইয়া পরম সুখে নিজ কর্তব্য পালনে পবিত্র হৃদয় ও আনন্দিত থাকিতে পারে, প্রচুর প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়াও সংযমী থাকিতে পারে এবং অশ্বেষের হুঃখের সহিত নিজের হুঃখ সময় করিয়া পরের প্রতি সমবেদনা দেখাইতে পারে ।

কাহাকে কোন ভাবে কি বস্তুর দ্বারা সন্তোষ করিতে হয়, সে বিষয়ে মনু লিখিয়াছেন—

স্বাধ্যায়েনার্চয়েতর্মান্ হোমৈর্দেবান্ যথা বিধি

পিতৃন্ শ্রাদ্ধৈশ্চ নুনমৈ ভূতানি বলিকর্ষণা । মঃ ৩য়ঃ ৮১

স্বাধ্যায় দ্বারা ঋষিদিগকে পরিতৃপ্ত করিবে, যথা বিধি হোমের দ্বারা দেবগণকে, শ্রাদ্ধ দ্বারা পিতৃগণকে, অন্ন দ্বারা অতিথিকে, যথায়োগ্য আহার দ্বারা ভূত সকলকে পরিতৃপ্ত করিবে । গৃহস্থের প্রতিদিন এই পঞ্চযজ্ঞ যথা সাধ্য করিতেই হইবে পঞ্চ যজ্ঞানুষ্ঠান পরায়ণ গৃহস্থ যে পরিজন বর্গকে নিত্য সুখী করত আত্মার উন্নতি বিধান করিয়া সুখী হয় তাহাতে সন্দেহ নাই । এখানে স্বাধ্যায় শব্দে অধ্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন ও শ্রবণ কীর্তন বলিতে হইবে, কারণ অশ্বত্থ লিখিত আছে যে—

“ঋণ ত্রয় মপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেসয়েৎ

ঋণ ত্রয়ং তু দেব ঋণং ঋষি ঋণং পিতৃ ঋণ মিতি ।



অর্থাৎ গৃহস্থ তিনটী রূপ হইতে মুক্ত হইয়া মোক্ষ লাভের অধিকারী হয়। সেই তিনটী রূপ যথা দেবরূপ, ঋষিরূপ ও পিতৃরূপ।

“তত্র অধ্যাত্ম সাত্ত্বাধ্যয়নেন ঋষি রূপং

যজ্ঞেন দেব রূপং সৎ প্রজয়া পিতৃ রূপং অপাকরোতি ॥

অধ্যাত্ম শাস্ত্র (যাহাতে আত্মতত্ত্ব ও ভগ্নতত্ত্ব নিরূপিত আছে তাহাকে অধ্যাত্মশাস্ত্রবলে) আলোচনায় ঋষি রূপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

কেবল পরোপকার পরায়ণ ঋষিগণ কাহারও নিকট কোন স্বার্থ কামনা না করিয়া দীর্ঘকাল কৃত সাধনের দ্বারা আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা সম্ভব করিয়াছেন নানা প্রকার যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা সেই সুনির্মল তত্ত্ব জীবের কৃতার্থতার জ্ঞান শাস্ত্র রূপে লিপি বন্ধ করিয়া গিয়াছেন, ঋষি গ্রন্থ পড়িলে ও ঋষি গ্রন্থের আলোচনা, করিয়া চলিলে ঋষিদিগের ছায় বল বীৰ্য্য ও দীর্ঘায়ু হইয়া পরমানন্দে সংসার করিতে পারা যায়, অধ্যাত্ম শাস্ত্র জ্ঞান যাহার নাই সে কেবল আহার নিদ্রাদি ভোগ পরায়ণ হইয়াই জীবনের মধুময় সময় নানা প্রকার অশান্তিতে নষ্ট করে। অধ্যাত্ম শাস্ত্রবিদ জ্ঞানী গৃহস্থ সর্বদা সর্ব শক্তিমান পরমেশ্বরের শক্তি অনুভব করত নির্লিপ্ত ও পবিত্র ভাবে জীবন যাত্রার উপযোগী অর্থোপার্জন এবং পরিজন পোষণ রূপ নিজ কর্তব্য পালন করত পূর্ব পূর্ব সঞ্চিত পাপ ক্ষয় করিয়া নিরুত্তি (মোক্ষ সুখ) লাভ করিতে পারে, শাস্ত্র চর্চা যে প্রতিদিন স্নান ভোজনের ছাড়া নিত্য কর্তব্য তাহাতে সন্দেহ নাই। শাস্ত্রালোচনায় সন্দেহ দূর হয়, শাস্ত্রালোচনায় পরোক বিহীন জ্ঞান যায় শাস্ত্রালোচনায় পাপের ও পুণ্যের পরিণতি জানিয়া মুক্ত জীবও যে আত্মার উন্নতি করিতে পারে তাহাতে কিছু নাহি সন্দেহ নাই। আমরা শাস্ত্রালোচনা করিয়া বিজ্ঞ হইলে ঋষিরা পরিতৃপ্ত হন এমন নিঃস্বার্থ ঋষি ব্রজ করিয়া যে ঋষিরূপ হইতে মুক্ত না হয় সে যে অক্ষত ও অপরাধী তাহা আর বলিয়া বুঝাইতে হয় না।

এইরূপে অধ্যাত্ম শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ঋষিরূপ মুক্ত তত্ত্বজ্ঞ গৃহস্থ ব্রহ্মানুষ্ঠান দ্বারা দেবরূপ হইতে মুক্ত হইবে, যজ্ঞ শব্দে দেবতার প্রসন্নতা কামনায় কৃত পুস্ত, দান, হোম ও জপাদি ব্যায়—

“যজ্ঞ দেব পূজা সজ্জতি করণ দানেষু” ।

অর্থাৎ দেবতা উদ্দেশে পূজা ও দেবতার উদ্দেশে সং ব্যক্তিকে দান প্রভৃতি পবিত্র কর্মকে দেব যজ্ঞ বলে ।

এই দেব যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা যে দেবগণের আভাব মোচন হয় তাহা নহে ; নিজের স্বভাব ও দেহাদির উন্নতি হয়, দেব পূজা ও দেবতা উদ্দেশে কৃত পবিত্র কর্ম দ্বারা আত্মার প্রসন্নতা ও সত্ত্বগুণ ময় ভাব লাভ হওয়ার দেবযজ্ঞ গৃহস্থের দেহেরও আত্মার উন্নতি সাধক হয়, ভগবান্ বক্ষিয়াছেন—

দেবান্ ভাবয় তানেব তে দেবা ভাবয়ন্ত বঃ

পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্ স্যথ ।

অর্থাৎ দেবগণকে ভাবনা করিলে দেবগণ তোমাদিগকে ভাবিবেন, এইরূপে পরস্পর পরস্পরকে ভাবিলেই পরম মঙ্গল সাধন হয় । দেবগণ প্রসন্ন হইলে তাঁহাদিগেরই রূপায় পালিত ও চালিত মনুষ্যাদি প্রসন্ন হইয়া সকল রকমে শুভ ফল প্রদান করে, দেবযজ্ঞের ফলে চিন্তের সমতা হয় বলিয়া দেব যজ্ঞ দ্বারা সমাজের কল্যাণ, দেবযজ্ঞ দ্বারা যথাকালে বর্ষাদি হওয়ার দেহ যজ্ঞের ফলে দেশের কল্যাণ এবং দেবযজ্ঞ সাধন করিতে পারিলে ইষ্ট সাক্ষাৎকার হওয়ার দেব যজ্ঞ দ্বারা আত্ম প্রসন্নতা লাভ হয়, চিন্তের উদারতা ও অতিমান শূন্যতা লাভের প্রধান উপায় দেবযজ্ঞ, এই নিমিত্ত পূর্বকার সংগৃহস্থ মাত্রেয়ই বাড়ীতে নারায়ণ ও অশ্বাচ্ছ দেবতা স্থাপিত থাকিত অবশ্য কর্তব্যবোধে সকলেই দেব ধন হইতে মুক্তি লাভের কামনায় প্রতিদিন যথা সম্ভব দেবতার আর্চনা ও দেবতার উদ্দেশে দানাদি করিয়া দেব ধন হইতে মুক্ত হইতেন । এই ভাবে দেব যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা নিরোগী ও সত্ত্বগুণাবলম্বী প্রসন্নমনা গৃহস্থ কর্তৃক যৌথ বিধি অনুসারে ধর্ম পন্থীতে সং সন্তান উৎপাদন করিয়া ঐ সন্তান ও সন্তানের সংস্কার উপলক্ষে পিতৃগণের উদ্দেশে সং পাত্রে দানাদি দ্বারা পিতৃ ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে । প্রথমে নিজেরা সং না হইলে সং সন্তানের আশা করা যায় না, আবার সংসন্তান না হইলে সন্তান হইতে পিতা মাতার কিছু মাত্র সুখ হয় না, অসং পুত্র হইতে পিতা মাতাকে নিরন্তর দুঃখ ভোগ করিতে হয় ।

নিজেরা পিতৃ বজ্রামুষ্ঠান দ্বারা পিতৃ মাতৃ ভক্তির উজ্জল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সম্ভান সম্ভতিপ্নগকেও পিতৃ মাতৃ ভক্ত করিবে। গৃহস্থের নীতি ও ধর্ম উভয় মতেই পিতৃ মাতৃ সেবা যে পরম ধর্ম তাহাতে সন্দেহ নাই

পিতরং মাতরকৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতাং

মত্বা গৃহী নিবেবেত সদা সর্ব প্রথমতঃ ।

গৃহস্থ পিতা মাতাকে প্রত্যক্ষ দেবতা জ্ঞানে সেবা করিবে, সকল রকমে পিতৃ মাতৃ সেবাই গৃহস্থের প্রধান ধর্ম। পিতা মাতার বর্তমান অবস্থায় অসুগত থাকিয়া বাঁক্য প্রতিপালন ও সেবা সূক্ষ্মা পিতৃ যজ্ঞ। মৃত পিতা মাতার উদ্দেশে পিতৃ মাতৃ-প্রিয়বস্ত সং, পাত্রে দান করার নাম পিতৃ যজ্ঞ, এই পিতৃ যজ্ঞ যে, সংসারিক শাস্তি, মানসিক স্বচ্ছন্দতা ও পারত্রিক কল্যাণকর, ইহা বুদ্ধিমান্ মাত্রেই বুঝিতে পারেন। ষাহারা ক্রমানুসারে প্রথমে ঋষি বজ্রামুষ্ঠান করত তত্ত্ব জানিয়া পরে দেব যজ্ঞ করিয়া সত্ত্বগুণ সম্পন্ন হইয়া পরে পিতৃ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া পারিবারিক শাস্তি লাভ করিয়াছেন, তাহাদিগের পক্ষে ভূত যজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ অতিশয় সুখ কর হক। ভূত যজ্ঞ অর্থাৎ গৃহস্থের গৃহকে অবলম্বন করিয়া যে সকল প্রাণী রহিয়াছে নিরাসক্ত ভাবে তাহাদিগকে আহার দেওয়া। আর নৃযজ্ঞ অতিথি সেবা—

“নৃযজ্ঞোহতিথিপূজনং” ॥

এই নৃযজ্ঞ অর্থাৎ অতিথি সেবা গৃহীর পরম ধর্ম বলিয়া ঋষিরা বলিয়াছেন, অতিথি সেবায়ও সংসার শাস্তিময় হয়, একমাত্র অতিথি সেবায়ই যে, অনেক গৃহস্থ শ্রীভগবানকে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন; ইহার বহুদৃষ্টান্ত মহাভারতাদি ধর্ম গ্রন্থে বর্তমান আছে, আবার অকপট প্রাণে অতিথি সেবা করিয়া অনেক দীন দারিদ্র্য গৃহস্থ যে সাধু অতিথির শুভ আশীর্বাদে অতুল ঐশ্বর্ঘ্যের অধিকারী হইয়াছেন ইহারও অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

অতিথি সেবার নিয়ম অতি সুন্দর; শাস্ত্র বলেন—

উত্তমশ্রাণি বর্ণস্ত নীচোপি গৃহমাগতঃ ॥

পূজনীয়ো যথ যোগ্যং সর্বদেবময়ো তিথিঃ ॥

উত্তম বর্ণের গৃহে যদি নীচবর্ণও অতিথি রূপে উপস্থিত হয়, তবে যথাযোগ্য ভাবে তাহার সেবা করিবে, কারণ অতিথিতে সকল দেবতার অধিষ্ঠান অর্থাৎ অতিথি প্রীত হইলে সকল দেবতা প্রীত হন।

অতিথি যন্ত্র তথাশো গৃহাং প্রীতি নিবর্ততে ।

স তস্মৈ হুঙ্কতিং দত্তা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি ॥

অর্থাৎ অতিথি যাহার গৃহ হইতে আহার না পাইয়া ফিরিয়া যায় তাহার মহাপাপ, অতিথি নিজের পাপ গৃহীকে অর্পণ করিয়া গৃহীর পুণ্য গ্রহণ করত চলিয়া যায় অর্থাৎ অতিথির সকল পাপ গৃহীর হয় গৃহীর সঙ্কিত পুণ্য অতিথিতে যায়।

এক্ষণে আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন এই পঞ্চ যজ্ঞ কেবল পুরুষের যজ্ঞ হইতে পারে না, ধর্ম পত্নী ইহার সহায় হইলেই বিশেষ সুবিধা হয়। অতিথি সেবা প্রীতির সহিত করিতে হয়, সুতরাং ধর্ম পত্নীকে এই সকল ধর্ম বিশেষরূপে শিক্ষা দিতে হইবে, পত্নী শিক্ষিত হইলে অন্যান্য পরিজনও শিক্ষিত হয় এবং একের কার্যে অন্য সহায় হয়। পরিজন বর্গের সহিত যে ব্যক্তির সকল স্নকমে একমত আছে সেই ব্যক্তিরই যথার্থ অতিথিসেবা প্রভৃতি ধর্ম্যানুষ্ঠান সহজ ও প্রীতির সহিত অনুষ্ঠিত হয়; নতুবা অশ্রদ্ধার সহিত অতিথি সেবা ও ধর্ম্যানুষ্ঠান করা কেবল লোক দেখান মাত্র হয়, উহাতে আত্মারও উন্নতি হয় না, পরিবার বর্গেরও সুখ হয় না। গৃহস্থের সকল কার্যই সমন্বয় ধর্মাক্রান্ত অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের সহায়তার অপেক্ষা করে, পরিজনকে পরিতৃপ্ত রাখা গৃহস্থের আর একটা প্রধান ধর্ম; উহার মূল কারণ পত্নীকে সংশিক্ষা দেওয়া, গৃহস্থের প্রধান ও প্রথম অবলম্বন গৃহিনী:-

ক্রমশঃ

দীনবন্ধু শর্মা।

## সুখজীবন লাভের উপায় ।

—:—

এই তত্ত্বের মীমাংসা করিতে হইলে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে হইবে ।

( ১ ) জীবন কাহাকে বলে ( ২ ) ভোগ্য দ্রব্যের উপকরণ কি ।

( ৩ ) ভোগ করে কে ( ৪ ) ভোগে সুখ পাইবার উপায় কি ।

স্বল্প দৃষ্টি সুস্পন্ন ঋষিগণ শাক্ত মুখে এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, মনের উর্দ্ধ গतिकে জীবন পথ বা জ্ঞান মার্গ বলে ; রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পঞ্চ বিষয় ভোগের উপকরণ, এবং মন ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে এই উপকরণ গুলি ভোগ করে, এক্ষণে অনুসন্ধান করিতে হইবে যে, ভোগে প্রকৃত সুখ লাভের উপায় কি ? এবং তাহাই আমাদের আলোচ্য ।

জীবনের বিপরীত মৃত্যু, এইমৃত্যু শব্দের অর্থ অধোগতি, অজ্ঞান মুগ্ধ মানবগণ মৃত্যু পথে সুখের অন্বেষণ করে বলিয়া বিফল মনোরথ হয়, এবং বারি ভ্রমে মরিচিকার উদ্দেশে ধাবমান হওয়ার ছায় যন্ত্রণা ভোগ করে মাত্র, ফলতঃ জীবনের পথ অবলম্বন না করিলে সুখ নাই ; যদিও এই পথে সুখের জোয়ার ভাটা বা উচ্চ দাস ও স্রিকাক আছে কিন্তু হৃৎকের হৃদয় শোষণ তাপ নাই এবং এই জন্তই মহাপুরুষগণ এই জীবনের পথ অবলম্বন করিয়াই অনন্ত জীবনে প্রবেশ করিবার উপায় নির্দেশ করিয়াছেন, অতএব প্রথমতঃ এই পথে অগ্রসর হইবার সম্বল স্বরূপ জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করা আবশ্যিক ।

শাক্ত বলিয়াছেন যে অজ্ঞানই মৃত্যু এবং জ্ঞানই জীবন, ইহার অর্থ এই যে অজ্ঞান পথে অগ্রসর হইলে জীব উত্তরোত্তর অধোগামী হইয়া যন্ত্রণাময় মৃত্যুর তমোময় গহ্বরে পতিত হয় কিন্তু জ্ঞান পথে যত অগ্রসর হইবে অর্থাৎ মনকে যত উর্দ্ধগামী করিবে, ততই সুখের মাত্রাধিক্য ভোগ করিয়া অর্থাৎ প্রকৃত জীবন সন্তোষ করিয়া পরিণামে নিত্যানন্দময় অনন্ত জীবনে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইবে ।

মনের তিন ভূমি, অজ্ঞান ভূমি, জ্ঞান ভূমি ও চৈতন্য ভূমি, যখন মন অজ্ঞান ভূমিতে অবস্থান করে তখন পশু ভাব, জ্ঞান ভূমিতে দেব ভাব ও চৈতন্য ভূমিতে শিব ভাব লাভ করে, অজ্ঞানাবস্থায় মন যে সাময়িক সুখ অনুভব করে তাহা দুঃখের বিরাম সূচক মোহাবেশ মাত্র, আবেশকে সুখ বলা যায় না, কেননা সুখে দুঃখ নাই, বিরাম আছে মাত্র এবং এই জন্তই জ্ঞান লাভ করিয়া যখন মন সুখের আশ্বাদ প্রাপ্ত হয় তাহাও অবিচ্ছিন্ন নহে, কিন্তু সে সুখ তখন মেঘাচ্ছন্ন হইলেও তাহাতে নিশার স্থায় অন্ধকার হইয়া পৃথিকের দর্শন শক্তিকে অভিভূত করিতে পারে না, ফলে পদস্থলন না হওয়ার তাহার গতি অব্যাহত থাকে এবং এইরূপে অশ্রুসর হইতে হইতে ক্রমে উচ্ছ্বাস বিরামের অতীত হইয়া মন যখন চৈতন্য ভূমিতে প্রবেশ করে তখন সুখের উপাধিও আকার পরিবর্তিত হইয়া যায়, সে তখন অনন্ত ও অবিচ্ছিন্ন ভাব ধারণ করিয়া আনন্দে পরিণত হয় ও চৈতন্য ভূমিতে উন্নীত শিবভাবাপন্ন মনকে নিত্য উপাসনা করে ।

ধনিগর্ভ হইতে 'সত্ত্ব উত্তোলিত লৌহ যেমন কদাকার ও খাদ-যুক্ত থাকে, পরে যখন অগ্নির উত্তাপে নির্মূল লৌহে পরিণত হয় তখন উহাই আবার চুম্বকের নিকট অবস্থান করিলে চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয় । সেইরূপ অজ্ঞান অবস্থায় মন মগ্ন ও অসং ভাবাপন্ন থাকে, পরে জ্ঞানাগ্নির তাপে যখন 'উহা' সত্ত্বাপন্ন ও নির্মূল হয় তখন ভগবৎ সান্নিধ্যে অর্থাৎ ত্রীভুগবানের কাছে অবস্থান করিলে তাহাতে চৈতন্য শক্তি অনুলব্ধি হইয়া তাহাকে শিবত্বে উন্নীত করে; ফলে চুম্বক সহবাসে লৌহের চুম্বকত্ব লাভের স্থায় মন এই সময়ে শিব ভাব লাভ করিয়া আশ্ব স্বরূপ হওয়ার অনন্ত ও অবিচ্ছিন্ন আনন্দ সত্ত্বাপ করে ।

একপে আমরা মনের অবস্থান ভূমি অবগত হইলাম, বুঝিলাম যে জ্ঞান লাভ না করিলে সুখ নাই, ফলতঃ জ্ঞান 'চৈতন্যেরই আভাস মাত্র, ইহা লক্ষ হইলে মন প্রবৃত্তির প্রভু হইয়া রূপ রসাদি বিষয় ভোগ করিতে সক্ষম হয়, নতুবা মোহ মুগ্ধ প্রাণে প্রবৃত্তির দাস হইয়া বিষয় ভোগ করিতে গেলে মৃত্যুর দ্বারা ভুক্ত হইয়া স্বপ্না গর্ভে নিপতিত হওয়া অনিবার্য, কিন্তু জ্ঞান বলে অহংকারকে ভগবদ্ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া 'বিষয় ভোগ' করিলে প্রবৃত্তির প্রভু হওয়া ।

যায় ; ফলে বশীভূত অথ যেমন ভ্রমণ করাইয়া তৃপ্তি দান করে সেইরূপ ইন্দ্রিয়-  
গণ বশীভূত ভাবে তাহাকে তৃপ্তির পথে লইয়া যায় এবং মন তখন পার্থিব  
ভোগে স্থখ শান্তি পাইতে পাইতে ইহার পারে যাইয়া পরম ভোগে পরমানন্দ  
লাভ করে ।

নদীতে পতিত হইলে যেমন সত্তরণের দ্বারা তাহা পার না হইলে তীরে  
বাঁওয়া যায় না, সেইরূপ কর্ম ফলের আকর্ষণে যখন আমরা সংসারে আসিয়াছি  
তখন ভোগের দ্বারা কর্ম ক্ষয় করিয়া ইহার পারে না যাইলে প্রকৃত আনন্দ  
সন্তোষের আশা নাই, কিন্তু এই সংসার নুদী কাম ক্রোধাদি হিংস্র জন্তুতে  
পূর্ণ, অতএব ইহাদের কবল হইতে আশ্রয় রক্ষা করিয়া সত্তরণ অর্থাৎ ভোগ  
করিতে না পারিলে নিরাপদে পার হইবার উপায় নাই এই জন্য সত্তরণ করিবার  
সময়ে ভগবন্ডাবের হলুদমাখা অবশ্যক, কেননা, হলুদ মাখিলে আর কুস্তীরাদির  
ভয় থাকে না ।

বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয় সংযোগ হইবার সময়ে মনে ভগবন্ডাব  
অর্থাৎ শ্রীভগবানের স্মরণ অব্যাহত রাখিয়া ভোগ করিলে অবসাদের দ্বারা  
আক্রান্ত হইবার ভয় থাকে না ; অথচ বিচার শক্তি আচ্ছন্ন না হওয়ার বিষয়ের  
স্বরূপ জ্ঞান হয় এবং তাহার ফলে মোহ দূরে যায় ও তৃপ্তি সহজ লভ্য হয়,  
কিন্তু এই ভাব আর্জিত করিবার পূর্বে জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক, জ্ঞান অর্থে  
জানা, এবং ভগবৎসত্ত্ব জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান শব্দ বাচ্য, অতএব যাহার ভাব  
লাভ করিতে হইবে তাহাকে না জানিলে কার্য সিদ্ধি হইতে পারে না, যে  
চিন্তা বা স্মরণ ভাব লাভ করিবার আকর্ষণি স্বরূপ, তাহা জ্ঞানের শক্তি ভিন্ন  
গঠিত হইতে পারে না, অর্থাৎ যাহার চিন্তা করিবে তাহার স্বরূপ না জানিলে  
কোন লক্ষ্যে চিন্তাকে চালনা করিবে? ষ্টিম ভরিয়া তাহাতে বেগ প্রয়োগ করিলে  
যেমন চক্রের সাহায্যে এঞ্জিন চালিত হয়, সেইরূপ জ্ঞান লাভ করিবার ভাবে  
বেগ প্রয়োগ করিলে মন চিন্তার দ্বারা সূচালিত হইয়া চরম লক্ষ্যে উপনীত  
হয়, অতএব স্মরণ কথা এই যে, প্রথমতঃ জ্ঞান লাভ করিয়া ভগবন্ডাব অবলম্বন  
পূর্বক বিষয় ভোগ করিলে তৃপ্তি অনিত প্রকৃত স্থখের আশ্বাদ প্যুওয়া যায়,  
নতুবা স্থখ লাভের আশা বিড়ম্বনা মাত্র ।

শ্রীভগবান গীতার বলিয়াছেন :—

যৎ করোষি যদশ্বাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ  
যত্নপশুসি কোন্তেয় তৎ কুরুষ, মদর্পণম্ ।

ইহার ভাবার্থ এই যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে কোন ভোগ করিবে তাহা আমাকে নিবেদন করিয়া ভাবশ্রমে বিষয় ভোগ করিলেই উহা প্রকৃত নিবেদিত হইয়া প্রসাদ স্বরূপে ভুক্ত হয়, অতএব মানব মাত্রেয়ই এই ভাষের ভিত্তি স্বরূপ ভগবৎ তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হওয়া আবশ্যিক, কেননা ব্যাকুলতাই জ্ঞান হৃদ্যোদয়ের উৎস স্বরূপ ; ইহা মনের বিক্ষেপ নষ্ট করিয়া তাহাকে প্রকৃত লক্ষ্য অগ্রসর হইবার শক্তি প্রদান করে এবং এইরূপে মনের ইচ্ছা শক্তি তীব্র ভাবাপন্ন হইলেই শ্রীভগবান নিজে তাহাতে জ্ঞান সঞ্চার করিয়া দেন, কেননা এই অবস্থাপন্ন জীবের সম্বন্ধে তিনি গীতার বলিয়াছেন—

“দদামি বুদ্ধি যোগং তৎ যেন মা মুপযান্তি তে”

অর্থাৎ আমি তাহার মনে আমাকে লাভ করিবার উপযোগি জ্ঞান সঞ্চার করি ।

অতএব প্রথমতঃ আমাদের জ্ঞান লাভের অল্প চেষ্টা করা কর্তব্য অর্থাৎ শ্রীভগবানকে জানা আবশ্যিক তিনি সর্বব্যাপী ও দয়াময়, তাঁহাকে জানিবার বা তাঁহাকে লাভ করিবার তীব্র ইচ্ছা হইলেই তিনি তাহা পূরণ করেন, কিন্তু এই ইচ্ছা আন্তরিক ও অকপট হওয়া চাই কম্পাসের সাহায্যে লক্ষ্য স্থির থাকায় জাহাজ যেমন গম্যস্থলে উপস্থিত হইতে পারে, সেইরূপ তাঁহাকে জানিয়া তাঁহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিষয় ভোগ করিলে আমাদের পথ ভ্রান্ত হইতে হইবে না, খুঁটি ধরিয়া ঘুরিলে যেমন পতনের আশঙ্কা থাকে না সেইরূপ ভগবত্বাৰ অবলম্বন করিয়া বিষয় ভোগ করিলে মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে সক্ষম হইব, সুখের পথ দিয়া আনন্দের রাজ্যে, জীবনের পথ দিয়া অনন্ত জীবনে উপস্থিত হইয়া ধন্য হইব ।

শ্রীহরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় ।



## সং প্রসঙ্গ ।

( পূর্ব প্রকাশিতের পর । )

—:—

নদীর উপরকার স্রোত ও নিম্নের স্রোত যেমন বিভিন্ন মুখীন, সেইরূপ বাহ্যাত্ম্যস্তর ভেদে মনের অবস্থা ভেদ হয়, অহঙ্কার যাবৎ মনের বহিরঙ্গে ভাসিতে থাকে তাবৎ সে ঐ বহিরঙ্গে আভ্যন্তরিত কার্য্যভিমুখীন জ্ঞান শক্তিকে স্থূল ইন্দ্রিয় পথে চালনা করিয়া স্থূল বিষয় প্রত্যক্ষ করে মাত্র এবং ইহাকেই অজ্ঞান বলে, এই অবস্থায় দেহত্যাগ হইলে মনে স্থূলের ভাব পূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকে, কিন্তু স্থূল ইন্দ্রিয় না থাকায় স্থূল বিষয়ের ভোগাদি করিবার তীব্র ইচ্ছা সত্ত্বেও তাহা করিতে পারে না, সর্বদা অতৃপ্ত লালসার যন্ত্রণাময় আধাতে জর্জরিত হয়; অথচ স্থূল বিষয় সম্পর্কেও অন্ধ থাকে বলিয়া তজ্জনিত আনন্দ লাভ করিতে পারে না, ফলে এইরূপে অজ্ঞানের তামসিক উপাদানে প্রস্তুত আভির্বাহিক দেহের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া “ইতঃভ্রষ্টঃ ততোনষ্টঃ” অবস্থায় কর্ম্মের ক্ষয়কাল পর্য্যন্ত প্রৈতলোকে পরিভ্রমণ করে, কিন্তু আত্মোন্নতির জন্য যিনি সাধন পথে অগ্রসর হন, তাঁহার অহঙ্কার তামস মালিন্যের আবরণ হইতে মুক্ত হইয়া বিচার সহায়ে মনের অন্তরঙ্গে নির্মজ্জিত হয় এবং কার্য্যভিমুখীন জ্ঞান শক্তিকে আরম্ভপূর্বক উহা স্থূল ইন্দ্রিয়পথে চালনা করে ও এইরূপে স্থূল বিষয়ও তাহাতে প্রতিবিম্বিত কারণের সত্ত্বা প্রত্যক্ষ করিয়া তজ্জনিত আনন্দ সম্ভোগ করিতে সক্ষম হয়। স্থূল দৃষ্টি যেমন সীমাবদ্ধ, এই স্থূল বা জ্ঞানদৃষ্টি সেরূপ নহে, ইহা স্থূলের যবনিকা ভেদ করিয়া অনন্তে চালিত হয়, সুতরাং সাধক ইচ্ছা করিলে এই অবস্থায় বহুদূরের বস্ত বা ঘটনা নিকটস্থের ন্যায় প্রত্যক্ষ করেন ও শক্তির মূলতত্ত্ব এবং তাহা আকর্ষণের পস্থা অবগত হওয়ায় সেই শক্তির দ্বারা অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি আরোগ্য করিতে সক্ষম হন, কিন্তু এই সময়ে সাধকের সাবধান হওয়া উচিত, কেননা গুপ্তভাবে অবস্থিত অবিজ্ঞামায়া এই সময়ে

অজস্রধারে পার্থিব সম্মান বর্ষণ করিয়া তাঁহার যোগশক্তি আচ্ছন্ন করিতে চেষ্টা করে। অনেক সাধক এই আচ্ছন্নাবস্থায় সম্মুখে বিদ্যাশক্তির মনোহর মূর্তি দর্শনে তাহাতে আসক্ত হইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হন, অবিদ্যার লৌহ শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া বিদ্যার স্বর্ণ শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া পড়েন, অতএব এই সার কথাটি মনে রাখিও যে বিদ্যার জ্ঞান বিদ্যার উপাসনা করিলে তাহাতে আসক্ত হইয়া তদ্বারা বদ্ধ হইতে হয় কিন্তু ভগবানের জন্য বিদ্যার উপাসনা করিলে সে সাধককে আপন অধিকারের সীমা পর্য্যন্ত পথ দেখাইয়া দেয়।

পূর্বে বলিয়াছি যে ভগবদর্শন ও লাভ এক জিনিষ নহে, অতএব যতক্ষণ না মায়ার অতীত হইয়া শ্রীভগবানকে লাভ করিবে এবং ভগবৎ সংসর্গ বশতঃ লোহের চুম্বকত্ব প্রাপ্তির স্থায় মন আশ্রয় হইয়া না যাইবে, তাবৎ শক্তির আকর্ষণে মুক্ত হইলে সাধন সীমাবদ্ধ হইয়া অপচয় হইতে থাকে, কেননা অবিদ্যা মায়ী হইতে মুক্ত হইয়াও বিদ্যামায়ার পথে অগ্রমনস্ক হইলে গুণের প্রতিষ্ঠাত বশতঃ পতন অনিবার্য হইয়া পড়ে অর্থাৎ অর্জিত শক্তি রাজসিক অহঙ্কারের দ্বারা সীমাবদ্ধ হইলেই উহাতে তমোগুণের মালিন্য সঞ্চার হইতে থাকে, এবং মরিচা পড়িলে যেমন আধারে ছিদ্র উৎপন্ন হওয়ার ক্রমে ভিতরস্থিত জল বাহির হইয়া যায় সেইরূপ তমোগুণের মালিন্য প্রসূত ছিদ্র দিয়া শ্রী সীমাবদ্ধ শক্তি নির্গত হইয়া যায়, কিন্তু বাহ্যিক লক্ষ্য স্থির থাকে, যে ভাগ্যবান আশ্র সমর্পণের বিনিময়ে ভগবৎশক্তির দ্বারা চালিত হন, এই জ্ঞানশক্তি তাঁহার নিত্য উপাসনা করে, আবগুক বোধে স্থল বিশেষে তিনি শক্তি চালনা করিলেও উহাতে অহঙ্কারের গন্ধ না থাকায় তিনি শক্তির দ্বারা আকর্ষিত হইন না, শক্তির রত্ন শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া তাঁহার গতিরুদ্ধ হয় না, ফলে যোগ অব্যাহত থাকায় পরিণামে তিনি কৃতার্থ হন।

ফলতঃ ধ্যান যোগে জ্যোতী বা জ্যোতীষন ভগবৎমূর্তি প্রত্যক্ষ করিবার হুইটী মাত্র সরল উপায় যাহা তোমাকে বলিলাম, পিপাসুর নিকট তাহা অমূল্য রত্ন স্বরূপ, ভাল করিয়া তোমার বুদ্ধিবার সুবিধা হইবে বলিয়া পুনরায় সংক্ষেপে বলিতেছি প্রবেশ কর।

প্রথমতঃ ভক্তিযোগে রূপ চিন্তা করিতে করিতে মন বহির্বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত ও স্থির হইয়া যত সমাধির পথে অগ্রসর হয়, ঐ রূপ ততই মানস প্রত্যক্ষের গোচর হইতে থাকে, পরে সমাধি অভ্যাস হইলে ঐ সমাধি বলে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের স্থায় ইচ্ছামত দর্শন করা যায়।

দ্বিতীয়তঃ জ্ঞানযোগে বিচারের সাহায্যে বহির্বিষয় হইতে মনকে প্রত্যাহার করিয়া ব্রহ্মের অব্যক্ত ভাব বোধে অন্ধকারে সংযম প্রয়োগ করা। এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে মন কিস্তরঙ্গ ও স্থির হইয়া সমাধিযোগ্য হইলেই সাধকের ভাবানুযায়ী জ্যোতী বা জ্যোতীষ্মন ভগবদ্ভক্তি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের স্থায় দৃষ্ট হয়, ফলে এই দ্বিবিধ উপায়ের মধ্যে যাহাতে তোমার অভিক্রটি সেই পথ অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হও কিছুদিন এইরূপে লক্ষ্যস্থির করিয়া তীব্র ইচ্ছার দ্বারা মনকে ধ্যানের পথে চালনা করিলে যখন আনন্দের আভাস পাইবে তখন আর ধ্যান কষ্টকর বোধ হইবে না, কিন্তু একটি কথা স্মরণ রাখিও যে, অশ্বকে যেমন আহার ও পানীয় দিয়া তাহার ধাবন শক্তি বজায় রাখিতে হয়, সেইরূপ যে ইচ্ছা বাহন স্বরূপ হইয়া তোমার মনকে ধ্যানের পথে লইয়া যাইবে, সাধুসঙ্গ ও সংগ্রহ অধ্যয়নাদির দ্বারা তাহার শক্তি অব্যাহত রাখা কঠব্য, নতুবা ইচ্ছাশক্তি দুর্বল হইলে ধ্যানের পথে অগ্রসর হইবার চেষ্টা ফলপ্রদ হয় না।

বীজ বপন করিবার পূর্বে যেমন জমি ঠিক করিয়া বপন করিতে হয়, পরে ঐ অঙ্কুরিত বীজ বারি সেচনাদির দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে ফল দান করে সেইরূপ সাধন করিবার পূর্বে সংপ্রসঙ্গাদির দ্বারা শ্রীভগবানের সর্বব্যাপিত্ব বুঝিয়া ঐ সত্তার উদ্দেশ্যে ব্যাকুল ভাবে আত্মসমর্পণপূর্বক প্রার্থনা যোগে শক্তি অর্জন কর, এবং ঐ শক্তিবলে চিন্তাক্ষেত্রকে উর্বর করিয়া তাহাতে সাধন বীজ বপন কর, পরে ধ্যানাদি বারি সেচনের দ্বারা উহা সিদ্ধিরূপ বৃক্ষে পরিণত হইলে চৈতন্য ফল লাভ করিতে বিলম্ব হইবে না।

ভাই! সাধনের যে পথেই যাও না কেন, অগ্রসর হইবার ইহাই সরল উপায় ও মূল সূত্র স্বরূপ জানিও, কেননা নিজে অহুত্বব করায় এই মহান সত্য সম্বন্ধে আমি নিঃসংশয়।

ক্রমশঃ ।

শ্রীহরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ।

# লীলারহস্য ।

( পূর্ক প্রকাশিতের পর । )

( ৯ )

—:—

( শ্রীকৃষ্ণের নাগ করণ । )

শুক উবাচ—

গর্গঃ পুরোহিতো রাজন্ যদনাং সুমহাতপাঃ ।

ব্রজং জগাম নন্দস্ত বহুদেব প্রচোদিতঃ ॥

নূতন নূতন লীলা কথা শ্রবণে অতিশয় আনন্দিত চিত্ত মহারাজাদি রাজ পরীক্ষিত বলিতেছেন । গুরুদেব! অপূর্ক লীলা কথা শ্রবণে আমি বৃতার্থ হইলাম, আমার মনে হইতেছে ব্রহ্মশাপ আমার হিতের নিমিত্তই হইয়াছে ; কারণ যদি জীবন কালের সৌম্য শ্রবণে আমার বৈরাগ্য না জন্মিত, যদি আমি রাজ্যার্থ্য্য পরিত্যাগ করিয়া মৃত্যুর জন্ত প্রস্তুত না হইতাম এবং যদি আশ্রিত্ত্ব জানিবার জন্ত ব্যাকুল না হইতাম, তবে আপনার ত্রায় নিবৃত্তি নিরত ব্রহ্মনিষ্ঠ পরমভাগবত গুরুর কৃপা পাইতাম না । বিষয় বাসনা চিত্তে থাকিতে কখনই সং গুরুর কৃপা হয় না, অতএব আপনার ত্রায় গুরু পাইয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে আমি ধস্ত । গুরুদেব! বলুন পরাংপর পরমেশ্বর শ্রীগোবিন্দ মা যশোদার প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া অপর কি কি লীলা করিয়াছিলেন ।

রাজার শ্রবণেচ্ছায় পরমভাগবত গুরুদেব অতিশয় আশ্লাদিত হইয়া বলিতেছেন, হে রাজন্! একদিন ভগবানের মায়ায় বিমোহিত বহুদেব, ভগবানের সর্কেধরত্ব ভুলিয়া তাঁহাকে নিজ সন্তান জ্ঞানে সংস্কার দ্বারা পবিত্র করিতে বাসনা করিয়া গর্গাচার্য্যকে বলিলেন, আচার্য্য! আপনি গোকুলে গমন করিয়া নন্দ ও যশোদা বৃত্তিতে না পারে এমন ভাবে কৌশলে আমার পুত্রদ্বয়ের দ্বিজাতি সংস্কার করুন, দেখুন আপনি জানেন যে, হুরাশ্বা কংসের ভয়ে আমি পুত্রকে নন্দ ভবনে গোপনে রাখিয়াছি, যশোদা ও নন্দ অতি যত্নে আপন

পুত্র জ্ঞানে আমার পুত্রদ্বয়কে লালনপালন করিতেছে, তাহারা জানেনা যে উহারা আমার পুত্র, সুতরাং তাহাদের মনে যাহাতে সন্দেহ না হয়, যাহাতে তাহারা আন্তরিক ব্যথিত না হয় এমন ভাবে কর্ম সমাধা করিবেন, পরমতপস্বী যদুকুলপুরোহিত গর্গাচার্য্য, যোগবলে পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনই দেবকীনন্দন রূপে আবিভূত এবং যশোদা ও নন্দ কর্তৃক সুপালিত ইহা জানিতে পারিয়া আরাধ্য দেবের দর্শন স্পর্শন কামনায় অতি প্রীতির সহিত বহুদেবের কথায় স্বীকৃত হইয়া নন্দালয়ে গমন করিলেন।

তং দৃষ্ট্বা পরম প্রীতঃ প্রত্যাখ্যায় কৃতাজ্জলিঃ ।

আনর্চাধোক্ষুজ্জুধিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বঃ সরং ॥

তৎকৃত, অভিমানশূন্য, আদর্শ গৃহস্থ নন্দরাজ গর্গাচার্য্যকে দর্শন করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন, সহসা গাত্রোথান করিয়া কৃতাজ্জলি পুটে অভ্যর্থনা করত সুখকর আসনে বসাইয়া প্রণাম করত বিষ্ণু বৃদ্ধিতে অর্চনা করিলেন, গৃহাগত ব্যক্তি মাত্রকেই সর্বদেবময় বিবেচনা করিয়া সম্মানিত করা বিশেষত যদি জ্ঞানবান সাধু ব্যক্তি অতিথি হন তবে তাঁহাকে সাক্ষাৎ বিষ্ণু স্বরূপ মনে করিয়া তাঁহার অর্চনা করা কর্তব্য, নন্দ মহাশয় নিজে আচরণ করিয়া গৃহস্থকে এই শিক্ষা দিলেন।

সুপবিষ্টং কৃতাত্তিথ্যং গিরা সুনৃতয়া মুনিং ।

নন্দয়িত্বা ব্রবীৎ ব্রহ্মানু পূর্ণশ্চ কর বাম কিং ।

মননশীলু গর্গাচার্য্য নন্দ মহারাজের আতিথ্যস্বীকার করিয়া যখন, সুস্থ ও সুখে উপবিষ্ট হইলেন, তখন বিনয়মাত্রভাবে অতি শুল্লিত ভাষায় নন্দরাজ বলিতে লাগিলেন, হে আচার্য্য ! আপনি ব্রহ্মানন্দে আনন্দিত, আপনি আত্মারাম, আপনার কামনা নাই, আমি বিষয়ী আজ আমার বহু ভাগ্য যে, গৃহে বসিয়া আপনার দর্শন পাইলাম; এক্ষণে আদেশ করুন, আপনার প্রীতির জন্য কি অমুষ্ঠান করিব।

স্বহৃদ্বিচলনং নৃপাং গৃহীনাং দীনচেতসাং ।

নিঃশ্রেয়সায় ভগবন কল্পতে নাশুখা কচিৎ ।

হে ভগবন্! আমার নিকট আপনার কোন প্রয়োজন থাকিতে পারেনা, কারণ আপনারা পরমেশ্বরের ভাবে সর্বদা পরিপূর্ণ, স্তুতরাং নিষ্কাম। আমার মনে হয় গৃহাসক্ত ব্যক্তির সর্বদাই গৃহ চিন্তায় অভিভূত থাকায় ভগবন্ ভাবধনে বঞ্চিত পরমার্থ ধন বিহীন দরিদ্র, অতএব সেই দীন দরিদ্র গৃহিদিগকে কৃতার্থ করিবার মানসে মহাজন তাহাদিগের নিকটে আসেন, গৃহীকে কৃতার্থ করা ভিন্ন গৃহস্থের আশয়ে সাধু জনের আগমনের অহ্ন কোন কারণ নাই।

একপে আমার নিবেদন এই যে—

জ্যোতিষা ময়নং সাক্ষাৎ যন্তজ্জ্ঞান মতীন্দ্রিয়ম্ ।

প্রণীতং ভবতা যেন পুমান্ বেদ পরা বরং ॥

হে গুরো! শাস্ত্র দ্বারা মানবগণ স্কুল, স্কন্দ, সৎ, অসৎ, সকল বিষয় জানিতে পারে, যাহা দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অগোচর বিষয় ও প্রত্যক্ষের ছায় অহুভব করিতে পারে আপনি সেই জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, আপনার অজ্ঞাত কিছুই নাই আপনি ভূত তবিষ্যত বর্তমান সকলই জানেন।

তুং হি ব্রহ্ম বিদ্যাং শ্রেষ্ঠং সংস্কারানু কর্তু মর্হসি।

বালয়ো রনয়ো নৃণাং জন্মনা ব্রাহ্মণো গুরুঃ ॥

আপনি বেদজ্ঞ পশুিতগণের প্রধান, আপনি আমার এই পুত্রদ্বয়ের নাম রকণাদিসংস্কার করুন, ব্রাহ্মণ মাত্রেই সকলের গুরু বিশেষত বেদজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ আপনার ছাত্র মহাত্মা ব্রাহ্মণ সকলেরই যে পরম গুরু তাহাতে সন্দেহ নাই। নন্দ মহারাজের এইরূপ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া গর্গাচার্য্য অন্তরে বিশেষ আনন্দিত হইলেন কিন্তু বহুদেবের বাক্যানুসারে ভাব ধোপনের জন্ত একটুকু লল পাতিলেন মাত্র। গর্গাচার্য্য বলিতেছেন, মহারাজ!—

যদুনা মহ আচার্য্যঃ ধ্যাতশ্চ ভুবি সর্বদা

স্তুতং ময়া সংস্কৃতং তে মগ্নতে দেবকী স্তুতং

কংসঃ পাপ মতিঃ সধ্যং তব চানক হৃদুভেঃ ।

দেবক্যা অষ্টমো গর্ত্তো ন স্ত্রী ভবিতু মর্হতি ।

ইতি সক্তিগুপ্তনু শ্রুত্বা দেবক্যা দারিকাবচঃ

যদি হস্তা গতশঙ্কঃ তর্হি তন্মোনয়ো ভবেৎ ।

আপনার প্রার্থনা পূর্ণ করা বড়ই কঠিন, দেখুন আমি যে বহু কুলের পুরোহিত তাহা সকলেই জানে, সুতরাং আমি এই পুত্রদ্বয়ের সংস্কার করিলে অনেকে এই পুত্রকে দেবকীর তনয় বলিয়া সন্দেহ করিবে, বিশেষ কারণ দেবকীর অষ্টম গর্ভ কখনই স্ত্রী সন্তান হইতে পারেনা, দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান বলিয়া কংস যাহাকে বিনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল সেই মায়ারূপিনী দেবকী তনয়া বলিয়াছেন যে “হে দুষ্ট কংস আমাকে নষ্ট করিবার চেষ্টা অকারণ করিয়াছ তোমার প্রাণ নাশক শত্রু যে কোন স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে” সুতরাং সন্দেহচিত্ত পাপমতি কংস তোমার সহিত বহুদেবের সখ্যভাব জানে আর ঐ মহামায়ার বাক্যে সন্দেহ করিয়া যদি এখানে আসিয়া তোমার পুত্রের প্রতি অজ্ঞায় ব্যবহার করে তবে আমার মহাপাপ হইবে তোমারও দুঃখের সীমা থাকিবে না। অতএব আমার দ্বারা প্রকাশ্য ভাবে সংস্কার করান উচিত হয়না। এই বলিয়া গর্গাচার্য্য নিঃশব্দে রহিলেন। উপযুক্ত লোকের দ্বারা সংস্কার করাইলে পুত্রের বিশেষ কল্যাণ হইবে, গর্গাচার্য্যকে ছাড়িয়া দিলে আর এরূপ মিলিবেনা এই সকল ভাবিয়া নন্দ মহারাজ বলিতেছেন।

নন্দ উবাচ—

অলঙ্কিতোহস্মিন্ রহসি মামটৈ রপি গোব্রজে ।

কক্ষ দ্বিজাতি সংস্কারঃ স্বস্তিবাচন পূর্বকং ।

মহাশয় আপনি যাহা বলিলেন তাহা যুক্তিসম্মত বটে কিন্তু আপনাকে আমি ছাড়িবনা, যোগ্য ব্যক্তিকে সংস্কার করিতে অধিকারী। আপনি অতি গোপনে এই ব্রহ্ম মধ্যে স্বস্তি বাচন পূর্বক যাহাতে মঙ্গল হয় তেমন ভাবে ইহানের দ্বিজাতি সংস্কার করুন আমার বিশেষ আশ্বায়গণকেও আমি জানিতে দিবনা।

শক উবাচ—

এবং সং প্রার্থিতো বিপ্রঃ স্বচিকীর্ষিত মেব তং

চকার নাম করণং গুটো রহসি বালয়োঃ।

শুকদেব বলিলেন, মহারাজ! ভগবদ্ভিচ্ছা অতিক্রম করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। গর্গাচার্য্য নন্দের বাক্যে স্বীকৃত হইয়া অতি গোপনে নিজের অভি-  
মতে বালকদ্বয়ের নামকরণ সংস্কার করিলেন। বালকদ্বয়ের দর্শন ও স্পর্শনে

পরমানন্দ পাইয়া সর্বেজ্ঞ গর্গাচার্য্য নন্দ যশোদার বাৎসল্য প্রেমের অভাব না হয়  
এমত ভাবে ইঙ্গিতে উহাদের সর্বেশ্বরত্ব প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন ।

গর্গ উবাচ—

অয়ং বৈ রোহিণীপুত্রোরময়ন স্নুহদোঙঠৈঃ ।

অধ্যাত্ততে রামহীতি বলাধিক্যাং বলং বিহুঃ ।

যদু নামপৃথগ্ ভাবাং সঙ্কর্ষণমুশন্ত্যপি ॥

হে মহারাজ! আপনার পুত্রদ্বয় অতি শুভক্ষণযুক্ত, আমি এরূপ সর্বেশ্বরসম্পন্ন  
বালক আর দেখি নাই, ইহাদের উপমা মেলেনা, গুণাত্মরূপ নাম করা ও সম্ভব  
হয় না; দেখুন! এই বড়টী গুণের দ্বারা বন্ধ বান্ধবগণকে অতিশয় আনন্দিত করিবে  
বলিয়া ইহার নাম “রাম” রাখিলাম, আর ইহার অতিশয় বলবীর্ঘ্য প্রকাশ পাওয়ায়  
লোকে ইহাকে “বল” বলিয়াও ডাকিবে। আবার যদুবংশের সহিত তোমাদের  
অভিন্নতাব বন্ধিত করিবে বলিয়া ইহার আর একটী নাম “সঙ্কর্ষণ” রাখিলাম ।

এই কনিষ্ঠ পুত্রটির যে কত গুণ তাহা আমি ব্যাখ্যা করিতে পারি এরূপ  
সাধ্য নাই, ইনি যুগে যুগেই জন্মগ্রহণ করেন, দেখুন—

আসন বর্ণান্নয়োহস্ত গৃহ্নতোহনুযুগং তনুঃ ।

শুক্লোরক্ত স্তথাপীতঃ ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ।

হে রাজন্! এই পুত্রই সত্যযুগে শুক্লবর্ণ মূর্তি ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইয়া  
ছিলেন, ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণরূপে আবির্ভূত হইয়া ছিলেন, সংপ্রতি কৃষ্ণবর্ণে  
আবির্ভূত হইয়াছেন, ইনিই আবার কলিযুগে পীতবর্ণরূপে আবির্ভূত হইবেন, এই পুত্রকে  
সামান্য মানব মনে করিওনা, এক্ষণে কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া ইহার প্রধান নাম কৃষ্ণ  
রাখিলাম ।

প্রাগয়ং বহুদেবস্ত রুচিজ্জাতস্তবাস্তজ্জঃ ।

বাসুদেব ইতিশ্রীমানভিজ্জাঃ সং প্রচক্ৰতে ॥

অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলেন যে তোমার এই পুত্র পূর্বে কোন সময় বহুদেব হইতে  
জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এইজন্য এবং নিশ্চয় সত্ত্বগুণ প্রধান অগবৎস্তূল্য গুণ-  
শালী বলিয়া আমি ইহার নাম শ্রীমান বাসুদেব রাখিলাম ।



বহুনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সূতশ্চ তে  
গুণকর্মানুরূপাণি তাশ্চহং বেদ নো জনাঃ।

হে রাজন্ ! তোমার পুত্রের গুণ এবং কৰ্ম্মানুসারে বহু বহু নাম আছে ও কৈমিক নতুন নতুন নাম হইবে, আমি যোগবলে তাহা জানি, অশ্চে জানিতে পারে না। ইঁহার অনন্ত গুণ, অনন্তক্রিয়া এবং অনন্ত নাম, কৰ্ম্মানুসারে ভক্তগণ কীৰ্ত্তন করিবেন।

এম বঃ শ্রেয়ঃ আধাশ্চঃ গোপ-গোকুল-নন্দনঃ  
অনেন সৰ্ব্বহুর্গাণি যুয়মঞ্জস্মরিষাথ ॥

হে রাজন্ ! তোমার এই পুত্র গোপ ও গোসকলের অতিশয় আনন্দ প্রদ হইবে, তোমার ইঁহার গুণে সকল পাপ ও সকল দুঃখ হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইবে, তোমাদের কোন প্রকার ভয় থাকিবে না। হে মহারাজ ! কেবল তোমরা কেন—

য এতস্মিন্ মহাভাগে প্রীতিং কুর্কস্মি মানবাঃ  
নারয়োহভি ভবন্ত্যেতান্ বিযুপকানি বাসুরাঃ ॥

যে ব্যক্তি ইঁহার প্রতি ভালবাসা স্থাপন করিবে ; ও য়ে কোন ভাবে ইঁহার সেবা করিবে, বিযুপকান্তিত দেবগণের আয় তাহারা নিরাপদে থাকিবে, কোন প্রকার আপদ বিপদ তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিবে না।

তস্মাং নন্দাস্বজোহয়ং তে নারায়ণ সমোঽশুণঃ ।

• শ্রিয়া কীৰ্ত্ত্যানুভাবেন গোপায়স্ব সমাহিতঃ ॥

তোমার এই পুত্র শোভা সম্প্রদিত্তে, কীৰ্ত্তি ও মহানুভাবতায়, সকল প্রকারে সাক্ষাৎ নারায়ণ তুল্য, সূতরাং সংভাবে সংযত প্রাণে ইঁহাকে তোমরা রক্ষা কর, এই সন্তান প্রতিপালনই তোমাদের সকল ধৰ্ম্ম ইঁহা জানিও, এই পুত্র পাইয়া তোমরা ধুত্ত হইয়াছ, যে কোন ব্যক্তি ইঁহাকে প্রাণ ভরিয়া সেবা করিবে সেই ব্যক্তিই যে পরমানন্দ লাভ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। মহারাজ আজ তুমি ধত্ত, তোমার ব্রজধাম ধত্ত, গোপ গোপীগণ ধত্ত, আমিও ইঁহার সংস্কার করিয়া ধত্ত হইলাম, এই সকল বিষয় গোপনে রাখিও, দেখ যেন অসংযত ভাবে সকলের নিকট বলিও না।

গর্গাচার্য এই বলিয়া নন্দরাজের কৃত, অভিবাদনাদি গ্রহণ করত স্বস্থানে গমন করিলেন ।

ইত্যন্তানং সমাদিত্ব গর্গে চ স্বগৃহং গতে ।

নন্দঃ প্রমুদিতোমেনে আস্মানং পূর্ণমাশিষাঃ ।

তকণেব বলিলেন, মহারাজ গর্গাচার্য এই বলিয়া নিজ ধামে গমন করিলেন, নন্দরাজ অতিশয় আনন্দিত হইয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিলেন, নন্দ যশোদার আর কোন কামনা রহিল না, সামান্য পুত্র প্রার্থনায় জব স্নোত্র ও ব্রতাদি করিয়া সর্ব্বময় নিখিলমঙ্গলালয় শ্রীভগবানকেই পুত্ররূপে পাইয়াছেন জানিয়া আর অত্ৰ কোন কামনা ও কোন ভয় বা বাসনা রহিল না, অতুলনীয় আনন্দ লাভে উভয়েই বিভোর হইয়া কেবল প্রিয়তম গোপালেরই লালন পালনে নিযুক্ত রহিলেন ।

ভক্ত পার্থকগণ! এক্ষণে শ্রীভগবানের নামকরণ লীলার নিগূঢ় রহস্য আলোচনা করিয়া দেখুন, ইহা কত মধুর, এবং কত আবশ্যকীয় জ্ঞানোদ্দীপক তত্ত্বপূর্ণ। ভালবাসার রাজ্য শ্রীভক্তধাম, বাংসল্য, সখ্য ও মধুর, এই তিন রকম ভালবাসার সর্ব্বোত্তম দৃষ্টান্ত স্থান। প্রথমে বাংসল্য প্রেমের অধিকারিণী মা যশদাকে অবলম্বন করিয়া বাংসল্য প্রেমে আকৃষ্ট, বাংসল্য রসাধার, বাংসল্য ভাবগ্রাহী ভগবান বাংসল্য রসানন্দনে নিজ ঐশ্বর্য্য ভুলিয়া প্রিয়ভক্ত সাধককে ভাব ও তত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্ত অনেক খেলা খেলিলেন। কেমন করিয়া তাঁহাকে ভালবাসিতে হয়, কেমন করিয়া তাঁহার জন্ত সকল ভুলিয়া কায়-মন-বাক্যে, তাঁহার সেবা করিতে হয়, এবং কেমন করিয়া সর্ব্বেশ্বরকে আপন পুত্ররূপে আপন অধীন করিয়া রাখিতে পারা যায়, একে একে সে সকল দেখাইলেন। অবশেষে মুখমধ্যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড দেখাইয়া মা যশোদার ভাব ও ভালবাসার দৃঢ়তা জন্মাইলেন। এক্ষণে সাধু সঙ্গগুণে তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে সাধকের ভাববুদ্ধির দৃষ্টান্ত দিতেছেন। বিস্তৃত সত্যগুণের প্রেরণায় সাধু সঙ্গ হয়, অর্পিত চিত্ত সত্যগুণ এখান না হইলে ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞান-সাধুর সহিত মিলিত হইতে ইচ্ছাও হয় না, সাধুর সঙ্গ লাভও হয় না। সাধুসঙ্গ হইতে, যে ভগবদ্ভক্তির উদয় হয়, আবার ঐ সাধুসঙ্গ হইতেই যে ভক্তি স্থায়ী ভাব লাভ করে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সাধুসঙ্গে সাধু ব্যক্তির দ্বারা আরাধ্য দেবের মহিমা অংগত

হইলে একমাত্র আরাধ্য দেবেই সর্কর্ষ্যাপণ, আত্মনির্ভর ও একনিষ্ঠা লাভ করিয়া ভক্ত ভাবামৃতপানে পরম নিরুত্তী লাভ করিতে পারে। এই সর্কোচ্চ-ভাব লাভের শিক্ষা দিবার জন্তই বিস্তৃত সত্য মূর্তি বহুদেব কর্তৃক ভগবৎ তত্ত্ব সাধু গর্গাচার্য্যকে ভালবাসার স্থান স্বরূপ নন্দ যশোদার আলয়ে পাঠাইলেন। ইহা শ্রীভগবানেরই লীলা রহস্য। এই লীলার মধ্যে অনেক অবাস্তর তত্ত্ব থাকিলেও একটা ভাববিশেষ প্রদানরূপে আমাদের আলোচ্য। সে তত্ত্বটী এই যে, সংসঙ্গে আত্মতত্ত্ব জানিয়া পুত্রাদির প্রতিও যে ভালবাসা, তাহাও পরমাত্মা শ্রীভগবানের ভক্তি ও ভাব পুষ্টির কারণ হয়। আর তত্ত্ব না বুঝিয়া বহু আড়ম্বরের সহিত ঈশ্বর মূর্তিকে পূজা ও ভক্তিভাব প্রয়োগ করিলেও ঐ ভাব স্থায়ী হয় না। অধিকন্তু অতর্ক্যের ভক্তিভাব প্রায়ই হেতুগর্ভ, মন্দেহ গর্ভ, এবং অস্থায়ীভাবে কেবল মোহভাবই জন্মাইয়া দেয়। যশোদা শ্রীভগবানকে প্রথমে কেবল পুত্ররূপেই ভাল বাসিতে ছিলেন, ঐ পুত্রই যে সর্কোপর ও সর্কোধার তাহা জানিতেন না। শ্রীভগবান মুখবিষয়ে ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করাইয়া পুত্র রেহই যে যশোদার সকল সাধন ভজনের চরম ফল, আর যে যশোদার সাধন ভজনের আবশ্যক নাই, যশোদা যাহাকে পুত্ররূপে ভাল বাসিয়াছেন তিনিই যে সর্কোত্তর্য্যামী ও সর্কোময় ইহাও জানাইলেন। এক্ষণে পুত্রের সর্কোপরত্ব সাধুমুখে শুনাইয়া একেবারে ভাবের চরম অবস্থা লাভ করাইবার মানসে এবং শ্রীকৃষ্ণের মুখমধ্যে যে ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়াছেন, উহা যে ভ্রম নয়, উহাই যে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, এই ভাব চিরস্থায়ী করিবার মানসে, গর্গরূপী পরম সাধু কর্তৃক নামকরণ ছলে স্বরূপ তত্ত্ব কীর্তন করাইলেন। যে লালন পালন, যে আত্মীয়তা, এবং যে ভালবাসা কেবল বাহ্যিক ভাবেই ছিল তত্ত্ব সাধুর মুখে সেই আদরণীয় বস্তুর স্বরূপ জানিয়া, ঐ ভাব আন্তরিক ও বাহ্যিক উভয় ভাবেই দৃঢ়তম ভাব লাভ করিল, এবং ঐকিক ও পারত্রিক সকল যুক্ত কল্যাণের হেতু হইল। যাহাকে ভাল বাসিয়াছি, যাহাকে পুত্ররূপে পাইয়াছি, যিনি সর্কোদা আমার হইয়া আমাকে আনন্দ দিতেছেন, তিনি সামান্য নহেন; তিনি নিখিল জীবের জীবন, তিনিই আমাদের শান্তি বিধাতা। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র আধার স্বরূপ; নিখিল জীব, নিখিল বস্তু, ও নিখিল দেবদেবী তাঁহারই দেহে নিরন্তর বিহার করেন, ইহা শুনিয়া মা যশোদা ও পিতা নন্দের আর আত্মাদেব

সীমা থাকিল না। অধিকন্তু শ্রীকৃষ্ণের ভালবাসা যেন দিন দিন নিঃসীমভাবে বাড়িতে লাগিল।

পাঠকগণ, একমাত্র আরাধ্য দেবেই সকল, বর্তমান সংস্রু দ্বারা এই ভাব স্থায়ী হইলে আর বহু নিষ্ঠা থাকে না, এক নিষ্ঠা আসে, এক নিষ্ঠা থাকাই যে, সিদ্ধি, মুক্তি বা পরম প্রেম লাভের একমাত্র সোপান তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। গর্গাচার্যের মুখে গোবিন্দের গুণ ও মহিমার বিষয় অবগত হইয়া নন্দ ও যশোদা শ্রীগোবিন্দের মুখমণ্ডল ভাবিতে ভাবিতে ক্ষণকালের জন্য একেবারে আত্মবিস্মৃত হইলেন। পূর্বেও গোপালের ভালবাসায় আত্ম-হারা ভাব ও সদানন্দ অনুভব করিতেছিলেন; এখনও তাহাই রহিল, তবে গোপাল যে সামান্য নন ঐ গোপালের ভালবাসাই যে একমাত্র পরম পুরুষার্থ, গর্গাচার্যের মুখে ইহা শুনিয়া প্রতিকার্যে অধিকতর আনন্দ ও উৎসাহ পাইতে লাগিলেন। আরাধ্য দেবের পূজায় ও সাধনার প্রবল উৎসাহ লাভই সাধুসম্প্রদায়ের মহিমা। এবং সাধনার তত্ত্ব জানিয়া সাধনার সিদ্ধি লাভকরা ও অন্য বাসনা-শোপ হওয়াও সাধুসম্প্রদায়ের মহিমা, এখানেও তাহাই হইল।

পাঠক পাঠিকাগণ! এক্ষণে বিচার করুন, বিগ্রহ ও ভালবাসার সহিত ইষ্টদেবের পূজা ও মন্ত্র জপাদি করিতে করিতে যদি তত্ত্বজ্ঞানসাধক কিসা সংস্করণ মুখে মন্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্যার্থ এং ইষ্ট দেবের মহিমা প্রবণ করা যায়, তবে সেই পূজায় ও সেই মন্ত্র বপে যে অধিকতর উৎসাহ ও ভাবের আবির্ভাব হয় ইহা ঘাঁহারা অনুভব করিয়াছেন তাঁহারা এই লীলার নিগূঢ়, তত্ত্ব অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। এবং আনন্দের সহিত শ্রীভগবানের নাম করণ লীলার জয় না দিয়া থাকিতে পারিবেন না। নামকরণ লীলা আর কিছুই নয় কেবল, আরাধ্য দেবের তত্ত্ব ষাখ্যা। শাস্ত্র, দাস্ত্র, সখ্য প্রভৃতি যে কোন ভাবে অবলম্বন করিয়া সাধন করণ মন্ত্রার্থ ও আরাধ্য দেবের তত্ত্ব জানিয়া লউন, ভক্তির বুদ্ধি হইবে, সাধন-ভজনে আগ্রহ আসিবে, এবং প্রতিপদে পদে ভাবের বিকাশ হইবে, মন্ত্রের ও নামের বর্ণে বর্ণে অপূর্ক অমৃত ময় ভাস্বরসের আনন্দ পাইয়া প্রাণ, মন, আনন্দে পুলকিত হইবে সন্দেহ নাই। তত্ত্ব জ্ঞান না জন্মিলে কেবল “গুরু বলিয়াছেন, তাই জপ করি, জপ না করিলে

পাপ হইবে" এইরূপ ভাবের সাধন ভজন কখনও চির সুখের ও ভাবোদ্দীপক হইতে পারেনা। অনেকে মন্ত্র গ্রহণ করেন, ইষ্ট দেবের পূজা করেন, মুখে ইষ্টদেবের নামও করেন, কিন্তু করেন না সাধু সঙ্গ, শোনেন না তত্ত্ব কথা, জানেননা ইষ্ট তত্ত্ব ও মন্ত্র তত্ত্ব। সুতরাং মন্ত্রে ও ইষ্টে এক নিষ্ঠা থাকে না, গুরুতে ও ইষ্টেতে অভেদ বুদ্ধি লাভে বঞ্চিত থাকিয়া সাধন ভজন কেবল সাংসারিক কার্যের মতন একটী কষ্টকর কার্য বিশেষ মনে করেন।

আমরা একান্ত বিশ্বাসের সহিত বলিতে পারি যে, যদি সাধনের তত্ত্বজ্ঞানে যদি মন্ত্রের মৰ্ম্ম জানে, আর যদি নিজের সম্বন্ধ স্থির করিয়া ভাবের সহিত ভজন ও সাধন করে, তবে অতি অল্প কালের মধ্যেই ইষ্ট নিষ্ঠা ও সেবার এমন আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম হয় যে, প্রতিদিন আহাৰ করা যেমন আবশ্যক ও সুখকর মনে হয়, তদপেক্ষাও অধিকতর সাধন ভজনের আবশ্যকতা মনে করিতে পারে এবং সাধন ভজন না করিয়া থাকিতে পারেন না।

এইরূপে নন্দ ও যশোদা ভাবময়ের ভাবে সম্পদা আনন্দিত থাকিয়া নিঃসন্দেহে নিরাম ভাবে শ্রীগোবিন্দকে দালন পালন করিয়া আনন্দ মনে আনন্দময়ের ভাবে লীলার পুষ্টি সাধন করিতে লাগিলেন।

পাঠক পাঠিকগণ! শ্রীভগবান্ বাৎসল্য লীলার আবশ্যকীয় দৃষ্টান্ত এই পর্যন্ত শেষ করিলেন ইতঃপর সখ্য ভাবের লীলা করিবেন। আপনাদের মধ্যে যাহারা শ্রীভগবান্কে বাৎসল্য ভাবে উপাসনা করেন, তাঁহারা এ বিষয় আলোচনা করিবেন, এবং লীলার লক্ষ্য লক্ষ রাখিয়া আত্মসম্মতি সাধন করিবেন, এই লীলা রহস্য হইতে যদি ভক্তগণের একটুকু মাত্র ভাবের উদ্দীপনা হয়, তবে আমার সকল পরিশ্রম সার্থক জান করিব। ভক্ত পাঠকগণ! নিবিষ্ট চিত্তে আলোচনা করুন, নন্দ যশোদার জয় দিউন, আর প্রাণ খুলিয়া বলুন শ্রীযশোদানন্দনের জয়, শ্রীগোবিন্দের জয়, শ্রীগোকুল বিহারী শ্রীহরির জয় ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দ লীলায় দীনবন্ধু বেদান্তরত্ন সম্বলিত লীলা রহস্যের প্রথম তত্ত্বাংশ সমাপ্ত।

# বাঁকুড়া জেলার প্রাচীন বৈষ্ণব কবির গান ।

—:0:—

“পোদোর গান ।

বাঁকুড়া জেলার অনেক গুলি বৈষ্ণব কবি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন । কিন্তু কোন সাময়িক পত্রেই তাঁহাদের কাহারও বিষয় আলোচিত হইতে আমরা দেখি নাই । অত্ৰ আমরা একজন উচ্চ অঙ্গের বৈষ্ণব কবির বিষয় কিছু আলোচনা করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে চাই । পাঠকগণও সাধক কবির সাধনা ও ভজন সঙ্গীত পাঠে আনন্দিত হইবেন যদিয়া আশা করা যায় ।

আজ আমরা যে মহাস্মার বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাঁহার প্রকৃত নাম ৮ পদ্ব লোচন । বাঁকুড়া অঞ্চলে ইনি “পোদো” নামে প্রসিদ্ধ ও তাঁহার রচিত গীতসমূহ “পোদোর গান” বলিয়াই খ্যাত আছে ।

পদ্ব লোচন জাতিতে ব্রাহ্মণ, উপাধি বটব্যাল, তাঁহার বাসস্থান সন্দা, গ্রাম ঝানি বিষ্ণুপুর সহর হইতে ৬৭ ক্রোশ দূরে, পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত । সন্দা গ্রামে এখনও পদ্ব লোচনের বাসস্থান বর্তমান রহিয়াছে । পদ্ব লোচনের পুত্রের নাম শ্রীনটবর বটব্যাল । শুনিতে পাই, তিনিও পিতৃপদের অনুসরণ করিতেছেন । পুত্র পিতৃকীর্তি বজায় রাখিলেই সুখের কথা ।

বাঁকুড়া অঞ্চলে পোদোর নাম অথবা পোদোর গান শুনে নাই, এমন লোক অতি বিরল । পোদোর গান দু’ চারিটা প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ত্রিফোপজীয়া বৈষ্ণবের মুখে ‘পোদোর গান গুলি’ প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় । এক সময়ে পোদোর গানের প্রভাব ও প্রভা বাঁকুড়া অঞ্চলে বেশী পরিমাণে বিস্তৃত হইয়াছিল এক্ষণে কিছু স্তিমিত বলিয়া বোধ হয় ।

কিন্তু যাহা প্রকৃত সার বস্তু, তাহার ধ্বংস নাই । পোদোর গান খাঁটি জিনিষ বলিয়াই আমরা জানি । উহাতে খাদের মিশ্রণ নাই । খাঁটি জিনিষের আদর

সর্বত্রই। সুতরাং প্রকাশিত হইলে, শুধু বাঁকুড়ায় কেন, যেখানে বাঙ্গালী ভাষা প্রচলিত আছে সেখানে যে উহা আদৃত হইবে, তাহা সন্দেহ নাই।

পোদোর গান তাঁহার সরল ও সরস প্রাণের স্বতঃ উচ্ছ্বাস। সাধক যখন যে ভাবে ছিলেন, সাধনার ধনকে পূজা করিতে গিয়া, তখন সে ভাব আপনা হইতেই উচ্ছ্বাসিত হইয়া পড়িয়াছে।

গানের ভাষা অতি সরল। প্রেমিক কবি রীতিমত বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ধর্ম পথের পথিক হন নাই। সুতরাং বঙ্গ ভাষার এই পরিণতির দিনে কাহারও কাহারও চক্ষে, কবির ভাষার স্থানে স্থানে দোষ ঠেকিতে পারে। গানগুলির স্থানে স্থানে গ্রাম্য দোষ না আছে, তাহা নহে। কিন্তু সে সকল ধর্মব্যয়ের মধ্যই নহে বলিয়া আমরা বিবেচনা করি।

পত্র লোচনের রচিত এমন গান আছে, যাহা বুঝা আমাদের শ্রায় সাধন হীন, ধর্ম জগতের কীটের পক্ষে একেবারে অসমর্থ। সে সকল অতি উচ্চ অঙ্গের ও উচ্চ রাগাঙ্গিক পদ, আমরা পাঠক বর্গকে মেগুলি উপহার না দিয়া অপেক্ষা রুত সরল, বোধ গম্য পদ সকলই উপহার দিব। পোদোর গান সম্বন্ধে একটা কথা প্রচলিত আছে তাহা এই—

“যে না জানে উপাসনা।

সে যেন পোদোর গান শুনে না ॥”

সুতরাং পোদোর গান শুনিতে হইলে অথবা পাঠ করিতে হইলে “ভিতরে” প্রবেশ করিতে হইবে উপরে উপরে ভাসিয়া গলে চলিবে না। অধিক বাগাড়ম্বর ত্যাগ করিয়া আমরা এক একটা করিয়া পোদোরগান পাঠক বর্গকে শুনাইতেছি পাঠকগণ শুনিয়া পরিতুষ্ট হউন, এবং তৎসঙ্গে ধর্ম সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা লাভ করিতে পারেন ত করুন। এস্থানে একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যিক। পোদোর স্বহস্ত লিখিত খাতা আমরা দেখি নাই। তাঁহার ভক্তগণের ও কোন কোন প্রাচীন লোকের মুখে গান গুলি যে ভাবে শুনিয়াছি, সেই ভাবেই উদ্ধৃত করিতেছি। এরূপ স্থলে নানা দোষ ঘটিতে পারে। এ হেন দোষের ভাব সাধক কবির স্বক্ষে না চাপাইয়া আমাদের স্বক্ষেই দেওয়া উচিত।

পাঠকগণের উদারতা, এ অবস্থায় যে একান্ত বাঙ্খনীয়, তাহা বলাই বাহুল্য। উক্ত গান গুলির কোন কোন স্থানে যদি আমাদের অজ্ঞাতসারে অন্তায় পরিবর্তন হইয়া গিয়া থাকে, তবে সংশোধিত করিয়া কেহ আমাদিগকে জানাইলে একান্ত বাঞ্ছিত হইব।

পরম দয়ালু নিত্যানন্দের প্রেম সম্প্রদেই পোদোর গান আরম্ভ করা যাক। নিতাইএর প্রেমের তুলনা কোথায়? যেখানে পাপী সেখানে নিতাইএর প্রেম; যেখানে তাপী সেখানে নিতাইএর প্রেম; নিতাইএর প্রেমে গৌরান্দ্র প্রভু স্বয়ং মাতোয়ারা তাঁহার প্রেমের তুলনা দিব কাহার সঙ্গে? জগাই মাধাই উদ্ধার করিতে গিয়া পোদোর গানে এ প্রেমের কি উচ্ছ্বাস ছুটিয়াছে পাঠক তাহা দেখুন।

( ১ )

কে তাপিত আছ ডাক্ছে চাঁদ নিতাই।

রাধার প্রেমের বচা ভেসে যায় ॥

( এ ন'দেতে ) নিতাই ডাকে ছুই বাছ তুলে,

গোলক হ'তে এনেছি নাম লও বিনা মূলে ;

খাস তফিলের মোহর ভেঙ্গে, নিতাই আমার অনর্পিত ধন বিলাস ॥

শুনে নিতা'র চাঁদ মুখের বাগী,

জগাই মাধাই এল যেন কাল ভুজঙ্গিনী,

এলো কেশে ক্রোধা বেশে যেন রাছ বিধু পায় ॥

( বলে ) চণ্ডিকা আর বিয় হরি, এই মাত্র জানি,

কোথা হ'তে এল হরি নাম গোপমালের ধনি,

শুনে কর্ণে তালী লাগল রালা, এমন পাপী ছিল কে নদিয়ার ॥

ভগ্ন কুম্ভ সম্মুখে দেখি,

কানা ফেলে মেনে মাধা অরুণ দুই আঁধি,

রাধির ধারাবেয়ে পড়ে নিতা'র পদ্মমালা ভেসে যায় ॥

গোসাঞী হরি কয় গুন পদ্মলোচন,

গৌর তখন ক্রোধা বেশে ডাক্ছে হু দর্শন,

নিতাই বলে উদ্ধারিব তব প্রেমের মহিমায় ॥



উপরি লিখিত গানটী বখন কোঁস সুখায়ক কর্তৃক আমাদের নিকট নীত হইতেছিল, তখন বাস্তবিকই আমাদের পাষণ হৃদয়েও গেমের বত্যা প্রবাহিত হইয়াছিল। নীত কেবল পড়িয়া গেলেই সে আনন্দ, সে সৌন্দর্য উপলব্ধি হইবে আশা করা যায় না। ক্রমে ক্রমে পোদোর রচিত আরও ২৩টী গান নীচে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি দেখুন।

(২)

আমার মনের দোষে সতের সঙ্গ এবার ভঙ্গ হ'ল।

সাধন হ'লনা গেল তমের বশে, ঐ দেখ শুকনো ডাঙ্গায় যেমন মীন প'ড়ে ম'ল ॥

ওরে,—মন যদি আপনার হ'তো, রত মণি চিনে নিত,

তামা দস্তায় না হ'ত রত,—

মন আমার হ'লে হ'তো সিদ্ধ, হয়ে থাকত সতের বাধা,

তাতে মিলত মেওয়া খাশা, ও তা বুঝলি নারে চাষা,

আপন কর্ম দোষে এবার ঠকুতে হোলো ॥

মন হয়েছে কর্ম কান্না, দীনের দিন যায় তাও জান না, কাঁচা রলে হয় আনাগোনা ;—

এবার কাঁচা রস তোর ট'কে যাবে, তাহে কি আর ভিগ্যান হ'বে,

তাতে হয়না মিছরী চিনি, সাধুর মুখে শুনি,

জলে জ্বাল দিয়ে এবার দিনটা গেল ॥

ঐশি ছিল যোল আনা, কত দেনা কত পাওনা,

মন্ত আমার হিসাব রাখলি না ;—

এই দেখ পূর্ণিমার চাঁদ ক্ষয় হ'তেছে, দীনের দিন তায় যেতেছে,

কবে হবে অন্ধকার, তা বুঝলি না মন আমার,

গোসাঞী হরি বলে পোদো এবার কয়েদ হ'লো ॥

(৩)

না জেনে রাগের করণ শুধু কথায় কি হয়রে মন,

শুদ্ধ শ্রেমের আচরণ।

ধনু ধরি শিক্ষা করি, বিক্রমেতে কর রণ।

অহ্ন ছাড়ি গেলে পরে যাবা মাত্র হয় পতন ॥

পাতীতে হয় গোরচনা সে কি জানে তার মরম ।  
 সর্পের মাথায় থাকতে মণি করে কেন ভেক ভোজন ॥  
 পরের ধনে ধনী হ'য়ে সে কি জানে ধনের বেদন ?  
 চারি কড়ার চাটীয়ে শুয়ে লাথ টাকার দেখে স্বপন ॥  
 করবি যদি প্রেম পীড়িতি ধরণে সাধুর শ্রীচরণ ।  
 সাধন সিদ্ধ হবে পরে মিলবে প্রেমের পরম ধন ॥  
 গোসাঞী হুরি ব'লছে পোদো ডিগ্‌রের মত' আচরণ ।  
 তাল হারায় লাউয়ে চাপড় কাঁধে কুঠার খুঁজে বন ॥

( ৪ )

“ও মন আমি তোমার না হইলে তুমি হবি কারুরে ।  
 কে আমি কার কথায় চলি হামে বেহুঁ সার রে ॥  
 হাঁরে ঘাঁর স্বরে চুরি সিঁধ, সেও পড়ে যায় নিধু ।  
 কি করে তার প্রতিবেশী কার লেগে কে মরে রে ॥  
 চোদ্দ পালাল ক'রে চুরি, চৌকীদারের শেষে জারী,  
 চোর পালাল সতরুক হ'ল শেষে দেয় ফুকার রে ॥  
 হাত হোল মুদ্রা ছাড়া, কর্তা হলেন ভেকো হারা,  
 নির্বাণ প্রদীপে তৈল কি তাৎপর্য তার রে ॥  
 উঠলেন কর্তা নিদ্রা ছাড়ি, স্বরে নাহিক ধূলি ঠুঁড়ি,  
 গত কর্ণের কি অনুসাধ তুঁয়ে দিয়া পাদ রে ॥  
 গোসাঞী হুরি কহেন সারাৎসার, মৃতদেহে অলঙ্কার,  
 অন্ধের নয়নে কাজল কি তাৎপর্য তার রে ।  
 বাকিদু নাইকো কামানেতে, তড়া দিচ্ছে রঞ্জকে তে,  
 হাতে কলা পাও গোবিন্দ পোদোর ব্যবহার রে ॥ ”

( ৫ )

সচৈতন্য মানুষ্যের প্রেম গরল মাখা ।

হতাশন, আছে ভস্মে ঢাকা ॥

কিসের জ্বারে, ধরবি তারে হাতআছে পাথরে জাঁকা ॥

শুক ত্যজে পুষলাম শারী, শারী বলে রাই কিশোরী,

তার রূপ নেহারী ;—

মন পবনের হিল্লোলেতে ঈষৎ হেলে তার শিধি-পাখা ॥

দিনের অধীন হয় যে জনা,

সে কখন দীন গুণে না,

তার ওই ভাবনা ;—

দিন গুণে তারিখ রেখেছে, দিন গুণে কুমুরে পোকা ॥

( ধ'রবে ব'লে )

গোসাঞী হরি ব'লছে ধীরে,

গোদোর কথা ব'ল'ব কিরে,

তাই আছি ম'রে ;—

দোষ নাই তার ফুঁপি গোণা, চৌদ্দ কাণার হাতী দেখা ॥ ( আমার হ'ল )

( ৬ )

আপনার দেহের খবর আগে জান রে মন ।

কোন পথেতে জীবের স্থিতি, কোন পথে গুরুর আসন ॥

দেহে আছে পঞ্চজন, তাদের কিরূপ গঠন,

কোথায় ধাম, কোথায় স্থিতি, কোথায় বা গমন ;

দেহে কেন্দ্র ঘুমায়ে কেবল জাগে, কোন জনায় দেখায় স্বপন ॥

দেহে দশ ইন্দ্রিয় আছে,

ছয় রিপু তারই পাছে,

( এই ) পঞ্চ শব্দ তত্ত্ব কর্তা দিয়েছে ;

দেহে ক'জন বা পুরুষ বটে প্রকৃতি বা হয় ক'জন ?

গোসাঞী পদ্ম লোচন ভণে,

হরি গুরুর চরণে—

গুরুর রূপা না হ'লে কি বস্তু হয় মনে ;

দেহে চৌষট্টি কুঠরী, নামে ভব বন্ধন হয় ঘোচন ॥

( ৭ )

রং মহলের রংখানায় একজন চোর এসেছে ।  
 মহলেও প্রমাদ স্ব'টেছে ॥  
 চোরের কিবা পরিপাটী, বিষম সিঁধ কাটি,  
 লুট্বে জহর কুঠী মনে ক'রেছে ॥  
 কুঠীর ছিল নয় ছয়ার, নয়জন চৌকী খাড়া,  
 দিবা নিশি তারা দিত পাহারা  
 আছে চড়ন্দার পাঁচজনা, তারা করে কুমন্ত্রণা,  
 বিষবোধ খেয়ে দ্বার ছেড়ে দিয়েছে ॥  
 গোসাগ্রী হরি কর, ভাবি মনে মনে,  
 মহলের বাস উঠল এত দিনে,  
 পোদোর কিবা আছে ধন, সে সুধবে মহাজন,  
 মাথায় হাত দিয়ে ব'সে কাঁদিয়েছে ॥

( ৮ )

“সাধ ক'রে বনায়েছ রং মহল খানা ।  
 বাকীর দায়ে প'ড়ে তাও রবে না ॥  
 ( ৩৩২ ) হিজুল হরিতাল, করিয়ে মিশাল;  
 নানারূপ রঙ্গে লিখেছ দেওয়াল,  
 দিয়ে করণের খুনি, অহুরাগের সান্না খানি,  
 উঠল মটকা, খড় মুজ্জী টিকবেনা, ॥  
 মন, ভুই করলি মনি কোঠা, মানিক মুক্তা আঁটা,  
 হীরের কপাট তাহে রশের ছটা ;  
 মল, করলি প্রেম শিকল, দিলি রমের হাসকল,  
 ভাবের কুলুপ ক'রে প্যাট জাননা । ( খুলবি কিসে )  
 কি বলে সনাতন, শুন্নে পোদো শোন,  
 এমন যর করলি ছুঁচোর কৌতন ।

যাবে তুমি কুলি, কাঁদবে কুলি কুলি,  
আন্দবে যবে ও তোর পরোয়ানা ॥ ( হজুরহতে )

( ৯ )

"এবার আমি কাজ হারালাম ।  
মঞ্চে বিষয় বিধে, আপনার কর্ম দোষে,  
হায়রে জনম্, জনম্, হেরে যে এলাম ॥

এ দেহ তরঙ্গী এনে, বোকাই কবুলাম গরল কিনে,  
তা জেনে শুনে, এ যে আমার সাধের তরী ;  
তরী শুকনো ডাঙ্গায় ডুবায়ে দিলাম ॥

বনালাম এক ডাবের কুঁড়ে, মম আগুনে গেল পুড়ে,  
এবার বাজী করের হাতে যে ম'লাম ॥

না আমি মন্ত্র কাহিনী, ধরতে গেলাম কাল সাপিনী,  
আগে কি দংশিবে জানি, আমি বিষের জ্বালায় আঁলে, যে গেলাম ।  
নাম ধরলাম সোণার বেণে, নিতে নারুলাম সোণা চিনে,  
ঝেড়াই পিতল ক্রিনে ; গোসাঞী হরি পোদোয় বলে,

আমি চক্ষু থাকতে কাণা যে হলাম ॥

( ১০ )

ছ'সারী বেছ'সারী হওনা, অতএব বলি মন ।  
ক্লত মহাজনের ভরা, বেছ'সারে গেছে মারা,  
অগ্নির মুখে রেখে পারা, কণ্ডে হয় ধন উপার্জন ॥  
অগ্নি মুখে পারা কুটে, দেখে পারা যায় না চ'টে  
( তাহ'লে ) হ'তে হবে মাধার মুটে হবে না ধন উপার্জন ॥  
রঙ্গীর মন হরণ ক'রে, থাকতে হয় জীয়ন্তে ম'রে,  
অমুরাগের হাওয়া ধ'রে রপে দিয়ে দুঃখল ॥  
মুখ্ থাকতে বাক্য বন্ধ, মেখানে নাই কাম সম্বন্ধ,  
আছে কেবল প্রেম রতন ॥

পান্না থাকে ফুটের ধারে, এ কথা আর বোলব কানে,  
 থাকতে হয় জীবন্তে ম'রে, পুরুষ প্রকৃতি হু'জন ॥  
 মাধ ক'রে পরদার পুকুরে, বাঁপ দিলাম গো ঠিক হুপুরে,  
 পোদো ম'ল সত্ত্বঃ জ্বরে, আমি চোরসি ভ্রমণ ॥

দীন প্রীরসিক লাল দে ।

## ভ্রাস্তের প্রলাপ ।

—:—

আমি একজন সাধন ভজনহীন সাধারণ ভাবে সংসারাসক্ত জীব ও অতি মগ্ন ব্যক্তি । উদরামের জন্ত পীড়িত হইয়া অতি হীন দাসত্ব বৃত্তিতে জীবন অতিবাহিত করিতেছি ; সাধুসঙ্গ আমার ভাণ্ডে কখন হয় নাই এবং ইহ জীবনে কখনও যে হইবে তাহারও আশা দেখিতে পাই না, তবে সাধুরা অহৈতুক কৃপাসিক্ত, যদি দয়া করিয়া কেহ কখন দর্শন দিয়া চরণে স্থান দেন, তাহা হইলে এজীবন সার্থক মনে করিব ।

আমি কখন কোন প্রবন্ধ লিখি নাই, এই আমার প্রথম চেষ্টা ; প্রবন্ধে ভাষা-গত নানা দোষ থাকিবার সম্ভাবনা, সঙ্কল্প গাঠক পাঠিকাগণ নিজগুণে তাহা ক্ষমা করিবেন । আমি জানিমা আমার হৃদয়ের ভাবগুলি লিপিবদ্ধ করিতে কেন আমার ইচ্ছা হইল, তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, ভগবৎ প্রেরিত আমার ঐ ভাব সকল এই দুঃখ ও হুশ্চিন্তাপূর্ণ সংসারের মধ্যেও আমার সময়ে সময়ে আনন্দ প্রদান করে এবং আমার বিশ্বাস, আমার মত ভ্রাস্তরাও নিবিষ্ট চিন্তে উহা পঠ ও আলোচনার ক্রমিক আনন্দ লাভ করিবে, এই বিশ্বাসে উৎসাহিত হইয়া ভক্ত ও ভগবানকে প্রণাম করিয়া শক্তি প্রার্থনান্তর নিম্নে এই ভ্রাস্তের প্রলাপ লিখিলাম ।

শাস্ত্র জগত প্রতিবৎসরেই অজ্ঞাধিক পরিমাণে বিজ্ঞান শাস্ত্রে ( Science ) উন্নতি লাভ করিতেছে । কয়েক বৎসর গত হইল চিকিৎসাশাস্ত্রে "রপ্টজেনে

( Rantgen Ray ) বা “এক্স রে” ( X Ray ) নামক একটি বৈদ্যুতিক আলোক আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ আলোক অস্ত্র চিকিৎসকদিগের বিশেষ ব্যবহারে আইসে। ইহার প্রধান গুণ এই যে, ইহা এক পার্শ্ব হইতে কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পাতিত করিলে ঐ স্থানের চৰ্ম্ম, মাংস ইত্যাদি নরম গঠনগুলি ভেদ করিয়া স্থানীয় অস্থিগুলিকে অপর পার্শ্বস্থিত একটা বৈজ্ঞানিক দর্পণে প্রতিবিম্বিত করিয়া স্পষ্ট দেখাইয়া দেয়। এই আলোক ও দর্পণের সাহায্যে লৌহময় সিক্ককের ভিতরে কি কি কঠিন দ্রব্য আছে তাহাও দেখিতে পাওয়া যায়।

বিজ্ঞানে ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, জগতে যত কিছু পদার্থ আছে, অত্যন্ত কোমল হইতে কঠিনতম স্বর্ণ, লৌহ, ইস্পাত, প্রস্তর, প্লাটিনাম পর্যন্ত সমস্ত পদার্থেরই অণু, পরমাণু, যাহার সমষ্টি দ্বারা ঐ সকল পদার্থ বা বস্তু গঠিত, পরস্পর হইতে পৃথক থাকে, অর্থাৎ একটি পরমাণু পার্শ্ববর্তী পরমাণুর সহিত সংযুক্ত থাকে না, তাহাদের মধ্যে ব্যবধান থাকে। ঐ ব্যবধান Mer বা ব্যোম থাকে অর্থাৎ তাহা শূন্যময় এবং এই জগতই, অর্থাৎ জগতে কোন বস্তু নিরেট না হওয়া বিধায়, X Rayর সাহায্যে জালের মধ্য দিয়া দেখার স্থায়, কঠিন পদার্থ ভেদ করিয়াও দেখা যায়।

এক্ষণে ফল কথা এই যে, সামান্য X Ray যাহাকে আমরা মূল চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাই, তাহা যখন কঠিনতম পদার্থের অভ্যন্তরে প্রবেশ ও অবস্থান করিতে সক্ষম, তখন ভগবৎ সত্তা বা শক্তি যাহা X Ray অপেক্ষা অনন্তগুণে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম তাহা যে জগতের সমস্ত বস্তুতে অর্থাৎ পঞ্চমহাভূতে ওতপ্রোত ভাবে বিচ্রমান নাই তাহা কে বলিবে? বস্তুতঃ সর্বত্র ও সর্ব বস্তুতে সেই প্রাণ রূপী চৈতন্য আছেন বলিয়াই সকলের অস্তিত্ব অর্থাৎ সেই অনাদি অনন্ত, সর্বকারণ কারণ, প্রাণৈক বলভের প্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া জীবের ও জগতের অস্তিত্ব বৃদ্ধি ও বিকাশ হইতেছে।

তারপর কথা এই, ভগবৎসত্তা আবার জ্ঞানময় ও প্রেমময়, তিনি ঐ বিরাটরূপে সর্বত্র থাকিলেও তত্ত্ব হৃদয় রঞ্জনের জন্য সর্বদাই ভক্তের আরাধ্য মূর্তিতে ভক্তকে দেখা দিতেছেন এবং গোলকে আনন্দধ্বন্যরূপে ভক্তের সহিত নিত্যলীলা করিতেছেন। তিনি ভাবগ্রাহী, “ভাবগ্রাহী জনার্দনঃ”;—

“যে স্তম্ভ যে ভাবে তাঁর করে আশ্বাহন,  
সেই ভাবে আসে তিনি দেন দর্শন ;  
স্তম্ভত বৎসল হরি সর্বভাবনয়,  
সর্বরূপে সর্বস্থানে তাঁহার উদয়।”

তিনি সাধকের মন বুকিয়া, ভাব বুকিয়া ধন দেন এবং সাধকের হৃদয় যদি অকপট, শুদ্ধ ও অচুরাগী হয়, তাহা হইলে সাধক প্রস্তর পুঞ্জিলেও স্তম্ভবৎসল ভগবান তাঁহাকে রূপা করিবার জন্ত সেই প্রস্তরের মধ্য হইতে আরাধিত মূর্তিতে বা ভাবে তাহাকে দর্শন দিয়া য় স্তম্ভ উপলব্ধি করাইয়া আপনার করিয়া দেন, ইহাই পরমার্থ জগতের নিয়ম ; এবং ভগবান মিজো এই কথা বলিয়াছেন, যথা ;—  
“যে যথা মাংপ্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং ।” অর্থাৎ যে, যে ভাবে ভগবানকে ভজনা করে, ভগবান সেই ভাবেই তাহার সাধ পূরণ করেন। শাস্ত্রে ইহার ভূরিভূরি প্রমাণ আছে, তন্মধ্যে ভক্তের মান রক্ষার্থ স্তম্ভ হইতে নৃসিংহ দেবের আবির্ভাব ও প্রস্তর হইতে সাক্ষীগোপালের প্রকট ভাব ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত । তাহা হইলে ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, আমরা যদি কেবল মাত্র অকপট ও শুদ্ধচিত্তে সাধনা করিতে পারি, তাহা হইলে জগৎশুভ রূপা করিবেনই করিবেন । সাধন অকপট ও ত্রৈলোক্যিক হইলে প্রস্তরের মধ্য হইতেও যখন ভগবান তাঁহার আনন্দঘন মূর্তিতে সাধককে দর্শন দেন, তখন যে আমরা ভগবদ্ভাবে থাকিয়া সম্যকরূপে সাধুসেবা বা প্রতিমা পূজার দ্বারা তাঁহার দর্শন পাইব না ইহা নিতান্ত কুতর্ক ।

আমাদের যেমন ভাব, লাভ ও তেমনি হয় । কারণ ইহাও জড় জগতের ও ভাব জগতের একটি নিয়ম । Like “attracts like” সমজাতীয় বস্তু ও ভাব সমজাতীয় বস্তু ও ভাবকে আকর্ষণ কর । জল জলকে টানে ও জলের সহিত মিশাইয়া পরিমাণে বৃদ্ধি পায় তদ্রূপ আমরা যদি সর্বদা ভগবদ্ভাবে থাকিতে পারি, সর্ব বস্তুতে তাঁহার সত্তা দেখিতে পাইবার চেষ্টা করি ও সর্বকর্মে তাঁহারই কর্তৃত্ব ও মঙ্গল ইচ্ছা অনুভব করিতে পারি, তাহা হইলে জগতের স্থাবর জঙ্গম সমস্ত বস্তু অস্তিনিহিত অবিচ্ছিন্ন ভগবৎসংশ, শক্তি বা ভাব ও আমাদের ভাবের সহিত মিলিত হইয়া আমাদের ভাব কেহকে পুষ্ট করিয়া



অচিরে আমাদিগকে সেই ভাবময়ের চরণ প্রান্তে উপস্থিত করাইবে। তাই অমুরোধ, প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ ভাবে থাকিতে চেষ্টা কর, ভাবই সাধনা ভাবই চতুর্কর্গ ও প্রেমফলপ্রদাতা। যে সাধু ভাবধনে ধনী, জগতে তাঁহার কিছুই অপ্রাপ্য নাই; আনন্দময়ের অনন্ত সুখের ভাণ্ডার তাঁহার নিকট সদাই অব্যাহতদ্বার। পিতার ধনে যেমন পুত্রের অধিকার, জগত পিতার সমস্ত ঐশ্বর্যই সেইরূপ সাধুভুক্তের করতলগত। জ্ঞান, বৈরাগ্য, প্রেম, যশঃ, শ্রী ও বীৰ্য্য সমস্তই তাঁহার অঙ্গের ভূষণ এবং সর্বদা সে প্রেমময়ের প্রেমে ও বরাভয়রূপ দর্শনে মাতোয়ারা হইয়া জগতে অনাসক্ত ভাবে তাঁহারই কাণ্ড করিতে থাকে, সে জানে ও বিশ্বাস করে যে, জগতে তাঁহার অস্তিত্ব, তাঁহার দৈহিক সুখ সমস্তাগের জ্ঞান নহে; তাঁহার দত্ত দেহ রক্ষার্থ মাত্র চেষ্টা করিয়া তাঁহার ভাবে থাকিয়া নিরভিমনে, তাঁহারই নিয়োজিত জানে, ফলাফলের দিকে লক্ষ্য না করিয়া আত্মসুখ কামনায় জলাঞ্জলি দিয়া অনাসক্ত ভাবে সমস্ত কর্ম তৎপ্রীত্যর্থে করাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

“তঃ প্রীত্যর্থে কর্ম” ইহার ভাব ও ব্যাখ্যা নানা প্রকার হইলেও এই বহি-মুখী মনকে, আত্মগত হোক বা পরগত হোক, অন্তমুখী করিবার ও অন্তমুখী করিয়া রাখিবার চেষ্টাই, তাঁহার প্রীতি উৎপাদনের প্রধান কর্ম। জগতে যত কিছু সং কর্ম আছে তৎ সমুদায়েরই ঐ এক মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া প্রতীত হয়। যে কর্মের দ্বারা হৃদয় অন্তমুখী না হয়, অর্থাৎ যাহার দ্বারা বিবেক বৈরাগ্যের উদয় না হয়, আশ্রয় সংযম ও ত্যাগ অভ্যাস না হয়, চিত্তশুদ্ধি না হয়, যাহার দ্বারা সর্বত্র ও সর্ব বস্তুতে ভগবৎ সত্তা ভাবের উদয় না করে, যাহার দ্বারা, “তিনি একমাত্র কর্তা” এই জ্ঞান না জন্মায়, যাহার দ্বারা তাঁহার সরস্বা-পন্ন ও আশ্রিত ভাব আনয়ন না করে, যাহার দ্বারা আমাদিগকে তাঁহার উপর পূর্ণ নির্ভর করিতে শিক্ষা না দেয়, যাহার দ্বারা তাঁহার পদে ও কার্যে আমাদিগের আশ্রয় সর্সর্পণের সহায়তা না করে এবং যাহার দ্বারা আমাদের হৃদয়ে নিঃস্বার্থ বিশ্বজনীন প্রেমের স্বরূপ ও বর্ধন না করে সেই সমস্তই অকর্ম বা কুকর্ম।

মনকে অন্তমুখী করিবার নানা প্রকার উপায় থাকিলেও তিনিই আমাদের একমাত্র আশ্রয় ও মঙ্গলদাতা জানে ভগবৎপদে, ভাবে, কার্যে ও সৈবায়

শ্রীতি ও প্রেমের সহিত আত্ম সমর্পণই মূল ও প্রধান। যিনি আত্ম সমর্পণ করেন, তিনি আপনার বলিতে কিছু রাখেন না; যাহা কিছু থাকে, তাহার দ্বারা অষ্টকালীন ভগবৎ সেবা করেন। এই ভগবৎ সেবা তিন অংশে হইয়া থাকে; চিৎ অংশে, জীব অংশে ও জড় অংশে। চিৎ অংশে ইষ্ট দেবতার নাম, রূপ, লীলা বিষয়ের ধ্যান, ধারণা ইত্যাদি; জীব অংশে সাধু ও ভক্ত দেহে ভগবৎ সন্তার অধিক প্রকাশ হেতু ভগবৎ ভাবে ভক্ত সেবা এবং জড় অংশে বহিমুখ জীব (যথা রোগী, দুঃখী দরিদ্র, অজ্ঞানী, পাপী ইত্যাদি) ও প্রকৃত জড়, তাঁহারই কোন না কোন শক্তির আধার জ্ঞানে ভগবৎ ভাবে তাহাদের সেবা। ফলতঃ সাধক সর্বেশ্বর দ্বারা যে নাম, রূপ বা ভাব অবলম্বনে তাঁহার সেবা করুক না কেন, সে কখনও ভগবৎ ভাব ছাড়া হয় না।”

(সে) স্বাবর জন্ম দেখে না দেখে তাঁর মুক্তি।

স্বাধা স্বাধা নেত্র পড়ে তাঁহা ইষ্ট স্মৃতি ॥

তাঁহার বিশ্বাস, গুরুরূপে কৃষ্ণ শক্তিই জীবগণে রূপা করেন, মাতা পিতার মেহরূপে কৃষ্ণ সংসার পালন করেন, সুধারূপে তিনিই জীব দেহকে আহার করাইয়া পুষ্ট করেন, নিদ্রারূপে তিনিই জীবের শ্রান্তি দূর করেন, ক্রোধ রূপে তিনিই অজ্ঞায় ও অত্যাচার নিবারণ করেন, কামরূপে তিনিই তাঁহার সংসার রক্ষা করেন এবং অহং জ্ঞানে ও সুখেচ্ছায় তাড়িত করিয়া তিনিই জীবকে তামসিক অবস্থা হইতে জাগ্রত করেন এবং পরে পুরুষকার শিক্ষা দ্বারা রজোগুণের বৃদ্ধি করাইয়া, জগতের সুখ দুঃখ ভোগ করাইয়া, সুখের নধুরতা ও হেয়তা বুকাইয়া, তত্ত্ব জ্ঞান জ্যোতির সঞ্চার করিয়া জীবকে ক্রমশঃ সত্ত্ব গুণের গণ্ডির ভিতর আনিয়া উপরি উক্ত তিন প্রকারের সেবার্থ প্রেমে আত্ম সমর্পণ চেষ্টাই যে পরম, পুরুষকার তাহা বুকাইয়া দেন। আমরা তাঁহার এই মঙ্গল কার্য বৃদ্ধিতে পারি বা না পারি, বৃদ্ধিতে পারিয়াও তাচ্ছিল্য বা মাশ্র করি বা না করি, তিনি সর্বদাই আমাদের দেহ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ইত্যাদির সম্ভব মত হিত করিতেছেন, গীতা ১০অ, ১১শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন—

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ ।

নশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞান দীপেন ভাস্বতা ॥

অর্থাৎ—

অবাচিত অনুগ্রহ করিবার ভরে,  
 গুপ্ত থাকি তাঁহাদের বুদ্ধি বৃদ্ধি পরে ;  
 তাহে করি তত্ত্ব জ্ঞান জ্যোতির সঞ্চার,  
 জ্ঞান জ্যোতিঃ দিয়া নাশি অজ্ঞান আধার ।

জগতের কার্য তিনি এইরূপেই চালাইতেছেন, আমরা তাহা বুঝি না বলিয়াই বৃথা কৰ্ত্তা সাজি ও সুখ বাসনার স্বার্থকে হইয়া কৰ্ম্ম করি এবং তজ্জগতই কৰ্ম্মের বন্ধন কঠিন করিয়া ফেলি। হায়! আমরা কি ভ্রান্ত? আমরা এমন প্রেমিক অহৈতুক মঙ্গলদাতাকে, আমাদের প্রাণের একমাত্র প্রাণকে, আমাদের সৰ্ব্ব সুখ ও ঐশ্বৰ্য্যের একমাত্র আকরকে একেবারে ভুলিয়া থাকিয়া, তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া, যে কি মহা অপরাধ করিতেছি তাহা একবার সপ্নেও ভাবিনা।

প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ? তাহা হইলে এখন ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, দৈহিক সুখাভিলাষে কৰ্ত্তা সাজিয়া, স্বার্থপর ও অপ্রেমিক হইয়া, আত্ম সমর্পণ, নির্ভরতা ও তাঁহার প্রীতির কার্য ত্যাগ করিয়া, অনিত্য দ্রব্য আহরণের চেষ্টায় ঘুরিয়া, আমরা আমাদের এই দুর্দশা করিয়াছি। কোথায় আমরা রাজ রাজের ধরের সম্ভান, তাঁহার অনন্ত ঐশ্বৰ্য্যভোগী, আর কোথায় আমরা দীন দুঃখী, সামান্ত উদরানের জন্ত লালায়িত। হায়! আমরা স্বেচ্ছায় আমাদের এই অবস্থা ঘটাইয়াছি এবং ইহাও ভুলিয়া গিয়াছি যে, জগতের অচেতন বা সচেতন পদার্থ যিহারা আমরা সুখ সন্তোষ ও আনন্দ লাভ করিতে পারিব বলিয়া তাহার প্রাপ্তির জন্ত ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছি, তৎ সমুদয়ই তাহাদের সেই সেই আনন্দোৎপাদিকা ও সুখদায়কশক্তি সেই সৰ্ব্ব শক্তি মান হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ তিনিই সেই বস্তু সকলের সেই সেই গুণরূপে বর্তমান আছেন। এক্ষণে যদি এই সমস্ত বুঝিতে পারিয়া আমরা পুনরায় আশ্রোদ্ধারের চেষ্টা করি ও ঈশ্বর পিতার নিকট তদর্থে কাঙ্ক্ষার ক্ষমতা প্রার্থনা করি, তাহা হইলে শীঘ্রই তাঁহার রূপায় পুনরায় আমাদের সুপ্রভাত হইবে, সাধন পথের বিঘ্ন সকল ক্রমে ক্রমে অপসারিত হইবে এবং আমাদের সমস্তই সুযোগ হইয়া যাইবে, কিন্তু তাহা আমরা করি কৈ? অমরা নশ্বর

সুখ বাসনায় ও ভোগ লালসায় এমনি মোহাজ্জর যে, ভুলিয়াও এই সকল বিষয় একবার চিন্তাও করি না, বরং তুচ্ছ ক্ষণস্থায়ী সুখের জগ্ন লালসায়িত হইয়া অমূল্য রত্ন জীবন, সাধনবিদ্যা বুথা নষ্ট করিতেছি। দেব! গুরো! প্রভো! ভগবন্! আমাদের সুমতি দিন, সাধক ও সাধু ভক্তগণ আপনাদের চরণে ধরি, আশীর্বাদ করুন, যেন মন সংসার ভুলিয়া ভগবৎপদ প্রাপ্তির কামনায় চেষ্টিত হয়; আর যেন বুথা মায়্যা ধোরে ঘুরিয়া না বেড়ায়।

আজকাল সাধারণতঃ জগতে সাধন ব্যাপার সম্বন্ধে এক মহা ভ্রম দেখিতে পাওয়া যায়। নরনারী দীক্ষিত হইলেই আপনাদের কৃতার্থ মনে করে। দীক্ষিত হইলে তাহারা প্রতিশ্রুত হইয়া যে কি গুরুভার স্বক্কে করিল, তাহারা যে স্বচ্ছায় "ধর্ম ক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে" কি কুরু পাণ্ডব সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল, তাহারা তাহা একবারও ভাবেনা, তাহারা বুঝেনা যে, দীক্ষিত হইবার দিন হইতেই তাহাদের মনের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা উচিত, অর্থাৎ মনকে কখন বুথা আমোদ প্রমোদে সময় অতিবাহিত করিতে দেওয়া উচিত নহে এবং যখনই মন ভগবৎ ভাব ত্যাগ করিয়া বহির্মুখ হইবে, তখনই তাহাকে বলে ফিরাইয়া আনা একান্ত আবশ্যিক ও কর্তব্য। দীক্ষিত ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ ভাবে যে, "যেন তেন প্রকাশেণ" একবার সংখ্যা নাম জপ করিলেই ও চক্ষু মুদ্রিত করিয়া একবার ধ্যানে বসিলেই তাহাদের সাধনা হইয়া গেল। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম মূলক ও অপরাধ জনক, ইহা মনকে আঁধি ঠাণ্ডা ও আত্ম বধনা মাত্র।

আমাদের বুঝা উচিত যে, দীক্ষিত হইলে আমাদের যে সকল ক্রিয়া করিতে হয় এবং যে সকল মন্ত্র জপ ও যাহা ধ্যান করিতে হয়, তাহাদের বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। এই উদ্দেশ্য প্রধানতঃ দুইটি, প্রথমতঃ, আত্ম সংযম, স্বার্থ ত্যাগ ও অনাসক্তি দ্বারা চিন্তাশুদ্ধি হইলে, সেবার্থ প্রীতি ও প্রেমের সহিত আত্ম সমর্পণ। দ্বিতীয়তঃ, মনস্থির। যাহা কিছু প্রক্রিয়া আছে, যথা—পাঠ, পূজা, ব্রত, তীর্থভ্রমণ, সাধারণ ভাবে সাধুসঙ্ঘ ও পরোপকার ইত্যাদি সকলেরই উদ্দেশ্য প্রথমে স্বার্থ ত্যাগ। শিক্ষা দ্বারা চিন্তা শুদ্ধি হইলে সাধককে সেবার্থ প্রেমে আত্ম সমর্পণোপযোগী করা। মন্ত্র, জপ, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা প্রভৃতির একমাত্র উদ্দেশ্য মনস্থির করণ, জগতে কোন কার্য হুচাকরূপে সম্পন্ন করিতে

হইলে, কোন বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে হইলে, তাহা নিবিষ্ট চিন্তে, অধ্যবসায় সহকারে করিতে হয় তবেই ফললাভ নতুবা সমস্ত পরিশ্রমই বিফল হয়। সাধন রাজ্যেও তদ্রূপ মনস্থির অতি আবশ্যিক, কিন্তু স্বার্থ ত্যাগ ও আত্মসংযম না করিতে পারিলে, হৃদয়ে কামনা ও আসক্তি থাকিলে, চিত্ত শুদ্ধি না হইলে মনস্থির হওয়া বড় কঠিন ব্যাপার; এই নিমিত্ত চিত্ত শুদ্ধির জন্ত, নিকাম ও অনাসক্ত হইবার জন্ত, বিশেষ চেষ্টিত হওয়া অগ্রে কর্তব্য। সত্য বটে, চিত্ত মালিন্য থাকিতেও হট যোগের দ্বারা মনস্থির হয় এবং ভগবৎ সত্ত্বা সর্কত্র ও সর্কদা বিরাজমান থাকা বিধায় স্থির নদীতে চল্ল বা স্থূর্য্য প্রতিবিশ্বের স্থায় সাধকের ভাব অনুযায়ী তাহার ঐ স্থির মনে ভগবৎ রূপ ভাব ইত্যাদির প্রতি-বিশ্ব পড়ে, কিন্তু, শুরূপ মনস্থিরতা ও সাধনা জীবকে সময়ে বিপথ গামী, করে, কারণ মূলে স্বার্থ ও কামনা মালিন্য থাকায় সাধকের অতি শীঘ্রই পতন হয় ও কর্ম বন্ধন শিথিল না হইয়া বরং কঠিনতর হইয়া যায়। এই কারণে শুদ্ধ সাধকের পক্ষে চিত্ত মালিন্য থাকিতে হটযোগ নিষেধ। রাজযোগ অথবা ভক্তি যোগই তাহাদের পক্ষে প্রশস্ত। স্থির মনে যেরূপ ভগবৎ সত্ত্বার প্রতি-বিশ্ব সহজে পড়ে, তদ্রূপ শুদ্ধ চিন্তেও অনায়াসে তাহার দর্শন পাওয়া যায়। ভগবান সর্কত্র সর্কদাই বিরাজমান থাকা বিধায় তাঁহাকে সমস্ত বস্তুতেই সর্কত্র সর্কদাই দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু দর্পণ ধূলি কণার দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিলে তাহাতে কেমন প্রতিবিশ্ব পড়ে না, বা অতি অস্পষ্ট রূপে পড়ে, তদ্রূপ ভগবৎ সত্ত্বার অন্তিম আমাদের মলিন হৃদয়ে আমরা বুঝিতে পারি না, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে আমরা আমাদের চিত্ত দর্পণ হইতে কামনা, আসক্তি ও অভি-মানরূপ মালিন্য পরিষ্কৃত করিও পারিব তদন্তেই আমাদের ভাবানুযায়ী স্বপ্রকাশ ও প্রেমানন্দ ধন ভগবান আমাদের চিদপর্শে স্পষ্ট প্রকাশ পাইবেন ও আমরা তাহা বুঝিতে পারিব এবং তাহার ফল স্বরূপ আমাদের হৃদয়ে সেবার্থ আত্ম সমর্পণাপযোগী লিঃস্বার্থ প্রেমানন্দের উদয় হইবে। চিত্ত শুদ্ধির আরও একটা বিশেষ উপকারিতা এই যে, চিত্ত যত শুদ্ধ হইবে, হৃদয় হইতে যত পরিমাণে কামনা, আসক্তি, অভিমান ইত্যাদি অপসারিত হইয়া যাইবে, মনঃ স্বতঃই তত স্থিরতা লাভ করিবে এবং সাধক তখন সর্কদাই দেখিবেন যে, "আঁক আছে চিত্ত পটে বাঁকা মদন মোহন"। তাই বলিতেছি, প্রিয় পাঠক

পাঠিকাগণ, এ, ও, তা; সাত পাচ বুঝতে, যাইয়া আমার ন্যায় বুধা নময় নষ্ট করিও না; এক একটি ভাষের সাহায্যে চিত্ত শুদ্ধির জন্য একান্ত চেষ্টা কর।

ভগবৎ ভাবের সাহায্য লইলে চিত্তশুদ্ধি, আশ্রয়-সমর্পণ ও প্রেমভাব অতি শীঘ্র হয় অর্থাৎ তিনি সর্বভূতে আছেন, তিনিই সকলের প্রাণের প্রাণ, সমস্ত সাজা বা নকল কর্তার অন্তঃস্থিত একমাত্র আসল কর্তা তিনিই, জগৎ সংসার তাঁহার, আমরা তাঁহারই উদ্দেশ্যের জন্ত সৃষ্ট লালিত ও পালিত হইতেছি। তাঁহার প্রীত্যর্থ দৈহিক সুখ বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া ফলাকাজ্জ্বা রহিত হইয়া অনাসক্ত ভাবে তাঁহারই নিয়োজিত নামে প্রেমের সহিত সর্বভূতে তাঁহারই সেবার কর্ম করাই আমাদের একমাত্র কার্য। তিনিই আমাদের একমাত্র মঙ্গলময়, আশ্রয়, ও ভরসা স্থল এবং সকল সুখ ও সম্পত্তির আকর। তিনিই আরাধিত্যকে নিত্য, শুদ্ধ, চিদানন্দ ভোগ করাইবার জন্য আমাদের পাপক্ষয় করিয়া নরকান্ত করিবার জন্ত রূপায় নয়কান্তি ধারণ করিয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়া আমাদের যুগে যুগে শিক্ষা দিয়া থাকেন ও এইরূপে অবস্থা বিশেষে আরাধিত্য মূর্তিতে তিনি নিজে অথবা তাঁহার সিদ্ধ ভক্তগণের দ্বারা নিত্যই সাধকের মনোব্রাজ্যে দর্শন দিয়া সর্ব বিষয় নাশ করিয়া সর্বতোভাবে তাহার হিত করিতেছেন।

অত্মপিও নিত্যলীলা করে গৌর রাগ।

আঁখি যার আছে সেই দেখিবারে পায়॥

গীতা ৪ অঃ ৭, ৮, শ্লোক—

যস্য যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থান মধর্মস্য ওদাত্মানং স্বেজাম্যহম্। ৭

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ হৃঙ্কতাম্।

ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সন্তবামি যুগে যুগে ॥ ৮

অর্থঃ—

ধর্ম হানি, পাপ বৃদ্ধি যখন যখন;

আবিভূত হই আমি অর্জুন তখন। ৭

সামুদয়ের পরিত্রাণ দান করিবারে;

পাপীদের ধ্বংস নীতি সাধনের তরে।  
 ধনঞ্জয়, ধর্ম ধন স্থাপন করিতে,  
 যুগে যুগে অবতীর্ণ হই অবনিতে ॥

সীতা ৯ম অঃ ৩৩, ৩৪ শ্লোক—

অনিত্যমহুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্বমাম্। ৩৩  
 মম্মনা ভব মত্ততো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।  
 আমেবৈচ্ছাসি যুক্তেবুমাআনং মংপরায়ণঃ ॥ ৩৪

অর্থঃ—

তাই বলি এ অনিত্য সংসারে আসিয়া,  
 আমায় ভজনা কর মন প্রাণ দিয়া। ৩২  
 আমাতেই রাখ চিত্ত মম ভক্ত হও  
 নমস্কার কর যোরে উপাসনা লও,  
 এরূপে আমাতে হলে সমাহিত মন,  
 নিশ্চয় আসিয়া আমি দিব দরশন ॥ ৩৪

শ্রীমদ্ভাগবৎ একাদশ স্কন্ধ ১১ অধ্যায় ২৮ শ্লোক—

ত্বং ব্রহ্ম পরমং ব্যোম পুরুষং প্রকৃতেঃ পরমঃ।  
 অবতীর্ণোহসি ভগবন্ শ্বেচ্ছোপাস্ত পৃথগ্ বপুঃ ॥

অর্থঃ হে ভগবন্! আপনি প্রকৃতির নিয়ন্তা পরাংপর পরব্রহ্ম, মহাকাশের  
 ন্যায় নির্লিপ্ত ভাবে সর্বত্র অবস্থিত থাকিয়াও স্বীয় ভক্তগণের সাধ পূরণার্থ পৃথক  
 পৃথক বিগ্রহ ধারণে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে দর্শন দিয়া থাকেন। এইরূপ  
 ভাব মকল হৃদয়ে পৌষণ করিয়া আমরা যদি সর্ব বস্তুতে তাঁহার অস্তিত্ব দর্শন  
 করিতে, সর্ব কর্ষে তাঁহারই কর্তৃত্ব অনুভব করিতে ও সেই সেই কর্ষে তাঁহার  
 মঙ্গল উদ্দেশ্য বুঝিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে অচিরে আমাদের চিত্ত শুদ্ধ ও মন  
 স্থির হইবে এবং আমাদের হৃদাকাশে সেই প্রেমময়ের আনন্দ স্বনমুর্তি দেখিয়া  
 আমরা প্রেমে আত্মহারা হইতে পারিব।

ভাব সাগরে অশেষ অমূল্য রত্ন আছে। সাধকের যোগ্য ভাব বা নামটি ভাল লাগে ও যাহাতে তাহার মন মাতিয়া উঠে, সেইরূপ ভাব বা নামটি যতনে হৃদয়ে ধারণ করিয়া প্রার্থনা যোগে অকপট প্রাণে, প্রেমে সেবার্থ আত্ম সমর্পণের চেষ্টা করা তাহার উচিত। তাহাতেই তাহার উদ্দেশ্য শীঘ্রই সফল হইবে, সে মায়্যা ও কর্ত্ত্ব বন্ধন কাটাইবে এবং প্রেমময়ের রাজ্যে স্থান পাইয়া অতুল ঐশ্বর্য ও প্রেমের অধিকারী হইয়া সদানন্দে থাকিয়া সাদরে তাহারই কর্মে ব্রতী থাকিবে; নতুবা এইটি ভাল, এইটি মন্দ এইটি উৎকৃষ্ট, এইটি নিকৃষ্ট, এই বিচারে জীবন নৃশা নষ্ট হইয়া যায় ও মন অবিখ্যামী হয়। আরও কথা—সাধন পথ, ক্রিয়া বা ভাব নানা প্রকারের, সেইজন্ত অপরের ভাব, যাঁহা আমরা ধারণা করিতে পারি না ও যে ভাবে আমরা সাধনা করি নাই, তাহা অপরে উৎকৃষ্ট বলিলেও আমাদের ধারণা করিতে যাওয়া অবিবেচকের কার্য, কারণ তাহা সাধন রাজ্যে আমাদের মস্তকের গতি ও স্তরের সহিত না মিলিত হওয়ায় আমাদের সহজ সাধ্য বোধগম্য হয় না এবং তজ্জন্ত তাহার দ্বারা আমাদের মন প্রাণ সহজে মাতিয়া উঠে না, স্বয়ং ভগবান এই জন্তই বলিয়াছেন “পরধর্মঃ ভয়াবহঃ” ও রাম রামানন্দ বলিয়াছেন “কিন্তু যার যেই রস সেই সর্কোত্তম”। অবশ্য এ সব উক্তি আরও উৎকৃষ্টতর ব্যাখ্যা আছে। ভগবানের অনন্ত জগতে অনন্ত নীলার অনন্ত বিচিত্রতা, তিনি যাহাকে যে রূপে যে ভাবে মাতাইয়া নাচান, তাহাকে সেইরূপ সেই ভাবেই নাচিতে হয় ও ভাব শুদ্ধ হইলে সেইরূপে সেইভাবে অকপটে নাচিয়াই সাধক মনে আনন্দ পায় ও উন্নতির সোপানে ক্রমশঃ সহজে অগ্রসর হয়; তবে যিনি সকলকার ভাব বা-ইষ্ট মুক্তির ভিতর আপন ইষ্ট দেবতাকে দেখিতে পান, তিনিই উৎকৃষ্ট সাধক; যথা শ্রীমদ্ভাগবত ১১ঃস্কঃ, ২ অধ্যায়, ৪৩ শ্লোকঃ—

সর্কভূতেষু যঃ পশ্যেৎভগবত্বা বমায়নঃ ।

ভূতানি ভগবত্যাশ্ৰেয ভাগবতোত্তমঃ ॥

“যে ব্যক্তি ভূত ভৌতিক যাবতীয় পদার্থের অন্তরে সর্ক পরিপালনকারী সর্ক-ব্যাপী পরমাত্মা হরির সর্কৈশ্বর্য পূর্ণ ভাব এবং সেই-পরিপূর্ণ পরমাত্মাতে যাবতীয় পদার্থের বঙ্গভাব সন্দর্শনে সমর্থ হয়, তিনিই ভাগবত প্রধান বলিয়া পরিকীর্ণিত,



শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি ।

# ভক্তি ।

১১শ সংখ্যা—৮ম বর্ষ ।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী ।

ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্ত্র জীবনম্ ॥

## প্রার্থনা ।

ভোগে ভোগপ্রদে ভোগ্যে তথা ধন জনাদিসু

প্রবৃত্তি রূপস্বং ভাসি ত্বং প্রবৃত্তি প্রদোহরিঃ ।

হে দীনদয়াময় ! ভোগে ও ভোগ্য বস্তুর ব্যবহারে এবং ধন জন দেহ  
গেহাদিতে তুমিই প্রবৃত্তিরূপে বর্তমান ইহা অনুভব করিতেছি । আবার তুমিই  
প্রবৃত্তি দিতেছ প্রবৃত্তিরূপে তোমারই মহিমা আজ আমার প্রাণে তোমার ভাব  
আগাইয়া দিতেছে । ভোগ করিতে করিতে কেন ভোগে প্রবৃত্তি আসে এই বিষয়  
অনেক ভাবিলাম, অনেক বিচার করিলাম এবং অনেক শাস্ত্র প্রমাণ ও ভক্তের  
ব্যবহার সংগ্রহ করিলাম, কিন্তু কোনরূপেই কোন একটা বিষয়ে যে আমার কর্তৃত্ব  
আছে তাহার বিশুদ্ধ প্রমাণ পাইলাম না । তাই ভাবিতেছি আমার তুে কোন  
কিছুতেই কর্তৃত্ব নাই, আমার তো অভিমান করিয়া কিছুই করিবার সাধ্য নাই।

তুমি ভোগ্যবস্তু মিলাইয়া দিতেছ আবার তুমিই ভোগের প্রবৃত্তি প্রদান করিয়া ভোগ করাইতেছ ; তবে আর ভয় কি, তোমার চরণে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া তোমার হইতে পারিলেই সকল চিন্তা বিদূরিত হইবে। যে ভোগ ও যে ভোগ্যবস্তু তোমার ভাবে ভাবাইতে পারে, যাহাতে কৃথা অভিমান আসিয়া তোমাকে ভুলাইয়া না দেয়, সেইরূপ ভোগ্যবস্তু প্রদান করিয়া ভোগে প্রবৃত্তি দাও, প্রাণ ভরিয়া, ভাবনা রহিত হইয়া, মনের আশা মিটাইয়া ভোগ করি। কিন্তু দীনদয়াল ! এই দুর্বলের প্রতি সেরূপ ভোগ প্রবৃত্তি ও সেরূপ ভোগ্যবস্তু প্রদান করিও না যাহাতে তোমায় ভুলিয়া যাই।

যতদিন তোমায় না চিনিব, যতদিন তোমার অস্তিত্বে সুস্পূর্ণ বিশ্বাস না পাইব এবং যতদিন অভিমান শূন্য হইতে না পারিব, ততদিন তুমি প্রবৃত্তিরূপেই প্রকাশ পাইয়া ভোগ সুখে আসক্ত করিয়া রাখিবে ইহা স্থির নিশ্চয়রূপে বুঝিয়াছি। আবার ইহাও মনে বিশ্বাস আছে যে, যেদিন তোমারই কৃপায়, প্রাণে প্রাণে তোমারই আকর্ষণে তোমাকে পাইতে প্রাণ ব্যাকুল হইবে, সেই শুভদিন ভিন্ন তোমাকে নিরুত্তি স্বরূপে দেখিতে পাইব না।

হে নাথ ! হে সন্তাপহারিন্ ! নিবৃত্তিরূপে প্রাণে প্রাণে দেখা না দাও তাহাতেও ক্ষতি নাই, বিষয় ভোগ সুখ হইতে নিরাশঙ্ক না করণতাহাতেও মনে দুঃখ নাই, কিন্তু প্রবৃত্তিরূপে তুমি যে আমার মনোরাজ্যে বিরাজ করিতেছ, তোমারই প্রেরণায় সকল হইতেছে ও করিতেছি এই অশেষ বিশ্বাস দাও।

হে প্রবৃত্তিপ্রদ ! হে প্রবৃত্তি স্বরূপ ! ভাব স্থায়ী করিয়া দাও প্রবৃত্তি স্বরূপেও যে তুমি হৃদয়ে বিরাজ করিতেছ, এই ভাবে তোমায় লইয়া দিবানিশি বিষয় ভোগ করিয়াও অকর্তা এবং অনাশঙ্ক হইয়া সর্বদা আনন্দ অনুভব করি, দীন হীনের ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীদীনবন্ধু বেদান্তস্বরূপ ।

## হে গৌরাজ !

—:০:—

(তুমিই কি সেই জন ?)

শিশু কাল হ'তে বুঁজেছি যাহারে, তুমিই কি সেই জন ?

কেঁদে কেঁদে সারা, হ'লাম পথ হারা, এতদিনে ধরা দিলে কি আপন !!

আমি তোমারই ব'লে যদি চিনাইলে,  
তুমি আমারই, ব'লে যদি জানাইলে,  
তবে, দেখো যেন নাথ, আর কোন কালে,  
দীনে ভুলনা, এ নিবেদন হে ।

মনের মানুষ খুঁজিতে খুঁজিতে,  
পেয়েছি তোমারে বহু আয়াসেতে,  
এসহে নিভুতে হৃদয়-বাস্নেতে—  
রাখি করি সফল জীবন হে ।

না ভুলিয়ে আর সৎসার মায়ায়,  
দাসী ভাবে নিতি পুঞ্জিব তোমায়,  
দেখিব তোমারে, দেখিবে আমায়,—  
হবে হৃদয়ে হিয়া মগন হে ।

ঐশ্বৰ্য্যে ভুলিয়া গিয়াছিহু দূরে,  
তাই, তুমি সন্নিয়া ছিলে হে অন্তরে,  
প্রখন ধরা যদি দিলে অধম জনেরে,  
ক'রনা আর আঙ্গ গোপন হে ।

প্রাণের ভিতর আলোকিত করে,  
 ভাব দেহে তোমায় দেখি অস্তঃপুরে,  
 সংসার-বড়াই আমি ধীরে ধীরে—  
 ভেসে দেয় সুখ মিলন হে ।

বিষামৃত গোরা প্রেমের পরিচয়,  
 এমনি ভাবে সুখি দেখাইতে হয় !  
 ডুবি অমৃত সাগরে, কড় বা গরলে,  
 প্রাণ হয় উচাটন হে ।

ভেবেছি হে আমি তোমায় নিলজন,  
 ( তাই ) ভাবিয়াছি সার যুগল চরণ,  
 চিরকালের তরে দাওহে শরণ,—  
 হের শরণাগত, অভাজন হে ।

শ্রী রসিকলাল দে ।

## “বিভু গীতি” ।

—:—

( ১ )

হরি প্রেমে মজ মন আমার ।  
 পড়ে মায়া জালে শ্রীহরি ভুলিলে,  
 শেষে সেদিনে কি হবে তোমার ।

এ পাপ সংসার, সকলি অসার,  
 শ্রীহরি চরণে, তাহে পারাবার ॥  
 হইয়া সুস্থির, জপ নিরন্তর  
 ব্রহ্ম হরিনাম হৃদয় মাকার ।

ভাই, বন্ধু, পুত্র, আছয়ে যতেক  
সময়েতে সব ভাবিয়া না দেখ,  
অসময়ে তোরে কে করে নিস্তার,  
হরি বিনা কেহ নাহি তারিবার ॥

(২)

হরি হে করি কি উপায় !  
পড়িয়ে বিষম ফেরে প্রাণ বুঝি যায় ।  
হৃর্জয় ভয়ে অন্তর, কাঁপে সদা ধর ধর  
এ হৃন্তরে রক্ষাকর হইয়া সদয় ।  
কায় প্রাণে নিবেদন, করি হে দীনরঞ্জন !  
কিঙ্করারে শ্রীচরণ দাও রুপাময় ।

(৩)

ত্রাহি শ্রীমধুসূদন ঠেকেছি বিষম দায় ।  
তব পদাশ্রয় বিনা না দেখি মম উপায় ॥  
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ মাৎসর্য্য সহ,  
আমায় করি আজ্ঞাবহ আঁধারে সদা ঘুরায় ।  
সংসারে ( সাগরে ) তরঙ্গ ভারি,  
তাহে মম জীর্ণ তরি ( দেহ ),  
ভরসা চরণ তব, তুমি বিপত্তি বারণ,  
( তাই ) লইলাম শরণ আজি ঐ রক্ষা পায় ॥

দীনা—শ্রীমতী কুম্ভকুমারী দেব্যা ।

## আর কিছু নয় ।

—:—

( ১ )

মিশে যায় কালের প্রবাহে,  
জীবনের দিন যত জল বিশ্ব প্রায় ।  
যেমতি মরুতৃ হৃদি, মরিচিকা নিরবধি, ছলনায় মোহে ;  
তেমতি এ হৃদি মোর প্রলুদ্ধ ধরায়,  
মায়ায় মোহময় অসার আশায় ।

( ২ )

স্বরভি কুসুম দলভরা  
সংসার আগার, নহে আনন্দের ধাম ।  
মায়া মমতায় ঘেরা, সহজেই আত্মহারা,  
পাগলের পারা ;  
ভুলিয়া পরম বস্ত্র অস্তি মমোরম,  
বাছে মিলে নিত্যধাম অনন্ত আরাম ।

( ৩ )

দয়াময় ভক্তবৎসল !  
মানস ভেষণে তুমি দেহ সমুদয় ।  
ভাবময় তবাবে, কিবা সুখ আছে তবে ?  
ভাবি সদাকাল ;  
রাতুল চরণে তব মতি যেন রয়,  
অভাব হৃদয়ে এই আর কিছু নয় ।

উদ্ভাস্ত পথিক ।

## একটা গীত।

হে বিভো! পাব কি বারেক তব দরশন ?  
 ব্যাকুল মানসে সদা করি অবেষণ ॥  
 কত দিবা সন্ধ্যা কত, কতই যামিনী গত,  
 খুঁজে খুঁজে ফিরিলাম না পাই সন্ধান ॥  
 শ্রামল ব্রততিলে, নিশীথে গগন কোলে,  
 দেখিলাম পাতি পাতি রুখা পর্যটন ॥  
 কি মোহ মমতা তারে, পরাণে বাঁধিলে মোরে,  
 বাসনা, সদাই হেরি ও রাস্তা চরণ ॥  
 পবিত্র সে ভালবাসা, অমিয় মধুর ভাষা,  
 জাহ্নবীর কুলুশনে করেছি শ্রবণ।  
 ( বিভো ) পাবনা কি বারেক তব দরশন ?

উদ্ধৃত পথিক।

---

 ভ্রাতের প্রলাপ।
 

---

( পূর্ব প্রকাশিতের পর । )

পূর্বে উক্ত হইয়াছে তিনিই সর্বময় কৰ্তা ; আমাদের যেমন করান আমরা  
 তেমনি করি ; একথা সত্য, কিন্তু ইহা তোমার আমার ব্যবহার বা ভ্রম সাপেক্ষ  
 নহে। যিনি ঐরূপ অভেদ জ্ঞানে জীবন গঠিত করিয়া অতিবাহিত করিতেছেন,  
 যাহার দেহাত্ম বুদ্ধি নাই, যিনি “আমি বা আমার” বলিতে কিছু রাখেন নাই, অর্থাৎ  
 যাহার অভিমান বা কোন বাসনা ও আঁসক্তি নাই, তিনিই ঐরূপ বলিতে বা  
 ভাবিতে পারেন। তুমি আমি, যাহারা কামিনী কাকন ও অভিমান ইত্যাদির

জীতদাস, যাহারা পূর্ণভেদ জ্ঞানে পরের অনিষ্ট ও অহুবিধা করিয়াও সদাই আপনাদের দৈহিক সুখ স্বচ্ছন্দতা ও আধিপত্যের জ্ঞান ব্যস্ত তাহাদের মুখে ও কথা শোভা পায় না এবং তুমি আমি যদি ওরূপ বলি জগৎ আমাদিগকে ভণ্ড বলিতে বাধ্য। সুখ মুখে বলিলে কোন ফল হয় না, সাধনা চাই এবং ভাব ও লক্ষ্য অনুযায়ী জীবনে কর্ম করিতে চেষ্টা করা চাই, তবেই সময়ে অভীষ্ট ও উন্নতি লাভ এবং মঙ্গল সাধিত হয়, নতুবা সমস্তই পণ্ড হইয়া যায় এবং কর্ম পাশ দূত হয়। জগতের সর্বত্রই আমরা এই একটা নিয়ম সর্বদাই দেখিতে পাই যে, “অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা হয়”। আমরা যখন ঘোর অহঙ্কারী “আমি” “আমার” জ্ঞান যখন পূর্ণমাত্রায় আমাদের আছে এবং তাহা হইতে যখন আমাদের অব্যাহতি পাইবার আশা নাই, তখন আমাদিগকে সেই ভগবৎ নিদ্দিষ্ট পথে, যাহা হইতে উৎপত্তি তাহাতেই নিবৃত্তি এই নিয়মানুযায়ী, অর্থাৎ অহঙ্কার ও আত্ম সুখ লালসা বৃত্তির ভিত্তর দিয়া চলিয়া, উন্নতির পথে অগ্রসব হইতে হইবে। আমরা ভগবৎ দত্ত গুণ সকলের সদ্যবহার করিনা বলিয়াই কষ্ট পাই, নতুবা অহঙ্কার বা লালসা বা স্বার্থপরতা মন্দ বৃত্তি নহে, ইহারা ও অশ্রান্ত বৃত্তি সকল অন্তর্মুখী হইয়া আমাদিগকে চরমে ভগবৎ পদে উপনীত করে।

আমাদের ইহা স্থির বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে, “মন এক মনুষ্যানাং কারণং বন্ধ মোক্ষয়োঃ” অর্থাৎ মনই বন্ধ মোক্ষের কারণ এবং আমাদের অদৃষ্ট আমরা নিজেরাই গঠন করিয়াছি। জগতে কারণ ভিন্ন কোন কার্য বা ফল হয় না। অদৃষ্টের ফলাফল ও ভোগাভোগ সবই কার্য বা ফল রাজ্যের অঙ্গগত। মনই যাবতীয় কার্যের, অদৃষ্টের এবং ফলাফলের একমাত্র কারণ। মানসিক রাজ্যে আমরা যে বীজ বপন করিয়া বাসনা বারি সিকনে অদৃষ্ট বৃক্ষরূপে পরিবর্তিত করিয়াছি ভগবৎ নিয়মে সময়ে তাহা বীজানুরূপ ফল প্রসব করিবেই করিবে এবং আমাদের তাহা নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হইবে। যতদিন না আমরা নিকাম হইতে পারিব, যতদিন না ভগবৎ পদে আত্ম সমর্পণ করিব, ততদিন আমাদের নে ভোগাভোগের হাত হইতে অব্যাহতি নাই; এই জ্ঞানই শাস্ত্রে বলে “অদৃষ্টং ফলতি সর্বত্রং ন চ বিত্তা ন চ পৌরুষং”। আমাদের সুগতি সুগতির



জন্তু আমাদের মানসিক ভাব ও তদোক্তি কৰ্ম্মই দায়ী। আমরা মূলে ভগবদ্বাক্ত “স্বৈচ্ছার” (free will এর) কুব্যবহার করিয়া আত্ম সুখ লাভসায় স্বার্থপর ও অপ্ৰেমিক হইয়া ভগবৎ আশ্রয় ত্যাগ করিয়া অহংকর্তা সাজিয়া, অনিত্য বিষয়ের ভজন্য করিয়া আমাদের কৰ্ম্মের দায়িত্ব আপনি স্বক্কে লইয়াছি, যথা চৈতন্য চরিতামৃতে “জীব নিত্য কৃষ্ণ দাস ইহা ভুলি গেল, অমনি মায়া আসি তার গলেতে বাঁধিল,”। এরূপ স্থলে আমরা যদি পুনরায় মৌক্ষ ও প্রেম ভক্তি লাভের আশা করি, তাহা হইলে স্বৈচ্ছায় প্রার্থনা ও পুরুষকারের সাহায্যে অহংকর্তা ভাব ও আত্ম সুখ লাভসা ত্যাগ করিয়া আপনাদিগকে নিরাশ্রয় জ্ঞানে কাতরে ভগবৎ পদে যতদিন না মনে প্রাণে স্মরণ লইব, যতদিন না প্রেমে সে রাস্তাপদে আগোৎসর্গ করিব, ততদিন আর আমাদের স্বহস্তে গঠিত কৰ্ম্ম শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাব ঘুচিবে না।

“যাওয়া আসা এ দুর্গতি কভু না ঘুচিবে।

যাবৎ কৰ্ম্মের ফলে বাসনা রহিবে ॥”

তাই বলি, আমাদের এ অবস্থা হইতে পুনরায় যদি আমরা, প্রেমমগ্নের রাজ্যে স্থান পাইয়া পরমানন্দ লাভ করিতে ইচ্ছুক হই, তাহা হইলে পুরুষকার ও প্রার্থনাই আমাদের অবলম্বনীয়। এই পুরুষকারকে সকাম বলা যায় না; ইহা ভগবৎ প্রীত্যর্থ হইয়া বসিয়া এবং অস্তে ইহাই আমাদের তৎসেবায় প্রেমে আত্ম সমর্পণ শিক্ষা দেয় বলিয়াই ইহাকে নিষ্কাম কৰ্ম্ম বলা হয়। “অকামো বিষ্ণু কামো বা” বিষ্ণুর প্রীতি বা তৎপ্রাপ্তির কামনায় যে কোন কৰ্ম্ম করা যায় তাহারই নাম নিষ্কাম কৰ্ম্ম। পুরুষকার না থাকিলে, জড়ের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে জগতের কোন কার্যই সাধিত হয় না, এইজন্যই কবি বলিয়াছেন;—“উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ”—

“ইচ্ছায় না ফলে কৰ্ম্ম উদ্যম বিহনে।

নৃগ নাহি পশে সুপ্ত সিংহের বদনে ॥”

ভবে সাধন বিনা সৈ ধন মিলে না।

কর সাধন পূর্ণ হবে মনোবাসনা ॥”

সাধন ভিন্ন, চেষ্টা ভিন্ন, পুরুষকার ভিন্ন কোন কার্যেই সিদ্ধ লাভ হয় না। সাংসারিক উন্নতি করিতে হইলে, পারমাণ্বিক উন্নতি করিতে হইলে, কোন বিদ্যা

শিক্ষা করিতে হইলে, এমন কি অধঃপাতে যাইতে হইলে, এবং প্রতারক বা প্রবঞ্চক হইতে হইলেও জগতে তদনুরূপ চেষ্টি চাহি; চেষ্টি ভিন্ন কোন কার্য ফলবতী হয় না, অতএব পুরুষকার অত্যন্ত আবশ্যকীয়, ইহা ভিন্ন একটি পদও অগ্রসর হইবার ক্ষমতা কাহারও নাই। এই পুরুষকারের মূল উৎপত্তি স্থান মন এবং ইহাও ঠিক যে আত্ম সমর্পণ চেষ্টিই পরম পুরুষকার। অতএব মনে প্রাণে আত্ম সমর্পণ চেষ্টিই এই বন্ধাবস্থা হইতে মুক্তি লাভ করিবার প্রধান উপায়। আমাদের মনের ভাব ও তদোদ্বিগ্ন কৰ্ম বা পুরুষকারই আমাদের সুখ দুঃখের জনক; ভগবান নিজে এই কথা বলিয়াছেন, যথা শ্রীমদ্ভাগবত ১০স্কন্ধ, ২৪ অধ্যায়, ১৩ শ্লোক—

“দেহানুচ্ছাবচান জন্তঃ প্রাপ্যোৎসজ্জতি কৰ্মণা।

শক্রমিত্র মুদাসীনঃ কৰ্মেব গুরুবীধরঃ ॥”

অর্থাৎ “জীবগণ কৰ্মের দ্বারাই উত্তম অথম দেহাদি লাভ করে, আবার কৰ্ম দ্বারাই দেহত্যাগ করে। জীবের শক্র মিত্র, মধ্যস্থ (উদাসীন) গুরু, সুখ দুঃখ প্রদাতা সকলই কৰ্ম মাত্র জানিবেন।” আমাদের পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নি, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, শক্র, মিত্র, হিতকারী শিক্ষাগুরু সমুদয় এবং আমাদের বর্তমান অবস্থা, ভাল বা মন্দ হউক সুখের বা দুঃখের হউক, লাভের বা (প্রতারিত বা অপহৃত বা যে কোন কারণে) লোকসানের হউক, পুরুষকারের বা তিরস্কারের হউক, যাহাই হউক না কেন, সমস্তই আমরা আমাদের কৰ্মানুযায়ী প্রাপ্ত হই, তজ্জন্য অপর কেহই দায়ী নহে। অতএব নিজ অবস্থার জন্য, অথবা তাহার দৃষ্টান্ত কারণ হইলেও, আমরা নিজেই যখন সম্পূর্ণ দায়ী তখন তন্নিমিত্ত অপরের উপর দোষারোপ করা অত্যন্ত গর্হিত ও জ্ঞান বিরুদ্ধ। আরও কথা এই যে, আমাদের বর্তমান দুর্দশা যখন আমরাই ঘটাইয়াছি তখন তজ্জন্য শোকে অভিভূত হইয়া, কামনার সহিত তাহার প্রতিবিধান করিয়া কৰ্ম শৃঙ্খল আরও জটিল করা আমাদের উচিত নহে। বরং অবিচলিত চিত্তে হাত্যমুখে, সন্তুষ্ট ভাবে কামনা শূন্য হইয়া তাহা সহ করিয়া মনকে অন্তর্মুখী করতঃ তাহার প্রতীকারের চেষ্টি করা উচিত। এই প্রতিকার একদিনে হয় না। আমরা মূলে সুখবাসনায় কায়মনে যে বার্ষিকরতা জন্ম জন্মান্তর হইতে অনুক্ষণ অভ্যাস করিয়া আমাদের সংস্কার ও স্বভাবরূপে গঠিত

করিয়াছি, যাহার দ্বারা আমাদের মন্দ হইবার পথ সুগম করিয়াছি, যে কারণে আমাদের প্রত্যেক মন্দচেষ্টা সহজ ও আশুফল প্রদ হয় এবং যাহার জন্ত আমাদের এই বন্ধন ও প্রারন্ধ বৎস দুর্দশা ভোগ হইতেছে তাহার প্রতীকার করিতে হইলে কৰ্মসমূহের সেইগতি, কঠিন অদৃষ্টচক্রের সেই গতি ফিরাইতে হইলে তদোচিত অধ্যবসায় সহকারে সদা শরণাপন্ন ভাবে থাকিতে অভ্যাস করা নিতান্ত আবশ্যক। জন্ম জন্মান্তর হইতে ঐরূপ সৰ্বদা স্বার্থভ্যাগ, ভগবৎ শরণাপন্ন ও সেবা অভ্যাসের জন্য সাধুদের “ভালর” পথ পরিষ্কার হইয়া যায়, এবং তাঁহাদের প্রত্যেক ভাল চেষ্টাই সহজ ও আশুফল প্রদ হয়। অতএব কামনা শূন্য হইয়া অনাসক্ত ভাবে একাগ্র চিত্তে সদা শরণাপন্ন ভাব অভ্যাস করা সৰ্বতোভাবে উচিত, ইহাতেই আমাদের দুর্দশার শেষ হইবে ও আমরা মোক্ষ লাভ করিতে পারিষ। গীতা ৮ অঃ ৭, ৮ শ্লোক—

“তস্মাৎ সৰ্বৈর্দু কালেণু মামন্যস্বয়ং যুধ্য চ।

মধ্যপিতৃমনোবুদ্ধি মামেবৈষায়সংশয়ঃ ॥ ৭

অভ্যাসযোগ্যযুক্তেন চেতস্যা নাশ্চ গামিনা।

পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিত্তয়ন ॥ ৮

অর্থঃ—“সৰ্বদেঃ শরণ মোরে কর ধনঞ্জয়,

ধর্ম যুক্ত রত হও হইয়া নির্ভয় ;

আমাত্রে মন বুদ্ধি করিলে অর্পণ,

নিশ্চয় আমার পাষে পাণ্ডুর নন্দন।” ৭

“অর্জুন অভ্যাস যোগে একাগ্র অন্তরে,

গুরু উপদেশে দিব্য পুরুষ প্রবরে

করিতে করিতে ধ্যান লাভ করা যায়

সেই নিত্য সত্য ধন অনিত্য ধরায়।”

যে পাপের যেরূপ প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক তাহা অস্বীকৃত না হইলে দৃষ্টতঃ ফল লাভের আশা নাই। দাবান্নি জ্বালাইয়াছি তাহা নিভাইতে হইলে এক গণ্ডু ব জ্বলে হইবে না, মূলধ্বংসের বৃষ্টি চাহি, অতএব বৈধর্ম্য ধরিয়া বিরোধি ভাব জ্বালো-  
চনা ও কাঁচি ভ্যাগ করিয়া সৰ্বতোভাবে সম্যক্ চেষ্টা করিলে সময়ে ফল

ফলিবেই ফলিবে। এই চেষ্টার প্রধান লক্ষণ ও সহায় বিখ্যাসী হৃদয়ে ফলাফলের দিকে লক্ষ্য না করিয়া আত্ম সুখ কামনায় জলাঞ্জলি দিয়া অনাসক্ত ভাবে ভগবৎ নিয়োজিত হ্রানে সদা স্বরূপ হইয়া তাঁহার ভাবে থাকিয়া তৎপ্রীত্যর্থ্যে যথা সম্ভব প্রেমের সহিত পূর্বলিখিত তিন প্রকারে তাঁহার সেবার জন্ত আত্ম সমর্পণ করা।

জগতে ভাল মন্দ কোন ক্রিয়া আলোচনা বা ভাব সাধনা কখন বিফলে যায় না এবং ঐ চেষ্টা বাধা পাইয়াও যতবার ইচ্ছায় হৃৎক, অনিচ্ছায় হৃৎক পুনঃ পুনঃ সাধিত হয়, দৃষ্টতঃ প্রথম প্রথম তাহাতে অকৃত কার্য হইলে, অথবা তাহার কোন ভাল মন্দ ফল দেখিতে না পাইলেও, আমাদের অজ্ঞাতমারে আমাদের চেষ্টারূপ দেহের তত বারই অস্বাভাবিক পরিমাণে পুষ্টি সাধিত হইয়া থাকে এবং সময়ে তাহার এত বল ও তেজ বৃদ্ধি পায় যে, তখন তাহা যিনি চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার দেহে ভাবে ও ব্যবহারে প্রকাশ হইয়া পড়ে।

এই বিপদমঙ্গল দুঃখপূর্ণ প্রলোভনময় জগৎ সাধকের পক্ষে কষ্ট পাথরের ন্যায় কার্য করে। ইহা তাহাকে ভোগাভোগের মধ্যে ফেলিয়া বুঝাইয়া দেয় যে, এখনও সে কোন রাজ্যে কতদূরে আছে। এ সংসারে সাধক আত্মসংযম ও আত্ম সমর্পণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সুযোগ যতবার পায় ও তাহাতে কৃত কার্য হইবার জন্য যতবার আন্তরিক চেষ্টা করে প্রথম প্রথম তাহাতে বিফল মনোরথ হইলেও তত বারই তাহার আন্তরিক বল বৃদ্ধি হইয়া তাহাকে তাহার অভীষ্ট পথে অগ্রসর করায়। বিপদে ভয় পাইলেই মন দুর্বল হয়; স্থির থাকিয়া ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে আন্তরিক, চেষ্টা করিলে আমাদের পরম শত্রু স্বার্থপরতা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আইসে। স্বার্থপরতাই আমাদের অধোগতি, বন্ধন ; সুখ দুঃখ আনয়ন করে এবং বাসনাই ইহার মূল। কলিপাবন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কোন সময়ে ভক্তদের বলিয়াছেন যে, “ব্যাকুলতাই ভগবানকে পাইবার একমাত্র উপায় হইলেও হৃদয়ে বাসনা ছিদ্র থাকিলে কোন উপায়েই ফল প্রসূত হয় না।” নিকাম হইয়া ভগবদ্ভাবে পরার্থ পরতাই আমাদের পুনরায় মুক্তি প্রদান করিয়া তাঁহার সেবার প্রেম ও আত্ম সমর্পণ শিক্ষা দিয়া আমাদেরকে অতুল ঐর্ষ্যের অধিকারী করিয়া দেয়। অতএব বাহাতে আমরা নিকাম

হইতে পারি তদর্থে ষথাসম্ভব প্রার্থনা করিয়া স্বরণপন্নভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত নিত্য নিঃস্বার্থ ভাবে কার্যমনোবাক্যে পরোপকার করিয়া অনর্থ নিবৃত্তির জন্য নিত্য নিম্নমিতরূপে বিরলে বসিয়া নাম, রূপ, গুণ, গীলা, ইত্যাদির ধ্যান করা আবশ্যিক। তাই বলিতেছি, শ্রিয় শাঠিক পাঠিকাগণ! সাদরে যে বীজ হৃদয়ে ধরিয়া বারি সিকন করিতেছ তাহা নিত্য করিও এবং যতদিন না ঐ বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ক্রম বিকাশ দ্বারা বৃহৎ বৃক্ষের আকার ধারণ করে, ততদিন তাহাকে বর্ষা, রৌদ্র ও ছাগ গরু হইতে অর্থাৎ বহিমুখী ভাব ও সঙ্গ সকল হইতে রক্ষা করিও তাহা হইলেই অভীষ্ট লাভ করিবে নতুবা রৌদ্রতাপে বর্ষায় বা পশুর উপদ্রবে বীজ ও নবীন বৃক্ষ নষ্ট হইয়া যাইবে। সাবধান, ভাব শিশুকে চন্দাই বৃক্ষে করিয়া আতি মতর্কতার সহিত লালন পালন করিবে, অর্থাৎ যাহাতে তাহার অনিষ্ট না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া নিত্য নিমিত্ত রূপে আদরাতিশয়ে তাহাকে আহার দিয়া তাহার পুষ্টি সাধন করিবে এবং তদর্থে আত্মহের সহিত অকপট ভাবে কাতরে ভগবানের নিকট নিত্য প্রার্থনা করিবে। ইহাই তাঁহার আদেশিত ও তৎ প্রীত্যর্থ্যে কন্ম। এই ভাবশিশু যেমন নিজ হৃদয়ে পুষ্ট করিতে হয়, তদ্রূপ অপরের হৃদয়ে ভাবশিশুও যাহাতে পুষ্ট ও বদ্ধিত হইতে পারে তদ্বৎ প্রীত্যর্থ্যে নিঃস্বার্থ ভাবে তাহারও সম্যক্ চেষ্টা করিতে হয়। ইহাই প্রকৃত ও মুখ্য পরোপকার। নিঃস্বার্থ ভাবে পরোপকার করিতে পারিলে হৃদয়ে আনন্দ লাভ হয়। সাধু মহাজনের সর্বদাই নিঃস্বার্থ পরোপকার করিয়া থাকেন এবং তাঁহারা যৎ প্রকৃপ কার্য করিবার সুযোগ পান ততই আপনাদের ধন্য মনে করেন। কারণ, জীব সেবাকে তাঁহারা জীব সেবা ভাবেন না, তাঁহারা অভেদ জ্ঞানে, অর্থাৎ "সর্বং খণ্ডিদং ব্রহ্ম" জ্ঞানে, জীব রূপ আধারের অন্তর্গত সেই এক পরমাত্মা বা ভগবানেরই সেবা ভাবেন এবং যেখানে কার্যমনোবাক্যে সাহায্য করিয়া কোন জীবের মনকে অন্তর্মুখী করিয়া তাহাতে ভগবদ্ভাষের উদ্রেক করিতে পারেন, সেখানে সেই জীবের মধ্যে ভগবানের অলৌকিক প্রকাশ দেখিয়া ভাবে মৃত্যোয়াক্স হইয়া যান। ভগবদ্ভাবে পরোপকার আমাদিগকে নিঃস্বার্থ ও আলবাসার আধার করিয়া, আমাদিগের চিত্ত শুদ্ধি করে এবং আমাদেব হৃদয়ে সর্বতোমুখ্যত্ব তৎ সেবার্থ প্রেমে অঙ্গ সর্পণের ভাব উদয় করাইবার একটা

প্রধান সহায় হয়। পরোপকারকে এই জন্য প্রকৃত পক্ষে পরোপকার বলা যায় না, ইহা সত্য সত্যই নিজ উপকার এবং ইহাই তাহার ইচ্ছিত আদেশিত ও প্রীতির কর্ম। যে সার্থক পরোপকার ব্রতে ভগবদ্ভাবে ব্রতী হইবে, প্রাতে প্রার্থনার সময় “জগত্‌হিতায়” প্রার্থনা সে যেন নিত্য কষ্টে, ইহাতে তাহার সাধনা সহজ হইবে, জীবে দয়া আসিবে এবং তাহার কৰ্মা ও সহগুণ শীঘ্রই বাড়িবে। পরোপকার ব্রত যাহার না লইয়াছে তাহাদেরও পরোপকার করিবার সুযোগ ভগবৎ ইচ্ছায় উপস্থিত হইলে সাধ্যমত সৰ্ব্বতোভাবে প্রেমে পরোপকার করা উচিত। যাহার হৃদয় পরের দুঃখে কাতর না হয়, যে পরের বিপদের সময় ক্রমতা সঙ্গে সাহায্য না করে, তাহার সকল ধর্ম কর্ম, ভাব ভক্তি ও জ্ঞান সবই বৃথা হয়। সমস্ত গুণে ভূষিত হইলেও সে অত্যন্ত ঘৃণিত স্বার্থপর এবং তজ্জন্য জ্ঞান, ভক্তি, মুক্তি ও প্রেম তাহার পক্ষে অসম্ভব। তাই বলিতেছি, তুমি যে কোন ধর্ম পথের পথিক হওনা কেন, প্রেমের সহিত যথা সম্ভব পরোপকার করিও ; ইহাতে তোমার স্বার্থপরতা ক্ষীণ হইবে, বন্ধন শিথিল হইবে, তোমার সাধনার পথ সুগম হইবে ও তুমি অচিরে ভগবৎরূপী লাভে প্রেমধর্মের ধনী হইয়া তৎসেবার্থ আত্ম সমর্পণ করিতে পারিবে।

সাধ্যমত যাহারা ভগবদ্ভাবে থাকিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহারা ভাগ্যবান ও শ্রীর্ণম্য, কিন্তু যাহারা আমার ন্যায় বহিমুখ ও নিরাধিকারী, তাহাদের উপকারার্থে, পুনরাবৃত্তিরূপ দোষ হইলেও, আরও দু'একটা স্থূল কথা এই বলিতেছি যে, যদি “ভাবে থাকা অবস্থা” অন্নায়াসে লাভ করিতে বাসনা থাকে তাহা হইলে অস্তিতঃ কর্তব্য বোধে, ওদাসিন্যা ও অঙ্গসতা ত্যাগ করিয়া দিনান্তে, নিত্য স্বকৃত দৈনিক কাৰ্য্য ও মানসিক ভাবাদির পরীক্ষাস্তর, অনর্থ নিরুত্তর জ্ঞান কাতরে প্রার্থনা করিয়া, অল্পাধিক পরিমাণে নিঃশব্দ রূপে বিশ্রাসী হৃদয়ে অকপটে ভগবৎ রূপ, গুণ, ও লীলা ধ্যান করিও এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে, যথা সম্ভব, অল্পাধিক পরিমাণে নিঃস্বার্থভাবে প্রেমের সহিত পরোপকার করিও এবং বস্ত্রগত ও ভাবগত গুণ ও তাহাদের ক্রিয়া এবং প্রায়শ্চিত্ত বিধি ও নিজ নিজ ক্রমের ফলের উপর বিশ্বাস করিয়া সর্ব প্রথমে শান্ত, ধীর, সহিষ্ণু, ক্রমাশীল ও দয়ালু হইতে চেষ্টা কর। বার্চালতা, পরচর্চা, বৃথা আলোচনা ও প্রতিকূল আয়োদ প্রয়োদ এবং

কৌতুক ব্যাগ বর, তাহা হইলে অভ্যাস ও বিবেচনা শক্তির সাহায্যে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া সংসারে কাৰ্য্য করিতে পারিবে ; বৃথা আশু ক্লম্ব হইবে না, নতুবা ষড়রিপু বশীভূত হইয়া, ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া, অস্থির ভাবে উত্তেজনা বশে স্বার্থাক হইয়া কাৰ্য্য করিলে, বিবেচনা শক্তি সে সময়ে লুপ্ত হওয়ায় তাহার সাহায্য পাঠরে না, কাজেই সে অবস্থায় লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইবে এবং যাহাই করিবে তাহাতেই কৰ্ম্ম বন্ধন আরও জটিল ও কঠিন হইবে ।

জগতের অচেতন বা সচেতন সমস্ত বস্তুর গুণ, ভাব ও ব্যবহার অজ্ঞানিক পরিমাণে সংক্রামক, সেই জন্ত যাহার যাহা লক্ষ্য তাহার সেই লক্ষ্যের প্রতিফল ভাবে লক্ষ্যে স্থান দেওয়া, তাহার আলোচনা করা বা তাহার পোষণ-কারীর সঙ্গ করা, কখন কর্তব্য নহে । পরিহাসচ্ছলেও যদি তাহাদের প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তাহা হইলেও তাহারা নিশ্চয়ই মনকে নিস্তেজ করিয়া সময়ে লক্ষ্য ভ্রষ্ট করাইবে । পরমযোগী মহাদেব সতর্কিত হইয়াও নিজ অনুরোধিত ভগবানের প্রতিফলরূপ, মোহিনী রূপ দেখিয়া যখন বিহ্বল হইয়াছিলেন, তখন আমাদের তায় দুর্লভ জীবের কি কথা ? এই জন্তই শ্রীচৈতন্য মহা প্রভু সাধকের উপর কঠিন অনুশাসন করিয়াছেন যে, সাধক যেন কখন স্ত্রী কণ্ঠে হরিনাম পর্য্যন্ত শব্দ না করে ।'' অতএব সাধক এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকিবেক, নতুবা, তাহার সমস্ত সংচেষ্ঠাই বিরোধি অবস্থায় পড়িয়া ব্যর্থ হইয়া যাইবে । জগতের অচেতন ও সচেতন সমস্ত বস্তুর গুণ, ভাব ও ব্যবহার সংক্রাম ধর্মী হওয়ায়, আমাদের লক্ষ্যের প্রতিফল ভাব ইত্যাদি ভ্রাগ করিলে যেমন অনর্থ নিবৃত্তি হয়, তদ্রূপ অনুরূপ ভাব ইত্যাদির সর্লতোভাবে অভ্যাসে, আমরা অতি শীঘ্রই আমাদের লক্ষ্যের দিকে জ্ঞানমর হইতে থাকি । জগতে কেহ কাহারও ভাল বা মন্দ করিতে পারে না সত্য, অতএবেই আপন আপন ভাব ও ক্রম অনুযায়ী ফল ভোগ করে, বটে, কিন্তু বস্ত, জীব, ভাব ও বস্তু মাত্রের সংক্রামক গুণ ও সঙ্গে সঙ্গে কাৰ্য্য করে বলিয়া আমরা যেকপ বস্ত বা জীবের সঙ্গ করি, ভাল, মন্দ, যে যেরূপ ভাবনা হৃদয়ে স্থান দিই, যে যেরূপ আলোচনা বা কাৰ্য্য কবি, আমাদের সেই সেইরূপ গুণ, ভাব, আলোচনা বা কাৰ্য্য তাহাদের সমজাতীয় গুণ ও ভাবের জরুক আলোচক বা কাৰ্য্যকারকদের মনের উপর আমাদের স্রষ্টার মা

কার্য করিয়া তাহাদের সেই সেই জাতীয় গুণ ইত্যাদি বৃদ্ধি করিয়া তাহাদিগের "ভাল মন্দ" হওয়ার পথের সহায়তা করে। ভাষ জগতের এই সত্যটি খিওসকি-ক্যাল সোসাইটির পূজ্যপাদ মাষ্টারেরা মেডেম ব্লাভট্‌স্কীর দ্বারা Secret Doctrine নামক পুস্তকে লিখাইয়া প্রচার করিয়া জগতের অশেষ উপকার করিয়াছেন। বিসেস্ বেনাট্ট ঐ কথাই তাঁহার Thought power নামক পুস্তকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাই বলিতেছি, জগতের অচেতন ও সচেতন, সমস্ত বস্তুর গুণ, ভাব ও ব্যবহার যে সংক্রামক গুণ বিশিষ্ট সে বিষয় স্থির বিশ্বাস রাখিও এবং যদি নিজহিত ও পরহিত চাও, যদি ভগ্নবৎ কাপাপ্রার্থী হও, তাহা হইলে সংচিন্তা সং-বস্ত বা ভাবের ধ্যান, ধারণা, সংআলোচনা, সংপুস্তক পাঠ, সংসঙ্গ ও সংব্যবহার করিও; ইহাতে অচিরে অশেষ ফল পাইবে। এইরূপে সতর্ক হইয়া শরণাপন্ন হাভে চলিলে সাধুভক্তদের সাহায্য মানসিক রাজ্যে অচিরে স্পষ্টই অনুভব করিতে পারিবে এবং সময়ে তাহাদের দ্বারা নিজেকে অনুক্ষণ রক্ষিত বৃদ্ধিতে পারিবে, তখন ক্রমশঃ আপনা হইতেই সর্কতোভাবে সেবার্ধ প্রেমে আত্ম সমর্পণ অজ্ঞাস হইয়া যাইবে ও তোমার জীবন জনম সফল হইবে, তুমিচরম অর্জীষ্ট লাভ করিবে।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া যাইতেছে; আর দু'একটী বাচালতা করিয়া উহার উপসংহার করিব। এখানে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, জগতের সুখ স্বচ্ছন্দতা ও ভোগাদির চেষ্টা না করিয়া, ভগবৎ সাধনায় কি লাভ অর্জিত আছে না জানিয়া ও না বুঝিয়া কেন সাধনে প্রবৃত্ত হইব? ইহার উত্তরে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, কোন দরিদ্র যদি বুঝে যে ক্রমশঃ ও সহজ উপায় সত্ত্বেও সে নিজ বুদ্ধির দ্বারা অর্জনতা বশতঃ ধন সম্পত্তি উপার্জন করিতে না পারায় তাহার কষ্টের লাঘব হয় নাই, দরিদ্রতা যায় নাই, তাহা হইলে সে যেমন নিজেকে তখন অত্যন্ত দুঃখিত ও তাহার জীবন বৃথার গেল মনে করে, তদ্রূপ আমাদের বাসনা পাশবিক জীবাত্মা অতুল ভোগ প্রাপ্তির মধ্য থাকিরাও যদি দেখে যে ইহ জীবনে তাহার সাধনা হইতেছে না, সে ভগবদ্ভাব ও প্রেমধনে ধনী হইতে পারিতেছে না, তাহা হইলে সেও সদাই আপনাকে অতি দরিদ্র মনে করে এবং অন্যান্য জীবনটী ব্যথার গিয়াছে 'জাবিয়া লেহাওস্তে অত্যন্ত দুঃখ ও কষ্ট পায়।



তাহার সে হুঃখের পরিসীমা থাকে না। জীবাস্ত্র এই হুঃখ আমরা আমাদের বহিমুখ অবস্থায় উপলব্ধি করিতে পারি না, কিন্তু দেহান্তে যখন আমরা স্মৃতদেহ পাইব তখন এইহা স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া অত্যন্ত হতাশ হইব। প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ! যদি জীবনান্তে ঐ ষোর হুঃখের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে, সময় ও সবকাশ করিয়া, অকপট প্রার্থনা যোগে, নিত্য নিয়মিতরূপে অল্প অল্প সাধনা করিও, মনে সুখ পাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে কৰ্ম বন্ধন শিথিল হইয়া পাইবে। বাসনা ত্যাগে অনাসক্ত ভাবে ভগবৎ প্রীত্যর্থ সৰ্বতোভাবে তাহার সেবার প্রেমে আত্ম সমর্পণই—উদ্দেশ্য ও সাধনা।

আর এই একটি কথা, সম্যক দর্শন ও বিচার দ্বারা আমরা জানিতে পারি যে, জগতে কামনার বশীভূত জীব, রাজ রাজেশ্বর হউন বা দীন হুঃখী হউন, কেহই সুখী নহেন এবং স্থায়ী পরমানন্দ লাভ করিতে পারেন না; অতএব সমস্ত উন্মত্ত ও যত্ন স্বার্থ সাধনে না দিয়া, অন্ততঃ কর্তব্য বোধে, অল্প অল্প করিয়া নিত্য নিয়মিতরূপে অকপটে সাধনা করা কর্তব্য। স্বার্থ পরতায়, দৈহিক সুখ বিমল সদানন্দ লাভ হইতে পারে না, কারণ ইহারা সুখ হুঃখ উভয়েরই জনক। কামনার লেশ মাত্র ও থাকিলে ক্ষণস্থায়ী সুখ হুঃখই ভোগ হয়। সুখ বাসনা ও চেষ্টা দ্বারা এই যখন আমরা আমাদের এই বন্ধন ও হুঃখের দশা আনয়ন করিয়াছি, তখন এই বর্তমান হুঃখের দশা নিবৃত্তি ও সুখোদয়ের জন্ত সক্রম ভাবে পুনরায় চেষ্টা করা উচিত নহে, এই জন্তই পাশ্চাত্য জগতের গুরু Jesus Christ সাধকদের উপর তুলনাজ্ঞা করিয়াছেন, Resist no evil ( অর্থাৎ অমঙ্গল ঘটনার প্রতিবন্ধকতা করিও না, অর্থাৎ ঐহিক সুখেচ্ছায় স্বরূত কৰ্ম ফলানুযায়ী তুমি নিজের যে অবশ্যস্তাবি হুঃখ বা বন্ধন অবস্থা আনয়ন করিয়া অতৃপ্ত বাসনার জন্ত হুঃখ পাইতেছ পুনরায় সেই সুখ লালসায় ঐ হুঃখাশা বন্ধন অবস্থা অর্পণনয়ন বা ঐতীকারের চেষ্টা করিয়া নিজের কৰ্ম বন্ধন জটিল করিও না। ) এবং থিওসফিক্যাল সোসাইটির স্রষ্টা মেডেম ব্লাভটস্কিককে যখন কার্ডেটস্ অব ওয়াকমিষ্টার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে তুমি তোমার দৈহিক ব্যাধি ও কষ্ট তোমার যৌগিক ক্ষমতার দ্বারা নিবারণ করনা কেন, তখন তিনি তত্ত্বেরে বলিয়াছিলেন, "I tell you I have no choice, I am pledged by the strictest rules and laws of Occultism to a

renunciatio of selfish considerations or of our occult powers to allay our personal sufferings,” অর্থাৎ আমি তোমাকে বলিতেছি আমার নিজ মনন কিছুই নাই। যোগ শাস্ত্রের কঠোরতম নিয়ম ও শাসন দ্বারা স্বার্থ চিন্তা ত্যাগ অথবা আমাদের যৌগিক ক্ষমতা দ্বারা আমাদের দৈহিক কষ্ট প্রশমন করণে শপথ করিয়াছি। স্থায়ী পরমানন্দ, সুখ স্বচ্ছন্দতা ও পরমৈশ্বর্য্য ভোগ করিতে ইচ্ছা থাকিলে নূতন কামনার দ্বারা নূতন বন্ধন সৃজন না করিয়া বিরোধি ভাব আলোচনা, বা কার্য্য সতর্কতা সহিত সর্কতোভাবে ত্যাগের চেষ্টা করিয়া নিষ্কামকর্ষ্য ভগবৎ প্রীত্যর্থ্যে করিতে হয়। আত্ম সুখ লালসায় আমরা যে সুখ দুঃখের স্রোত গঠিত করিয়াছি, নূতন কামনা দ্বারা তাহার কলেবর বৃদ্ধি করিলে আমরাদিককে তাহা ক্রমশঃ দুঃখ সাগরে উপনীত করিবে। এই লালসা অন্তর্মুখী না হইলে, ইহা কখন শুভদায়ী হয় না। জীব নিকাম হইতে পারিলে, সর্ব্ব কর্ম্মফল তাঁহাকে অর্পণ করিতে পারিলে সর্ব্বদা তাঁহাতে নিবিষ্টচিত্ত থাকিয়া তৎপ্রীত্যর্থ্যে সেবার জগু প্রেমে আত্ম সমর্পণ করিতে পারিলে শীঘ্রই তাহার বন্ধন কাটে ও সে মোক্ষ লাভ করে।

“বিষয়ে আসক্তি যেই করে মুঢ় জন,  
পদে পদে হয় তার বিরহ ঘটন।  
আশা ভঙ্গে মনস্তাপে হয় জর জর,  
অনিত্যে মমতা সর্ব্ব দুঃখের আকর।  
যে জন সচ্ছিদানন্দে সঁপে মন প্রাণ,  
না জানে বিরহ দুঃখ সেই ভাগ্যবান।  
আশা ভঙ্গ নাহি তার, শোক নাহি জানে,  
সদানন্দে রয় চিদানন্দ সুধা পানে।”

গী. গা ১২ অঃ ৬, ৭, শ্লোক—

“যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংগ্রহ্য মং পরাঃ ।  
অনন্তো নৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাস্তে ॥”  
“তেষামহং সমুর্দ্ধতা মৃত্যু সংসার সাগরাং ।  
ভবামি ন চিরাং পার্থ ময্যাবেশিত চেতসাম্ ॥

অর্থাৎ—

“কিন্তু করি সর্ব্ব কর্ম্ম অর্পণ আমাকে,  
 বাহারা একাগ্র যোগে আমাতেই থাকে,  
 ধ্যানেতে আমায় সদা উপাসনা করে,  
 আমাতে নিবিষ্ট চিন্তা সেই সব নরে,  
 অচিরে কাণ্ডারী হয়ে করি আমি পার,  
 মৃত্যু ময় এ সংসার জলধি অপার।” ৬, ৭।

আমরা দিবসে যে চিন্তা বেশী করি, সায়ংকালে তাহা মনে উদয় হয় ও তদনুযায়ী নিদ্রাবস্থায় আমরা স্বপ্নে সুখ দুঃখ ইত্যাদি ভোগ করিয়া থাকি, তদ্রূপ জীবনে যে ভাবনা জীব বেশী করে ও তীব্রতার সহিত ভাবে, মৃত্যুর সময় তাহার সেই চিন্তাই প্রবল হয় এবং তদনুযায়ী সে পর জন্মে দেহ, গৃহ, অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং ইহাও সত্য, যে মৃত্যু অতি অনিশ্চিত ; কে কখন মৃত্যু মুখে পতিত হইবে তাহার কিছুই স্থিরতানাই। গীতা ৮ম অঃ যষ্ঠ শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন:—

“যং যং বাপি স্মরণ ভাবং ত্যজত্যস্তে কলেবরং  
 তং তমেবৈতি কোন্তেয় সদা তদ্ভাব ভাবিতঃ ॥”

অর্থাৎ—

“যেই ভাব অন্তরেতে করিয়া স্মরণ,  
 কলেবর পরিত্যাগ করে জীবগণ,  
 সেই, সেই, ভাবে চিন্তা নিবিষ্ট থাকায়,  
 কোন্তেয় ! দেহান্তে জীব সেই ভাব পায় ॥”

জ্ঞান গুরু শ্রীমং শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন—

“মা কুরু ধন জন যৌবন গর্কং  
 হরতি নিমেঘাং কালীঃ সর্কং  
 মায়াময়মিদ মখিলং হিত্তা  
 ব্রহ্মপদং প্রবিশান্ত বিদ্বিত্তা।” ৩  
 “নলিনী দলগত জলবন্তরলং  
 তদ্বজ্জীবন মতিশয় চপলং

ধর্ম মিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা

ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা ॥”

অর্থাৎ—“ধন জন এবং যৌবনের পর্ক করিওনা, কারণ নিমিষের মধ্যেই কাল তাহা হরণ করিতে পারে। এই মায়ায় নিখিল প্রপঞ্চ ত্যাগ পূর্বক শীঘ্র ব্রহ্ম পদ জানিয়া তাহাতে প্রতিষ্ঠ হও।” ৩

“কমল পত্রস্থিত জল যেমন চঞ্চল, তেমনি জীবনও অতিশয় চঞ্চল, এই সংসারে একমাত্র সাধু সঙ্গই অঙ্কুরের জন্ম হইলেও ভব সাগর পারের নৌকা স্বরূপ হয়।” ৪

তাই পুনরায় বলিতেছি সর্ব ধর্ম ও সাধনা পরিহার করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া প্রেমে সেবার্থ আত্ম সমর্পণ করিবার চেষ্টা কর, ও সময় মত সাধু সঙ্গ কর, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। গীতা ১৮ অঃ ৬৪, ৬৫ এবং ৬৬ শ্লোক—

“সর্ব গুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ ।

ইষ্টোহসি মে দৃঢ়মিতি ততোবক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥” ৬৪

“মননা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজ্ঞী মাং নমস্কুরু ।

মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতি জানে প্রিয়াহসি মে ॥” ৬৫

“সর্ব ধর্মানুপরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।

অহং ত্বাং সর্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥” ৬৬

অর্থাৎ—

“সর্বাপেক্ষা গুহ্যতম,

পরম বচন মম,

মনোযোগ সহ পুনঃ শুন পাও হুত,

তোমা সম প্রিয় নাই,

হিত কথা কহি তাই,

ভালবাসি বলিয়াই কহিতেছি এত । ” ৬৪

“আমাতেই প্রাণ মন,

কর তুমি সমর্পণ,

আমারই ভক্ত হও সর্ব তেয়াগিয়া,

আমার অর্চনা আর,

আমাকেই নমস্কার,

বারংবার কর চিত্ত একান্ত করিয়া ;

অর্জুন নিশ্চয় তবে, আমাকেই প্রাপ্ত হবে,  
সত্যই প্রতিজ্ঞা করি কহিতেছি আমি ;

কেম এ প্রতিজ্ঞা করি, জান কি কিরীটধারী ?  
জগতে আমার পার্থ, বড় প্রিয় তুমি ।” ৬৫

“সর্ব ধর্ম পরিহরি, কেবল আমাকে স্মরি,  
একান্ত অন্তরে লও আমার স্মরণ,

সর্ব পাপে পরিত্রাণ, আমিই করিব দান,  
আর হুঃখ করিওনা, কুস্তীর নন্দন ।” ৬৬

“রে জীব একান্ত যদি লভিবে নির্ঝাণ,  
তবে এই মহামন্ত্র কর অনুষ্ঠান ;

যিনি যজ্ঞেশ্বর হরি, তাঁরি প্রেমানলে ।

আত্মাকে আছতি দাও “কুম্ভায় নমঃ” বলে ।”

“রে জীব এই মহাশাস্ত্র কর অনুষ্ঠান,  
যাহে তব পিতৃলোক লভিবে নির্ঝাণ ;

বিপ পিতা ত্রীহরিকে করি আবাহন,  
শ্রদ্ধায় হৃদয় পিণ্ড কর নিবেদন ॥”

প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ ! আর অধিক প্রলাপ বন্ধিবার আবশ্যক নাই ;  
আম্বন প্রবন্ধ শেষে আমরা সকলে মিলিয়া সেই প্রেম ও সর্বমঙ্গলময়ের  
শরণাপন্ন হইয়া অকপটে প্রার্থনা করি। দেব ! গুরো ! প্রভো ! ভগবন্ !  
আমাদের হৃদয়ে বল দিন, আমরা যেন নিরভিমাণে বাসনা ত্যাগ করিয়া অনাসক্ত  
হইয়া আপনার নিয়োজিত ও আশ্রিত জানে, আপনার শরণাপন্ন থাকিয়া, আপনার  
প্রীত্যর্থ সর্বতোভাবে আপনার সেবার প্রেমে আত্ম সমর্পণ করিতে পারি, যেন  
সর্বজীবে আপনাই অধিষ্ঠান উপলব্ধি করিয়া প্রেমে তাহাদের সেবা ও হিত  
করিতে পারি, যেন সর্ব কর্ণে আপনাই কর্তৃত্ব দেখিতে পাই ও তাহার মুখে  
আপনার মঙ্গল ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য বুঝিয়া প্রেমে বিভোর হইয়া যাই। এই জীব  
মন মাতাইয়া দিন, প্রভু আপনার প্রেমানন্দবন বরাভয় মূর্ত্তি দেখা দিয়া

আশস্ত করিয়া আমাদের কিনিয়া লউন, আমিরা দেহ-মন-প্রাণে আপনাই হইয়া যাই ; “আমি” “আমার” বলা বা ভাবা নিবৃত্তি হইয়া যাউক ।

### রাগিণী পূর্বী—তাল একতাল ।

“গাওরে সন্ধ্যা, গাওরে চন্দ্র, গাওরে উজ্জ্বল তারকাদাম ।

গাওরে আকাশ, গাওরে বাতাস, প্রাণারাম হরিনাম ॥

গাওরে কানন কুম্ভচয়, জয় রাম জয় জয়,

জীব-জীবন, শ্রীমধুসূদন, বংশীধারী বাঁকা শ্যাম ॥

গাওরে প্রাণ আপন প্রাণে, হরিগুণ গান মধুর তানে,

গাওরে বিহগ কুজন তানে, কৃষ্ণ ভজন সুধা ;—

ত্রিভুবন বাঁধা চরণে ঘাঁহার, তাঁহারই চরণে প্রাণ আমার,

বাধ আপনারে প্রেমডোরে, ভব সাগর পারিবে ত্রাণ ॥

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গুপ্ত ।

## দম্পতী দর্পণ ।

—:—

( পূর্ব প্রকাশিতের পর । )

( ২ )

এই জগৎ সর্ধর্মিনীকে প্রথম হইতে এই পক্ষ যজ্ঞের বিষয় বিশেষরূপে শিক্ষা দিতে হইবে, প্রথম হইতেই যদি পতি ও পত্নীর কর্তব্য জ্ঞান ও উভয়ের অন্তরে বিস্তৃত ধর্ম্য ভাব থাকে, পতির ক্রম্বে পত্নীর সহায়ভূতি ও উৎসাহ এবং পত্নীর কর্তব্য ক্রম্বে পতির যথা যোগ্য সহায়তা থাকে, তবে সেই সুপরিচিত আদর্শ দম্পতী হইতে পরিজনবর্গ সংশিক্ষা লাভ করিয়া গৃহস্থামীর সকল ক্রম্বে সহায়তা ও উৎসাহ দান করিতে পারে। দম্পতী পবিষ্ট হইলে, দম্পতী হইতে সমুৎপন্ন পরিজন নিঃশয় সং হইবেই। এইরূপে প্রতিদিন পক্ষ যজ্ঞের

অনুষ্ঠান করা গৃহীর নিত্য কর্ম ঐরূপে সংভাবে সংসার করিলে সংসারে থাকিয়াই গৃহস্থ জীব মুক্ত হইতে পারে, অপর আশ্রম সীকার না করিলেও গৃহস্থ যে মুক্তির অধিকারী হয় তাহাতে সন্দেহ নাই—

গৃহস্থেন সদা কার্ধ্যং আচার প্রতি পালনং

নহাচার বিহীনশ্চ সুখ মত্র পরত্র চ ।

গৃহস্থ কায়মনোবাক্যে সর্বদা সদাচার রক্ষা করিবে, আচার প্রতিপালনই গৃহীর ধর্ম, গৃহস্থ সদাচারী হইলেই সকল আশ্রমী সদাচারী হয়, আবার গৃহস্থের আচার নষ্ট হইলে আচারহীন ব্যক্তির সঙ্গ করিয়াও আচারহীন গৃহীর দান গ্রহণ করিয়া অস্বাভাবিক আশ্রমি কল্পিত হয়, আবার আচারহীনের গৃহ জাত সম্ভান সম্ভতি কখনই ব্রহ্মচর্য্য বাসপ্রস্থ বা ভিক্ষাপ্রমে যাইয়া উন্নতি লাভ করিতে পারে না ।

আচার হীনা ন পুনস্তি বেদা যথ্যাবীতাঃ সহ ষড়্ভি রশ্চৈঃ ।

ছন্দাশ্চেনং মৃত্যু কালে ত্যজন্তি, নীড়ং শকুন্তা ইবজাত পক্ষাঃ ।

অর্থাৎ আচার বিহীন জন যদি ষড়্ভৈর সহিত বেদাদি অধ্যয়নও করে তথাপি ঐবেদ তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না । পক্ষী সকল যেমন পক্ষ হইলেই বাসা ত্যাগ করে, সেইরূপ আচার হীনের শাস্ত্র জ্ঞান মৃত্যুকালে স্মরণ থাকে না, সুতরাং আচার হীনের বেদাধ্যয়ন কেবল তার বহন মাত্র হয় ।

আচারাল্লভতে হানুরা চারীদীপ্পিতাঃ প্রজাঃ

আচারাল্লভতে ধর্ম্মং আচারোহন্ত্য লক্ষণং ।

আচার হইতে আয়ু বৃদ্ধি হয়, আচারবানের সং পুত্র জন্মে ও আচার হইতে চিত্ত প্রশন্ন হয়, এমন কি আচার হইতে দুর্দৃষ্টও নষ্ট হয় । শাস্ত্রে সদাচারের এমন ভাবে প্রশংসা করিয়াছেন যে, গৃহস্থ মাত্রেয়ই সকল কর্মে সদাচার প্রতিপালন করা একান্ত কর্তব্য । অনেকে সদাচারের উপকারিতা অনুভব করিতে ও চেষ্টা না করিয়া কেবল লোভী ও কামী হইয়া দেহেন্দ্রিয় পীড়িত হইয়া দিবানিশি ব্যতিব্যস্ত থাকে, তাহারা জানেনা যে কদাচারী হুখের প্রত্যাশায় ঘুরিলেও হুখের বস্তু বহু বহু সংগ্রহ করিলেও প্রাণে সুখ পায় না ।

অধিকন্তু হস্তস্থিত ব্রহ্মহৃদিত স্থানের উপরে সুবর্ণ কঙ্কণ দিলে যেমন সুখ হয় না, বরং ক্রেশই হয় সেইরূপ কদাচারে কলঙ্কিত চকল ও ব্যথিত হৃদয়ে বাহ্যিক সুখের বস্তু দিলেও তাহাতে সুখ হয় না ।

তাই বলিতেছিলাম, গৃহী তোমার গৃহ তোমার পুত্র তোমার ধন সম্পদাদি হইতে যদি তুমি ষাণ্ডার্থ জীবনানন্দকর সুখ পাইতে চাও তবে সদাচারী হইতে যত্ন করিও গৃহিনীকে সদাচারিণী করিতে বিশেষ উপদেশ দিও নতুবা সুখের আশা মাত্রই হইবে সুখ পাইবে না । দেখ আচারের উদ্দেশ্য সত্য গুণের বৃদ্ধি করা, কারণ সত্য গুণই সকল সুখের একমাত্র কারণ । ভগবান নিজ মুখে বলিয়াছেন—

সত্যং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কৰ্ম্মণি ভারত

জ্ঞানমা বৃতাতু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়তাত ।

অর্থাৎ সত্য গুণ সুখ দান করে, রজো গুণ কৰ্ম্মে ও কৰ্ম্ম বাসনায় আসক্ত করে, আর তমোগুণ সুখ দেয় না কৰ্ম্ম ও করায় না কেবল হুঃখময় নিদ্রা আলস্য ও বুধা পরচর্চায় আসক্ত করিয়া মহা হুঃখ দেয় । সুতরাং সত্য গুণের বৃদ্ধিকারক সদাচার প্রত্যেকেরই পালনীয় ।

আচার হুই ভাগে বিভক্ত মানসিক ও শারীরিক ; পূর্বে যেসকল বলা হইল ঐ ভাবে ঐ পুত্রাদি স্বজনগণের সহিত সৰ্বদা পবিত্র বিষয়ের চিন্তা ও আলোচনা করিয়া মনকে উন্নত করিবে এবং সুলভে দ্বারা সত্ত্বগুণ, প্রধান দ্রব্য আহাৰ বিহার করিবে ।

সং বিষয় ভাবনা ও সং বিষয়ের আলোচনাকে মানসিক সদাচার বলে অর্থাৎ যাহাতে শয়নে, স্বপনে ও জাগরণে মনে মনে ঈশ্বর মূর্তি বা ঈশ্বর তত্ত্ব কিংবা ভক্তের বিষয় ভাবনা করা যায়, আর যাহাতে মনের চকলতা ও দুৰ্ব্বলতা নাশ হইয়া একাগ্রতার উদয় হয়, এরূপ ভাবের ব্যবহার করাই মানসিক সদাচারের উদ্দেশ্য মানসিক সদাচার না হইলে কেবল শারীরিক সদাচার মানবকে আত্মোন্নতির পথে চালাইতে পারে না অধিকন্তু মানসিক উন্নতি না করিয়া কেবল শারীরিক সদাচার করিলে লোক দেখান ধার্মিকতা ও ( শুচিবায়ুর ভাব ) হইয়া গুড়ে, অগঠিতচিন্ত ব্যক্তি কেবল বহিঃ আচার করিতে করিতে কপটী ও ধৰ্ম্মধৰ্মী হইয়া লোকের নিকট অবিধাসী ও উপহাস্যস্পদ হয় । ক্রমশঃ

শ্রীদীনবন্ধু বেদান্তরত্ন ।



শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি ।

# ভক্তি ।

১২শ সংখ্যা—৮ম বর্ষ ।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী ।

ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্ত জীবনম্ ॥

## প্রার্থনা ।

প্ররম্ভেচ নিরুত্তেচ কার্য্য কার্য্যে শুভা শুভে ।

ক্ৰমৈব চালিতোষীতি হং প্রযুক্তঃ করোম্যহম্ ।

কর্ম্মণা যেন দেবেশ্ ত্বয়ি ভক্তিঃ সুনিন্দনা ।

জায়তেতু তথা দেব নিগুঞ্জ, মামনুব্রতম্ ॥

হে ভূত ভাবন! কর্ম্ম ক্ষেত্রে নানা প্রকার কর্ম্ম প্রদান করতঃ তুমিই আমাকে নানা ভাবে ভাবাইতেছ, নর্তকের ইচ্ছার চালিত কাঠের পুতুলের স্থায় কর্ম্মে যে ভাবে যতদিন নাচাইবে, সেই ভাবে সেই কার্য্যে তত দিন নাচিতেই হইবে। ভুগিয়া ভুগিয়া বেশ শিখিয়াছি এবং তোমারই কৃপায় এই ধারণা আসিয়াছে যে, কোন বিষয়েই আমার কর্তৃত্ব নাই, কি প্রবৃত্তি পথে, কি নিবৃত্তি পথে, কিছুই কর্ণে, কি মন্দ কর্ণে, তুমি যে ভাবে চালাইবে আমি সেই ভাবেই তোমার আদেশে

তোমার শক্তি বলে কর্ম করিতেছি ও করিব, কিছুতেই তোমার শক্তির বাহিরে যাইয়া নিজ শক্তি বলে কিছুই করিতে পারিবনা । তবে আমি কাঙ্গাল, আমি ভিক্ষুক, তোমার নিকট ভিক্ষা না করিয়া থাকিতে পারিবনা, তাই পুনঃ পুনঃ চাহিতেছি, জানাইয়া দাও কোন পথে চলিলে তোমার আনন্দ ধামে পহুছান দায়, কোন কর্ম করিলে সেমাতে নিশ্চলা ভক্তি আসে, আর বুঝাইয়া দাও আমার জীবনের লক্ষ্য এবং জীবনের প্রকৃত কর্তব্য কি ? হে অমৃতধামিনি ! তুমি হৃদয়ের সকল ভাবই সাক্ষীরূপে জানিতেছ, আমি তোমার প্রতি নির্ভর করিয়া তোমার আদেশ প্রতি প্রাণনের আশায় তোমার দিকে চাহিয়া রহিলাম তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, তুমি যাহা করাইবে তাহাই করিব, স্পৃহা শূন্য করিয়া দাও, আর যেন কিছু চাহিবার প্রবৃত্তি আসিয়া তোমার বিমুগ্ধ ভালবাসার অনুভবে বঞ্চিত না করে । তুমি যখন যাহা দিবে, যখন যে ভাবে রাখিবে, তাহাই যেন হাসি মুখে অবিচারিত ভাবে আত্মাদের সহিত গ্রহণ করিয়া তোমার মঙ্গলময় নামের জয় দিতে পারি ।

### গান ।

তোমারি মতন এমন আপন, ভুবন মাঝারে নাই আমার ।

জীবন বলভ :—(নাথ) তুমি আমার আমি ও তোমার ॥

দিবানিশি নাথ আছ আশে পাশে, প্রাণে প্রাণে আছ অমায় ভালবেসে,  
ছাড়িয়ে থাকনা :—তবু ভালবাসা বুঝি না তোমার ॥

দিতেছ শক্তি বলিতে করিতে, খাইতে ঘুমাতে উঠিতে বসিতে,  
দেখিতে শুনিতে :—তোমা বিনে কোন বল নাই আমার ॥

দীনবন্ধু হরি দীন জন ভ্রাতা, তোমাবিনে কে আর জানে মন ব্যাথা,  
বা করাও তাই করি :—তুমি হরি সর্ব মূল্যধার ॥

দীনবন্ধু বেদান্তরত্ন ।

## নিবেদন।

—:—

ভক্ত গ্রাহক-মহোদয়গণ! দেখিতে দেখিতে ভক্তির আর একটা বংসর পূর্ণ হইয়াগেল, কাল কাহারও বাধ্য নয়, সময় নিরন্তরই চলিয়া যাইতেছে; তবে কেহ কেহ সময়ের সং ব্যবহারে আত্মার উন্নতি সম্পাদন করিয়া নিজেও সুখী হন, অপরকেও সুখী করেন, আর কেহ কেহ সুদালোচনা রসে বঞ্চিত থাকিয়া নিজেরাও অজ্ঞান অন্ধকারে থাকেন, পরের প্রাণেও ঐ অন্ধকার সঞ্চারিত করেন। ভাগ্যবান্ ও ভাগ্যবতী নরনারী সং আলোচনা ও সংসঙ্গ করিয়া জীবনের লক্ষ্য ও কর্মের পরিণাম স্থির করত আপন আপন কুসংস্কার ও কুপ্রবৃত্তি প্রসৃত কুংসিত ভাব সকলকে কাল শ্রোতে ভাসাইয়া ক্রমিক উন্নতির পথে অগ্রসর হন, তাঁহারা অনুভব করেন যে, একটা বংসর গেল তাই কত নতন নতন কথা, নতন নতন শিক্ষা ও নতন নতন ভাব লাভে সুখী হইলাম একটা বংসর যেমন চলিয়া গেল উহার সহিত আমারও অনেক অজ্ঞানান্ধকার অপসারিত হইল, যে সময়টা গেল তাহা যেমন আর আসিবেনা, আমারও যে অজ্ঞান যে মন্দ ভাব বংসরের গতির সহিত চলিয়া গেল তাহাও আর কিরিয়া আসিবেনা। আমি ক্রমিক সেই প্রাণারাম অধ্যাস্থ সুখে সুখী হইবার জন্ত এক শ্রেণী উপরে উঠিলাম, আশুক নতন বর্ষ, আবার নতন নতন বিষয় শিখিয়া ও অনুষ্ঠান করিয়া ইহা অপেক্ষা উন্নত, শুদ্ধ ও পবিত্র হইব। এইরূপ ভাবে ক্রমোন্নতিতে সমারূঢ় নরনারী নতন নতন বর্ষকে সাদরে আহ্বান করেন, নিত্য নিত্য যাহারা নতন নতন শিক্ষা লাভ করেন ও করিবার অভিলাষী তাঁহারা বুঝিবেন সং আলোচনা সং উপদেশ ও ভগবৎ ভক্তগণের আচার ব্যবহারের আলোচনা কত সুখ কর ও কত অশিষ্টকরী ॥

আর যাহারা আলোচনার দিকে অগ্রসর হইবার জন্ত কিছু মাত্র চেষ্টা করে না, নিজ নিজ বন্ধ মূল কুসংস্কারকে অতি আদরে হৃদয়ে রাখিয়া অসংসঙ্গে বৃথা পরচর্চায় জীবনের কাল অতিবাহিত করে, তমো গুণে বিবেক শক্তি যাহাদের একেবারে সমাচ্ছাদিত, তাহারা সংআলোচনা করেনা সং আলোচনার অর্থশূন্যতা

ও বৃথিতে পারেনা, এমন কি সং আলোচনা সংভাব ও সং প্রসঙ্গ কাহাকে বলে তাহাও জানেনা, কেবল আহাৰ নিদ্রা পরায়ণ ভোগোমুখ ইন্দ্রিয়ের দাম হইয়া মনুষ্য জীবনের অনূল্য সময় অতিবাহিত করে, তাহাদের এক একটা বৎসর যায় আর ছন্দয়ের আবর্জনা, পাপ, তাপ, হতাশা ও হুরাশা বাড়িতে থাকে, এই অবস্থায় আবার কেহ কেহ ভাবে হইল কি! বিষয় ভোগের জগ ও ক্রী পুত্রাদির সহিত নানা প্রকার সুখ সচ্ছন্দতা ভোগ করিব বলিয়া যে উচ্চ জীবন পাইয়াছি তাহার একটা বৎসর কমিয়া গেল; আশামুরূপ আনন্দ পাইলাম না, শরীর ও মন হুস্থ হুইল না, কষ্টও শেষ হইল না, দিনে দিনে দিন চসিয়া গেল, হায় করিলাম কি ?

আবার এক শ্রেণীর লোক এরূপ ভাবনাও করেনা, তাহারা কেবল ইন্দ্রিয় সুখ ও বৃথা আমোদ প্রমোদে যে কোন প্রকারে সময় কাটানই জীবনের লক্ষ্য মনে করে, বোঝেনা মনুষ্য জীবন কত উচ্চ, জানেনা কষ্টের পরিণতি, ভাবেনা পরে কি হইবে।

এইরূপে সংভাবাপন্ন, সংভাবলাভেক্ষুক, ও অসং, এই ত্রিবিধ লোকের উন্নতি ও সময়ের সার্থকতার জগ শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রমাণ ও ভক্তের দৃষ্টান্ত সম্বলিত প্রবন্ধাদি যথা সাধ্য সংগ্রহ ও সঙ্কলন করিয়া বহু ভক্ত নরনারীর আনন্দ বর্ধন করত তাহাদেরই যত্নে রক্ষিতা ভক্তি পত্রিকা আজ ৮ম বর্ষের পূর্ণতা লাভ করিল, যাঁহারা ১ম হইতে ইহার প্রবন্ধাদি লিখিয়া ও পড়িয়া আনন্দলাভ করিতেছেন তাঁহাদেরই বৃত্তিতেছেন ভক্তি পত্রিকার উদ্দেশ্য কত দূর সিদ্ধ হইতেছে। এ বিষয় আমার অধিক বলা অসঙ্গত বিবেচনায় আমি পাঠক পাঠিকার প্রতিই এ সমালোচনার ভার অর্পণ করিলাম। যাঁহারা এই পত্রিকা হইতে ধর্মতত্ত্বের ও আত্মোন্নতির অনুকূলে কিছুমাত্র উপকার পাইয়াছেন, তাহারা আপন বন্ধু স্বাক্ষরের মধ্যে সেই বন্ধু ও সেই আত্মোন্নতির ভাঙউৎসাহের সহিত প্রচার করুন ইহা আমার বিশেষ নিবেদন।

যাঁহারা আমাকে ভক্তিতে লিখিত প্রবন্ধাদির জগ আশীর্বাদ ও উৎসাহ বাক্যে উৎসাহিত করিতেছেন, তাঁহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা পাশে বন্ধ থাকিয়া প্রার্থনা করিতেছি যে, তাঁহারা যেন পূর্ব পূর্ব বৎসরের মত জাগামী

বর্ষেও ঐরূপ উৎসাহ প্রদান করিয়া কর্মের সহায়তা করেন এবং যাহাতে তাঁহাদিগকে সুখী করিতে পারি মেরূপ আশীর্বাদ করেন। আর যাহার রূপায় এই ৮ম বর্ষের পত্রিকায় নিরাপদে “শ্রীশ্রীগোবিন্দলীলারহস্য” “দম্পতীদর্শন” প্রভৃতি অতি আবশ্যিকীয় বিষয় সকল লিপিবদ্ধ করিয়া ভক্ত সমাজে প্রচার করিতে পারিয়াছি সেই বিশ্বনিস্তার রূপায় যেন নববর্ষেও ঐ সকল তত্ত্ব প্রচার করিতে সমর্থ হই। আমার সকল বিষয়েই বল ভরসা ও সহায় সম্পদ সেই লীলাময়ের রূপা, ভক্তগণ আশীর্বাদ করুন।

শ্রীদীনবন্ধু বেদান্তরত্ন।

## সংপ্রসঙ্গ ।

( পূর্ব প্রকাশিতের পর । )

—:—

চ। ধ্যানের বিজ্ঞান সুন্দর রূপে বুঝিলাম, তুমি বলিলে যে সাধনের প্রথমাবস্থায় একটুকুষ্ট মুহূর্ত্ত কল্পিতে হয়, কিন্তু সে দিন জনৈক পণ্ডিতের নিকট শুনিলাম যে, বেদে লিখিত আছে “ধর্ম্মাদি মুখং” ফলতঃ সাধন যদি ধর্ম্ম হয় ও বেদ বাক্য যদি সত্য হয়, তবে সাধনে মুখ না পাইবার কারণ কি? অথচ ইহাও দেখিতেছি যে নিরম রক্ষার জন্ত যখন ইষ্ট মন্ত্র জপ কল্পিতে বসি তখন মনকে বহির্বিষয় হইতে ফিরাইয়। ধ্যানে সংলগ্ন করা কষ্টকর হয়, প্রকৃত আনন্দ পাইলে মন তাহা ছাড়িয়া অন্য দিকে যাইবে কেন? যাহা হউক এক্ষণে এই সন্দেহটি মিটাইয়া দাও।

র। ভাই সাধনকে ধর্ম্ম মনে করিয়া তুমি প্রথমেই ভুল করিয়াছ, সাধন কর্ম্মের অন্তর্গত, এবং এই কর্ম্ম ধর্ম্মলাভ রূপ উদ্দেশ্যের উপায় মাত্র, উপায় উদ্দেশ্য নহে, অর্থাৎ উপার্জন করা ভোগরূপ উদ্দেশ্যের উপায় মাত্র, কিন্তু যদি কেহ এই উপার্জন করাকেই উদ্দেশ্য মনে করিয়া উহা ভোগ না করে, তাহা হইলে যেমন তাহার কষ্ট মাত্র সার হয়, তাহার ভাগ্যে ভোগের আনন্দ লাভ হয় না, সেইরূপ সংসারের অধিকাংশ ব্যক্তি অজ্ঞানজনিত অজ্ঞতার বশে উপায় কে উদ্দেশ্য অর্থাৎ কর্ম্মকে

ধর্ম মনে করিয়া ধর্মের প্রকৃত ফল লাভে বঞ্চিত হয়, কর্ম ধর্মমন্দিরে প্রবেশ করিবার সোপান মাত্র ও সাধিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে কর্মের তিন প্রকার ভাব, এবং এই ভাবানুযায়ি ইহার গতিও ত্রিবিধ, তামসিক কর্মের নিয়গতি, রাজসিকের মধ্যগতি ও সাধিকের উল্লগতি, ফলে সাধিক কর্মই প্রকৃত সাধন শব্দবাচ্য, ইহার দ্বারা মন উন্নীত হইয়া বুদ্ধি বা জ্ঞানের শাস্তিময় অধিকারে প্রবেশ করে, এবং এই জ্ঞানই ধর্ম মন্দিরের দ্বার স্বরূপ, অতএব দ্বারের মধ্যে প্রবেশ না করিলে যেমন মন্দিরের মধ্যে যাওয়া যায় না, সেইরূপ জ্ঞানের উন্মেষ না হইধে ধর্মের উপলব্ধি হইতে পারে না, আবার সোপান পার না হইলে যেমন দ্বারের নিকট যাওয়া যায় না, সেইরূপ সাধিক কর্ম ভিন্ন জ্ঞানের উন্মেষ হইতে পারে না ।

অতএব ইহা নিশ্চয় জানিও যে, সাধিক কর্মের দ্বারা জ্ঞান অর্জিত না হইলে ধর্মের উপলব্ধি হয় না, জিহ্বার দ্বারা ভিন্ন যেমন অল্প কোন উপায়ে মিষ্টানের আশ্বাদ পাওয়া যায় না, সেই রূপ জ্ঞানের দ্বারা ভিন্ন ধর্মের আশ্বাদ ও তজ্জনিত আনন্দ ভোগ করিবার অল্প উপায় নাই, তবে সাধনের পথে কিছুদূর অগ্রসর হইলে দূর হইতে যখন জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ করা যায়, তখন গুপ্তধনের আশায় মৃত্তিকা খননের স্থায় সাধনের শ্রম আনন্দগর্ভ হওয়ায় উহার বেগ অনুভূত হয় না, পরে ঐ ধন লাভ করিলে যেমন আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, সেইরূপ জ্ঞান লাভ পূর্বক ধর্ম মন্দিরে প্রবেশ করিলে প্রকৃত আনন্দের উপলব্ধি হয় ; এই অবস্থায় সাধকের নিকট ত্রিতাপ প্রতিহত হইয়া যায় ও তাঁহার জন্ম মরণাদির মহাত্ম্য আর থাকেনা, সামান্য অধি যেমন পর্বতাকার ভূমি সমূহকে ভস্ম করে, সেইরূপ জ্ঞান লাভের পর প্রকৃত ধর্ম অল্পরূপে অনুষ্ঠিত হইলেও জন্ম মরণাদির কারণ স্বরূপ পুঞ্জীভূত কর্মবীজ সমূহকে দগ্ধ করিয়া ফেলে, এই জন্যই গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন :—

“স্বল্পমপ্যস্য ধর্মশ্চ ত্রায়তে মহতোভয়াৎ

দ্বিতল পর্বের ন্যায় এই ধর্মমন্দির দ্বিতল, ইহার প্রথমতল জ্ঞানময় ও দ্বিতীয় তল চৈতন্যময়, প্রথম তলে আনন্দের উচ্ছ্বাস বিরাম আছে, কিন্তু প্রথম তলে অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় তলে অর্থাৎ প্রতিবিন্ধিত চৈতন্য বা জ্ঞানের সীমা পার হইয়া, স্বরূপ চৈতন্যের অধিকারে ষাইবার সময়ে ভাবের সোপান দিয়া সাধক

যত অগ্রসর হন, ততই আনন্দের আধিক্য অনুভব করিতে করিতে ক্রমে স্বরূপ চৈতন্যের স্তরে উন্নীত হইলে উচ্ছ্বাসময় আনন্দ অবিচ্ছিন্ন ভাবে তাঁহাকে অনন্ত কালের তরে আশ্রয় করে জানিও।

চ। জীবে দয়া করা ধর্মের না কর্মের অন্তর্গত?

র। ভাব ভেদে দয়া কখন ধর্মের এবং কখন কর্মের অন্তর্গত হয়, আমিত্ত্ব বুদ্ধিতে দয়া করিলে উহা কর্মের অন্তর্গত হইয়া প্রয়োগ ভেদে ন্যূনাধিক পরিমাণে সাময়িক শুভ ফল মাত্র প্রসব করে এবং অহমিকার আবরণ উন্মোচন করিয়া শ্রীভগবানের ভাবে দয়া করিলে উহা ধর্মের অন্তর্গত হইয়া নিত্য ফলের জনক হয়, দয়া চারি প্রকার, তামসিক, রাজসিক, সাত্ত্বিক ও নিষ্কর্মেণ, ইহার মধ্যে যে ভাব সংযুক্ত করিয়া দয়া করিবে, তদনুযায়ী ফল লাভ হইবে, প্রথম তিন প্রকার ভাবের দয়া কর্মের ও নিষ্কর্মেণ দয়া ধর্মের অন্তর্গত জানিও।

চ। ভালরূপ বৃত্তিতে পারিলাম না।

র। তামসিক দয়া কাহাকে বলে জান! মনে কর এক জন দস্যু এক পথিকের সর্বস্ব হরণ করিয়া বলিল “তোমাকে প্রাণে মারিতাম কিন্তু দক্ষা করিয়া ছাড়িয়া দিলাম, শীঘ্র পলায়ন কর,” এই ভাবযুক্ত দয়ার ফলে পুণ্য সঞ্চয় না হইলেও ইহা অতিরিক্ত পাপে ডুবিতে দেয় না। ঐহিক বা পারলৌকিক সুখ কামনায় দয়া করাকে রাজসিক দয়া বলে, ইহা সাময়িক শুভফল প্রসব করে মাত্র, আর শাস্ত্রাদিষ্ট কৃতবৃত্ত বোধে শ্রীভগবানের প্রীত্যর্থ দয়া করাকে সাত্ত্বিক দয়া বলে, এইরূপ দয়ার ফলে মোক্ষানন্দের কারণ স্বরূপ জ্ঞান সম্পত্তি লাভ হয়, কর্মজ দয়ার মধ্যে এইরূপ দয়াকেই শ্রেষ্ঠ ও নিঃশূল বলিয়া জানিও, কেননা ইহার দ্বারা শ্রীভগবানের দয়া আকর্ষিত হইয়া জ্ঞান স্বরূপে সাধকের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়।

উপরোক্ত ত্রিবিধ দয়াই কর্মের অন্তর্গত, ইহা ব্যতীত ধর্মের অন্তর্গত যে নিষ্কর্মেণ দয়ার কথা বলিয়াছি তাহা জ্ঞান লাভের পরে ভিন্ন উপলব্ধি করা যায় না এবং আমিত্ত্ব বুদ্ধির দ্বারা এরূপ দয়ার প্রয়োগ হইতে পারে না, এজন্য নিষ্কর্মেণ ইচ্ছার সংপ্রব না থাকিতে তাহা সকল পাত্র প্রযুক্ত হয় না, কিন্তু পাত্র বিশেষে যখন প্রযুক্ত হয় তখন সাধক আগনাকে যত্নবৎ বিবেচনা করিয়া

শ্রীভগবানের দিকে চাহিয়া থাকেন ও তাঁহার দয়াতে নিজের আধার পূর্ণ দেখেন, ফলে তাঁহার আমিত্ব বুদ্ধি সেই চৈতন্যময়ের শ্রীচরণ কমলে যুক্ত থাকায় তিনি উপলব্ধি করেন যে, দয়া জীবের নহে, ইহা অনন্ত ভাবে এক শ্রীভগবানকেই আশ্রয় করিয়াছে, জীবের সম্বল প্রার্থনা, এবং দয়ার মালিক তিনি ।

গঙ্গা হইতে আধারের দ্বারা বারি উত্তোলন করিলে সীমাবদ্ধ হওয়ায় যেমন তাহার শক্তি ক্ষীণ হইয়া যায় এবং ঢালিবার পরে আধার অল্পক্ষণ শীতল থাকে মাত্র, সেইরূপ আমিত্ব বুদ্ধির দ্বারা আত্মসং পূর্কক দয়াকে সীমাবদ্ধ করিলে উহা শক্তিশূন্য হইয়া যায় এবং প্রযুক্ত হইলে সাময়িক শুভফলের জনক হয় মাত্র, কিন্তু গঙ্গার সহিত সংযুক্ত থাকিলে দীর্ঘিকা যেমন নিজে পূর্ক থাকিয়া অপরের তৃষ্ণা দূর করে, তাহার বারি কখনও ফুরায় না, সেইরূপ শ্রীভগবানের দয়া সাধকের আধার দিয়া যখন পাত্র বিশেষে প্রযুক্ত হয় তখন তাহা অনন্তের সহিত যুক্ত থাকায় নিত্য ফল প্রসব করে জানিও ।

যখন দয়ার প্রয়োগ হয় ; তখন শ্রীভগবানের দয়ায় আপন আধার পূর্ণ দেখিয়া সাধক নির্জেকে কৃতার্থ বোধ করেন ও কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ভগবদ্ভূতেশে বলেন যে, প্রভো! ধন্য তোমার দয়া! আর আমিও ধন্য! কেন না তোমার দয়ার স্রোত আমার আধার দিয়া প্রাবাহিত হইয়া তোমার কৃপা পাত্রে প্রযুক্ত হইল ।

ভাই! এই নিগূর্ণ দয়ার দাতা ও গৃহীতা উভয়েই লক্ষ্য ভগবদুখীন হইলে পূর্ণরূপে ইহার আদান প্রদানের সুবিধা হয়, দাতা আমিত্ব বুদ্ধিতে দয়া করিবেন না ও গৃহীতা মানুষের নিকট দয়া চাহিবেন না, মানুষের আধাররূপ যবনিকার অন্তরঙ্গস্থিত শ্রীভগবানের করুণা অনুভব করিবেন, ফলতঃ 'উভয়ের ভাব সমান হইলে এইরূপ দয়ার আদান প্রদানে পূর্ণ ফল লাভ করিয়া উভয়েই কৃতার্থ হইবে, নতুবা স্থল বিশেষে একের ভাব ঠিক থাকিলেও উহার দ্বারা তিনি অস্ত্রের ভাব উদ্বুদ্ধ করিয়া দেন ও তাহাতে অস্ত্রের পূর্ণ ফল লাভ না হইলেও তাহার পূর্কভাস সূচিত হয় অর্থাৎ দঙ্গগুণে ক্রমশঃ তাহার লক্ষ্য প্রকৃত পথে চালিত হইতে জানিও ।

চ। দান কিসের অন্তর্গত ?



র। দয়া সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, দান সম্বন্ধেও সেই ভাব, ইহাও দয়ার  
অন্য ভাব ভেদে ধর্ম বা কর্মের ত্রিবিধ স্তরের অন্তর্গত হইয়া তদনুযায়ি ফল  
প্রদান করে, বিরক্তির সহিত অনিচ্ছায় দান তামসিক, ঐহিক বা পারলৌকিক  
সুভ কামনায় দান রাজসিক ও ভগবৎ প্রীত্যর্থে নিজের আধ্যাত্মিক মঙ্গল  
কামনায় দান সাত্ত্বিক কর্মের অন্তর্গত। এই ত্রিবিধ দান ব্যতিত জ্ঞানী সাধকগণ  
আমিত্ব বুদ্ধিকে ভগবল্লক্ষ্যে স্থির রাখিয়া যত্নবৎ ভাবে যে দান করেন তাহাই  
ধর্মের অন্তর্গত ও নিগুণ এবং নিত্যফল প্রসবকারী।

চ। গ্রহণের ভাব কিরূপ ?

র। ইহারও আকার পূর্বোক্তরূপ, জোর করিয়া বা অনুরোধাদির দ্বারা  
বাধ্য করিয়া বিরক্তি ভাবের দান গ্রহণকে তামসিক, কাল্পনিক অভাব পূরণ  
বা সঞ্চয়ের জন্ত মানুষের নিকট গ্রহণ কে রাজসিক ও কেবল প্রকৃত অভাব  
পূরণের জন্ত মানুষের ভিত্তর হইতে ভগবানের দান গ্রহণ করাকে সাত্ত্বিক  
বলে এবং অযাচিত দান ভগবৎ প্রেরিত বোধে গ্রহণ করাকে নিগুণ বলে  
জ্ঞানিও, তামসিক ও রাজসিক গ্রহণে অজ্ঞানের ও সাত্ত্বিক গ্রহণে জ্ঞানের  
বীক্ষণ বসিত হয়, কিন্তু নিগুণ গ্রহণ অজ্ঞান ও জ্ঞানের অতীত চৈতন্যময় ভাব প্রদ  
হয় জর্জনও।

শ্রীহরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়।

ক্রমশঃ।

## লীলা রহস্য। (১০)

( পূর্বপ্রকাশিতের পর । )

প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ! এইবার শ্রীচক্ষু বাৎসল্য ভাবের পুণ্ডীর বাহির  
হইলেন তাহারই উদ্যোগ করিতেছেন, এভাবে কেবল ঐ যশোদার ভাবে  
ভাবিত থাকিয়া যশোদানন্দন নামে মাতৃভাবাপন্ন গোপীগণের নিকট বালক-  
রূপে খেলিতেছিলেন, মাতৃভাবাপন্ন গোপীরাই বাৎসল্য ভাব বুকে ধরিয়া

গোপালকে দেখিতে আসিতেন, গোপালকে ভালবাসিতেন, এবং গোপালকে আদর যত্ন করিতেছিলেন। আনন্দ দাতা শ্রীগোবিন্দও সন্তানরূপে মাতৃগণের জন্ম জন্মান্তরীন স্মৃতির স্মৃকল প্রদান করতঃ সকলেরই প্রাণে অনির্লক্ষণীয় সুখ বিধান করিতেছিলেন, এইবার আর একটু ভাবের প্রসার আনন্ত হইল। গোপালের রূপলাবণ্য ও সুমধুর বালকভাবের কথা সর্বত্র প্রচার হইল, যাহারা বাৎসল্য কিম্বা সখ্য ও মধুর ইহার কোন একটা ভাবের বিষয় আশ্রয় করেন নাই অথচ ধার্মিক ধার্মিকা সেই সলক নর নারী গোপালের গুণশ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া ভালবাসারমূর্ত্তি মা যশোদার নিকট আসিতে লাগিলেন। সর্কান্তধামী শ্রীকৃষ্ণ সকলকেই আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, যশোদা নন্দনকে দেখিয়া সকলেরই হৃদয়ের গুপ্তভাব জাগিয়া উঠিতে লাগিল, শুধু গোপগোপী নন্দ যাহারা সখ্য প্রেমের আধার স্বরূপ সেই ব্রজবালকেরাও আকর্ষিত হইতে লাগিলেন। সুতরাং মা যশোদার বাৎসল্যভাব-রাজ্যের মধ্যে অন্যান্য ভাবের সংমিশ্রণ আরম্ভ হইল। শ্রীকৃষ্ণের রূপ লাবণ্য শ্রীকৃষ্ণের সুমধুর বাক্য ও প্রাণ মন বিমুক্তকারিণী বালকমূলভ খেলা আজ গোকুল ছাড়িয়া ব্রজধামকে আনন্দিত করিতে লাগিল।

লীলাময়! ধন্ত তোমার খেলা, ধন্ত তোমার চতুরতা। তোমার খেলার জয় হউক, তোমার খেলায় আকৃষ্ট হইয়া নর নারীর প্রাণ স্থনীতল হউক, তোমার খেলার তত্ত্ব আলোচনা করিয়া সংশয়িত চিত্ত নর নারীর হৃদয়ের অন্ধকার বিদূরিত হউক। মঙ্গলময়! আশীর্বাদ কর যেন লীলাতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি, জগৎকে শিখাইতে তুমি নাম রূপের অতীত নিত্যবস্ত হইয়াও বালক সাজিয়াছ, তুমি ইচ্ছাময়; যাহা ইচ্ছাকর তাহাই হয়, তবু হে লীলাময়! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জুই তুমিই আবার সঙ্গী জুঠাইতেছ? এ রহস্য তুমি না বুঝাইলে কে বুঝাইবে বল।

পাঠক পাঠিকাগণ! পূর্বে শুনিয়াছেন, গুর্গাচার্য্য সংক্ষেপে নন্দকে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের তত্ত্ব বুঝাইয়াছেন, ইহার দ্বারা সাধক সাধিকাকে কি শিক্ষা দিয়াছেন সে বিষয়েও ইঙ্গিত করা হইয়াছে, এক্ষণে তাহার পর কি হইল জানিতে সমুৎসুক রাজা পরীক্ষিতকে লক্ষ্য করিয়া শুকদেব কি বলিতেছেন শুনুন।

ইত্যাত্মানং সমাদিশু পুংগেচস্বগৃহং গতে ।

নন্দঃ প্রমুদিতোমেনে আত্মানং পূর্ণমাশিয়াং ॥

এইরূপে অতি উদারচেতা গর্গাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণের নামকরণশীলা সমাপন করিয়া নিজ গৃহে গমন করিলেন, পূর্ণব্রহ্ম সনাতনই পুত্ররূপে আসিয়াছেন এ পুত্র হইতে সকলের সকল ছুঃখবিদূরিত হইবে গর্গাচার্য্যের এইরূপ তৎকথা শ্রবণ করিয়া নন্দমহারাজ নিজেকে কৃতার্থ মনে করিলেন । নন্দমহারাজ মনে মনে ভাবিতেছেন অহো ! আমার ভাগ্যের সীমা নাই, আমার পুত্র জীবনের ও ইহ জীবনের যাহা কিছু শুভানুষ্ঠান ছিল আজ বিধাতা তাহার পরিপূর্ণ ফলরূপে এই সর্বজন প্রশংসিত নরন ও মনের আনন্দবন্ধন সন্তানরত প্রদান করিলেন । দেবগণ দ্বিজগণ প্রশন্ন হইয়া আমাকে যে সকল আশীর্বাদ করিয়াছেন আজ সে সকল সফল হইল, গর্গাচার্য্য কখনই রঞ্জিত বা করিত কথা বলিবেন না, তিনি যাহা যাহা বলিলেন সে সকল সত্য বলিয়া আমার বিশ্বাস হইতেছে । আনন্দময় শ্রীভগবানকেই যখন আপন ঘরে আপন পুত্ররূপে পাইয়াছি তখন আমি ধন্য হইয়াছি; আমি কৃতার্থ হইয়াছি, আমার হার ভাগ্যবানকে আর ভয় কি ? আর আমার কোন অভাব নাই আর কিছু আমার পাইতে বাকী নাই । পাঠক ! ভাবুন নদের এইরূপ ভাব কি রক্তোপ্তের অহংকার ? না আর কিছু, সাধুসঙ্গে সাধক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসী, ভাবানন্দে আনন্দিত এবং সফল মনোরথ হইয়া নিজেকে সুখী মনে করেন, যতদিন এই তত্ত্বজ্ঞানের উদয় না হয় ততদিন “হায় আমার কিছুই হইলনা আমি বেধ হয় নরকে যাইব” এইরূপ অস্থিরতারভাব থাকে, তত্ত্বজ্ঞান হইনের হৃদয় সর্বদা ভীত ও সর্বদা অক্রোধস্থ থাকে, জ্ঞানের আলোক জালিলেই অজ্ঞান অন্ধকার সরিয়া যায়, যেমন অন্ধকার সরিয়া যায় অমনি সাধকের আত্ম তত্ত্বের উপলক্ষি হয়, সাধক সদানন্দ প্রাণে ভাবের উচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠেন “ধন্যোহস্মি ধন্যোহস্মি কৃতার্থোহস্মি ইত্যাদি” আমি ধন্য, আমি কৃতার্থ হইলাম ইত্যাদি আরও বলেন—

অহং দেবৌ নচাত্মোশ্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্

সচ্চিদানন্দ রূপস্যং নিত্যমুক্তস্বভাবভাক্ ।

অর্থাৎ আমি সেই সক্তিদানন্দময় শ্রীভগবানেরই অংশ, আমি শোকমোহ ও দুঃখাদিতে অভিভূত হবার যোগ্য নহি, আমি নিত্য মুক্ত স্বভাববিশিষ্ট, আমার ভয় নাই, বন্ধন নাই, মৃত্যু নাই, আমি আনন্দ স্বরূপ” এইরূপ ভাবানন্দের উচ্চ্বাস দেখাইবার জন্তই নন্দমহারাজের এইরূপ ভাব। পরে আবার লীলাময় কি লীলা করিতেছেন শুনুন।

কালেন ব্রজতা তাত গোকুলে রামকেশবো ।

জানুভ্যাং সহপাণিত্যাং রিঙ্গমানৌ বিজহৃতুঃ ॥

শুকদেব বলিতেছেন, হে রাজর্ষে ! তোমার লীলাতত্ত্ব শুনিতে বাসনা, তাই বলিতেছি শ্রবণ কর, লীলাময়ের লীলার সীমা নাই, প্রত্যেক লীলাই যে অপূর্ক ভাবরসের প্রস্রবণ স্বরূপিনী তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কিছু দিন পরে শ্রীরামকৃষ্ণ দুই ভাই বাছ ও জানুর দ্বারা চলিতে আরম্ভ করিলেন, এ চলার ভাব অতি মধুর, চলিতে চলিতে রাম ও গোবিন্দ গোকুল ছাড়িয়া এক একবার ব্রজমধ্যে প্রবেশ আরম্ভ করিলেন।

তাবজ্জি, যুগ্ম মনুকৃষ্য সন্নীহপত্তৌ ।

ঘোষ প্রঘোষক্চিরং ব্রজকর্দমেষু ।

তন্নাদ হৃষ্টমনসা বনুসত্য লোকং

মুগ্ধ প্রতীতবহুপেয় তুরন্তি মাত্রোঃ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ চরণ আকর্ষণ করিয়া অতি দ্রুতবেগে চলিতে চলিতে কাটি ও পদ-  
স্থিত ভূষণের স্তমধুর শব্দে আকৃষ্ট হইয়া ব্রজের কর্দমের মধ্যেই গমন করিতে  
লাগিলেন, ভূষণের শব্দের তালে তালে ফাকুট হইয়া পথে গমন শীল লোকের  
সহিত্রবহুদূরে যাইয়া আবার ঐ সকল লোক অপরিচিত বোধে একটু ভীতের  
মত হইয়া অতি দ্রুতবেগে মেহময়ী জননী বশোদা ও রোহিণীর নিকট ফিরিয়া  
আসিতেছেন কর্দমাক্ত হইয়া ও স্বভাৎ সুন্দরাস্ত্র শ্রীকৃষ্ণ বলরাম নিজ নিজ  
অঙ্গ কান্তিতে সফলকেই মোহিত করিতে লাগিলেন।

তন্নাতরৌ নিজ স্তৌ ঘণয়া শ্ৰু বস্তৌ ।

পঙ্কাস্ত্রাগক্চিরাবুপ গুহদোভ্যাং ।

দক্ষা স্তনং প্রপিবতোঃ মা মুখং নিরীক্ষ্য

মুগ্ধশ্চিত্তাঙ্গদশনং যযতুঃ প্রমোদং ॥

রাম জননী রোহিণী এবং কৃষ্ণ জননী যশোদা উভয়ে আজ একত্র হইয়া এক স্থানে দাঁড়াইয়া একই বাৎসল্য ভাবে ভাবিতা হইয়া পুত্রদ্বয়ের গমন লীলা দর্শন করিতেছেন, চক্ষুর পলক নাই ; মনের অহৃদগে গতি নাই ; কেবল কানাই বলাইয়ের মুখ কমল নিরীক্ষণ করিতেছেন যত দেখেন ততই স্নেহ বাড়িতেছে, যত স্নেহ বাড়িতেছে ততই পুত্র মুখ মধুর হইতেও স্নমধুর মনে হইতেছে, পুত্র স্নেহে জননীর স্তন দুগ্ধ ক্ষরিত হইতেছে ; আর থাকিতে না পারিয়া-ত্রত পদে গমন করত কর্দমাক্ত শরীর তথাপি অতি সুন্দরঙ্গ শ্রীরাম কৃষ্ণকে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া আলিঙ্গন করিতেছেন, জননীর হৃদয় জুড়াইল পুত্র মুখে স্তন অর্পণ করিয়া স্তনুপান করাইতে লাগিলেন, স্নেহের সীমা নাই, যশোদা ও রোহিণী উভয়েই পুত্র স্নেহে আত্মহারা স্তন দুগ্ধ দিতে দিতে পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ ও হস্তদ্বারা সন্মাহন করিতে করিতে পুত্রের সহাস্য বদনে স্নান অঙ্গ দস্ত উঠিয়াছে দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন, রাম ও কৃষ্ণ আজ বদন শোভায় মায়ের মন প্রাণ বিমুগ্ধ করিতেছেন, সাধনের ধনকে বার বার বক্ষ ধারণ ও চুষ্টন করিয়া যতই শুভ আশীর্বাদ ও আদর করিতেছেন কিছুতেই যেন আশা মেটে না কোন কথাই যেন প্রাণের ভাব সম্যক ব্যক্ত হয় না। হায় যে স্নেহকে উপনিষদাদি গ্রন্থে “অবাঞ্ছনসো গোচর ” বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন কান্ন সাধ্য তাহা ব্যক্ত করে ?।

যশোদা রোহিণীর এই অব্যক্ত মধুর বাৎসল্য ভাবোচ্ছ্বাস স্নানুভব করিতে বোধ হয় কোন গৃহস্বেরই কষ্ট হইবেনা, কারণ যাহারা সন্তান প্রসবকপ্রিয়াছে তাহারা ইহা পদে পদে অনুভব করে, যে, পুত্রের একটুক একটুক স্নেহভিত্তিতে পিতা মাতার মনে কিরূপ অনির্বচনীয় আনন্দ হয়। পাঠক! যখন সাধারণ মায়িক সংসারেও মায়িক পুত্র কন্যার উন্নতিতে মা বাপ আত্মহারা আনন্দ লাভ করেন, তখন প্রেমের আধার শ্রীভগবানকে যাহারা পুত্ররূপে পাইয়াছেন তাঁহাদের যে কি রকম হয় তাহা কে বলিতে পারে ?।

এখানে শ্রীভগবান্ নরনারীকে যেন ধ্বংসিতেন জীব তুমি যদি প্রাণ খোলা ভালবাসা লইয়া আমাকে আপন করিতে পার তবে আমি ক্রমিক তোমার আনন্দ বর্ধনের নিমিত্ত তোমার ভাববনের পুষ্টি সাধন করিয়া তোমায় চিন্ময় নিত্য সুখে সুখী করিব। মায়িক সপ্তক দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া যেমন আশ্র তত্ত্ব ভুলাইয়া দেয়, আমাতে রুও প্রেম সপ্তকও সেইরূপ দিন দিন অসীম ভাবে বাড়িয়া বাড়িয়া মায়িক বাসনা কামনা ও পার্থিব ভাব ভুলাইয়া এমন কি আশ্রহারা করিয়া আমারই ভাবানন্দে আনন্দিত করে।

এদিকে—

যর্হাঙ্গনা দর্শনীয় কুমার লীলা বস্ত্র ব্রজে তদবনাঃ প্রস্থীতপুচ্ছঃ ।

বংসৈরিত স্ত্রত উভাবনু কয়া মাণৌ ।

প্রেক্ষ্যত উজ্জিত গৃহা জহনু হৃমস্ত্যঃ ॥

এইরূপে যখন কুমার লীলার প্রথমাবস্থায় রামকৃষ্ণ বংসের পুচ্ছ ধারণ করিয়া তাহাদের সহিত খেলা করিতে আরম্ভ করিলেন, বংসগণও দ্রুত পদে গমন করত গোকুল ও ব্রজধাম এই দুই স্থানে রামকৃষ্ণকে আকর্ষণ করিতে লাগিল, তখনকার সেই দর্শনীয় অপূর্ণ লীলা দর্শনে সমাগত গোপগোপীগণ একেবারে গৃহ কন্ড ভুলিয়া গেলেন তখন তাহাদের কেবল নৈত্র ইন্দ্রিয়েরই সার্বকভা হইতে লাগিল, রামকৃষ্ণের ভাব ভঙ্গিতে আর্কষ্ট হইয়া নিজেরাও হাসিতে লাগিলেন, অপরকেও হাসাইতে লাগিলেন, অন্যচ্ছিত্র নাই, অশ্রু করের ভাবনা নাই সকলেই আনন্দ-রূপে বিভোর

পাঠক পাঠিকাগণ! এই লীলার ভাব কি বুঝিতেছেন না? লীলাময় আজ কোন নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া ভক্ত জনের মন প্রাণ পুলকিত করিতেছেন, ভাগুর্ন। সাধকের মনরূপ গোকুলে গোকুলবিহারী হরি আরাধ্যদেব এতদিন গোপনই ছিলেন, এক্ষণে গোপুচ্ছ ধারণ করিয়া ব্রজধামে যাতায়াত করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ সাংসারিক কার্যের মধ্যেও ভাবময়ের খেলা অশ্রুভব করিতে আরম্ভ হয়, গোপুচ্ছ ধারণ করিয়া চণ্ডার তাঁৎপর্য ইন্দ্রিয় ভোগকে অবলম্বন করিয়া, ষোণ্য বিষয়ের মধ্যেও দেখা দেওয়া, অর্থাৎ এইরূপ উন্নত অবস্থায় সাধক বেশ বুঝিতে পারেন যে, চক্ষুই দেখেনা, কর্ণই শোনেনা ইহার সহিত

ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা ইন্দ্রিয় গোচর শ্রীগোবিন্দই বিষয় ভোগ করিতেছেন, আমি যাহা করি তাহা আমার শক্তিতে নয় গোবিন্দেরই খেলা। এইরূপে প্রত্যেক কার্যে ভগবৎ খেলার অনুভূতি হওয়ায় সাধক নিজের অভিমান সম্বৃত সকল কার্য ভুলিয়া কেবল ভগবৎ খেলায়ই বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন, সকল কার্যেই বলেন শ্রভো! ধন্য তোমার খেলা আমি আগে বলিতাম আমি করি, আমি বালি, এক্ষণে দেখিতেছি আমি কাঠের পুতুলের মতন, তুমি যাহা যাহা করাইতেছ তাহাই করিতেছি। এইক আশ্রয়হারা ভাবে ভগবৎ খেলা অনুভব করিতে করিতে আবার প্রাণে প্রাণে ভয় হয় পাছে এই অপূৰ্ণ ভাব অসং সংশয় নষ্ট হয়, তাই নিজের ভাব নিজের হৃদয়েই সংগোপনে রাখিতে যত্ন করেন মা যশোদ! ও রোহিণীর দ্বারাও লীলার ভাবে তাহাই দেখাইতেছেন।

শ্রীদীনবন্ধু শাশা।

ক্ৰমশঃ—

## দম্পতী দর্পণ ।

( পূর্বপ্রকাশিতের পর । )

শ্রীভগবান নীতায় বলিয়াছেন ।

কর্মেন্দ্রিয়ানি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন ॥

ইন্দ্রিয়ার্থবিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥

লৌকিক সঙ্গীচরী হইবার জন্য লোক দেখাইয়া যে ব্যক্তি বাহিরে কর্মেন্দ্রিয়গণকে সংযম করে মনকে মানসিক সঙ্গীচরে সংযম করিতে চেষ্টা করে না, বাহিরে যে যে বিষয় ত্যাগ করে মনে মনে সেই সেই বিষয়ের ভোগ ভাবনা করে এইরকম লোককে মিথ্যাচার বলে, সুতরাং আগে মনকে সংযত করিয়া পরে বাহ্যিক আচার করাই যুক্তি সম্মত মন যদি সংযত থাকে তবে নিরাসক্ত ভাবে বাহিরে কর্ম করিলেও আত্মার অধঃপতন বা বন্ধন হয় না।

যত্নশ্রিয়ানি মনসা নিধম্যার ভতেহজুঁন ॥

কর্মেশ্রিত্যৈঃ কর্মযোগ মমক্তঃ সবিশিষ্যতে

অর্থাৎ মানসিক সদাচারের বলে মনকে সংযত করতঃ নিরাসক্ত ভাবে যে ব্যক্তি কর্মশ্রিয়ার দ্বারা কর্ম করে সে ব্যক্তি নিস্পাপ ও নিত্য মুক্ত। গৃহস্থকে এই ভাবে সংসার করিতে হইবে, আন্তরিক সংযম অভ্যাস করিয়া কর্তব্য পথে বিষয় ভোগ করাই সংগৃহস্থের কর্তব্য, সুতরাং প্রথমে মানসিক সদাচার করিয়া মনকে নিরাসক্ত, নিস্পৃহ ও শাস্ত করতঃ বাহ্যিক সদাচার সংআহার ও সংব্যবহার করিবে, যাহাতে রজোগুণ ও তমোগুণের বৃদ্ধি হয় এরূপ দ্রব্য আহার করিবে না, সার্বিক দ্রব্য আহারে মানসিক ও শারীরিক উভয় রকমে সদাচার প্রতিপালিত হয়, যাহারা তামসিক ও রাজসিক বৃত্তিতে সুখ প্রত্যাশায় রাজসিক ও তামসিক দ্রব্য আহার করে তাহারা শারীরিক ও মানসিক উভয় রকমে শাস্তিহারা হইয়া পারিবারিক ও নানা প্রকারে অশান্তি ভোগ করে। গৃহস্থ কখনও নিজে অসংস্কৃত করিবে না, এবং পরিজনবর্গকে করিতে দিবে না, গৃহস্থ যদি সাত্ত্বিক আচারে এবং পরিজন বর্গের সহিত সাত্ত্বিক ব্যবহারে সংসার করিতে পারে তবে অলোভী, অক্রোধী ও নিরোগী হওত সংসত্তানগণের জনক হইয়া সংসারেই স্বর্গীয় সুখলাভ করিতে সমর্থ হয়, বলা বাহুল্য যে, গৃহস্থ নিজে যেরূপ পবিত্র ভাবে থাকিবে, নিজ স্ত্রীকে সেই ভাবে রাখিতে চেষ্টা করিবে, স্ত্রীজাতি যদি সদাচারের প্রভাবে সংঅনুষ্ঠান দ্বারা সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন হয়, তবে যখন যে ভাবেই থাকুক তাহাতেই সন্তোষ ও প্রফুল্লবদনা থাকিয়া নিজেও সুখ পায় এবং স্বামী, পুত্র প্রভৃতি পরিবারবর্গকেও সুখী করিতে পারে। এইরূপে সাত্ত্বিক ভাবই যে সকল রকম সুখের জনক তাহাতে সন্দেহ নাই, সুতরাং সেই সর্ব জনক সাত্ত্বিক ভাবের একমাত্র উদ্দীপক যে মানসিক ও শারীরিক সদাচার তাহা গৃহস্থ মাত্রেই সর্কান্ত করণে ও সর্ব প্রয়োজনীয়। সভ্যবৃন্দ! গৃহীর সকল কার্যই সঙ্গীক করিতে হয় “সস্ত্রীকো ধর্মমাচারেৎ” এই শাস্ত্র বাক্যকে আশ্রয় করিয়া গৃহস্থ দম্পতী পবিত্র ভাবে সঙ্গুণ প্রধান আহার করিলে আর কোন রকমই কষ্ট পায় না, এবং যথাসময়ে সন্ন্যাসাদি আশ্রম গ্রহণ কনিবার আবশ্যক হইলে সংসার ও ভোগ্যবস্ত ত্যাগ করিতে কষ্ট পায় না, শাস্ত্র বিধি অনুসারে



গৃহস্থ দম্পতি গার্হস্থ ধর্মরক্ষা করিলেই ক্রমিক সংযম ও ভগবৎসঙ্গা অহুত্ব করিয়া গৃহে থাকিয়াই সকল আশ্রমের ফল লাভে কৃতার্থ হয়, সংগৃহস্থ আশ্রমাস্তর স্বীকার না করিলেও প্রার্থিত ভগবৎপ্রেম, ভক্তি, জ্ঞান কিম্বা মুক্তি লাভে সফল মনোরথ হইতে পারে, এই জগুই প্রথমে বলিয়াছিলাম গৃহস্থাত্মম শ্রেষ্ঠ । আপনারা সকলেই গৃহী হুতরাং সময়ের অপব্যবহার না করিয়া পতিপত্নী দিবারাতি কেবল স্থূল ভোগ্য বস্তুতে আসক্ত না থাকিয়া যথাশাস্ত্র গৃহধর্ম রক্ষা করিয়া সূত্রভ মনুষ্য জীবন, সার্থক করিবেন, আর এ বিষয়ে অধিক বল নিশ্চয়গোজন আপনারা আমার এ ধৃষ্টতা মার্জনা করিবেন এখানে অনেকই আমার গুরুজন আছেন কেবল আপনাদিগের আজ্ঞা প্রতিপালনের জগুই উপদেশছিলে এত কথা বলিলাম । একপে শিষ্ট ব্যবহার করিতেছেন এমন সময় পণ্ডিত মহাশয় আদিয়া জামতাকে বলিলেন বাবা অগ্র এই পর্যন্ত থাক ভোজনের দ্রব্য প্রস্তুত । সত্যগণকে বলিলেন আপনারা একপে অনুমতি প্রদান করিলে প্রবোধ বিশ্রাম করিতে যায় আপনাদেরও অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত । পণ্ডিতের বাক্যে সকলেই স্তীকৃত হইলেন ও বলিতে লাগিলেন, পণ্ডিত ভুমি ধন, অতি সুপাত্রে কছাদান করিয়াছ, ইহার সহপদেশে ও সদ্যবহারে আমরা অনেকেই আপন আপন কদাচার পরিত্যাগ করিয়া আর্ধ্য জীবিত কর্তব্য কর্মে উদ্যুক্ত হইয়া পবিত্র জীবন লাভের জগু আশা করিতেছি, এইরূপে সকলে প্রবোধের গুণ ও মিষ্টভাবিতার প্রশংসা করতঃ সন্তা ভঙ্গ করিলেন । সকলে প্রবোধের কথিত বিষয় ভাবনা ও পরস্পর আলোচনা করিতে করিতে আনন্দের সহিত ভোজন করিয়া নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন একে একে স্ত্রী জাতিরাও আহার করিয়া নিজ নিজ গৃহে গমন করিল বাড়ীর মধ্যে কেবল পণ্ডিত মহাশয়ের আস্থীয় কুটুম্বগণে পরিবৃত হইয়া প্রবোধ আহার ও বিশ্রামান্তে দেশ প্রথানুসারে নিজের বাড়ী যাইবার প্রস্তাব তুলিলেন পণ্ডিত মহাশয় কোন রূপে আপত্তি না করিয়া কতাকে স্বাস্থ্যীয় বাড়ী পাঠাইবার উত্তোগ করিতে লাগিলেন । দেখিতেদেখিতে যতই বেলা শেষ হইতে লাগিল ততই পণ্ডিত মহাশয় ব্যাকুল হইতে লাগিলেন, নেত্রদয় স্বেং রক্তবর্ণ ও ছল ছল ভাবে অক্ষুণ্ণ হইতে লাগিল এই ভাবে গৃহীলার হাত ধরিয়া, প্রবোধের নিকট আনিয়া প্রবোধকে বলিলেন বাবা প্রবোধ আমার একমাত্র সন্তান

সাদরে পালিতা স্নেহের স্মৃশীলাকে তোমার করে অর্পণ করিরাছি, দেখ যেন স্মৃশীলা আমার সুখে থাকিতে পায়, স্মৃশীলা আমার শান্ত স্বভাবা, স্মৃশীলা বুদ্ধিমতী, স্মৃশীলা লোভ ও ভোগশক্তি রহিতা বলিলেও বসিতে পারা যায়, তবে স্মৃশীলা জন্মাবধি আদরে প্রতি পালিতা, স্মৃশীলা নিজের স্বভাবের গুণে একদিনও আমাদের নিকট কোন রূপ কটকথ। শুনে নাই বলিয়াই কোনরূপ কষ্ট ও কটু বাক্য সহ করিতে পারে না তুমি ইহাকে সুশিক্ষিতা করিতে যত্ন করিও ইহার শত শত অপরাধ ক্ষমা করিও এবং ইহার তুমিই একমাত্র ালক বলিয়াই ইহাকে স্নেহে প্রতিপালন করিও, আমি সংশিক্ষার পক্ষপাতী তুমি যে গত রাত্রে কর্তব্য বোধে বিবাহের উদ্দেশ্য ও মঙ্গলার্থ স্মৃশীলাকে শুনাইয়াছ তাহাতে আমি অতিশয় সুখী হইয়াছি, আমি তোমার গুণে আকৃষ্ট হইয়া তোমার হস্তে স্মৃশীলাকে অর্পণ করিব বলিয়া পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিরাছি, বিখনিয়স্তা—আমার আশা পূর্ণ করিয়াছেন, আজ হইতে আমি স্মৃশীলার জন্য নিশ্চিন্ত, এক্ষণে তোমরা দুইজনে সুখে সংসার করতঃ নিজেরাও সুখী হও ও গুরুজনকে সুখী কর ইহাই আমার আন্তরিক আশীর্বাদ, তুমি সুবোধ, শাস্ত্রজ্ঞ ও ধার্মিক তুমি জান যে ধর্মপত্নীকে কি প্রকারে পালন করিতে হয় সে বিষয় আমার কিছুই বলবার নাই, স্মৃশীলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন মা স্মৃশীলা আজ তুমি স্বর্গীর গৃহে গমন করিবে এই ভাবিয়া আমি কেমন অধীর হইয়াছি যে তোমার মুখপানে চাহিয়া কথা বলিতে পারিতেছি না, স্মৃশীলার মুখে হাত দিয়া বলিলেন স্মৃশীলা তুই আমার একমাত্র সন্তান জন্মাবধি একদিনও আমাদের ছাড়িয়া কোথাও যাই নাই, আজ আমাদের ছাড়িয়া অস্থ সংসারে প্রবেশ করিবি তাই তোর মুখপানে চাহিয়া চক্ষের জলসম্বরণ বরিতে পারিতেছি না, আমি আশার অনুরূপ গুণে ও রূপে অতি সুপাত্রে তোকে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম এখন বিধাতা সকল রকমে তোকে সুখে রাখুন ইহাই প্রার্থনীয়, স্মৃশীলা এতদিন যেমন পিতামাতার কাছে ছিল আজ হইতে ধর্মত আর এক পিতামাতার সংসারে যাইতেছি। মা স্মৃশীলা “পতি দেবা ভব” ( পতিই আরাধ্য দেব এই তাবাপনা হও ) পতির পিতামাতাকে আপন পিতা মাতা জ্ঞানে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিও তুমি যদি সেখানে তাহাদের প্রিয় হইতে পার তাহারা তোমার গুণে আকৃষ্ট হইয়া তোমাকে সন্তানের মত

ভাল বাসেন, সকলে তোমার যশ করে তবেই আমার মুখ উজ্জ্বল ও প্রাণ আনন্দিত হইবে, আর তুমি যদি তোমার ব্যবহারের দোষে তোমার শিশুর শাস্ত্রীর অবাধ্য হইয়া নিন্দনীয় হও তবে তোমাকে দেখিয়া, তোমাকে বাড়ীতে আনিয়া দিবারাত্র আদর যত্ন করিয়াও আমি সুখী হইব না, যদি শুনি তুমি সেখানে সুখে আছ, যদি শুনি সকলে তোমায় ভাল বলে ও ভালবাসে, আর যদি শুনি তুমি পতির ও পতির গুরুজনের সেবা শুশ্রূষায় তাহাদের প্রিয়পাত্রী হইয়াছ, তবেই আমার মুখ এতৎ যখনই সময় পাইব তখনই তোমায় দেখিতে যাইব। এই বলিতে বলিতে পণ্ডিতের চক্ষে জল আসিল, দুইহাতে চক্ষুর জল মুছিতে মুছিতে আবার বলিলেন, সুশীলা! আজ তোমাকে স্বামীগৃহে পাঠাইয়া কেমন করিয়া যে ঘরে থাকিব তাহাই ভাবিতেছি, একই পরিশ্রম করিয়া ঘরে আসিলে তুমি বাবা বাবা বলিয়া আমার নিকটে আসিয়া আমার শ্রম দূর করিবার জগুথেরূপ আদর যত্ন করিতে; মা আজ হইতে আমি সেই স্থখে বঞ্চিত রহিব, সংসারে আর একটা পুত্র কন্যা নাই যে, তাহাকে দেখিয়া তোমার মুখ ভুলিব, যাহাই হউক তোমাকে যখন সংপাত্রে অর্পণ করিয়াছি তখন তুমি সুখে আছ ইহা শুনিলে সকল দুঃখ দূর হইবে। সুশীলা একদিন গল্প করিতে করিতে শকুন্তলার কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছিলাম বোধ করি তোমার মনে আছে, কথমুনি সম্যাসী হইয়াও শকুন্তলাকে বিদায় দিবার সময় বলিয়াছিলেন—

যাণ্ড্যভ্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদয়ং সংস্পৃষ্ট

মুংকর্গ্যয়া অন্তর্বাণিতরোপরোধি গদিতং চিন্তা জড়ং দর্শনম্।

বৈক্রব্যং মম তাবদীদৃশমপি হেহাদরণ্যোকসঃ

পীড্যন্তে গৃহীণঃ কথং ন তনয়্যাবিল্লবজুঃধৈর্নবৈঃ ॥

কথমুনি বলিয়াছিলেন আজ শকুন্তলা পুত্রগৃহে যাইবে ভাবিয়া আমার হৃদয় অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছে, কথা বলিতে কষ্ট হয়, হৃদয়গত শোক যেন বাক্য অবরুদ্ধ হইতেছে, নয়নদয় যেন চিন্তায় জড়ীভূত হইতেছে, আমি বনবাসী আমারই যখন এইরূপ হইল তখন জামিনা যাহারা গৃহী নূতন কথার বিরহে তাহাদের প্রাণ কিরূপ হয়!

কথা অতি সত্য, আজ আমারও প্রাণ উৎকণ্ঠিত হইতেছে, কত্না বিবাহ দিয়াছি সুখের দিন তথাপি যেন কি দুঃখ। কি অব্যক্ত অভাব, আসিয়া যে হৃদয়কে ব্যথিত করিতেছে তাহা বলিবার ভাষা পাই না। মহামুনির যেমন শকুন্তলাকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন আমিও মা তোমাকে সেই ঋষি বাক্য প্রয়োগ করত আশীর্বাদ করিতেছি।

শুশ্রূষণ গুরুণ, কুরুশ্রিয় সখীবৃত্তিং পুরস্ত্রীজনে ।

ভূর্বিপ্ররুতাপি রোষণতয়া মান্বপ্রতীপং গুঃ ॥

ভূয়িষ্ঠংভব দক্ষিণা পরিজনে ভোগেষমুৎসেকিনী ।

যাহেহ্যবং গৃহিনীপদং যুবতয়া বামাঃ কুলশ্রাধয়ঃ ॥

অর্থাৎ পতিগৃহে গমন করিয়া গুরুজনদিগকে শুশ্রূষাকর, পুরহিত অশ্রান্ত স্ত্রীগণের প্রতি সখ্যভাবে ব্যবহার কর, স্বামীর বাহাতে আনন্দ হয় সেইরূপ ব্যবহার করিয়া স্বামী সুখে সুখিনী হও। পতিক্লেদ হইয়া অশ্রয় রক্ষণে কটু বলিলেও পতির প্রতি বিরক্ত ভাব প্রকাশ না করিয়া পতিকে শান্তনা করিবে। ভোগেতে আশক্তি না রাখিয়া লোভ ও ক্রোধ শূন্য হইয়া পতি কুলের বান্ধবগণকে আপন জন মনে করত সেবা করিবে। এইরূপে পতিকুলে যাহাতে স্কুলের নিকট যশস্বিনী হইতে পার ইহাই আমাদের প্রার্থনা ও উপদেশ। তাহার পর তোমার ভাগ্যে যেমন থাকিবে হইবে। সে বিষয় আর আমাদের বলিবার বা ভাবিবার অধিকার নাই।

পণ্ডিত এইরূপ বলিতেছেন আবু মাঝে মাঝে চক্ষের জল বস্তাকলে দ্বারা পুচ্ছিতেছেন এই সময় পণ্ডিতের স্ত্রী (সুশীলার মা) একেবারে পাগলিনীর মতন আত্মহারা আসিয়া বলিতে লাগিলেন, মা সুশীলা তাকে শশুর বাড়ী পাঠাইয়া আমি কি করিয়া গৃহে থাকিব; আর মা আমার বৃকে মাথা দিয়া আমার প্রাণ শীতল কর মা। এই বলিয়া সুশীলাকে বৃকে জড়াইয়া বারবার সুশীলার মুখে দ্বিধিয়া কান্দিতে লাগিলো। তখন সুশীলাও মায়ের সহিত অবিরল ধারে অশ্রুপাত করিতে করিতে কান্দিতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে মা মা বলিয়া মায়ের অঙ্গ জড়াইয়া আরও মায়ের কান্না বাড়াইতে লাগিল, তখনকার সেই বাৎসল্য রসের উচ্ছ্বাস ও সুশীলার ভাব গদগদ কর্ত্তর মা মা ধনি ও মপ্রেম নিরীক্ষণ পিতা মাতাকে একেবারে মায়ায় বিভোর করিতে লাগিল।

সেই সুখ দুঃখ মিলিত অব্যক্ত ভাব ভাষায় ব্যক্ত হয় না, যাহারা দেখেন ও অহুত্ব করেন তাহারই বুকিতে পারেন। যথার্থই সেই সময়টা শূশীলার পিতামাতার পক্ষে অতিশয় হৃদয় বিদারক দুঃসহ কষ্টের সময়, কারণ শূশীলাই তাঁহাদের একমাত্র সন্তান। যাহারা কত্না বিবাহ দিয়াছেন সেই পাঠক পাঠিকারা অহুত্ব করুন সেই সময়টা শূশীলা ও শূশীলার পিতামাতার পক্ষে কি রকম দুঃখাবহ।

শূশীলার ও শূশীলার পিতামাতার এইরূপ ব্যবহারে প্রবোধ ব্যথিত অন্তঃকরণে ধীর ভাবে বলিতে লাগিলেন, আপনারা দুঃখ করিবেন না যখন আপনাদের দেখিবার ইচ্ছা হইবে তখন সংবাদ দিলেই আমি ইহাকে এখানে পাঠাইয়া দিব, এ যদি আমার বুদ্ধ পিতামাতার শুশ্রুষা করে; তাঁহারা যদি ইহার যত্নে সুখী হন, তবেই আমি সুখী হইব, আমি ইহার নিকট সৰ্ব প্রথমে আমার পিতামাতার সেবা শুশ্রুষাই প্রার্থনা করি, সেই বিষয় সবিশেষ উপদেশ ও আজ্ঞা দিউন, আর অগ্রই ইহাকে আমাদের বাড়ীতে লইয়া যাইতে যদি আপনাদের বিশেষ কষ্ট হয় বা কোনরূপ আপত্তি থাকে তবে বলুন আমি আজ একাকীই গৃহে গমন করি পয়ে যখন আপনাদের ইচ্ছা হইবে তখনই লইয়া যাইব, উপস্থিত আপনাদের দুঃখ ভাব দর্শনে আশ্রয় ও ধন কেমন করিতেছে।

পণ্ডিত বলিলেন না বাবা ইহা মায়িক সংসারের নিয়ম, যে দিনই কত্না খুল্লানয়ে যাইকে সেই দিনই এরূপ দুঃখ হইবে, বিশেষতঃ—

অর্থোহিকত্বা পরকীয় এব  
তামত্র সংপ্ৰেম্য পরিগ্রহীতুঃ  
জাতোম্মি সত্ত্বো বিশদত্তরাস্ত্রা।  
চিরস্ত নিক্ষেপ মিবার্পয়িত্বা ॥

মহাকবি কালিদাস লিখিয়াছিলেন কত্না গচ্ছিত পরধন স্বরূপ, পরধন যেমন যাহার ধন তাকে দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায় কত্নার পিতাও সেইরূপ কত্নাধন সংপাত্রে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হন, সুউরাং সেই আদর যত্নে প্রতি পালিতা কত্নাধন তোমার হাতে অর্পণ করিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছি, তুমি সঙ্গীনে ধর্ম

পত্নীর সহিত যথা ধর্ম ব্যবহার করিয়া ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ভুজ সাধন কর, অতঃপর ধর্ম পত্নীর সহিত গৃহে গমন করিয়া পিতা মাতার আনন্দ বর্ধন কর ।

বিবাহের পরদিন কস্তুর স্বামী গৃহে যাওয়াই আমাদের দেশ প্রথা, বিশেষতঃ তোমার পিতামাতা নব বিবাহিতা বধূর সহিত পুত্র দর্শন লালসায় উৎকণ্ঠিত হইয়া আছেন, আমরা আর কান্দিব না । এই বলিয়া প্রবোধের মনে ব্যথা হইবে সুশীলাও অস্থিরা হইবে আর কান্দিনা শীঘ্রই সুশীলাকে আনিব এই সব কথা বুঝাইয়া বলিয়া বলিয়া পণ্ডিত সুশীলার মাকে শাস্ত করিলেন । দানের দ্রব্যাদি কতিপয় লোকের দ্বারা পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন কস্তাও জামাতাকে এক পাক্ষিতেই উঠাইয়া আশীর্বাদ সূচক শ্লোক পাঠ করত গমন করিতে আদেশ করিলেন, সুশীলা বার বার পিতা মাতার চরণ ধূলি গ্রহণ করিয়া স্নেহ নয়নে মার মুখপানে চাহিতে চাহিতে পালকিতে উঠিল প্রবোধ ও সুশীলাকে বহন করিয়া পাক্ষি বাহকেরা চলিতে লাগিল দেশের লোক দেখিবার জন্য স্থানে স্থানে মিলিত হইল, আশ্রয় স্বজন চক্ষুর অন্তরাল না হওয়া পর্যন্ত পাক্ষির দিকে চাহিয়া রহিল, পরে যাহার যেমন গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল, পণ্ডিতও পণ্ডিতের স্ত্রীও কিছুক্ষণ সুশীলার স্নেহের কথা বলিয়া রোদন করত আবার ক্ষতব্য বোধে সমাগত নর নারীর আহাওয়াদি প্রদানে নিযুক্ত হইলেন । সমাগত নর নারীরা সকলেই নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন ।

আজ সকলের মুখেই প্রবোধের উপদেশের কথা । বিবাহ অনেকের হয় কিন্তু প্রবোধ ও সুশীলার বিবাহ যেন দেশের লোকের প্রাণে এক নূতন দৃশ্য, নূতন শিক্ষা ও নূতন ভাব আগাইয়া দিয়াছে । এই বিবাহ হইতে দেশবাসি নর নারীর মধ্যে অনেকেরই প্রাণে পুরাতন আর্থ্য ঋষির ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে ।

এদিকে সুশীলা মস্তক অবনত করিয়া পাক্ষীর একপাশে পিতামাতার স্নেহ স্মরণ করিয়া বিসম্ব বদনে বিসিয়া একটুক একটুক রোদন করিতেছেন, প্রবোধও সংসারের মায়িক ব্যাপারের বিষয় ভাবিয়া ভাবিয়া নিজে নিজে বলিতে লাগিলেন, ওহো ! সংসারের কি মোহ ! সুখের কিছুই নাই খণ্ডের পাত্রের 'জন' কত ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া কত কষ্ট হুঃখ করিয়া পাত্র স্থির করিয়া বিবাহ দিলেন আবার কম্যাটিকে পাত্রস্থ করিয়া কান্দিয়া আকুল ! কৈ সুখ কোথায় ?

পরিজনকে ভাল বাসিলেও হুঃখ ভাল না বাসিলেও হুঃখ এ সংসার অতি ভয়ানক স্থান।

হে মঙ্গলময়! আশীর্বাদ কর, শক্তি দিও যেন হাসিমুখে না কান্দিয়া না ভাবিয়া তোমার ভাবে জীবন কাল সুখে অতিবাহিত করিতে পারি। হে বিপথ-বিধাতা! তোমারই অথও নিয়মে যদি দার পরিগ্রহ করিয়াছি দেখ, দয়াময় শত শত অপরাধ মার্জনা করিও, যাহাতে তোমার ভাবে তোমার প্রীতির উদ্দেশে নিরাসক্ত ভাবে সংসার করিয়া পরিজন ও আত্মীয় স্বজনগণের আনন্দ বর্ধন করিতে পারি, তাহা করিও দেব আমি নিজে অযোগ্য আবার আর একটি অনভিজ্ঞ জীবনের সুখ দুঃখের ভার গ্রহণ করিলাম তুমি ভিন্ন আর কে রক্ষা করিবে, রক্ষা কর এইরূপ প্রার্থনা করিয়া সুশীলা কে বলিলেন, সুশীলা তুমি কেন রোদন করিতেছ? হুঃখেরতো কোন কারণ নাই, তোমার পিতা মাতা যেমন বলিয়া দিলেন তাহাই ভাব, গতরাত্রে তোমায় অমন করে শাস্ত্রার্থ বুঝাইলাম তবু অশিক্ষিতার ত্রায় কেন রোদন কর, স্থির হও এই সময় আমার দুই চারিটা কথা বলিবার আছে এখন যদি না শুন আর না বুঝিরা আমাদের বাড়ী যাইত্না সেবিষয় ভুল কর, তবে পরে সেসব সংশোধন হওয়া কঠিন হইবে। পূর্কেই বলিয়াছিযে তোমাকে আদর্শ স্ত্রী কামিয়া আমি আত্মীয়গণকে শিক্ষা দিব সুতরাং তোমাকে বলিবার ও বুঝাইবার অনেক আছে। উপস্থিত আজ সাংসারিক ব্যাপারে দুই চারিটা কথা বলি শুন। তুমি আজ যেখানে যাইতেছ সেই গৃহই ধর্ম্মত তোমার নিজ বাড়ী সেইটাই তোমার যাবৎ জীবন আসস্থান, আপনি ভাগ্যাধীন সুখ দুঃখ যতদিন থাকিবে সেখানেই ভুগিতে হইবে।

দেখ, আমার পিতা বৃদ্ধ মাতা ও প্রাচীনা, সংসারে আমার একটা বিধবা ভগ্নী ও একটা পতিপুত্রবতী ভগ্নী আছে সে ভগ্নী প্রায়ই স্বস্তর বাড়ী থাকে বিধবা ভগ্নীটা সর্বদাই আমাদের বাড়ী থাকে, এক্ষণে তোমাকে তোমার ঐ বিধবা ভগ্নী ও বৃদ্ধ পিতা মাতা লইয়াই সংসার করিতে হইবে। আমাদের দেশের আধুনিক সমাজ স্ত্রীজাতির প্রতি উদাসীন অর্থাৎ স্ত্রীজাতিকে কোন্টাই সং শিক্ষা দেয়না, সধবারা পতি পুত্র লইয়া একভাবে সংসারে সুখ দুঃখ ভোগ করে, কিন্তু বালবিধবাদের প্রতি কোনই সদয় ব্যবহার নাই। সেই

পতি পুত্র স্বথ রহিত বাল বিধবা নিরন্তরই অশান্তি ভোগ করে এই কারণ আমার বিধবা ভগ্নিটী সংসারিক কর্ম করে আর খায় ইহাই সাধারণ নিয়ম বিধবা হওয়া অবধি আমার পিতা মাতার সেবাই করিত" তবে স্নান শিক্ষা না পাওয়ায় দিবারাত্র দ্বিয়মাণা ও অসন্তুষ্টাই থাকিত, আমি শিক্ষা লাভ করিয়া বাড়ী আসিয়া তাহার দুঃখের বিষয় আলোচনা করিয়া তাহাকে অনেক উপদেশ ও শিক্ষা দিয়াছি পরে তাহাকে দীক্ষাও দিয়েছি সংউপদেশ দিয়া জীবনের প্রকৃত যাহা লক্ষ্য তাহা অনেকট) ধারণা করিবার যোগ্যা করিয়াছি এবং ভাল ভাল পুস্তক ও সাধুদিগের জীবন চরিত কিনিয়া দিয়াছি এই জন্ত এখন আর পূর্বের স্থায় অশান্তি ভাব নাই এখন বেশ শান্ত ভাবে পিতৃ মাতৃ সেবা করিতেছে এবং আমার আদেশমত যথা সময়ে আঙ্গিক পূজা ও শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া বেশ শান্তিতে আছে। তাহাকে ভাল বাসিবে তাহার মনে ব্যথা দিবেনা। তাহার সহিত সং ব্যবহার ও তাহার কর্তব্য কর্মে উৎসাহ ও সহানুভূতি দেখাইলে তোমার প্রতি তাহার ভাল বাসনা পড়িবে, সংসারিক কার্যে তোমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিবে, আর আধ্যাত্মিক কার্যে ও উভয়ের দ্বারা উভয়ে সং সঙ্গের ফল লাভ করিয়া শান্তি পাইবে। আমার ঐ বিধবা ভগ্নীর প্রতি সহোদরা ভগ্নীর স্থায় ব্যবহার করিবে। পরে যেমন যেমন আবশ্যক হইবে আমি বলিয়া দিব।

এইরূপ হইলে তোমার ও সুখ্যাতি ও শান্তি আমারও মনে আনন্দ হইবে।

আর আমার পিতা মাতাকে পিতা মাতা জ্ঞানে সেবা করিবে, নিজে বুঝিয়া করিতে পারিলেও তাহাদের নিকট অনুমতি গ্রহণ করিয়া কার্য করিবে। তাঁহারা ক্রম্ বুলিলেও তাঁহাদের কথায় উদ্বৃত্ত করিবেনা, নিজে দোষী না হইলেও তাঁহাদের নিকট হাত জোর করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে, এইরূপ স্থানিয়মে প্রথম প্রথম চলিয়া যদি তাঁহাদের ভালবাসা আকর্ষণ করিতে পার, তবে তুমিও সুখ থাকিবে, তাঁহারাও তোমার সুখে রাখিবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিবেন।

ক্রমশঃ

দীনবন্ধু শর্মা।



শ্রীশ্রীচৈতন্য চন্দ্রায় নমঃ ।

## শ্রীশ্রীধ্রুব ও প্রহ্লাদ চরিতামৃত ।



মঙ্গলাচরণম্ ।

“পঞ্চ তত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ স্বরূপকম্ ।  
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্ত শক্তিকম্ ॥

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ জয়দৈত চন্দ্র ।

জয় জয় গোড়দেশ (১) বাসী ভক্তরন্দ ॥

জয়রূপ সত্যতন ভট্টরঘুনাথ ।

শ্রীজীব গোপল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥

গদাধর গঙ্গাদাস ঠাকুর হরিদাস ।

শ্রীবল্লভাচার্য সনাতন শ্রীনিবাস ॥

(১). হিমাঙ্গয় পর্বত হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডকে “গোড়দেশ” বলে । গোড়দেশ পাঁচভাগে বিভক্ত যথাঃ—

সারস্বতা: কাশ্যকুজাঃ গোড় মৈথিল চোংকলঃ

পঞ্চ গোড়া ইতি খ্যাতা বিষ্ণুজ্যোন্তর বাসিভিঃ ॥

শব্দভাষ্যক্রম ।

গোড়দেশের আধুনিক নাম বাংলাদেশ । শ্রীশ্রীগৌরানন্দ মহাপ্রভুর সময় হইতেই বৈষ্ণব শাস্ত্রে উহা “শ্রীগোড় মণ্ডল ভূমি” নামে বিখ্যাত । যথাঃ—  
“শ্রীগোড় মণ্ডল ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি, তার হয় ব্রজ ভূমে বাসী ॥”

## শ্রীশ্রীধর ও প্রহ্লাদ চরিতামৃত ।

চণ্ডীদাস বিद्याপতি সেন শিবানন্দ ।  
সার্কভৌম নরহরি স্বরূপ রামানন্দ ॥  
বৃন্দাবন কৃষ্ণদাস শ্রীপুরুষোত্তম ।  
বনমালী শ্রীধর লোচন নরোত্তম ॥  
সকল ভক্তের করি চরণ বন্দন ।  
এছারস্তে কর মোর বিষ় বিনাশন ।

### এস্থকারের নিবেদন ।

—:০:—

নিবেদন অবধান কর ভক্তগণ ।  
ভক্তি স্ততি হীন আমি অতি অভাজন ॥  
একান্ত বাসনা মোর হইল মনেতে ।  
শ্রীধর ও প্রহ্লাদের চরিত্র বর্ণিতে ॥  
অজ্ঞের নয়ন যিনি দুর্কলের বল ।  
নির্কনের ধন যিনি ভক্তের সম্বল ॥  
অজ্ঞানের জ্ঞানদাতা বিদ্যাহীনের বিদ্যা ।  
যিনি ব্যাপ্ত সর্বময় সকলের আত্মা ॥  
যাহার রূপায় পঙ্গু গিন্নিলজিৰ যায় ।  
যাহার রূপায় মুক স্থখে কথাকয় ॥  
ভরসা করিয়া সেই হরি রূপায় ।  
শ্রীগুরু হৈবম্ব পদ ভাবিয়া হৃদয় ॥  
শ্রীধর ও প্রহ্লাদের চরিত্র বর্ণন ।  
করিতে লেখনী করে করিছ ধারণ ॥  
বামনের বাহ্মা যেন ইন্দু ধরিবারে ।  
অজ্ঞের বাসনা যেন গজ বধিবারে ॥

## শ্রীশ্রীকব চরিতামৃত ।

ভেকে যেন ইচ্ছা করে অছি খাই ধরে ।  
চোরে যেন ইচ্ছা করে সাধু হইবারে ॥  
ভেঙ্গা ধরে চাহে যেন পদ্মা পারিদিতে ।  
রাজ্য হীনে চাহে যেন ভূস্বামী হইতে ॥  
দরিদের ইচ্ছা যেন বহুধন পায় ।  
সেইরূপ এ বাসনা আমার হৃদয় ॥  
হয় কিনা হয় মোর বাসনা পূরণ ।  
দিবানিশি, ভাবি বসি, বিষম বদন ॥  
মনেতে চিন্তিয়া সার করিয়াছি আমি ।  
নিজগুণে রূপাকর ওহে অতর্ঘ্যামি ॥  
যত্বপি না কর মোর বাসনা পূরণ ।  
পতিত পাবন নাম ধর কি কারণ ॥  
বাহু পূর্ণ না করিলে কলঙ্ক রটিবে ।  
ভক্তাধীন হরি তুমি কেহ না বলিবে ॥  
রূপা দৃষ্টি কর, মোরে হইয়া সদয় ।  
তবে মমভীষ্ট সিদ্ধি হইবে নিশ্চয় ॥  
বৃষণ সৃষ্টিধানে কহি অতঃপর ।  
রচনার দোষ সবে ক্ষমিবে আমার ॥  
যাহা লিখাবেন হরি করি শক্তি দান ।  
তাহাই লিখিব নাহি ভাল মন্দ জ্ঞান ॥  
দশ অপরাধ ( ১ ) হীন যেই মহাজন ।  
“তৃণাদপি শ্লোক ” ( ২ ) ঘাঁর কঠোর ভূষণ ॥

( ১ ) দশ বিধ মাথাপরাধের লক্ষণ পৃথক পৃথক রূপে দশ প্রকার নামাপরাধ বিচারিত ॥

( ২ ) “তৃণাদপি” শ্লোকের বিস্তৃত বিবরণ মৎ সংগৃহীত “শ্রীশ্রীহরিনামামৃত” গ্রন্থে দৃষ্টব্য ॥

বাহুল্য বেগে এখানে আলোচিত হইল না ।

আশাকরি তিনি ইঁহা যতনে পড়িবে । ( ১ )  
 বালক বলিয়া মোরে আশীর্বাদ দিবে ॥  
 ঢাকা বিভাগেতে পূর্ক্বে বরিশাল ।  
 অতি মনোহর স্থান ব্যক্ত ভূমণ্ডল ॥  
 তার অন্তর্গত থানা গৌর নদীনাথে ।  
 কোদালধোয়া গ্রাম শোভে তাহার পশ্চিমে ॥  
 সেই গ্রামবাসী ধন কৃষ্ণ ( ২ ) মহাশয় ।  
 ঈশ্বর রূপায় তাঁর ছইটি তনয় ॥  
 তাঁর সর্ক্বেষ্ঠ যিনি কালাচাঁদ নাম ।  
 তন্ত্রাজ্ঞ রত্ন কৃষ্ণ অতি গুণ ধাম ॥  
 শ্রীরত্ন কৃষ্ণের সূত নয়ান নামেতে ।  
 নয়ানের তিন পুত্র বিখ্যাত জগতে ॥  
 জ্যেষ্ঠ রাম গতি গুণবান অতিশয় ।  
 নয় পুত্র দিল তাঁরে হরি দয়াময় ॥  
 নয় পুত্র মধ্যে নবকৃষ্ণ হালদার ।  
 জানে গুণে তিনি হন শ্রেষ্ঠ সবাকার ॥  
 তন্ত্র সূত মম পিতা শ্রীগঙ্গাচরণ ।  
 তারিণী চরণ আমি তাঁহান নন্দন ॥

( ১ ) কতিপয় বাবতার শ্রীকোরাঙ্গ মহাশয় স্বীয় গুরু ঈশ্বর পুরীকে বলিয়া ছিলেনঃ—

“প্রভুবলে” ভক্ত বাক্য কৃষ্ণের বর্ণন ।  
 ইহাতে যে দেখে দোং সেই পাণ্ডীজন ॥  
 ভক্তের বর্ণনা যে-তে মতে কেনে নয় ।  
 সর্ক্বেষ্ঠ কৃষ্ণের শ্রীত-তাহাতে নিশ্চয় ॥

শ্রীচৈতন্য ভাগবত্, আদি খণ্ড ৭ম স্কঃ ।

( ২ ) “নবকৃষ্ণ চরিত্র” দেখুন ।

পণ্ড ছন্দে এই গ্রন্থ করিব রচন ।  
 ভক্তিতে করহ ভক্ত শ্রবণ পঠন ॥  
 ভক্তের চরিত্র পাঠে ভক্তির উদয় ।  
 ভাগবত বাণী ইথে নাহিক সংশয় ॥  
 শ্রীচৈতন্যক চারিশত একাদশে ।  
 কছা শুক্লা ষষ্টি ষড় বিংশ দিবসে ॥  
 শ্রীভূগা বোধন দিন অতি সুভঙ্গণ ।  
 হরিপদ ভাবি কৈহু গ্রন্থ আরম্ভন ॥

গ্রন্থ সূচনা ।

—:o:—

(উর্দানপাদ—রাজার জন্ম, স্থনীতি ও সুরুচির পরিণয় ও সুরুচির  
 ব্যক্যে স্থনীতিকে নির্কাসন করণ ।)

ভক্তি ভাবে, শুন সবে, যত ভক্তগণ ।  
 শ্রীকৃষ্ণ চরিতামৃত মধুর বচন ॥  
 হরি হরি বল ভাই নাম কর সার ।  
 হরি বিনে, ত্রিভুবনে, বন্ধু নাহি আর ॥  
 তরিতে তরনী সেই দীন বন্ধু হরি ।  
 ডাক তাঁরে ভব নদী দিবে যদি পারি ॥  
 দিবানিশি, ভুববসি, হৃদয় মাঝার ।  
 জনম মরণ ভয় রহিবেনা আর ॥  
 ধারা সূত ভাই বন্ধু কেহ নহে কার ।  
 অসময় হরি বিনে বন্ধু নাহি আর ॥

দেখিতে সুন্দর এই পঞ্চ ভূত দেখা।  
 ক্রমে একদিনেতে মিশিবে পঞ্চ সহ ॥  
 “কায় প্রাণে ন সম্বন্ধ” হইবে তোমার ।  
 দীন গেল দীনবন্ধু নাম কর সার ॥  
 ভ্রমে পড়ি নাহি চিন হরি ষয়াময় ।  
 তত্ত্বকথা ভুলিয়াছ মজিয়া মায়ায় ॥  
 হরি হরি বল ভাই দিন বয়ে যায় ।  
 ভেবে দেখ নাহি আর সাধন সময় ॥  
 পঞ্চম বর্ষের শিশু শ্রীঋষি আছিল ।  
 বৈষ্ণবেতে ভগবান তাঁরে কৃপা কৈল ॥  
 নারদ পুরাণ বিষ্ণু স্তব পুরাণেতে ।  
 “হরি ভক্তি সুধোদয়” শ্রীষষ্ঠাঙ্গবতে ॥  
 ঋষি ঐশ্বর্যের কথা বিস্তর বর্ণন ।  
 সংক্ষেপেতে কহি কিছু শুন ভক্তগণ ॥  
 ক্ষীরোদ শায়ি ভগবান বেদে ধীরে বনে ।  
 ব্রহ্মার উৎপত্তি তাঁর নাভিশতদলে ॥  
 সে ব্রহ্মার মনে সৃষ্টি বাসনা হইল ।  
 পত্নীসহ সায়ভূব মনুকে অজিল ॥ ( ১ )  
 শতরূপা সে মনু পত্নীর নাম ছিল ।  
 ক্রমে তাঁর গর্ভে হই পুত্র জন্মিল ॥

- ( ১ ) ক্ষত্রিয়ানাং বীজরূপো মাতা সায়ভূবো মনুঃ ।  
 বহ্নীয়া শত রূপাচ রূপোঢ্য কমলা কলা ॥  
 মন্বীকশ মনুস্তম্ভো বাভ্রাজ্য পরিপালকঃ ।  
 স্বয়ং বিধাতা পুত্রাংশু বাচ প্রহরিতাঃ ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ব্রহ্ম খণ্ড ৮ম অধ্যায় ।

প্রিয়ব্রত রাজা ও উত্তান পাদরায় ।  
 বিষ্ণুর কলাংশে জঙ্গ ভাগবতে কয় ॥  
 উত্তানপাদ রাজার রমণী ছইজন ।  
 সুনীতি সুরুচি নামে ব্যক্ত ত্রিভুবন ॥  
 কনিষ্ঠা সুরুচি রাণী পরমা সুল্লরী ।  
 তাঁর রূপ বর্ণিবারে কিবা শক্তি ধরি ॥  
 কামের রমণী রতি হেরিলে তাঁহায় ।  
 লজ্জায় অমনি ধনি বিবরে স্কায় ॥  
 তিলোত্তমা, রশ্মা, তারা কোন ছার ।  
 কিঞ্চিৎ উপমা মাত্র তড়িত ভাষার ॥  
 একদা রাজাকে রাণী কহিল গোপনে ।  
 আমার মিনতি সুনীতিকে দাও বনে ॥  
 ভার্য্যার প্রণয়ে মজি মমুর নন্দন ।  
 বিনা দোষে সুনীতিকে পাঠাইল বন ॥  
 বিব্রস বদনে রাণী কাদিতে কাদিতে ।  
 উপনীত হৈল কোন মূনির পুরেতে ॥  
 ঋণীর রোদন শুনি মূনি পত্নীগণ ।  
 মমুর আশিষ্ট সবে রাণীর সদন ॥  
 নারী হেরি নারীর মমতা বুদ্ধি হয় ।  
 সুনীতিকে দেখি যত মূনি পত্নী কয় ॥  
 কি জন্ত রোদন কর কহ ওলো ধনি ।  
 অসুভাবে বুঝি তুমি রাজার রমণী ॥  
 সুনীতি বলেন শুন মূনি পত্নীগণ ।  
 উত্তানপাদ রাজা আমার স্বামী হ'ন ॥  
 আমার সতিনী অতি সুল্লরী রমণী ।  
 ভাষার প্রেমতে পতি মজিয়ে এধনি ॥

বিনা দোষে শ্মোরে বনে নির্ঝাসিতা কৈল ।  
 এই বাণী, বলি রাণী, রোদন ফুঁড়িল ॥  
 রাণীকে বুঝায় বত মুনি পত্নীগণ ।  
 “সেই ভাল যেরূপে রাখেন জনার্দন” ॥  
 এত বলি যতেক ব্রাহ্মণ পত্নীগণ ।  
 কহিল রাণীর কথা স্বামীর সদন ॥  
 শুনি ষত মুনিগণ আনন্দিত মনে ।  
 রাণীকে কুটীর করি দিল সেই বনে ॥  
 যিনি রহিতেন অস্তঃপুরের ভিতর ।  
 জাগ্য দোষে র’ন এবে অরণ্য মাঝার ॥  
 কমল শয্যায় যার নিদ্রা না আসিত ।  
 বৃক্ষ পত্রোপরে তিনি হইল নিদ্রিত ॥  
 নিদাষে করিত দাসী চামর বাজন ।  
 এখন মিদাষ আলা নাশে প্রভঞ্জন ॥  
 সুরভিত তৈল যিনি মাখিতেন শিরে ।  
 তৈল বিনে এবে তাঁর শিরে গুলি উড়ে ॥  
 পরিধান ছিল যার বিচিত্র অঙ্গয় ।  
 বৃক্ষ ছাল পরে সেই বিপিন মাঝার ॥  
 ক্ষীর, স্নর, নবনীত করিত আহার ।  
 বৃক্ষফল খান তিনি কানন ভিতর ॥  
 বিধির লিখন কর্ম খণ্ডিতে কে পারে ।  
 যত কষ্টে, যতই রাণী অরণ্য ভিতরে ॥  
 তারিণী কহিছে ভাধু নীতি বিধাতার ।  
 সূৰ্য অস্তে হুঃখ ভোগ হয় সবাচার ॥



উত্তানপাদ রাজার মূগয়া বিবরণ ।

— ৩০: —

কতদিন পরে রাজা উত্তানপাদ রায় ।  
 সপ্তে লয়ে বহু সৈন্য চলে মূগয়ায় ॥  
 হয়, হস্তী, রথ, রথী, হাজার হাজার ।  
 কতেক মনুষ্য চলে সংখ্যা নাহি তার ॥  
 বহু সৈন্য সঙ্গে রাজা কাননে পশিল ।  
 হেন কালে শুন সবে বিবি বাহা কৈল ॥  
 মেঘগণে দশদিক করিল আন্ধার ।  
 উনপকাশ বায়ু বহে বিগুণ আকার ॥  
 একেবারে মহা ঝড় ঝুটি আরম্ভিল ।  
 ভয়ে সৈন্যগণ চতুর্দিকে পলাইল ॥  
 মেঘের গর্জন ধ্বনি শুনে উড়ে প্রাণ ।  
 শীল গুলি পড়ে যেন তাল পরিমাণ ॥  
 হস্তী ঘোড়া মনুষ্যাদি কত শত মৈল ।  
 বিবিধ রূপায় রাজা উত্তান ধাচিল ॥  
 অস্ত্র অস্ত্র মনুষ্যাদি ধ্বংসে ছিল যারা ।  
 হাত পা, ভাঙ্গিল কার কেহ অর্ধমরা ॥  
 হেন মাতে বিপিনেতে রহে সৈন্যগণ ।  
 পরে রাজা মহাতেজা করিলা চিন্তন ॥  
 এক অশ্ব আরোহীণে করিল গমন ।  
 শুনি শুনি ভক্তগণ অপূর্ব কথন ॥  
 যাইতে যাইতে রাজা দেখিবান্ধু পায় ।  
 অমুণ্য মাঝারে এক কুতীর আছেয় ॥

কুটীর মধ্যেতে হেরি নারী একজন ।  
 জিজ্ঞাসা করেন রাজা পুলকিত মন ॥  
 কে তুমি কাহার নারী কহ বিবরণ ।  
 একাকিনী হে কামিনী বনে কি কারণ ॥  
 শুনি রাণী কুটীরের বাহিরে আসিল ।  
 চিনিয়া আপন স্বামী কহিতে লাগিল ॥  
 তারিণী কহিছে ভাল বিধির লিখন ।  
 রাজা রাণী উভয়ের হইবে মিলন ॥

সুনীতির সহিত উত্তানপাদ রাজার মিলন ।

—:—

লঘু ত্রিপদী ।

কহেন সুনীতি,	তাহে নৃপতি,
আমি দাসী ভব নারী ।	
এবে নাহি মনে,	শুকচি বচনে,
মোরে কৈলে বনচারী ॥	
শুন শ্রীশ্রীশ্র,	কহি অতঃপর,
বিধির লিখন কর্ত্ত্ব ।	
বিধি যাহা করে,	কে খণ্ডিতে পারে,
কহিলাম সার মর্থ ॥	
রাণী নর বরে,	অতি সমাদরে,
বসিতে দিল আসন ।	
লজ্জিত হৃদয়,	মহুর তনয়,
কুটীরে বাসে তখন ॥	



## শ্রীশ্রী ধ্রুব ও প্রহ্লাদ চরিতামৃত ।'

মানা মৃতে রাণীকে দুখাল নৃপমণি ।  
রতিরস রঙ্গে হ'ল প্রভাত যামিনী ॥  
হরি স্মরি শয্যা হৈতে উঠিয়া রাজন ।  
স্তু মনে নিকেতনে করিল গমন ॥  
পাত্র মিত্রগণ যত অরণ্যেতে ছিল ।  
রজনী প্রভাতে সবে দেশে প্রবেশিল ॥  
নিজ পুরে প্রবেশিয়া উত্তান রাজন ।  
রাজ্য রক্ষা করে ল'য়ে পাত্র মিত্রগণ ॥  
সুকচির প্রেমে মজি মনুর কুমার ।  
সুনীতিকে বিম্বৃত হইল অতঃপর ॥  
তারিণী কহিছে শুন যত ভক্তগণ ।  
হরি ভক্ত শ্রী ধ্রুবের জন্ম বিবরণ ॥

## ধ্রুবের জন্ম ও উত্তানপাদ রাজার সভায় উপস্থিত ।

—:—

হেন মতে রহে রাজা আনন্দে মগন ।  
বন মাঝে সুনীতির গর্ভের উৎপন্ন ॥  
এক দুই করি ক্রমে দশ মাস হ'ল ।  
দশ মাস দশ দিনে পুত্র প্রসবিল ॥  
পরম সুন্দর পুত্র অতি সুলক্ষণ ।  
হেরিয়া সুনীতি হ'ল আনন্দে মগন ॥  
বহু মুনি পত্নীগণ আনিয়া তখন ।  
পুত্র হেরি আশীর্বাদ কৈল সর্কজন ॥  
মানে মানে চিন্তা করি যত মুনিগণ ।  
ধ্রুব বলে নাম তার রাখিল তখন ॥

বিষ্ণু অংশে অধর্ষিত ধ্রুব মহাশয় ।  
 জন্ম মাত্রে হরি ভক্তি তাঁহার হৃদয় ॥  
 দিনে দিনে বাড়ে শিশু শশাঙ্ক মতন ।  
 ক্রমে ক্রমে হৈল পঞ্চ বর্ষের নন্দন ॥  
 এক দিন সেই ধ্রুব মুনি স্ত.সঙ্গে ।  
 খেলে নানাবিধ খেলা অতি মনোরঙ্গে ॥  
 এমন সময় মুনি পুত্র একজন ।  
 ধ্রুবকে বলিল “তুমি কাহার নন্দন”  
 এবাক্য শ্রবণে ধ্রুব লজ্জিত হইল ।  
 অধো মুখে চেয়ে রৈল কিছুনা বলিল ॥  
 পুনর্বার কহে সেই মুনির কুমার ।  
 মায়ে জিজ্ঞাসিয়ে ধ্রুব করহ উত্তর ॥  
 বিনয় করিয়া তোর জননীকে ক’য়ে ।  
 তব পরিধান বস্ত্র আনহ চাহিয়ে ॥  
 লজ্জায় কাতর ধ্রুব গিয়ে মা’র কাছে ।  
 জিজ্ঞাসে পিতার নাম আর বস্ত্র যাচে ॥  
 সুনীতি বলেন বাছা করহ শ্রবণ ।  
 উত্তানপাদমূপতি তোমার পিতা হ’ন ॥  
 বসন বিহীন রাগী দুঃখিত অন্তরে ।  
 জীর্ণ এক বস্ত্র আনি দিল তনয়েনে ॥  
 জননীকে প্রণমিয়া ধ্রুব যশোধন ।  
 বস্ত্র ল’য়ে শিশু ঈশ্বর দিল দরশন ॥  
 ধ্রুবকে লইয়া সঙ্গে মুনি পুত্র যত ।  
 উত্তানপাদের সভায় হ’ল উপনীত ॥  
 ধ্রুবকে হেরিয়া রাজা হইল বিস্ময় ।  
 মনে ভাবে এল কোন রাজার তনয় ॥

সাদরে নৃপতি শ্রবে জিজ্ঞাসে তখন ।  
 কোথায় তোমার ধাম পিতা কোনজন ॥  
 শ্রব কন নিবেদন শুন মহাশয় ।  
 আমার পিতার নাম উত্তানপাদরায় ॥  
 বিনা দোষে মাকে পিতা পাঠাইল বনে ।  
 মাতা সহ বনে থাকি মুনিগণ সনে ॥  
 শুনি রাজা পুত্র বলে কোলে তুলি নিল ।  
 গৃহমধ্যে থাকি তাহা সুরুচি দেখিল ॥  
 ক্রোধেতে সুরুচি শ্রবে বলিল তখন ।  
 হুঃখিনীর পুত্র হয়ে চাহ সিংহাসন ॥  
 হরির তপস্বী করি এ তনু ত্যজিয়া । (১)  
 যদি জন্ম লও মোর গর্ভেতে আসিয়া ॥  
 তবে পাবি সিংহাসন ওরে বাছাধন ।  
 এবে পিতৃ ক্রোড় হৈতে চলি যাও বন ॥  
 বিমাতার শুনি হেন কর্কশ বচন ।  
 পিতৃ ক্রোড় হৈতে শ্রব নাবিল তখন ॥  
 পুত্র স্নেহে মহারাজ হুঃখিত অন্তরে ।  
 কিঙ্ক কিছু না বলিল সুরুচির ডরে ॥  
 বিপিনে পশিল শ্রব যথায় জননী ।  
 অভিমান হৈল মনে কহিছে তাঁরীণী ॥

(১) "তপস্বীরাধা পুরুষঃ তপস্বীশ্রবঃপ্রহে ন মে ।

গর্ভে ত্বং সাধনাত্মানং যদিচ্ছসি দুপা সমম্ ॥"



ভক্তি ভাবে যেই নরে,                   এ কথা শ্রবণ করে,  
হরি তারে দেন স্ব-চরণ ॥

সুনীতি কর্তৃক ক্রবের নিকট জটীল ব্রাহ্মণের বৃত্তান্ত কথন ।

—:—

সুনীতি বলেন শ্রব করহ শ্রবণ ।  
হরির মাহাত্ম্য কিছু করিব বর্ণন ॥  
নিরাকার নিকরিকার সারাংসার হরি ।  
তঁাহার মাহাত্ম্য কিবা বর্ণিবাবে পারি ॥  
ইচ্ছায় সাকার রূপ করিয়া ধারণ ।  
যুগে যুগে ভক্তগণে করেন রক্ষণ ॥  
এই যে জগৎ বাছা কর দরশন ।  
'সর্বভূত ময়োং হরিঃ' আছে সর্বক্ষণ ॥  
সুখ দুঃখ নাহি তাঁর জন্ম মৃত্যু হীন ।  
এক ভাবে ভগবান রন চিরদিন ॥  
তঁাহার ইচ্ছায় হয় সৃজন পালন ।  
তঁাহার ইচ্ছায় জীবের ঘটয় মরণ ॥  
ধনী মানি ভেদ নাই তঁাহার মদন ।  
সর্ব জীবে সম ভাবে করেন দরশন ॥  
ভক্তিতে যে জন তাঁরে ডাকে এক বার ।  
তারে না পরশে কভু রবির কুমার ॥  
ভক্তিতে ভক্তের কাছে বাধা ভগবান ।  
এক উপাখ্যান কহি শুন বাছাধন ॥  
জনক বিহীন এক ব্রাহ্মণ নন্দন ।  
জটীল তঁাহার নাম দরিদ্র সে জন ॥



মাতা যিনে ত্রিভুবনে কেহ নাহি তার ।  
 বন মধ্য দিয়া যায় বিত্রা শিখিবার ॥  
 এক দিন সেই শিশু কহে জননীরে ।  
 পাঠশালে যেতে ভয় যিপিন মাঝারে ॥  
 শুনি তার মাতা বলে ওহে বাছাধন ।  
 কাননেতে আছে তোঁর দাদা নারায়ণ ॥  
 যখন ডাকিবি তাঁরে পাবি দরশন ।  
 রক্ষা করিবেন তিনি তোঁরে সৰ্বক্ষণ ॥  
 মার বাক্যে সে জটীল কাননে পশিয়া ।  
 বলে দাদা “নারায়ণ” রক্ষহ আসিয়া ॥  
 নির্দয় হইয়া যদি না দাও দরশন ।  
 নিশ্চয় ত্যজিব আমি এ পাপ জীবন ॥  
 স্তম্ভাধীন ভগবান আসিয়া তখনে ।  
 জটীলেরে ডাকি বলে মধুর বচনে ॥  
 পাঠশালে যেতে ভাই না করিও ভয় ।  
 সৰ্বক্ষণ আমি রক্ষা করিব তোমায় ॥  
 এইরূপে নিত্য শিশু পাঠশালে যায় ।  
 তজ্জি বলে রক্ষা করে হরি দয়ীময় ॥  
 হেন মতে কত দিন গীত হয়ে গেল ।  
 এক দিন গুরু ছাত্রগণকে কহিল ॥  
 শুন শুন ছাত্রগণ আমার বচন ।  
 মম পিতা পরলোকে কর্বেছে গমন ॥  
 ধনবৃত্ত হীন আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ ।  
 কেমনে পিতার শ্রাদ্ধ করিব এখন ॥  
 শুনি যত ছাত্রগণে গুরুকে কহিল ।  
 কেহ মংস কেহ কাষ্ঠ কেহ দিবে চাউল ॥

কেহ ঘৃত কেহ চিনি কেহ মারিকেল ।  
 জনে জনে যত দ্রব্য স্বীকার কবিল ॥  
 গুরু কন শুন শুন জটীল ব্রাহ্মণ ।  
 কোন দ্রব্য দিবা তুমি কহ বাছাধন ॥  
 "অশ্রু দ্রব্য আছে মোর" দধি বাকী আছে ।  
 কোন দ্রব্য দিবা তুমি বল মোর কাছে ॥  
 জটীল বলেন শুন গুরু মহাশয় ।  
 জননী বলিবে যাহা দিবহে তোমায় ॥  
 গুরুকে শ্রণমি শিশু নিজালয়ে গেল ।  
 বিনয়ে মায়ের কাছে কহিতে লাগিল ॥  
 গুরু পিতৃ শ্রদ্ধে মাগে যত ছাত্রগণ ।  
 সকলে সকল দ্রব্য কৈল আহরণ ॥  
 আমি কোন দ্রব্য দিব বল গো জননী ।  
 শুনি জটীলের মাতা বলিল তখনি ॥  
 আমি কি বলিব তোর দাদা নারায়ণ—  
 যাহা কহে তুমি তাহা দিও বাছাধন ॥  
 মায়ের বচনে শিশু আনন্দ অন্বে ।  
 উপনীত হ'লাক্রতঃ বিপিন মাঝারে ॥  
 উচ্চৈশ্বরে ডাকি বলে কোথা নারায়ণ ।  
 কৃপা করে দাদা মোরে দাও দরশন ॥  
 ভক্তাধীন ভগবান আসিয়া সাক্ষাতে ।  
 জটীলেরে, বহিলেন হাসিতে হাসিতে ॥  
 কিকারণ ভাই মোরে করোছ স্মরণ ।  
 জটীল বাসিল দাদা শুন বিবরণ ॥  
 গুরু পিতৃ শ্রদ্ধ দিন উপনীত হইল ।  
 গুরুদেবে কোন দ্রব্য দিব আমি বল ॥

অন্তর্ধ্যামি অন্তরেতে জানিয়া তখনে ।  
 “বলিলেন দধি দিব” কৈও গুরু স্থানে ॥  
 বিদায় হইয়া শিশু পাঠশালে গেল ।  
 আমি দিব দধি গুরুর কাছেতে কহিল ॥  
 জটিলের বাণী শুনি অশ্রু ছাত্রগণ ।  
 নান্দা মতে জটিলেরে করিল নিন্দন ॥  
 জটিল বলিল শুন গুরু মহাশয় ।  
 দধি দিব দিব্য করি কহিহু তোমায় ॥  
 জটিলের বাক্যে গুরু বলিল তখন ।  
 শ্রাদ্ধের দিনেতে দধি দিও বাছাধন ॥  
 শুনিয়া জটিল অতি আনন্দিত মনে ।  
 উপনীত হল প্রভতে, নিষ্ক, নিষ্করতেন ॥

গুরুদেব ও জননীর সহিত জটিলের শ্রীহরি দর্শন ।

—:—

ক্রমে ক্রমে গুরু পিতৃ শ্রাদ্ধ দিন এল ।  
 লক্ষ লক্ষ দ্বিজ গুরু ভবনে টলিল ॥  
 আজি গুরু পিতৃ শ্রাদ্ধ জানিয়া জটিল ।  
 মনে গিয়া নারায়ণে ডাকিতে লাগিল ॥  
 ক্রমে ক্রমে শিরোপরি আসিল তপন ।  
 জটিলে না দেখি গুরুশিষ্যদিত মন ॥  
 শিরে করাঘাত করি করয়ে রোদন ।  
 বলে হায় কোথা রৈল জটিল ব্রাহ্মণ ॥  
 দ্বিপ্রহর বেলাতীত তবুনা আসিল ।  
 আহত অতিথি গণ স্তুধায় মরিল ॥

ক্ষুধায় কাতর হয়ে যত দ্বিজগণ ।  
 অভিশাপে মম বংশ করিবে নিধন ॥  
 হায় বিধি এই ছিল কপালে লিখন ।  
 পিতৃ ব্রাহ্মে বংশ সহ হইব নিধন ॥  
 এইরূপে গুরুদেব ভাবে মনে মনে ।  
 অন্তর্যামি নারায়ণ জানিল তখনে ॥  
 বন মাঝে যেখানে শ্রীজটীল আছিল ।  
 এক ভাগু দধি লয়ে তথা উত্তারিল ॥  
 সেই দধি দিল প্রভু জটীলের হাতে ।  
 দেখিয়া লাগিল শিশু রোদন করিতে ॥  
 বল দাদা এ দধিতে কোন কাণ্ড হয় ।  
 একজনে খেলে তার পেট না ভরয় ॥  
 নারায়ণ বলে তুমি বড়ই অজ্ঞান ।  
 এই দধি লয়ে দ্রুত করহ প্রয়াণ ॥  
 সম্পূর্ণ রূপেতে এই পাত্র না চার্জিলে ।  
 একেবারে এই দধি কাহাকে না দিবে ॥  
 হেথায় শ্রীগুরু মনে করিয়া চিন্তন ।  
 ভোজনৈতে বসাইলা যত দ্বিজগণ ॥  
 এমন সময় সেই জটীল ব্রাহ্মণ ।  
 দধি লয়ে গুরু স্থানে দিল দরশন ॥  
 ক্ষুদ্র এক ভাগু দধি হেরিয়া তখন ।  
 গুরুদেব হ'ল অতি বিস্মিত মন ॥  
 অস্ত অগ্ন ছাত্রগণে হরিষ অম্বরে ।  
 নানা মতে জটীলেরে তিরস্কার করে ॥  
 জটীল বলেন শুন গুরু মহাশয় ।  
 কোটা জনে খেলে এই দধি না ফুরায় ॥

তখন জটীল মনে চিন্তি নারায়ণে ।  
 দধি দিতে আরম্ভ করিল জনে জনে ॥  
 যত চায় তত দেয় তবু না ফুরায় ।  
 পুনর্ব্বার শূন্য ভাণ্ড পরিপূর্ণ হয় ॥  
 যত দ্বিজগণ সবে ভোজনের পরে ।  
 হর্ষাতুরে জটীলেরে আশীর্বাদ করে ॥  
 কেহ বলে ধন্য তুমি দ্বিজের তনয় ।  
 সেই ধন্য যে ধরেছে গর্ভেতে তোমায় ॥  
 তোমার সমান ভক্ত নাহি ত্রিসংসারে ।  
 অমৃতবে বৃষ্টি হরি দয়া কৈল তোরে ॥  
 এইরূপে দ্বিজ গণে আশীর্বাদ কৈল ।  
 যিশ্রাম করিয়া সবে নিজাজয়ে ॥১৬৯॥  
 পরেতে জটীল গুরু আর ছাত্রগণ ।  
 ক্রমে ক্রমে সকলেই করিল ভোজন ॥  
 জটীলের প্রতি কহে গুরু মহাশয় ।  
 কোথা পেলে এই দধি বল হে আমার ॥  
 জন্মিয়া এমন দধি না খাই কখন ।  
 কেবা তোরে দধি দিল কহ বাছাধন ॥  
 জটীল বলেন প্রভু দিবে কোনজন ।  
 একমারি আছে মোর দাদা নারায়ণ ॥  
 গুরু বলে কোথা আছে সেই নারায়ণ  
 একবার মোরে বাছা করাও দর্শন ॥  
 জটীল কহেন তিনি অরণ্য মাঝারে ।  
 যদি ইচ্ছা হয় প্রভু চল দেখিবারে ॥  
 গুরু বলে চল চল ওরে বাছাধন ।  
 এপাণ নয়নে তাঁরে করিব দর্শন ॥

জটীল বলিল শুন গুরু মহাশয় ।  
 জননী সহিত যেতে উপযুক্ত হয় ॥  
 এত বলি মাতা আর গুরুকে লইয়া ।  
 উপনীত হ'ল শিশু কাননেতে গিয়া ॥  
 "নারায়ণ" ব'লে ডাকে অতি উচ্চৈঃস্বরে ।  
 ভক্তাধিন ভগবান জানিয়া অন্তরে ॥  
 জটীলের কাছে গিয়া উপনীত হ'ল ।  
 নারায়ণে হেরি শিশু প্রণাম করিল ॥  
 জটীলের মাতা হেরি প্রভু নারায়ণ ।  
 একেবারে মহানন্দে হইল মগন ॥  
 জটীলেরে গুরু নারায়ণে না দেখিল ।  
 তখনে জটীল দ্বিজ গুরুকে কহিল ॥  
 আমাকে পরশ কর গুরু মহাশয় ।  
 তবেই তোমাকে দেখা দিবে দয়াময় ॥  
 জটীলেরে গুরু যেই পরশ করিল ।  
 ত্রিতম মুরতি হরি দেখিতে পাইল ॥  
 জটীল জননী গুরু আর শ্রীজটীল ।  
 তিন জনে হরিপ্রেম রসেতে ডুবিল ॥  
 জটীল জটীলমাতা গুরু তিন জন ॥  
 দিব্য রথে চড়ি গেল গোলক ভুবন ॥  
 'সুনীতি কহিছে ধ্রুব তোমাকে সুধাই ।  
 হরি বিনে ত্রিভুবনে বন্ধু কেহ নাই ॥  
 ভক্তি ডোরে যেই জন বেঞ্জেছে তাঁহারে ।  
 তাঁর ঋণ ভগবান সূঁধিতে না পারে ॥  
 তরিতে এ ভবসিদ্ধ থাকে ষার মন ।  
 তারিণী কহিছে ভজ শ্রীহরি চরণ ॥

তপস্কার্থে ধ্রুবের বনে গমন ।

একাবলি ছন্দ ।

—:—

জটীল বৃত্তান্ত করিয়া শ্রবন ।  
 ধ্রুব হ'ল অতি আনন্দিত মন ॥  
 বিময়ে বলেন জননীর কাছে ।  
 বল মাগো সেই হরি কোথা আছে ॥  
 তথা গিয়ে আমি করিব সাধন ।  
 এ হুধ সম্পদে নাহি প্রয়োজন ॥  
 সুনীতি বলেন শুন বাছাধন ।  
 বনে রহে পদ পলাস লোচন ॥  
 সিংহ ব্যাঘ্র আদি তথা অগণন ।  
 কিরূপে হে শিশু করিব সাধন ॥  
 ধ্রুব কহে মাগো এ পাপ জীবন ।  
 তপস্কা করিতে হইলে মিনন ॥  
 দীনবন্ধু হরি দিবে শ্রীচরণ ।  
 অবশ্যই আমি করিব সাধন ॥  
 মিছে মায়া পাশে বন্দি রহিব ।  
 ইহকাল পরকাল হারাইব ॥  
 এপাপ জীবন স'পেছি তাঁরে ।  
 করিব সাধন বল মাঝারে ॥  
 সুনীতি বলেন শুন বাছাধন ।  
 নাহি দিব তোরে প্রবেশিতে বল ॥  
 প্রাণ কি বাঁচিবে না দেখিয়া তোরে ।  
 কোথা যাবি বাপ দুঃখিনী মা ছেরে ॥

হেন মতে মাতা পুত্র দুইজন্ম ৷  
 ক্রমে নানা কথা কৈল আলাপন ॥  
 অস্ত গেল ভানু আইল যামিনী ।  
 আহাৰ কবিয়া পুত্র ও জননী ॥  
 কুটীর ভিতরে শয়ন করিল ।  
 ধ্রুবের নয়নে নিদ্রা নাহি এল ॥  
 সদা চিন্তে পদ পলাস লোচন ।  
 দ্বি-প্রহর নিশি হইল যখন ॥  
 শিশুমতি ধ্রুব করি গাত্রোত্থান ।  
 বলে কোথা পদ পলাস লোচন ॥  
 জননীর পদে করি পরণাম ।  
 বনে চলিলেন ধ্রুব গুণধাম ॥  
 দ্বিপ্রহর নিশি অতি অন্ধকার ।  
 কানর্নে পশিয়া উত্তান কুমার ॥  
 উচ্চৈঃস্বরে বলে হরি দয়াময় ।  
 একবার দেখা দাও হে আমায় ॥  
 মায়েয় মুখেতে শুনি তব গুণ ।  
 এসেছি হে প্রভু করিতে সাধন ॥  
 এইরূপে শিশু সদা হর্ষাস্তরে ।  
 শ্রীপদ পলাস লোচন স্মরে ॥  
 বনে কোন শক করিলে শ্রবন ।  
 আধি মেলি ধ্রুব চাহেন তখন ॥  
 মনে ভাবে বৃষ্টি এই এল হরি ।  
 উচ্চৈঃস্বরে সদা বলে হরি হরি ॥  
 কিছুক্ষণ পরে কোন শক নাই ।  
 কেন্দ্রে বলে শিশু কোথা হে গোসাঞি ॥



আমি অভাজন নাজানি সাধন ।  
 একবার প্রভু দাও দরশন ॥  
 হেন কালে শুন অপূর্ব কথন ।  
 ব্যাঘ্র ব্যাঘ্রি দৌহে ছিল সেই বন ॥  
 ধ্রুব বাক্য শুনি পাপিনী ব্যাঘ্রিনী ।  
 বিনয় স্বামীকে বলিল তখনি ॥  
 প্রভু সপ্ত মাসের গরভ আমার ।  
 ইচ্ছা নরমাংস করিতে আহার ॥  
 শ্রীর বাক্য শুনি ব্যাঘ্র চলিল ।  
 ধ্রুবের নিকটে উপনীত হৈল ॥  
 বিকট বদনে খাইবারে যায় ।  
 গদাধারী হাঁর এমন সময় ॥  
 আসি গদাধাতে ব্যাঘ্রে বিনাশিল ।  
 মহাভক্ত ধ্রুবের জীবন রক্ষিল ॥  
 বিষ্ণু হস্তে ব্যাঘ্র ত্যাজিয়া জীবন ।  
 রথে চড়ি গেল গোলক ভুবন ॥  
 তারিনী কহিছে বদন ভরি ।  
 ভক্তগণ সুবে বল হরি হরি ॥

ধ্রুবের নিকট নারদের গমন ও ধ্রুবকে দীক্ষামন্ত্র প্রদান ।

—:—:—

হেথায় নারদ মুনি ঋষিমণী প্রভাতে ।  
 বীনাতে শ্রীহরিন্দুগুণ গাহিতে গাহিতে ॥  
 হরিনামে মত্ত মুনি হরষ অন্তরে ।  
 হরি দরশনে যান গোলক নগরে ॥

হেনকালে বসি শ্রব একক্রম মূলে ।  
 উঠেঃস্বরে মৃগে সদা হরি হরি বলে ॥  
 শুনিয়া নারদ মুনি ভাবে মনে মনে ।  
 মোর তুল্য ভক্ত কেবা আছে ত্রিভুবনে ॥  
 অমনি নারদ মুনি ধ্যানেন্তেবসিল ।  
 তপেতে এমেছে শ্রব জানিতে পারিল ॥  
 শ্রবের নিকটে মুনি করিল গমন ।  
 মধুবন মাঝে দেখে নানা বৃক্ষগণ ॥  
 নানা চিত্র বিচিত্র উদ্ভান মনোহর ।  
 হায় কি সুন্দর বন দেখিতে সুন্দর ॥  
 মনোহর সরোবরে সুনির্মল জল ।  
 বিকশিত নীলস্নেহতুলোহিত উৎপল ॥  
 ঐক্লম্বিত কুমুদ কঙ্কার কোকনদ ।  
 গুন গুন শব্দে তাহে ভ্রমে ষটপদ ॥  
 সরোবরে শোভে চক্রবাক চক্রবাকী ।  
 রাজহংস রাজহংসী ডাঙ্ক ডাঙ্কী ॥  
 মৃত্তিমান বসন্ত সঙ্গতে ষড়াসন ।  
 ঠিক যেন ধরাধামে নন্দন কানন ॥  
 তথায় যতক মুনি বসি সোপাসনে ।  
 মুদ্রিত নয়নে সদা রত হরি ধ্যানে ॥  
 অতি মনোহর স্থান সেই মধুবন ।  
 সেবন হেরিলে হরি প্রমে মজে মন ॥  
 শ্রবের নিকটে গিয়া ব্রজার নন্দন ।  
 ছলনা করিয়া বলে গুন বাছাধন ॥  
 বিমাতার বাক্যে কেন এসেছ কাননে ।  
 চল মোর সঙ্গে বসাইব সিংহাসনে ॥

নারদের বাক্যে শিশু আনন্দিত মনে ।  
 অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে মুনির চরণে ॥  
 অবোধ বালক ঋষ ভাবিল অন্তরে ।  
 কৃপা করি বুঝি হরি দেখা দিল মোরে ॥  
 ঋষকহে শুন ওহে হরি দয়াময় ।  
 কিকারণে প্রভু মোরে হয়েছ নির্দয় ॥  
 মা'র মুখে তব গুণ শুনিয়া শ্রবনে ।  
 তপস্বী করিতে আমি এসেছি বিগিনে ॥  
 নিশিতে আমারে যদি ব্যাঘ্রে বিনাশিত ।  
 নিষ্কলঙ্ক তব নামে কলঙ্ক হইত ॥  
 নারদ বলেন শুন সুনীতি নন্দন ।  
 "হরি নই" আমি শ্রীনারদ তপোধন ॥  
 শুনি ঋষ কহে মুনি করি নিবেদন ।  
 নিজ গুণে যদি মোরে দিলে দরশন ॥  
 সিংহাসন লাভে মোর প্রয়োজন নাই ।  
 কিরূপে পাইব হরি বলহে গোমাগ্নি ॥  
 নারদ বলেন শুন উত্তান নন্দন ।  
 শ্রীহরির ভক্ত আমি ব্যক্ত ত্রিভুবন ॥  
 আমা হৈতে পাবি বাছা হরির সন্ধান ।  
 আজি তোরে দীক্ষা মন্ত্র করিব প্রদান ॥  
 স্থির চিন্তে সেই মন্ত্র জপিলে হৃদয় ।  
 তোরে তব দেখা দিবে হরি দয়াময় ॥  
 আমার সহিত চল যমুনার তীরে ।  
 বান করাইব মহামন্ত্র (১) দিব তোরে ॥

ধ্রুবেরে লইয়া সঙ্গে বিরিকি নন্দন ।  
 যমুনা পুলিনে গিয়া দিল দরশন ॥  
 স্বয়ং নারদ মুনি করে অক্ষু লইয়া ।  
 অজ্ঞান শিশুকে দিল জ্ঞান করাইয়া ॥  
 নারদ বলিল ধ্রুব শুন মন্ত্র রীতি ।  
 “ওঁ নমো ভগবতে বসুদেবায়” ইতি ॥  
 এই মহা মন্ত্র বাছা জপ (১) সৰ্বকৰণ ।  
 তবে তোরে দেখাদিবে শ্রীমধুসূদন ॥  
 এত বলি মহা মুনি দয়াদ্র হইয়া ।  
 মধুবনে দিল ধ্রুবে কুটীর করিয়া ॥  
 হরি প্রেমে মত্ত হইয়া উত্তান নন্দন ।  
 নারদেরে জিজ্ঞাসিল ধরিয়া চরণ ॥  
 কেমন শ্রীহরি রূপ আমি নাহি জানি ।  
 কিরূপে করিব ধ্যান কহ মহা মুনি ॥  
 তারিণী কহিছে শুন যত ভক্তগণ ।  
 ক্রিক্রিতে শ্রীহরি রূপ করিব বর্ণন ॥

ধ্রুবের নিকটে নারদের শ্রীশ্রীহরির রূপ বর্ণন ।

—:—

আনন্দে নারদ মুনি বলেন তখন ।  
 শ্রীহরির রূপ কহি শুন বাছাধন ॥

(১) জপ ৮ হাজার বারকে বিষ্ণুত রূপে জানিতে চাহিলে মৎসংগৃহীত “শ্রীশ্রী

গুরু তত্ত্বামৃত” ও “শ্রীশ্রীহরি নামামৃত”; পাঠ করন ।

প্রফুল্ল বদন তাঁর দৃষ্টি মনোহর +  
 উন্নত নাসিকা ভ্রু যুগল সুন্দর ॥  
 বিশাল কপোল তাঁর বিশ্ব রূপাধার ।  
 সুরগণ ঘনিরূপ পরম সুন্দর ॥  
 মনোহর বপু নব যৌবন সম্পন্ন ।  
 ওষ্ঠ অধর শোভে দ্বিষং রক্ত বর্ণ ॥  
 পুরুষ লক্ষণ যুক্ত শ্রীবংশ লাঙ্ঘিত ।  
 চতুর্ভুজ বন মাল্য গলে বিরাজিত ॥  
 শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শ্রী করে ধারণ ।  
 রতন কুণ্ডল কর্ণদ্বয় সুশোভন ॥  
 ত্রিভঙ্গ মুরতি হরি মুখে মুদ্রহাস ।  
 কৌন্তভ শোভিত গণ্ড পরা পীতবাস ॥  
 কিঙ্কিনী বেষ্টিত কটী অতি সুশোভন ।  
 সুবর্ণ সুপুর পদে বাজে ঝুন ঝুন ॥  
 জীবের মঙ্গল জন্তু সেই ভগবান ।  
 সর্কদাই সুপ্রসন্ন ভাবে তিনি রন" ॥  
 নারদ বলেন শুন সুনীতি কুমার ।  
 এইরূপ কর ধ্যান হৃদয় মাঝার ॥  
 তবে হরি কৃপা করি দিবে দরশন ।  
 এত বলি গেল চলি ব্রহ্মার নন্দন ॥

শ্রীহরির রূপ বর্ণনের প্রথম দুই পংক্তি ১৬ শেষ ভাগের ছয় পংক্তি বাদে অবশিষ্ট— "চিহ্নিত  
 অংশ শ্রীমদ্ভাগবতের ৬ষ্ঠ স্কন্ধ ৮ম অধ্যায়ের ৪৫-৪৯ শ্লোকের মর্শ্বাসুগারে পদ্মাসুন্দর  
 করা হইয়াছে ।

## শ্রীশ্রীধ্রুব ও শ্রীহরি চরিতামৃত ।

বাঙ্গ। কল্পতরু শ্রীহরির কৃপাবলে ।  
তারিণী রচিত এই গ্রন্থ কুতুহলে ॥

ধ্রুবের অদর্শনে স্ত্রীতীর রোদন ।

—:०:—

ওখায় স্ত্রীতীরে নিশি প্রভাত সময় ।  
পুত্র না হেরিয়া হ'ল উন্মাদিনী প্রায় ॥  
ছনয়নে বান্ধি ধারা বড়ে অনিবার ।  
হা ধ্রুব ! হা ধ্রুব বলি ত্রাসিত অন্তর ॥  
ভূমিতে পড়িয়া রাণী করেন ক্রন্দন ।  
বলে বিধি এত দুঃখ ভাগ্যেতে লিখন ॥  
বিনা দোষে স্বামী মোরে কৈল নির্দাসন ।  
বহু দুঃখে দেখিলাম পুত্রের বদন ॥  
কেন বিধি মোরে আজি নির্দয় হইয়া  
পুত্র মহাধন কেবা চুরি করে নিল ॥  
এইরূপে রঞ্জরাণী করেন ক্রন্দন ।  
হেন কালে, আমি বসে ব্রজার নন্দন ॥  
দুঃখ না ভাবিহ রাণী সম্বর রোদন ।  
তপস্থা করয় বনে তোমার নন্দন ॥  
সাধনোপদেশ আমি দিয়াছি তাহরে ।  
এবে বীর্ভা জানাইতে আইলু তোমারে ।  
মোর বাক্য শুনি দুঃখ ত্যাজ গো স্ত্রীরী ।  
অচিরে তোমার পুত্র লভিবে শ্রীহরি ॥

শুনি রাণী পুত্র শোক কিঁছু পাশরিল ।  
 স্মারদ বিদায় হয়ে সত্বর চলিল ॥  
 যথা বসিয়াছে রাজ্যউত্তান পাদ রায় ।  
 শ্রীনারদ উপনীত হইল তথায় ॥  
 মুনি পদে দণ্ডবৎ করিয়া রাজন ।  
 বসিবারে দিল তারে সুবর্ণ আসন ॥  
 নারদ বলেন রাজ্য করহ শ্রবন ।  
 তপশ্চা করয় বনে তোমার নন্দন ॥  
 বৈষ্ণবের শিরোমণি করেছি তাহারে ।  
 সূত সমাচার দিতে আইনু তোমাগে ॥  
 এত বলি মহা মুনি স্বস্থানে চলিল ।  
 শুনিয়া রাজার মনে আনন্দ বাড়িল ॥  
 বন হৈতে সুনীতিকে আনি নিজালয় ।  
 যতনেতে রাখিলেন উত্তানপাদরায় ॥  
 সুনীতি পুত্রের দুঃখ ক্রমে পাশরিল ।  
 তারিণী কহিছে ভাই হরি হরি বল ॥

ধ্রুবের তপশ্চা ।

—:—

নারদের উপদেশ করিয়া জীবন ।  
 তপশ্চায় রত হইল ধ্রুব যশোধন ॥  
 বৃক্ষ ফল পত্র যাহা পেত কাননেতে ।  
 তাহাই আহাঙ্গ করি রহে কোন মতে ॥

ক্রমে নিদ্রা ক্ষুধা তৃষ্ণা দিয়ে বিসর্জন ।  
 অনিল ভক্ষণ ধ্রুব কৈল আরম্ভন ॥ ১ ৷  
 গ্রীষ্মকালে চারিভিতে বহি প্রজ্বালিয়া ।  
 তপস্বী করয় তার মধ্যেতে থাকিয়া ॥  
 শীতকালে বারি মধ্যে থাকি নিরস্তর ।  
 মহামন্ত্র জপে ধ্রুব হরষ অন্তর ॥  
 ধ্রুবের কঠোর তপ করি দরশন ।  
 যত দেবগণ হৈল বিষাদে মগন ॥  
 ব্রহ্মা বলে ধ্রুব মোর লইবে ব্রহ্মহন ।  
 ইন্দ্র বলে লবে মোর স্বর্গের রাজত্ব ॥  
 ধর্ম্য কহে ধ্রুব মোর অধিকার লবে ।  
 এইরূপে হাহাকার করে মূঢ় সবে ॥  
 পরেতে মন্ত্রনা করি যত দেবগণ ।  
 করিবারে শ্রীধ্রুবের তপস্বী ভঞ্জন ॥  
 বেণুগণ কাছে এক দূত পাঠাইয়া ।  
 রূপবতী পঞ্চবেণু আনিল ডাকিয়া ॥  
 দেবরাজ বলে শুনি হে গনিকাগণ ।  
 মধু বনে তপ করে ধ্রুবমেশোধন ॥  
 মহাভাগবত (১) সেই বিদিত সংসারে  
 সবে মিলে যাও তার তপ ভাঙ্গিবারে ॥  
 ইন্দ্রের বচন শুনি বেণু পঞ্চজন ।  
 মধুবন মকৈ গিয়া দিল দরশন ॥

(১) “এক ভাগবত হয় ভাগবত সারি ।”

আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরস পাত্র ॥



হরি ধ্যানে ছিল তথা যত, মুনিগণ ।  
 বেথাগণে হেরি হৈল কামে অচেতন ॥  
 মধু বন মাঝে, বেগা পকজনে,  
 হেরি যত মুনিদল ।  
 পক শরাঘাতে, উত্ত হইল,  
 দূরে গেল বৃদ্ধিবল ॥  
 মদনের বানে, হইল অচেতন,  
 চলিয়া পড়িল ভূমে ।  
 ত্যাজিয়া জীবন, যেন জীবচয়,  
 বহে যত মহা যুমে ॥  
 ক্রমে বেথাগণ, কব মগ্নিধানে,  
 হইলেন উপনীত ।  
 পঞ্চম বর্গের বালক হেরিগা,  
 সবে হৈল চমকিত ॥  
 এ বলে উহারে, জন ওলো মগ্নী,  
 কব অতি শিশু মতি ।  
 কেমনে আমরা, ভূলাব ইহারে,  
 নাহি জানে মররীতি ॥  
 সকল শরীক, হইয়াছে শীর্ণ,  
 দুন্দুভ তপের ক্রেশে ।  
 দেখি বেথাগণ, লজ্জিত হইয়া,  
 চলিল ইন্দ্রের পাশে ॥  
 দেবগণ মাঝে, যথায় বসিয়া,  
 আছে সুসজ্জ লোচন ।  
 পকবেগা তথা, উপনীত হইয়া,  
 করিতেছে নিবেদন ॥

বেশাগণ বলে স্তন ওহে সুর-রাজ ।  
 ধ্রুবের নিকটে মোরা পাইয়াছি লাজ ॥  
 পঞ্চম বর্ষের শিশু বিহার না জানে ।  
 বল মোরা তারে ভুলাইব কি সন্ধানে ॥

ইন্দ্র কর্তৃক ধ্রুবের তপস্যা ভঞ্জনার্থে মধুবনে বাক্ষসী প্রেরণ ।

—:o:—

হবমে বিষাদ-ইন্দ্র হইল মগন ।  
 ডাক দিয়া আনিল বাক্ষসী একজন ॥  
 ইন্দ্র কহে স্তন ওহে বাক্ষসী সুন্দরী ।  
 মধুবনে এইক্ষেণে যাহ তুরা কবি ॥  
 পঞ্চম বর্ষের শিশু সুনীতি নন্দন  
 ধ্রুব তাব নাম তপ কবে মধুবন ॥  
 ধ্রুবের জননী রূপে প্রবেশি সে বনে ।  
 মায়ায় ভুলায়ে তারে আনহ এখানে ॥  
 ইন্দ্রের আজ্ঞায় চুপ্তা বাক্ষসী কখন ।  
 সুনীতির বেশ ধরী কবিল কখন ॥  
 ক্রমে ক্রমে মধুবনে প্রবেশ করিল ।  
 ধ্রুবের নিকটে গিয়ে কহিতে লাগিল ।  
 গায়ত্রি বাহিছে ত্বার স্নাননে ধাবা ।  
 বলে বাছা ফিরে চাহ স্নানের ভারা ॥  
 তোমার জননী আমি সুনীতি চুঃখিনী ।  
 তোম মুখ না হেরিয়া হৈলু পাগলিনী ॥

শিশুকালে বাছা তোর তপে কিবা ফল ।  
 কোলে আয় যাহুমণি নিজ দেশে চল ॥  
 তোর জগে ওরে বাছা ভ্রমি বনে বনে ।  
 অন্ধতুল্য হইয়াছি নাহেরি নয়নে ॥  
 মামা বলে অঁাধি মেলে ফিরে তুমি চাও ।  
 এক বার স্তম্ভ দুঃ পান করে যাও ॥  
 এইরূপে সে রাক্ষসী করিল বোদন ।  
 তবুনা চাহিল ফিরে প্রনীতি নন্দন ॥  
 তপেতে কয়েছে তার শীল কলেবর ।  
 হৃদ পড়ে হরি ধ্যান করে নিবস্তর ॥  
 নানা মতে সে রাক্ষসী মায়া প্রকাশিল ।  
 তবু নাহি বাহ্য জ্ঞান ধ্রুবের হইল ॥  
 তখনে রাক্ষসী অতি লাজিতা হইয়া  
 বাসব নিকটে বাস্তব জানাইল গিয়া ॥  
 পরে হৈন্দ দেব সহ মন্ত্রণা করিয়া ।  
 গোলোকে চলিল অতি ত্রাসিত হইয়া ॥

ধ্রুবের তপস্যা দর্শনে ভীত হইয়া দেবগণের  
 গোলোকনাথের নিকট গমন ।

— ৩০ —

মন্ত্রণা করিয়া ইন্দ্র আদি দেবগণ,  
 অত্যন্ত বিরস মনে, একত্রেতে সর্বজনে,  
 গোলোক ভুবনে গিয়া দিল দর্শন ।

দেখি লক্ষ্মী জিজ্ঞাসিল যত দেবগণে ।

শুন শুন দেবগণ, ইন্দ্র চন্দ্র হত্যাশপ,  
গোলোকে আইলা সবে কোন প্রয়োজনে ॥

শনিয়া রমার বাণী বলে সুরগণে ।

শুন গো মা নিবেদন, যে কারণে দেবগণ,  
একত্র হইয়া আইনু গোলোক ভুবনে ॥  
মধুবনে তপ করে প্রব যশোধন ।

উত্তান রাজার সূত, অতিরূপ গুণ যুত,

তাঁহার তপের কথা না যায় বর্ণন ॥

পবন আহাৰ করে তাজি অনাহার ।

ঐশ্বকালে বহি জ্বলে, রহে তার মধ্য স্থলে,

হেরি যত দেবতার লাগে চমৎকার ॥

পঞ্চম বর্ষের শিশু নাহি বাহ্য জ্ঞান ।

নয়ন মুদিয়া থাকি, হৃদয়ে কমলআঁখি,

ভক্তি ভাবে দিব্য নিশি করিতেছে ধ্যান ॥

তাঁর তপ দেখি মোরা হইয়াছি ভীত ।

বুঝি তাঁর তপ হেরি, রমা পতি রূপা দার,

আমাদের অধিকার দিবেন নিশ্চিত ॥

অতএব মাতা, কোথা আছে হরি ।

শুনহ মম বচন, লক্ষ্মী বলে দেবগণ,

চিন্তা নাহি যাহ সবে নিজ নিজ পুরী ॥

সর্ব উর্দ্ধে করে হরি পুরী নিরমাণ ।

বুঝি শ্রুত কৃপা করি,                    সেই রত্নময় পুরী,  
 নবীন তপস্বী ধ্রুবে করিবে প্রদান ।  
 শুনি যত দেবগণ আনন্দে মোহিল ।  
 লক্ষ্মীকে প্রণাম করি,                    গেল নিজ নিজ পুরী,  
 তারিণী কহিছে ভাই হরি হরি বল ॥

### ধ্রুবলোক নিৰ্মাণ ।

—:৩০:—

এদিকে শ্রীভগবান আনন্দিত হইয়া ।  
 সুর-শিল্পিকার বিগ্ৰহকন্ঠকে লইয়া ॥  
 নবগ্রহ চন্দ্র সূর্য্য সপ্তাষি উপর ।  
 ধ্রুব লোক নিৰ্ম্মাইল পরম সুন্দর ॥  
 পদ্মরাগ, নীলকান্ত, আদি মণি যত ।  
 লেখা জোখা নাহি তার নাম লব কত ॥  
 নানা রত্ন দিয়া নিৰ্ম্মাইল ধ্রুবাগার ।  
 স্থলে স্থলে মণি জ্বলে হরে অঙ্ককার ॥  
 এইরূপে ধ্রুবলোক নিৰ্ম্মাণ করিয়া ।  
 উপনীত হৈল হরি গোলোকতে গিয়া ॥  
 শ্রীহরি লক্ষ্মীকে হেরি অতি ক্রোধ যুক্ত ।  
 জিজ্ঞাসা কছিল প্রভু হ'য়ে শশব্যস্ত ॥  
 কহ প্রিয়ে কি কারণে এত ক্রোধ মন ।  
 লক্ষ্মী বলে ভগবান করহ শ্রবণ ॥

পঞ্চম বর্ষের শিশু ধ্রুব যশোধন ।  
 কঠোর তপস্বী করে বসি মধুবন ॥  
 ক্ষুধা তৃষ্ণা ত্যজি করে পবন আঁহার ।  
 তপেতে হয়েছে শীর্ণ তাহার কলেবর ॥  
 ধ্রুবের দুষ্কর তপ করি দরশন ।  
 ব্রহ্মা ইন্দ্র সূর্য চন্দ্র কুবের পবন ॥  
 যত দেবগণ অতি ত্রাসিত অন্তরে ।  
 জানাইতে এসেছিল গোলোক নগরে ॥  
 তোমাকে না হেরি তারা ওহে চক্রপাণি ।  
 মোরে জানাইল সবে হুংখের কাহিনী ॥  
 ব্রহ্মা বলিলেন মাগো করহ শ্রবণ ।  
 মধুবনে তপ করে উত্তান নন্দন ॥  
 বৃষ্টি তার তপে হরি সদয় হইবে ।  
 রূপা করি তারে মোর অধিকার দিবে ॥  
 এইরূপে একে একে যত দেবগণ ।  
 জানাইল সবে মোবে হুংখের কারণ ॥  
 লক্ষ্মী বলে প্রভু তুমি পাষণ সমান ।  
 দয়া নাহি তোমার শরীরে ভগবান ॥  
 মোর তপে যায় যদি ধ্রুবের জীবন ।  
 ভক্তাধীন নাম তবে ধর কি কারণ ॥  
 আঞ্জা কর যাই আমি ধ্রুবের সদন ।  
 কোলেতে বসায়ো তারে পিয়াইব স্তন ॥  
 তারিণী কহিছে মাগো কবি নিবেদন ।  
 চরম সময় মোরে দিও দরশন ॥

কণ্ঠরোধ করে যদি ছুরস্ত সমন ।

পুত্র বলে ক্রোড়ে তুলে মুখে দিও স্তন ॥

ধ্রুবের শ্রীহরি দর্শন ও বরপ্রাপ্তি ।

—:০:—

লক্ষ্মীর বচন শুনি শ্রুত নারায়ণ ।

রমা সহ গরুড়ে করিল আরোহণ ॥

অনিল গমনে পক্ষী গমন করিল ।

মধু বনে ধ্রুব স্থানে উপনীত হ'ল ॥

ভগবান বলে শুন বিনতা নন্দন ।

ডাকহ ধ্রুবকে বর দিব এইক্ষণ ॥

হরির আজ্ঞায় পক্ষী ডাকিতে লাগিল ।

কিন্তু ধ্রুব কিছু নাহি উত্তর করিল ॥

বাহুজ্ঞান নাহি শিশু ঐকান্তিক মনে ।

মন প্রান সঁপিয়াছে শ্রীহরি চরণে ॥

হরি পদে মন তার ডুবিয়া আছিল ।

একারণ ধ্রুব কোন্‌বাক্য না বলিল ॥

তখনে বিনতা স্তম্ভ ভাবে মনে মন ।

মরিত্যাছে বুঝি ধ্রুব নাহিক চেতন ॥

হরির চরণে পক্ষী কৈল নিবেদন ।

নিশ্চয় স্বটেছে শ্রুত ধ্রুবের মরণ ॥

ভগবান বলে শুন বিনতা নন্দন ।

আমার চরণে ধ্রুব সঁপিয়াছে মন ॥

হরি পদে ধীর মন, মগ্ন হ'য়ে রয় ।  
 জনম মরণে তার নাহি কোন ভয় ॥  
 এত বলি রমা সহ প্রভু নারায়ণ ।  
 ধ্রুবের নিকটে গিয়া দিল দরশন ॥  
 অন্তরে যেরূপে ধ্রুব হরি চিন্তা করে ।  
 হরি সেইরূপে দেখা দিলেন বাহিরে ॥  
 অন্তরে না হেরি হরি কাঁদিতে লাগিল ।  
 অমনি শ্রীলক্ষ্মী ধ্রুবে কোলে তুলে নিল ॥  
 ক্রমেতে সুনীতি সূত লভিল চেতন ।  
 আনন্দ অন্তরে লক্ষ্মী পিয়াইল স্তন ॥  
 বপু হইয়াছে শীর্ণ তপশ্চা কারণ ।  
 এজন্ত ধ্রুবের মুখে নাঙ্কুরে বচন ॥  
 ধ্রুব মনে ভাবে হরি সদয় হইল ।  
 নারদের বাক্যে বুঝি মোরে দেখা দিল ॥  
 ভক্তাধীন ভগবান জানিয়া অন্তরে ।  
 পাক জন্ত শঙ্খ স্পর্শ করাল ধ্রুবেরে ॥  
 সুনীতি নন্দন তাহে বলবান হৈল ।  
 দেখি হরি নিজ ক্রোড়ে তুলিয়া লইল ॥  
 তখনে বালক ধ্রুব হরিকে হেরিল ।  
 প্রেম অশ্রুনিরে তার শরীর ভাসিল ॥  
 ভগবান্ বলে শুন ঠিক্তান নন্দন ।  
 কোন বর চাহ তুমি বল বাছাধন ॥  
 ধ্রুব কহে বরে মোর নাহি প্রয়োজন ।  
 রত্ন লভিলাম করি কাচ অযেষণ ॥ (১)

(১) ব.চং বিচিৎস্রাপ দিব্য রত্নম্ স্বামিন্ কৃতার্থোন্নি বরং ন যাচে ॥



ভক্তি স্ততি নাহি জানি আমি অভাজন ।  
 দাস বলে রূপাদৃষ্টি রেখ সর্সকণ ॥  
 বৃথা সুখ সম্পদে নাহিক প্রয়োজন ।  
 ভরসা কেবল তোমার যুগল চরণ ॥  
 ধ্রুবে বচন শুনি বলে সাবোদ্ধার ।  
 রাজ্য করছ বর্ষ ছত্রিশ হাজার ॥  
 চরমে শ্রীধবলোকে করিছ গমন ।  
 এখন বাজ্য কর সুনীতি নন্দন ॥  
 এব বলে ওহে প্রভু করি নিবেদন ।  
 স্মরণ করিব যবে দিও দরশন ॥  
 “তথাত্ত” বলিয়া হরি গমন করিল ।  
 গোলোক ভুবনে গিয়া, উপনীত হইল ॥  
 তারিণী কহিছে ধব চল নিজ পুরে ।  
 একবার দেখা দাও তু বিনী মায়েরে ॥

তপস্বাস্তে ধ্রুবে নিজালয়ে গমন ।

স্বার্থ্য সাধন করি সুনীতি নন্দন ।  
 হর্ষাত্তরে নিজপুরে করিল গমন ॥  
 হরি প্রেমানন্দে তার পুলক শরীর ।  
 মধুস্নেহে ক্রমে হইল বাহির ॥  
 উচ্চৈশ্বরে হবি গুণ গাহিতে গাহিতে ।  
 প্রবেশ করিল এব আপন দাজ্যেতে ॥

উদ্ভান সংবাদ পেয়ে আনন্দিত হৈল ।  
 ক্রবকে আনিতে রথ হস্তী পাঠাইল ॥  
 অগ্রে চলে অগণন পদাতিক ঢালী ।  
 মনোহর অশ্ব পৃষ্ঠে যত মহাবলী ॥  
 ক্রবের নিকটে গিয়া দিল দরশন ।  
 কর যোড় করি সবে করে নিবেদন ॥  
 রথ লয়ে মোসবারে রাজা পাঠাইল ।  
 রথে চড়ি ওহে ক্রব নিজপুরে চল ॥  
 এবাক্য শ্রবণে ক্রব রথারূঢ় হৈল ।  
 পিতার নিকটে গিয়া দরশন দিল ॥  
 পিতাকে প্রণমি শিশু বলেন তখন ।  
 শুন শুন ওহে পিত করি নিবেদন ॥  
 মোর ঘোর তপে হরি দরশন দিরা ।  
 বর দান কৈল মোরে কোলেতে লইয়া ॥  
 শুনিয়া রাজার মনে আনন্দ বাড়িল ।  
 অন্তঃপুরে গিয়া ক্রত রাণীকে কহিল ॥  
 তপ করি হরিপদ করি দরশন ।  
 নিজাণয়ে আসিশাছে তোমার নন্দন ॥  
 দেখিতে বাসনা যদি কর এইক্ষণে ।  
 আমার সহিত চল ক্রবের সদনে ॥  
 শুন রাণী রাজা সহ আনন্দিত মনে ।  
 উপনীত হৈল ক্রত ক্রম সমিধানে ॥  
 জননী দেখিয়া ক্রব ওষধ কৈল ।  
 বিনয়ে মায়ের কাছে বলিতে লাগিল ॥  
 কঠোর তপস্যা কৈনু গিয়া মধুঘন ।  
 কৃপা করি মোরে হরি দিল দরশন ॥

স্তনিয়া সুনীতি অতি আনন্দিত হৈল ।  
 কোলেতে লইয়া ধবে জিহ্বাসা করিল ॥  
 আমার বচন শুন ওরে বাছাধন ।  
 দেখাইতে পার মোরে শ্রীমধুসূদন ॥  
 মার বাক্য শুনি ধব বদিল ভখন ।  
 দেখাব শ্রীহরি মাথো চল মধুবন ॥  
 শুনি সুনীতির মনে আনন্দ বাড়িল ।  
 পুত্র সহ মধু বনে উপনীত হৈল ॥  
 ধব বলে কোথার'লে দীনবন্ধু হরি ।  
 একবার দাসে দেখা দাও কৃপা করি ॥  
 ভক্তাধীন ভক্তমান রক্ষার কারণ ।  
 চারু চতুর্ভুজ মঙ্গল দিগন্ত ভ্রমণ ॥  
 উনবিংশ চিত্র ( ১ ) যুক্ত প্রভুর চরণ ।  
 মাতা পুত্র দুইজনে করি দর্শন ॥  
 হরি প্রেমানন্দে দৌড়ে উগ্রভ হইল ।  
 হৃদিপদে শত শত প্রণাম করিল ॥  
 সুনীতি বলেন শুন প্রভু নারায়ণ ।  
 পুত্রের গুণেতে হেরি তোমার চরণ ॥  
 ভগবান বলে ধব শুন মন দিয়া ।  
 ছত্রিশ হাজার বর্ষ রাজত্ব করিয়া ॥  
 অহুতকালে ধব হোলে কবিহু যমে ১  
 এত বলি গোপেশ্বরেতে গেল নারায়ণ ॥  
 সুনীতি সঁহিত কুব নিজপুরে গেল ।  
 শুক শুন ভক্তগণ, পরে যাহা হৈল ॥

( ১ ) হরি নামানুভবের টাকার প্রস্তাব ।

উত্তান রাজার যিনি সুরুচি রমণী ।  
 প্রবেশ তপের কথা শুনিলেন তিনি ॥  
 এক পুত্র ছিল তাঁর উত্তম নামেতে ।  
 তপস্যা করিতে তাঁরে পাঠাল বনেতে ॥  
 ভ্রামণ বিপিনে গিয়া তপ আরম্ভিল ।  
 কিছু দিনান্তরে তাঁরে যক্ষে বিনাশিল ॥  
 বহু দিন গত হৈল উত্তম না এল ।  
 সুরুচি পুত্রের জন্মে বনে প্রবেশিল ॥  
 দাতিনী হিংসন পাপে মৃত্যু হৈল তাঁর ।  
 পরে উত্তান পাদ করে দিয়া রাজ্যভার ॥  
 বিপিনে তপস্যা করি জীবন ত্যাজিল ।  
 হরির রূপায় রাজা ববলোকে গেল ॥  
 হরি বিনে ত্রিভুবনে অস্ত গতি নাই ।  
 তারিণী করিছে হরি হরি বল ভাই ॥

প্রবেশ সড়হ্রিংশ সহস্র বর্ষ রাজত্ব করণে ।

— ১০০ —

১২

রাজত্ব করেন পরে ধন যশোধন ।  
 তাঁহার যত্নে গুণ না যায় বর্জন ॥  
 দিনে দিনে বাড়ে ধন ইন্দ্র মতন ।  
 পুত্র তুলা প্রজাগণে করেন পালন ॥  
 সৌন্দর্য দরিদ্রে সদা করে দান দান ।  
 ধনৈব সমান কেহ নাহি পুণ্যবান ॥

জীব হিংসা নাহি তাঁর অহুরে কখন ।  
 সর্ক জীবে সমভাবে করে দরশন ॥  
 স্ত্রী মিত্র তাঁর কাছে সকলি সমান ।  
 অভিমান শূন্য দেয় পরকে সম্মান ॥  
 ধ্রুবের পালনে প্রজা আনন্দে মগন ।  
 ধ্রুবরাজ্যে হরি ভক্ত হৈল সর্কজন ॥  
 রোগ, শোক, নাহি তথা অকাল মরণ ।  
 নানা মত সুখ সদা ভুঞ্জে প্রজাগণ ॥  
 শিশুমার নামে রাজ্য ক্রমি কণ্ঠ্য তার ।  
 বিবাহ করিল তাঁরে ধ্রুব গণাধার ॥  
 কামি গর্ভে জন্মে দুই পুত্র নিরুপম ।  
 কল্প ও বঃ সর নামে গুণে ধ্রুব সম ॥  
 ধ্রুবের ছোট পমণী বাবু কুমারী ।  
 ইলাবতী নামে সস্তীরপা বিদ্যা ধরি ॥  
 তাঁর এক পুত্র হৈল ঐঃ কল নামেতে ।  
 এই তিন পুত্র ধ্রুবের বিখ্যাত জরতে ॥  
 পুত্রগণে করি ধ্রুব স্বরাজ্য প্রদান ।  
 হৃদয় মায়াধারে সদা চিন্তে ভগবান ॥  
 ধ্রুবের রাজ্যে সর্ক পূর্ণ হয়ে এল ।  
 তাঁরীণী করিছে ধ্রুব ধ্রুবলোকে চর ॥

## ଶ୍ରୀଶ୍ରବଙ୍କର ଶ୍ରବଲୋକପ୍ରାପ୍ତି ।

— ୧୧ —

କ୍ରମେ ଛତ୍ରିଶ ହାଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ ହେଲ ।  
 ଅର୍ଣ ରଥ ଲୟେ ଦୁହି ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତ ଏଲ ॥  
 ସୁନନ୍ଦ ଓ ନନ୍ଦ ନାମେ ଅତି ରୁପବାନ ।  
 ଚତୁର୍ଭୁଜ ମୂର୍ତ୍ତି ଦୋହେ ବିଷ୍ଣୁ ର ସମାନ ॥  
 ଅର୍ଣମଣି ଶ୍ରବଙ୍କର ପଦେ ନିବେଦନ କେଲ ।  
 ଅର୍ଣ ରଥେ ଚଢ଼ି ରାଜା ଶ୍ରବ ଲୋକେ ଚଲ ॥  
 ଆଜ୍ଞା କରେଛେନ ହରି ମୋ ସବାର ପ୍ରୀତି ।  
 ଶ୍ରବେ ଲୟେ ଶ୍ରବ ଲୋକେ ଏସ ଶ୍ରୀଶ୍ରଗତି ॥  
 ନୂତନ ବଚନେ ଶ୍ରବଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ବାଞ୍ଛିଲ ।  
 ଶ୍ରୀ ହରି ଓ ଜନନୀ ଲୟେ ରଥାରୁଢ଼ ହେଲ ॥  
 ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତେ ଶ୍ରବ ଶ୍ରୀହରି ଚରଣ ।  
 ହିରଣ୍ୟ ରୂପ ପରେ କରଲ ଧାରଣ ॥  
 ଅର୍ଣ୍ଣର ରଥ ଖାନି ବଳ ମଳ କରେ ।  
 ଶ୍ରବ ଲୋକେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳିଲ ବାହୁଭରେ ॥  
 ଅର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗେ ଥାକିଣା ଯତେକ ଦେବଗଣ ।  
 ଶ୍ରବଙ୍କର ଉପରେ କରେ ଅର୍ଣ୍ଣବର୍ଷଣ ॥  
 ନର୍ତ୍ତକେ ଗାହିଛେ ଗୀତ ବାଜାୟେ ମୃଦଙ୍ଗ ।  
 ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷ ସବେ ପୁଲକିତ ଭଙ୍ଗ ॥  
 ଶ୍ରବଙ୍କର ଯତେକ ଶୁଣ କରଣୀ ଅରଣ ।  
 ହା ଶ୍ରବ ! ହା ଶ୍ରବ ବଳେ କାନ୍ଦେ ଅଜାଗଣ ॥  
 ହରି ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ଶ୍ରବ ମତ୍ତ ସର୍ବକ୍ଷଣ ।  
 କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଶ୍ରବ ଲୋକେ ଦିଲ ଦରଶନ ॥

ধ্রুবকে হেরিয়া হরি আনন্দ অন্তরে ।  
 সিংহাসনে বসাইল ডানি হস্ত ধরে ॥  
 ভগবান্ বলে শুন, হুনীতি নন্দন ।  
 তোমার সমান ভক্ত নাহি কোন জন ॥  
 তোর ভক্তি ডোরে আমি বাধা সর্বক্ষণ ।  
 যখন ডাকিবি মোর পাবি দরশন ॥  
 মহা সুখে ধ্রুবলোকে রহ বাছাধন ।  
 জন্ম মৃত্যু ভয় তোর নাহিক কখন ॥  
 এত বলি ভগবান গমন করিল ।  
 গোলোক ভুবনে গিয়া উপনীত হৈল ॥  
 ধ্রুব লোকে রহে সুখে শ্রী ধ্রুব রাজন ।  
 তথায় যতেক সুখ না যায় বণন ॥  
 বার মাস সেখানে বসন্ত মুক্তিমান ।  
 দিবা নিশি করে সবে হরি গুণ গান ॥  
 জন্ম মৃত্যু ভয় তথা নাহিক কখন ।  
 সদা নিত্যানন্দময় যত জীবগণ ॥  
 ধ্রুবের চরিত্র যেই ব্রাহ্মণ সভায় ।  
 গায় সুশ্রুভাতে সাসং কালে পুর্ণিমায় ।  
 দ্বাদশী ও স্রাবণা শ্রবণা নকত্রে ।  
 ত্র্যহস্পর্শ ব্যতিপাত আর সংক্রান্তিতে ॥  
 কিসা রবিবারে শুদ্ধ চিত্তে যেই জন ।  
 ● শ্রী ধ্রুব চরিত্র কুরে শ্রবণ পঠন ॥  
 তার প্রতি ভগবান্ সর্বদা সন্তুষ্ট ।  
 ক্রমে নাশ হয় তার সংসারের কষ্ট ॥  
 হরি পদে হয় শুদ্ধ ভক্তির উদয় ।  
 চরম সময় তার দিকি লাভ হয় ॥

ভাগবত বাক্য ইথে নীহিক সংশয় ।  
 চতুর্থ স্কন্ধেতে দেখ দ্বাদশ অধ্যায় ॥  
 হরি হরি বল ভাই নামকর সার ৷  
 হরি বিনে ত্রিভুবনে বন্ধু নাহি আর ॥  
 তরিতে এ ভব দিঙ্কু থাকে যার মন ৷  
 তারিণী বহিছে ভজ শ্রীহরি চরণ ॥  
 শ্রীশ্রীধ্রুব চরিতামৃত সম্পূর্ণ ।

## শ্রীশ্রী প্রহ্লাদ চরিতামৃত ।

( জয় বিজয়ের অম্বররূপে জন্ম গ্রহণ । )

—:—

শ্রীজয় বিজয় নামে ভাই দুইজন ।  
 শ্রীবিষ্ণু দ্বারি ছিন বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥  
 একদিন ভৃগু মুনি আনন্দিত মনে ।  
 বিষ্ণু দরশনে গেল বৈকুণ্ঠ ভুবনে ॥  
 হরি প্রেমে মত্ত মুনি হরষ অন্তরে ।  
 জয় বিজয়েরে বলে দাঁড় দ্বার ছেড়ে ॥  
 শুনি জয় বিজয় মুনিকে রাধি দ্বারে ।  
 অনুমতি জ্ঞে গেল বিষ্ণুর গোচরে ॥  
 একারণ, কিছুক্ষণ শিগম হইল ।  
 মনে মনে ভৃগু মুনি ক্রোধেতে জ্বলিল ।  
 নির্দয় হইয়া মুনি দিল অভিশাপ ।  
 মহীতে জন্মিয়া দৌছে ভুঞ্জ গিয়া পাপ ।



স্তনি ভয়ে দ্বারি দয় কান্দিতে কান্দিতে ।  
 বিষ্ণুর নিকটে গিয়া লাগিল কহিতে ॥  
 পুরে প্রবেশিতে চাহে ভৃগু মুনিবর ।  
 তব আক্ষা বিনে প্রকু না ছাড়িহু দ্বার ॥  
 একারণ ভৃগু মুনি ক্রোধিত অহরে ।  
 শাপ দিল দৌহে জন্ম লহ মত্তা পুরে ॥  
 স্তনি বিষ্ণু বলে জয় বিজয় হু ভাই ।  
 দ্বিজ বাক্য লজ্জিবারে মোর সাধ্য নাই ॥  
 ভৃগু শাপে জন্ম হবে মরত ভুবনে ।  
 একারণ মিছে দুঃখ না ভাবিহ মনে ॥  
 মিত্র ভাবে যদি দৌহে ভজ হ আমায় ।  
 তবে সপ্ত জন্ম পরে আসিবে হেথায় ॥  
 কিন্তু শক্রভাবে মোরে ভাবিলে অন্তরে ॥  
 বৈকুণ্ঠে আসিবে দৌহে তিন জন্ম পরে । (১)  
 তখনে প্রণাম করি বিষ্ণুর চরণে ।  
 কান্দিয়া চলিল দৌহে মরত ভুবনে ॥  
 কষ্ণপ মুনির পত্নী দিত্তির উদরে ।  
 হিরণ্যকশিপু হিরণ্যাক্ষ নাম ধরে ॥  
 জনমিল হুই ভাই শাপের কারণে ।  
 কিন্তু পূর্ক জন্ম কথা সদা ছিল মনে ॥  
 একারণে হুই জনে আনন্দ অন্তরে ।  
 দেব দ্বিজ শ্রীবিষ্ণুর হিঃসা করি দ্বারে ॥

(১) জন্ম বিজয় ভগবানের সহিত শক্রভাবণ করিয়া তিন ভ্রমই উদ্ধার হইয়া  
 ছিলেন যথা:— (ক) হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ, (খ) রাবণ, কৃতবর্ন (গ) শিশুপাল  
 ও দত্তবক্র ।

বরাহ মুরতি ধরি প্রভু ভগবান ।  
 বিনাশ করিল হিরণ্যাক্ষের পরাণ ॥  
 তাহাতে কশিপু দৈত্য ক্রোধিত হইল ।  
 লভিতে অমর বর ঘোর তপ কৈল ॥  
 কশিপুর তপে তুষ্ট হ'য়ে দেব অজ ।  
 বলে বাছা বর লও ঘোর তপ ত্যজ ॥  
 দৈত্য বলে "মৃত্যু যেন না হয় আমার ।"  
 জলে স্থলে িবারাত্রে স্থপ্তিতে তোমার ॥  
 শুনি ব্রহ্মা সেই বর দিল হর্ষান্তরে ।  
 তবু কশিপুর তাহে সন্দেহ অন্তরে ॥

মহা বৈষ্ণব প্রহ্লাদের জন্ম ও তাঁহার হরি ভক্তি প্রকাশ ।

—:—

অমর হইতে দৈত্য করি দৃঢ় পণ ।  
 পুনর্বার, কৈল ঘোর, তপ আরম্ভণ ।  
 সেই কালে তার ভার্য্যা কায়াধু হৃন্দরী ।  
 হর রাজ হরি তাহে নিল হর পুরী ॥  
 পঞ্চ মাসের গর্ভবতী আছিল তখন ।  
 ইচ্ছিলেন ইন্দ্র তাঁর নাশিতে জীবন ॥  
 হেনকালে জন সবে অপূর্ষ কখন ।  
 উপনীত হৈল তথা ব্রহ্মার নর্দন ॥  
 নারদ বলেন শুন কথুপ তনয় ।  
 রমণী বিনাশ করা উপযুক্ত নয় ॥

পঞ্চমাসের গর্ভবর্তী করিষ্ণু সূন্দরী ।  
 না বধিয়া ইঁহাকে পাঠাও নিজপুরী ॥  
 বিশেষ বৃত্তান্ত কহি শুন সাব হিতে ।  
 হরি ভক্ত পুত্র আছে ইঁহার গর্ভেতে ॥  
 বৈষ্ণবের চূড়া মণি জন্ম বিষ্ণু অংশে ।  
 নররূপে অবতীর্ণ হবে দৈত্য বংশে ॥  
 শুনি দেবরাজ অতি বিমাদ অন্তরে ।  
 কুয়াধুরে পাঠাইয়া দিল নিজ পুরে ॥  
 ক্রমে কয়াধুর দশমাস পূর্ণ হৈল ।  
 শুভক্ষণে দৈত্য পত্নী পুত্র প্রসবিল ॥  
 প্রথমে জন্মিল পুত্র মনেতে আফ্লাদ ।  
 অতএব তাঁর নাম রাখিল প্রফ্লাদ ॥  
 জন্ম মাত্রে চিন্তে শিশু শ্রীহরি অন্তরে ॥  
 তাঁর হৃদে সদা হরি বাধা ভক্তি ডোরে ॥  
 ক্রমে কয়াধুর আর তিন পুত্র হৈল ।  
 সংফ্লাদ, অনুফ্লাদ, ফ্লাদ নাম রাখিল ॥  
 যখনে শ্রীপ্রফ্লাদের পঞ্চ বর্ষ হৈল ।  
 বিদ্যা শিখাট্টিতে দৈত্য মনেতে ভাবিল ।  
 শুক্রাচার্য্য সৃষ্টি ষণ্ডা মার্ক দুই ভাই ॥  
 প্রফ্লাদেরে বিদ্যাভাসে দিল তাঁর ঠাই ॥  
 সুভ বারে শিশু করে ষণ্ড দিল খড়ি ।  
 কান্দেন প্রফ্লাদ মদ্য "ক" ( ১ ) বরণ হেরি ॥

• (১) বোধ হয় প্রফ্লাদ ক অক্ষর ময় শ্রীভদ্রবাহকে দর্শন করিয়াই হরি প্রেমের উদয় হইয়া বোধন করিয়াছিলেন যথা :—

• "ককারে পুরুষঃ কৃষ্ণঃ সক্তিদানন্দ বিগ্রহঃ ।"

ইতি গৌতমী তন্ত্র

প্রহ্লাদেদের বঁলে ষণ্ডামার্ক দুই ভাই ।  
 কি জন্তে রোদন কর কহ বাছা তাই ॥  
 কর যোড়ে শ্রীপ্রহ্লাদ বলেন তখন ।  
 “ক” অক্ষর প্রভুর যে আন্যাক্ষর হ’ন ॥  
 শুনি ষণ্ডামার্ক দৌহে শিরে দেয় হাত ।  
 বলে বিধি ষটাইল কেমন উৎপাত ॥  
 যে নাম বলিতে রাজা নিষেধ করেছে ।  
 সেই নাম বলি শিশু রোদন যুড়িছে ॥  
 পরে ষণ্ডামার্ক দৌহে সদা সাবহিতে ।  
 প্রহ্লাদে পড়ায় তাঁরা অতি যতনেতে ॥  
 ক্রমে বেদ পুরাণাদি সকল শিখিল ।  
 উচ্চৈঃস্বরে বলে মদ্য হরি হরি বল ॥  
 গুরু যদি কোন স্থানে করেন গমন ।  
 অগ্ন্যাগ্ন ছাত্রকে কহে প্রহ্লাদ তখন ॥  
 কি কর হে ভাতৃগণ ! মিছে দিন গেহ ।  
 অন্তিমে তরিতে যদি হরি হরি বল ॥  
 হরি বিনে ত্রিভুবনে বন্ধু কেহ নাই ।  
 অথ চিন্তা পবি হরি হরি বল ভাই ॥  
 কৃতান্ত কিঙ্কর যবে করিবে বন্ধন ।  
 হরি বিনে কে রক্ষিবে বলহে তখন ॥  
 অতএব লও সবে হরি পদাশ্রয় ।  
 কভু না রহিবে আরি প্রম মৃত্যু ভয় ॥  
 নিত্য নিত্য শ্রীপ্রহ্লাদ সঙ্গিগণ সঙ্গে ।  
 এইরূপে হরি কক্ষা কহে ঋনো রঙ্গে ॥  
 পরে এক দিন ষণ্ডামার্ক নাহি ঘরে ।  
 অথ অথ ছাত্রগণে কহে প্রহ্লাদেবর ॥

না শুম গুরুন্ন বাণী পিতাকে না মান ।

রসনায় যথা হরি নাম বল কেন ॥

কালী কিম্বা শিব দুর্গা যারে ইচ্ছা হয় ।

ছাড়িয়া হরির নাম ভজহ তাঁহায় ॥

প্রহ্লাদ বলেন আমি না ভজিব আন ।

জীবন মরণে মোর প্রভু ভগবান ॥

শিব শিবা আদি যত দেব দেবীগণ ।

একমাত্র হরি হৈতে সকলে উৎপন্ন ॥

শ্রীহরির উপাসনা করিলে আদ্য ।

তাহাতেই সৰ্বদেবের উপাসনা হয় ॥

অতএব ভগবান সকলের আদি ।

তাঁর পাদপদ্ম আমি ভজি নিরবধি ॥ (১)

হরি হরি বল ভাই কুতর্ক ছাড়িয়া ।

ধন্য হরি নাম জীব নিস্তার লাগিয়া ॥

“সৰ্ব ভূত ময়ো হরিঃ” এই ভূমণ্ডলে ।

নানারূপ ধরে মাত্র লীলা খেলা ছলে ॥

অসার সংসারে কেহ কার বন্ধু নয় ।

জীবনান্ত হৈলে হুঙ্কর সসন্ধ বিলয় ॥

দিবসেও জীবগণে ভাবে মনে মন ।

মোহ ভাষ্যা মোর পুত্র এ ধন কাঞ্চন ॥

নিদ্রার সময় যেন তাহা ভুলি যায় ।

সেইরূপ এ সংসার জানিবে নিশ্চয় ॥

শ্রীহরির গুণ ভাই জনের অতীত ।

যথা সাধ্য করিলাম মাহাত্ম্য কিঞ্চিত ॥

(১) শ্রীহরি ভক্তন মাহাত্ম্য সন্দর্ভে বিস্তৃত বিবরণ মং সংগৃহীত “শ্রীশ্রীহরি প্রজামৃত”  
এস্থে দেখুন ।



পাপ কশ্মীরে রত, জ্বাছহ সতত,  
নাহি চিন্তা ভগবানে ॥

শুনে হুঃখে মরি, সে তোমার অরি,  
যিনি সকলের বন্ধু ।

বস্ত গুণ তাঁর, জীবৈ বুঝা ভার,  
অপার করুণা সিদ্ধ ॥

কঁারে না চিন্তিয়া, রয়েছ মজিয়া,  
ধন মদে হয়ে মত্ত ।

নাহি তও জ্ঞান, অজ্ঞান সমান,  
ভুলিয়াছ সার তত্ত্ব ॥

যে দিমে জীবন, হইবে পাতন,  
এ ধন কি সঙ্গে যাবে ।

পুত্র পরিবার, কেহ নহে কার,  
সকল পড়িয়া রবে ॥

এ দেহ ফেলিয়া, যাইবে চলিয়া,  
দেহের মালিক যিনি ।

পঞ্চ ভূত সহ, লয় হবে দেহ,  
রবেনা কিছু তখনি ॥

অতএব পিতা, ভজ সেই ত্রাতা,  
পাবে মুক্তি মহাধন ।

জনম মরণ, হবে না কখন,  
চিন্তা হইব শ্রীচরণ ॥

ভনি মহারাজা, হয়ে মহাতেজা,  
করি দস্ত করমড় ।

